কিশোর কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর কর্নেল সমগ্র

৩

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কর্নেলের প্রিয় পাঠকদের
করকমলে

লেখকের অন্যান্য বই

কর্নেল সমগ্র (১-১২)
কিশোর কর্নেল সমগ্র (১ম, ২য়)
নেপথ্যে আততায়ী
দেবী আথেনার প্রত্নরহস্য
লালুবাবু অন্তর্ধান রহস্য
কর্নেলের একদিন
নিষিদ্ধ অরণ্য, নিষিদ্ধ প্রেম
উপন্যাস সমগ্র (১ম, ২য়)
থ্রিলার সপ্তক
থ্রিলার পঞ্চক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
শ্রেষ্ঠ গল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

ছোটদের জন্যে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
হাট্টিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালো বাকসের রহস্য
ভয়ভূতুড়ে

এতে আছে

আলেকজান্ডারের বাঁটুল/৯
লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য/৩৬
বলে গেছেন রাম শন্না/৬২
কোদণ্ড পাহাড়ের বা-রহস্য/৮৮
ভীমগড়ের কালো দৈত্য/৯৮
পদ্মার চরে ভয়ঙ্কর/১০৬
ভূতুড়ে এক কাকতাড়ুয়া/১২১
রাজবাড়ির চিত্ররহস্য/১৪৭
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য/১৮২
সিংহগড়ের কিচনি-রহস্য/২১০
রাজা সলোমনের আংটি/২৪৩
বত্রিশের ধাঁধা/২৮১

আলেকজান্ডারের বাঁটুল

বাঁটুল, ফিরে এস

জিনিসটা দেখতে ক্রিকেটবলের মতো। কিন্তু বেজায় খসখসে এবং কালো রঙের। হাতে নিয়ে দেখলুম বেশ ওজনদারও বটে। সারা গায়ে হিজিবিজি কী সব লেখা আছে দুর্বোধ্য ভাষায়। সেই সঙ্গে জায়গায় জায়গায় সূক্ষ্ম নকশার কারিকুরি। নাড়াচাড়া করে দেখে বললুম, "জিনিসটা কী?"

যিনি এটা নিয়ে সকালবেলা কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ড্রইংরুমে হাজির হয়েছেন, তাঁর নাম বেণীমাধব রায়। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। স্বাস্থ্যবান শক্তসমর্থ চেহারার মানুষ। আমার প্রশ্ন শুনে একটু হেসে বললেন, "বুঝতে পারলেন"? এটা আসলে একটা লোহার বাঁটুল। কিন্তু ও লোহায় মরচে ধরার যো নেই।"

অবাক হয়ে বললুম, 'বাঁটুল? তার মানে যা ছুঁড়ে আদিবাসীরা পাখি-টাকি শিকার করে? বাঁটুল তো আমি দেখেছি। গুলতি থেকে মার্বেলের গুলির সাইজের মাটির বাঁটুল আমিও ছেলেবেলায় কতবার ছুঁড়েছি কার্নিশে পায়রা মারতে। বাঁটুল কখনও এমন প্রকাণ্ড হয়, দেখিনি তো! তাছাড়া এটার ওজন মনে হচ্ছে প্রায় আধকিলো। গুলিত থেকে ছোঁড়াও তো অসম্ভব মশাই।"

বেণীমাধববাবু রহস্যময় হাসলেন। "এটা প্রায় তেরশো বছরের পুরোনো গ্রিক বাঁটুল। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণে আসার সময় আফিগানিস্তানে পাঞ্জশির উপত্যকায় ঘোরবন্দ নদীর ধারে তাঁবু ফেলেছিলেন। ওই সময় তাঁর বাঁটুলটা হারিয়ে যায়। ওই আমলের ইতিহাসে এসব কথা আছে। যাই হোক, তার প্রায় ২২৩৯ বছর পরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পুরাবিজ্ঞানী জন মার্শাল ওই এলাকায় এক লুপ্ত সভ্যতার ধ্বংশাবশেষ পুনরুদ্ধারের সময় মাটির তলা থেকে এমনি একটা বাঁটুল কুড়িয়ে পান। তেমনি একটা বাঁটুল আমার ভাগ্যেও জুটেছে। তবে আমি এটা কোথায় পেয়েছি, তা বলা যাবে না। জিনিসটার দাম কয়েক কোটি টাকা। মার্শালের বাঁটুলটা লন্ডনের জাদুঘরে আছে সেটা কিন্তু আলেকজান্ডারের নয়।"

হাঁ করে শুনছিলুম। শোনার পর বললুম, "কিন্তু এটাই যে সম্রাট আলেকজান্ডারের বাঁটুল, তার প্রমাণ কী?"

বাঁটুলটার গায়ে খোদাই করা হিজিবিজিতে আঙুল রেখে বেণীমাধববাবু বললেন, "এই তো সব লেখা আছে প্রাচীন গ্রিক হরফে। আর এই গোল চিহ্নটা দেখছেন, এটা হল গ্রিক সম্রাটের শিলমোহর।"

কর্নেলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, উনি দাঁতে চুরুট কামড়ে একটা প্রকাণ্ড ইংরেজি বই খুলে গম্ভীর মুখে পড়ছেন। ওঁরা সাদা দাড়িতে চুরুটের ছাই পড়ছে, সেদিকে লক্ষ্যই নেই। বেণীমাধববাবু বাঁটুলদা কফিটেবিলে চৌকোণা কৌটোয় রাখলে এতক্ষণে মুখ তুলে কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ—কী যেন বলছিলেন বেণীমাধব? রাতবিরেতে আপনার ঘরে ভূতের উপদ্রব হয়?"

বেণীমাধব গম্ভীর হয়ে গেলেন। "হ্যাঁ কর্নেল। একমাস হল জিনিসটা আমি পেয়েছি। তারপর থেকেই প্রায়ই রাত্রিবেলা অদ্ভুত সব কাণ্ড হচ্ছে আমার ঘরে। দেয়ালে টাঙানো ছবি পড়ে যাচ্ছে ঝনঝন শব্দে। কিন্তু আলো জ্বালিয়ে দেখি কিছু পড়েনি—কিংবা ভাঙেওনি। কোনো রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি, কেউ ধুপধুপ শব্দ করে ঘরের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে! অথচ আলো জ্বাললে আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কোনোরাতে হঠাৎ শুনি, ফিসফিস করে কারা কথাবার্তা বলছে। আলো

জ্বাললেই সব চুপ। সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে গতরাতে। এতসব কাণ্ডের পর এমনিতেই আতঙ্কে ঘুম আসতে চায় না। প্রায় জেগেই কাটাই। কাল সাড়ে তিনটেয় এক কাণ্ড হল। টেবিলল্যাম্পটা জ্বেলেই রাখি সারারাত। হঠাৎ দেখি কালো কুচকুচে একটা হাত মাথার দিকের জানালা দিয়ে ঢুকে টেবিলল্যাম্পের সুইচ অফ করে দিল। লাফিয়ে উঠে বসলুম। পিস্তল আছে আমার। পিস্তল নিয়ে সুইচ টিপে বড় আলো জ্বেলে দিলুম। উঁকি মেরে কাউকে দেখতে পেলুম না। সকালে দেখি টেবিল আর জানালার ধারে এই লোমগুলো পড়ে আছে।"

পকেট থেকে বেণীমাধববাবু একটা কাগজের মোড়ক বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল মোড়কটা খুললেন। কয়েকটা কালো দু-তিন ইঞ্চি লোম। কর্নেল একটা লোম চিমটি কেটে তুলে বললেন, "বেজায় শক্ত দেখছি। যেন সূচ। ঠিক আছে। এগুলো থাক। আর বাঁটুলটা..."

কথা কেড়ে বেণীমাধববাবু বললেন, "ওটা আপাতত আপনার কাছেই থাক কর্নেল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি এবার। জিনিসটা ঘরে রাখতে সাহস হচ্ছে না। ভেবেছিলুম ব্যাংকের লকারে নিয়ে গিয়ে রাখব কি না। কিন্তু আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। লকার ভেঙে চুরি যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। আপনিই ওটা রাখুন।"

কর্নেল মোড়ক এবং বাঁটুলের সুদৃশ্য কৌটোটা হাতে নিয়ে পাশের ঘরে রেখে এলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে বেণীমাধববাবু। আমরা তাহলে ওবেলা একবার আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। আপনার ঘরটা একবার পরীক্ষা করা দরকার।"

বেণীমাধববাবু নমস্কার করে চলে গেলেন। কর্নেল আবার সেই ইংরেজি বইটা খুলে বসলেন। বললুম, "এটা কি সত্যি বাঁটুল? এবং আলেকজান্ডারেরই বাঁটুল বলে মনে করেন?"

গোয়েন্দাপ্রবর বই থেকে মুখ তুলে হাসলেন। "ডার্লিং! সেকালের বীরপুরুষরা ছিলেন সবই তাগড়াই মানুষ। খাদ্যে তখনও কেউ ভেজাল দিতে শেখেনি। হাওয়াবাতাসও এমন বিষিয়ে যায়নি। বিশুদ্ধ বাতাসে তাঁরা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতেন এবং অনেকে আস্ত একটা রামপাঁঠা খেয়ে হজম করতেন। তাঁদের বাঁটুল কি একালের মার্বেলের গুলির মতো হবে।"

বুঝলুম, রসিকতা করছেন। চটে যাওয়ার ভান করে বললুম, বাজে কথা বলবেন না! বরং এত ভেজাল খেয়ে এবং দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েও একালের মানুষ যা করছে, তা সেকালের ওই বীরপুরুষেরা কল্পনাও করতে পারতেন না। আমার ধারণা, বেণীমাধববাবু এই সকালবেলা একটা আজগুবি গল্প বলে তাকে তাক লাগিয়ে দিলেন।"

"তাই বুঝি?"

"ঠিক তাই। ভুঁয়ো বাঁটুলটা একটা ছল। লোমগুলো নিশ্চয় কোনো বাড়ির রোয়াকের আড্ডাবাজ কোনো পাঁঠার। আমার সন্দেহ, ওর কোনো উদ্দেশ্য আছে।"

"কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে তোমার সন্দেহ হচ্ছে?"

"বলা কঠিন এই মুহূর্তে। তবে ভদ্রলোকের চেহারায় কেমন ধূর্ততার ছাপ আছে। চোখ দুটো দেখলেন না বেড়ালের মতো যেন।"

কর্নেল হো-হো করে হেসে বললেন, "বুঝতে পারছি, ওঁকে তুমি পছন্দ করোনি। ডার্লিং! বেণীমাধব রায় একসময়কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী বংশের মানুষ। এখন ওঁদের অবস্থা পড়ে গেছে। কিন্তু এদেশে কিউরিও দ্রব্যের কারবারী হিসেবে নাম করতে হবে সবার আগে। বিচিত্র ধরনের প্রাচীন জিনিস উনি কেনাবেচা করেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ওঁর কিউরিও শপে তুমি দেশবিদেশের বহু কোটিপতি খদ্দেরের দর্শন পাবে দুবেলা। কাজেই ওঁর প্রতি অকারণ সন্দেহ পোষণ কোরো না। কেন উনি আমার সঙ্গে ছলনা করতে আসবেন মিছিমিছি?"

কর্নেলের কথা শুনেও আমার সন্দেহ গেল না। কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে ওঁর বইটার দিকে তাকালুম। খুব পুরনো বই বলে মনে হল। পোকায় যথেচ্ছ কেটেছে বইটাকে। জায়গায়-জায়গায় দুটো-একটা করে শব্দ কামড়ে খেয়েছে। বললুম, "এত মন দিয়ে কী বই পড়ছেন বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "আলেকজান্ডারের জীবনী। তাঁর সমকালের এক গ্রিক ঐতিহাসিক আরিয়ানের লেখা।"

"তার মানে আপনি বিশ্বাস করছেন, জিনিসটা সত্যি আলেকজান্ডারের বাঁটুল?"

কর্নেল বইটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "সেকথা পরে। কিন্তু গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডারের একটা প্রিয় বাঁটুল সত্যি ছিল এবং তা আফগানিস্তানে এসেও হারিয়েও গিয়েছিল। পড়ে দেখলে 'ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।"

বইটা নিয়ে খোলা পাতাটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলুম! একখানে লেখা আছে :

"....সম্রাট খুব ভেঙে পড়েছিলেন বাঁটুল হারিয়ে। সারারাত ঘুমোননি। সকালে ঘোরবন্দ নদীর ধারে একখণ্ড পাথরের উপর বসে আমাদের বললেন, আমাকে হিন্দুস্থান থেকে হয়তো নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে। বাঁটুলটা বড় পয়মন্ত ছিল। আমরা তাঁকে খুব বোঝালুম। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে দুঃখের ছাপ মুছল না। পরে হিন্দুস্থানের রাজা পোরাসের (পুরু) সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে জয় হলে তখন সম্রাটকে বললুম, দেবতা জিউস আপনার সহায়—তখন সম্রাট আমার কানে কানে বললেন, কাল রাতে দেবতা জিউস আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন, আর এগিও না। ফিরে যাও।"

পড়ার পর বললুম, "হুঁ—তাহলে সত্যিসত্যি একটা বাঁটুল ছিল। কিন্তু..."

কর্নেল আমার কথা কেড়ে বললেন, " কিন্তু রহস্যটা হল অন্যত্র। জয়ন্ত, ময়রার যেমন সন্দেশে রুচি থাকে না, তেমনি খবরের কাগজের লোক হওয়াতে কাগজে রুচি নেই।"

অবাক হয়ে বললুম, "হঠাৎ একথার অর্থ?"

"তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার দুইয়ের পাতায় অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা তুমি পড়োনি।"

"কী বিজ্ঞাপন?"

কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে দুইয়ের পাতার একটা বিজ্ঞাপন দেখালেন। বিজ্ঞাপনটা ছোট। "বাঁটুল, যেখানেই থাক, ফিরে এস। যা চাও, পাবে। রবিবার যশোর রোডে মন্দিরতলায় রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো, ইতি মামা।"

বিজ্ঞাপনের শেষ কথাগুলো অদ্ভুত বটে। কিন্তু এখানে সম্ভবত একটা ছেলের নাম। আজকাল কত ছেলে বাড়ি থেকে পালাচ্ছে!

আমার মনের কথা যেন টের পেলেন গোয়েন্দামশাই। একটু হেসে বললেন, 'কে বলতে পারে বিজ্ঞাপনের বাঁটুল আলেকাজান্ডারের বাঁটুল নয়?"

জোর গলায় বললুম, "অসম্ভব। ইনি জনৈক শ্রীমান বাঁটুল চন্দ্র ছাড়া কেউ নয়। আলেকজান্ডারের বাঁটুল কেউ চিনতে চাইলে বেণীমাধববাবুর কিউরিও শপেই যেতে পারত। তাছাড়া ইতি—মামা, যখন লেখা আছে, তখন আর কথা নেই। সম্ভবত বাঁটুলচন্দ্রটি বড় সেয়ানা ছেলে।"

কর্নেল আর কোনো মন্তব্য করলেন না। বইটা টেনে নিয়ে ফের পড়তে শুরু করলেন।...

আরেক ধাঁধা

বেণীমাধব রায়ের বাড়ি সল্টলেকের উত্তর সীমায়। পেছনে খাল। তার ওধারে দমদম এয়ারপোর্টগামী ভি. আই. পি. রোড। বাড়িটা বছর দুই আগে বানিয়েছেন বেণীমাধব। একতলা হলেও বেশ বড় ও নিরিবিলি জায়গায়। এপাশে-ওপাশে অনেকটা তফাতে কয়েকটা বাড়ি সবে তৈরি হচ্ছে। বিকেল পাঁচটায় পৌঁছে ঝটপট চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলুম। উলুকাশ আর ঝোপঝাড়-গাছপালায় জায়গাটা জঙ্গল হয়ে আছে। তাছাড়া যে সময়ের কথা বলছি, তখন সল্টলেকে সবে ঘরবাড়ি হচ্ছে। চারদিক প্রায় খাঁ খাঁ করছে। যে ঘরে ভূতের উপদ্রব হয়, সেই

ঘরটা একেবারে উত্তর অংশে। পেছনে একটুকরো পোড়ো জঙ্গুলে জমি। তার পেছনে তারকাঁটার উঁচু বেড়া। বেড়া ঘেঁষে গাছপালা গজিয়েছে। কর্নেল সে দিকটা কিছুক্ষণ ঘুরে দেখলেন। তারপর আমরা ঘরটাতে ঢুকলুম।

বেণীমাধব অবিবাহিত মানুষ। এ বাড়িতে তাঁর এক পিসিমা আর দূরসম্পর্কের এক ভাগ্নে অমল, তাছাড়া একজন রাঁধুনি দয়ার ঠাকুল, দুজন চাকর ভবা ও চাঁদু, দারোয়ান বীরবাহাদুর, ঝি পাঁচুর মা—লোকজন বলতে এই। বেণীমাধববাবুর গাড়ি আছে দুটো। কিন্তু ড্রাইভার রাখেননি। একটা নিজে চালান, অন্য গাড়িটা অমলকে দিয়েছেন। অমল মামার টাকায় ইলেকট্রোনিকস জিনিসপত্রের ব্যবসা করে। তার দোকান আছে চৌরঙ্গী এলাকায়। আমরা অমলকে.দেখতে পেলুম না। সে তার দোকান থেকে বাড়ি ফেরে অনেক রাতে। আমরা আসব বলে বেণীমাধববাবু তিনটের মধ্যে তাঁর কিউরিও শপ বন্ধ করে বাড়ি চলে এসেছেন।

বেণীমাধবের শোবার ঘরটা বেশ বড়। খাটের পাশে একটা টেবিল। তার গা ঘেঁষে জানালা। সেই জানালা দিয়ে একটা লোমশ হাত ঢুকে টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দিয়েছিল। কর্নেল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ—অনেক লোম পড়ে আছে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা বেণীমাধববাবু, কাল রাতে যখন ঘটনাটা ঘটল, তারপর কোনো মোটরগাড়ির শব্দ শুনেছিলেন কি?"

বেণীমাধব বললেন, "পেছনে খালের ওধারে ভি. আই. পি. রোড। সে শব্দ তো দিনরাত সবসময় শোনা যায়।"

"না। ধরুন, কাছাকাছি কোনো গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনেছিলেন কি?"

"খেয়াল করিনি।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "খালের ধারে তারকাঁটার বেড়ার একটা জায়গা কেউ ফাঁক করে রেখেছে দেখে এলুম। সেখানেও এমনি কালো লোম পড়ে আছে কাজেই বানরজাতীয় প্রাণী ওই পথেই এসেছিলাম। ওদিকে খালের ওপর একটা কাঠের পোলও দেখতে পেলুম। আমার ধারণা, প্রাণীটা কেউ পুষেছে এবং ট্রেনিং দিয়েছে। তারপর গাড়ি করে তাকে এনে আপনার বাড়ির দিকে পাঠিয়েছে।"

বেণীমাধববাবু চিন্তিতমুখে বললেন, "কিন্তু কেন? টেবিলল্যাম্পটা নিভিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?"

"টেবিলল্যাম্প তো সারারাত জ্বালিয়ে রাখেন বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ কর্নেল। ভুতুড়ে কাণ্ড কয়েকরাত চলার পর ওটা জ্বালিয়ে রাখতে শুরু করি।"

"টেবিলল্যাম্প জ্বললে আর কোনো উৎপাত ঘটে না বুঝি?"

"না।"

"তাহলে বোঝা যাচ্ছে, টেবিলল্যাম্প কেন নেভানোর দরকার হয়েছিল।" কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন। তারপর একটু হাসলেন। টেবিলল্যাম্পটা এপাশে সরিয়ে ভালই করেছেন। মে মাসের এই গরমে জানালা বন্ধ করা যাবে না। প্রাণীটার নাগালের বাইরে রাখাই ভাল। তা আপনি কি মশারি খাটিয়ে শোন?"

"উপায় নেই কর্নেল। সল্টলেকে বারমাস যা মশার উৎপাত।"

ঘরের ভেতর আসবাবপত্র প্রচুর। বেশিরভাগই সেকেলে ডিজাইনের জিনিস। আমি প্রকাণ্ড একটা কাঠের আলমারির দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বেণীমাধব একটু হেসে বললেন, "এসব জিনিস আমার ঠাকুরদার আমলের। মায়াবশে এগুলো বদলে আধুনিক ডিজাইনের ফার্নিচার কিনিনি। তাছাড়া আজকালকার জিনিস বড় ঠুনকো।"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "পুরানো জিনিসের প্রতি ওঁর মায়া থাকা স্বাভাবিক, জয়ন্ত। ওঁর কিউরিও শপ তার প্রমাণ।"

বেণীমাধব বললেন, "ঠিক বলেছেন, কর্নেল। যে জিনিস যত পুরনো, তার প্রতি আমার তত মায়া। বাতিকও বলতে পারেন। ওই যে ব্রোঞ্জের প্রদীপটা দেখছেন, ওটা গুপ্তযুগের। টাকার অংকে ওটার দাম লক্ষ টাকা—কিন্তু ওটা বেচিনি। দোকান থেকে এনে রেখেছি। আর এই পোড়ামাটির সিংহটা দেখছেন, ওটা ভারহুত স্তূপ থেকে সংগৃহীত। নানা হাত ঘুরে আমার হাতে এসেছিল। এটাও বেচিনি।" তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে ফের বললেন। "বাঁটুলটাও আমি মায়ায় পড়ে বেচিনি। বিক্রী করতে চাইলে ওর দাম পেতুম দেড়কোটি টাকা।"

কথা বলতে বলতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে আলো জ্বলেছে। একবার কফি, একবার চা এবং কিছু মিষ্টদ্রব্যও খাওয়া হয়েছে আমাদের। হঠাৎ কর্নেল উত্তেজিতভাবে একটা জানালার দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন, "আরে ওটা কী।" তারপর হন্তদন্ত হয়ে ওদিকে উঠে গেলেন। পর্দা তুলে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, "বেণীমাধববাবু! সেই আজগুবি বাঁদরটা পালাচ্ছে! এই মাত্র উঁকি দিচ্ছিল এখানে।"

বেণীমাধব লাফিয়ে উঠে বললেন, "তবে রে ব্যাটা!" তাপর বিছানার চাদর তুলে ওঁর পিস্তলটা নিয়ে রাগে অস্থির হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ওঁর চেঁচামিচি শুনলুম।

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। এবার আরও ভড়কে গেলুম কর্নেলের কাণ্ড দেখে। বেণীমাধববাবু বেরিয়ে যেতেই উনি তাঁর বিছানার তলায় হাত ভরে একটু চাবির গোছা টেনে নিলেন। তারপর ঝটপট একটা টেবিলের ড্রয়ারের চাবি মেলাতে থাকলেন। কয়েকটা চাবির পর একটা চাবি ফিট করল। তখন ড্রয়ার খুলে কী সব হাতড়াতে-হাতড়াতে চাপা গলায় বললেন, "জয়ন্ত! তুমি ওঁকে কিছুক্ষণ আটকে রাখো গিয়ে। বুঝতে পেরেছ কী বলছি?"

কর্নেলের সঙ্গে বহুবছর কাটাচ্ছি। আমাকে কী করতে হবে তখনই টের পেয়েছিলুম। পেছনের দরজায় বেরিয়ে দেখি, ঠাকুর-চাকর-দারোয়ান সবাই বেরিয়ে পড়েছে। তারা খামোকা "চোর! চোর!" বলে চেঁচাচ্ছে। বেণীমাধব পিস্তল উঁচিয়ে কাঁটাতারের বেড়াটার দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন সম্ভবত তাঁর ধারণা, প্রাণীটা ফোকর গলিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে। অমনি তাকে গুলি করবেন।

আমি গিয়ে তফাতে অন্ধকারে একটা ঝোপের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলুম, "ওই পালাচ্ছে!"

বেণীমাধব "কই, কই," বলে সেদিকে ছুটলেন। আমি তাঁর পেছনে দৌড়লুম। তারপর ফের প্রাণীটাকে দেখতে পাওয়ার ভান করে বললুম, "দেখুন তো, ওটা কুকুর, না সেই জন্তু?'

বেণীমাধব হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "কোথায় কোথায়?"

"ওপাশে ওই যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, তার ভেতর ঢুকল যেন।"

"চলুন তো দেখি!"

বাড়িটার ভেতর অন্ধকার ঠাসা। বেণীমাধব বললেন, "টর্চটা আনা উচিত ছিল। থাক্‌গে। মনে হচ্ছে, ব্যাটাচ্ছেলে কেটে পড়েছে, চলুন।"

আসতে আসতে বললুম, "এক কাজ করলে হত না বেণীমাধববাবু? কর্নেল বলেছিলেন, ভি. আই. পি.রোডে গাড়ি চাপিয়ে কারা প্রাণীটাকে নিয়ে আসে। চলুন তো, সেই ফোকর গলিয়ে আমরা দেখে আসি। অন্তত গাড়ির নম্বর নিতে পারব।"

কথাটা মনে ধরল ওঁর। বাড়ির পেছনে আগাছা ঢাকা জমি পেরিয়ে তারকাঁটার বেড়ার ফোকর খুঁজতে দেরি হল না। ওধারের রাস্তা থেকে যথেষ্ট আলো আসছিল। খালের ধারে দাঁড়িয়ে কোনো থেমে থাকা গাড়ি দেখা গেল না। যাবে না, তা তো আমি জানিই। কিন্তু ওঁকে আটকে রাখা দরকার। বললুম, "খাল পেরিয়ে গেল ভাল হত। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না কিছু। রাস্তার মধ্যিখানে আইল্যান্ডে ওইসব জঙ্গল করে রেখেছে যে!"

বেণীমাধব বললেন, "ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু। চলুন!"

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে কর্নেলের ডাক কানে এল। "বেণীমাধববাবু! জয়ন্ত! কোথায় আপনারা?'

কর্নেল বাড়িটার পেছনের বারান্দা থেকে ডাকছিলেন। অগত্যা আমরা ফিরে এলুম। আসতে আসতে বেণীমাধব রুষ্টভাবে বললেন, "কালই নিজের খরচায় ফোকরটা বন্ধ করে দেব। গভমেন্টের লোকেরা কিছু লক্ষ্য রাখে না।"

ঘরে ঢুকে ক্লান্তভাবে উনি বসলেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন, "এভাবে ঘর খোলা রেখে যাওয়া আমি সঙ্গত মনে করিনি। তাই উত্তেজনা দমন করে পাহারা দিলুম। কোন দিকে পালাল দেখলেন?"

বেণীমাধব শ্বাস ছেড়ে বললেন, "দেখতে পেলে তো গুলি করে মারতুম। টর্চ নিতে মনে ছিল না। আলো-আঁধার হয়ে আছে জায়গাটা।"

আমি বললুম, "বোঝা যাচ্ছে, কোনো কারণে, কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই জন্তুটা সন্ধ্যা হতে না হতেই পাঠিয়ে দিয়েছিল আপনার বাড়িতে। সম্ভবত ঘরে ঢুকে লুকিয়ে থাকত খাটের নিচে।

বেণীমাধব র‍্যাকের মাথা থেকে টর্চ দিয়ে ঝটপট খাটের তলাটা দেখলেন। ওঁর মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল। এবার মনে হল, ভেতর ভেতরে খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

আবার কফি এল। কফি শেষ করে ঘড়ি দেখে কর্নেল বললেন, "আজ উঠি বেণীমাধববাবু। আপনার ভাগ্নে অমলবাবুর ফিরতে বোধকরি রাত হবে। ওর সঙ্গে পরে সময়মতো আলাপ করা যাবে।

বেণীমাধববাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে হেসে ফেললুম। কর্নেল ধমকের সুরে বললেন, "চুপ। কোনো কথা নয়।"

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের ফ্ল্যাটে পৌঁছলুম যখন, তখন রাত আটটা বেজে গেছে। কর্নেল সোফায় আরাম করে বসে চুরুট ধরিয়ে বললেন, "তাহলে বোঝা গেল, একটা আজগুবি জন্তু—ধর, কোনো বাঁদরই তার মনিবের হুকুমে সত্যিসত্যি বেণীমাধবের বাড়ির জানালায় হাত বাড়িয়ে টেবিলল্যাম্প নিভিয়েছিল। এই ঘটনাটা মিথ্যা হলে বেণীমাধব আমার কথা শুনে অমন হুলস্থুল করে ছুটে বেড়াতেন না।'

"কিন্তু ওঁর ঘরে গোয়েন্দাগিরি করলেন কেন আপনি?"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "দুটো জিনিস পরীক্ষা করার সুযোগ নিয়েছিলুম। একঢিলে দুটো পাখি মারা বলতে পার। প্রথমটার কথা বললুম তোমাকে। দ্বিতীয়টা হল দৈনিক সত্যসেবকের সেই বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত। বেণীমাধবের ড্রয়ারে নোটবইয়ের ভেতর বিজ্ঞাপনের একটা কাটিং দেখলুম। সেটার চেয়ে বিস্ময়কর হল, দৈনিক সত্যসেবকের সেই বিজ্ঞাপন বিভাগের একটা রসিদ। একশো কুড়ি টাকা দিয়ে বেণীমাধবই ওই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। হ্যাঁ—তোমাকে বললে তুমিই তোমাদের কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগ থেকে ওই তথ্যটুকু এনে দিতে পারতে। কিন্তু বেণীমাধববাবুর বাড়ি যাওয়ার পর কথাটা আমার মাথায় এসেছিল হঠাৎ।"

"কেন?" কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। তারপর একসময় চোখ খুলে বললেন, "আজ শুক্রবার। রবিবার আগামী পরশু। তৈরি থেকো জয়ন্ত।"

কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বাড়ির পথে চলেছিল, তখন মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। কিছুতেই মাথায় আসছে না, বেণীমাধবের ওইরকম অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেওয়ার কারণ কী?

মন্দিরে মৃত্যুর ত্রাস

দমদম এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর যশোর রোডের ধারে কর্নেলের এক বন্ধু ডাক্তার শিবকালী মজুমদারের বাড়ি। ডাঃ মজুমদার কর্নেলের বয়সী। কিন্তু কর্নেলের মতো মোটাসোটা তাগড়াই নন। বেঁটে রোগাটে গড়ন। প্রকাণ্ড গোঁফ। তাঁর সঙ্গে আমার চেনাজানা অনেকদিনের। রবিবার সন্ধ্যায় কর্নেলের সঙ্গে পৌঁছে দেখি, ডাঃ মজুমদার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাড়ির সামনে ঢাকা লনে চেয়ার পেতে বসে অনেক গল্পসল্প হল। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ডাঃ মজুমদার বললেন, "সাড়ে ন'টা বাজে। এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। মন্দিরতলা অবশ্য কাছেই। থানাতেও আপনার কথামতো সব জানিয়ে রেখেছি। আমরা মন্দিরের পেছনে পুকুরপাড় ঘুরে যাব। মন্দিরে রাতে কেউ থাকে না।"

ডাঃ মজুমদার এর আগে কয়েকটা কেসে কর্নেলকে সাহায্য করেছেন। সেগুলো ছিল হত্যাকাণ্ড। ডাঃ মজুমদার একজন নামকরা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। এটা অবশ্য হত্যাকাণ্ডের কেস নয়। তবু সঙ্গে তিনি থানায় আমার ভালই লাগছিল।

ওঁর বাড়ির পেছনে অন্ধকার মাঠের ধানক্ষেত, সব্জিক্ষেত আর চাষ জমিতে জলকাদায় একাকার হয়ে সেই পুকুরপাড়ে পৌঁছলুম। ঘন আগাছার জঙ্গল সেখানে। টর্চের আলো সাবধানে পায়ের কাছে ফেলে তিনজনে হাঁটছিলুম। পুকুরটা খুব গভীর মনে হল। যশোর রোডে মোটরগাড়ি চলাচলের বিরাম নেই। হেডলাইটের ছটা বারবার দেখিয়ে দিচ্ছিল সামনের মন্দিরটাকে। সেকালের বিশাল মন্দির। বটগাছ আছে পাশে। আমরা বটগাছের আড়ালে ওঁত পেতে বসলুম। ঘড়িতে নটা পঁয়তাল্লিশ, তখন রাস্তায় একটা জিপ যাচ্ছে দেখতে পেলাম। পেছনে একটা ট্রাক আসছিল, তার আলোয় জিপটাকে পুলিশের বলে মনে হল। জিপটা ট্রাকটাকে যেতে দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থামল। ডাঃ মজুমদার ফিসফিস করে বললেন, "পুলিশ এসে গেল তাহলে।"

জিপটা একটু থেমেই চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের কাছাকাছি এসে ব্রেক কষল একটা প্রাইভেট কার। গাড়ির দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতরে আলো জ্বলল এবং দেখলুম বেণীমাধব নামছেন। তিনি একা এসেছেন গাড়ি নিয়ে। উত্তেজনায় আমার দম আটকে যাচ্ছিল। বেণীমাধব গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরের সামনে এসে একটু কাশলেন। মন্দিরের সামনে পাঁচিল এবং উঁচু ফটক রয়েছে। ফটক দিয়ে তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেখলুম। পাঁচিলটা তত উঁচু নয়। বেণীমাধবকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। ভেতরে গিয়ে উনি আবার কাশলেন। তারপর টর্চ জ্বেলে মন্দিরের ভেতরে আলো ফেললেন। আমরা এবার উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছি। টর্চের আলোটা কয়েক সেকেন্ড মাত্র স্থির রইল। তারপর বেণীমাধব আলো নিভিয়ে ফেললেন এবং হন্তদন্ত ফিরে চললেন ওঁর গাড়ির দিকে।

কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেণীমাধববাবু! বেণীমাধববাবু!" তারপর দৌড়লেন রাস্তার দিকে। সেই সময় মন্দিরের দুপাশ থেকে কয়েকজন পুলিশ বেরিয়ে টর্চ জ্বালল। ভারিক্কি গলায় পুলিশ অফিসারের হাঁকডাক শুনতে পেলুম—"গাড়ি থামান! নইলে গুলি করব।"

কিন্তু বেণীমাধবের গাড়িটা বোঁ করে গুলতির মতো ছুটে গেল। পুলিশের জিপটা একটু তফাতে গাছের আড়ালে দাঁড় করানো ছিল। পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবলরা দৌড়ে গিয়ে জিপে চাপলেন। তারপর জিপটা দ্রুত ছুটল বেণীমাধবের গাড়ির উদ্দেশে। কর্নেল চেঁচিয়ে কিছু বললেন পুলিশ অফিসারকে, হয়তো কানে গেল না।

ঘটনাটা এত ঝটপট ঘটে গেল যে আমার হকচকানি কাটতে সময় লাগল। কর্নেল ততক্ষণে

ফটক দিয়ে মন্দিরবাড়িতে ঢুকেছেন। ডাঃ মজুমদার আর আমি অন্ধকারে বটতলায় দাঁড়িয়ে আছি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে। এবার হুঁশ ফিরল। দুজনে মন্দিরবাড়িতে গিয়ে ঢুকলুম।

কর্নেল টর্চ জ্বেলে মন্দিরের ভেতর আলো চমক খাওয়া স্বরে বললেন, " এ কী !"

যা দেখলুম, শরীর শিউরে উঠল আতঙ্কে। শিবলিঙ্গের নিচে একটা লোক চিত হয়ে পড়ে আছে। তার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়েছে। দাঁতের ফাঁকে জিভও বেরিয়ে রয়েছে। বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। নাকের তলায় একটু রক্তও আছে। মনে হল, কেউ লোকটাকে মেরে ফেলেছে। লোকটার মুখে খোঁচাখোঁচা গোঁফ দাড়ি। দেখতে ভিখিরিদের মতো।

ডাঃ মজুমদার বললেন, "সর্বনাশ! এ আবার কে?" তারপর হন্তদন্ত হয়ে মন্দিরে ঢুকলেন জুতো খুলে রেখে। কর্নেল বললেন, "আপনিই পরীক্ষা করে দেখুন। আমি মন্দিরে ঢুকব না।"

টর্চের আলোটা পরীক্ষা করে দেখার পর ডাঃ মজুমদার গম্ভীর মুখে বললেন, "বহুক্ষণ আগেই মারা গেছে। গলায় ফাঁস আটকে মেরে ফেলা হয়েছে সম্ভবত। হ্যাঁ—এই যে দেখছি, নাইলনের দড়ি পড়ে রয়েছে। কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে—শিবলিঙ্গের আড়ালে খুনী বসেছিল ওত পেতে। এই লোকটা যে কোনো কারণেই হোক, এখানে ঢুকে সম্ভবত প্রণাম করছিল। সেই সময় গলায় আচমকা ফাঁস আটকে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে।"

তারপর উনি পায়ের কাছে ঝুঁকে কী কুড়িয়ে নিলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, ফের, "কর্নেল! কর্নেল! এ যে দেখছি সেইরকম কালো-কালো লোম! দেখুন!"

কর্নেল হাত বাড়িয়ে নিলেন। টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ। প্রাণীটা যে শিম্পাঞ্জি, তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু পুলিশ অফিসার ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখুন। আমি বারণ করলুম বেণীমাধববাবুর পেছনে ছুটতে। শুনলেন না। বেণীমাধববাবুকে তো ওঁরা বাড়িতেই পাওয়া যেত পরে। আসল রহস্য পেছনে ফেলে রেখে ওঁর পেছনে ছোটার মানে হয় না।"

ডাঃ মজুমদার বললেন, "পুলিশ বেণীমাধবকে পাকড়াও করে করবেটা কী? উনি প্রভাবশালী লোক। তাছাড়া ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটাই বা কী? মন্দিরে আসা নিশ্চয় অপরাধ নয়।"

"আমার ধারণা, পুলিশ আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারেনি।'

"আমি ওদের বলেছিলুম, মন্দিরতলায় একটা চোরাই মাল কেনাবেচা হবে। আপনার কথা বলেছিলুম। যাক্‌গে, এখন এই লাশটার ব্যাপারে কী করা যায় বলুন তো?"

কর্নেল রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটু হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে, বেণীমাধবের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে পুলিশ ফিরে আসছে। বেণীমাধবকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। বিনা অভিযোগে।"

পুলিশের জিপটা সত্যি ফিরে এল। জিপ থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন সেই পুলিশ অফিসার। বললেন, "বেণীমাধব রায় মহা ধড়িবাজ লোক। বলে কী, মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম। যাই হোক, ওঁকে ঘাঁটালুম না আপাতত। কিন্তু অন্য পার্টি তো এল না কর্নেল।"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, " এসেছিল। কিন্তু তৃতীয় এক পার্টি তাকে খুন করে মাল হাতিয়ে কেটে পড়েছে অনেক আগেই। ওই দেখুন।"

মন্দিরের ভেতর লাশটা দেখেই পুলিশ অফিসার চমকে উঠলেন। "সর্বনাশ! এ আবার কে?"

কর্নেল বললেন, "যেই হোক, একে কিন্তু বেণীমাধববাবু খুন করেননি—তা আপনারা এবং আমরা সবাই দেখেছি। বেণীমাধব এই মড়াটা দেখেই ভয় পেয়ে চলে গেছেন। আইনত উনি বড়জোর একজন সাধারণ সাক্ষী হতে পারেন। যাইহোক, বডিটা মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন এখনই।"

আমরা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম। পুলিশ অফিসার আবার জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কনস্টেবলরা মন্দিরে পাহারায় রইল। কর্নেল বললেন, "চলুন ডাঃ মজুমদার। কনস্টেবলদের বলে

যাচ্ছি, দরকার হলে আমাদের সঙ্গে আপনার বাড়িতে যোগাযোগ করবে ওরা। এখানে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই।"

ডাঃ মজুমদারের বাড়ির সামনের লনে আমরা বসলুম। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। জোরাল হাওয়া দিচ্ছিল বলে মশার উৎপাত নেই। কফি এল একপ্রস্থ। কফি খেতে খেতে ডাঃ মজুমদার বলেন, "লোকটার পরিচয় না পেলে কিছু বোঝা যাবে না। দেখে মনে হল, পাগলা ভিখিরি-টিখিরি যেন। ওকে খুন করল কেন?"

কর্নেল হাসলেন। "বাঁটুল রহস্য আরো ঘনীভুত হলে ডাঃ মজুমদার। শুধু এটুকুই আপাতত বলতে পারি।"

আমি বললুম, "বেণীমাধবের কাছেই সব রহস্যের চাবি রয়েছে। চলুন না, তাঁর কাছে যাই!"

কর্নেল হাসলেন। "দরকার নেই ডার্লিং! উনিই কাল সকালে আমার কাছে হাজির হবেন।"

ডাঃ মজুমদার বললেন, "আচ্ছা কর্নেল, শিম্পাঞ্জিকে দিয়ে মানুষ খুন করানো কী সম্ভব?"

"নিশ্চয় সম্ভব। শিম্পাঞ্জি বুদ্ধিমান প্রাণী। তাকে খুন করতে শেখানো মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। প্রথমে মানুষের ডামি তৈরি করে ডামির গলায় ফাঁস আটকানোর ট্রেনিং দিলেই শিখে নেবে। বেণীমাধবের ঘরে টেবিলল্যাম্প না নিভলে ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয় না। তাই শিম্পাজিটাকে তার মালিক টেবিলল্যাম্পের সুইচ অফ করতেও শিখিয়েছে। আরো কত কী শিখিয়েছে কে জানে!"

"ভৌতিক উপদ্রবটা সত্যি অদ্ভুত!" ডাঃ মজুমদার বললেন। "ব্যাপারটা কী হতে পারে?"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "নিছক একটা ক্যাসেটে টেপের ব্যাপার সম্ভবত। বেণীমাধবের ঘরে আলো না থাকলেই ব্যাপারটা জমে ওঠে। আলো জ্বললে ভূতুড়ে উৎপাত মোটেও জমে না। বরং ধরা পড়ার চান্স থাকে। আমার ধারণা, শিম্পাঞ্জিটা খুদে টেপরেকর্ডার নিয়ে এসে জানালা ধারে সেটা চালিয়ে দেয়। ক্যাসেটে কাচ ভাঙার শব্দ, ফিসফিস করে কথাবলার শব্দ, হাঁটাচলার শব্দ—সবই রেকর্ড করা আছে।"

অবাক হয়ে বললুম, "কিন্তু এর উদ্দেশ্য কী?"

কর্নেল বললেন, "হয়তো কেউ কোনো কারণে বেণীমাধববাবুকে ভয় দেখাচ্ছে।" ডাঃ মজুমদার মন্তব্য করলেন, "কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রহস্য সত্যিই ঘনীভূত..."।...

পলাতক দেহরক্ষী অ্যাস্টিডোনা

পরদিন সকালে কর্নেলের বাড়ি গিয়ে দেখি বেণীমাধব হাজির। এদিন ওঁকে ভীষণ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। চোখদুটো লাল। উস্কখুস্ক চুল। আমাকে দেখে কোনো সম্ভাষণ করলেন না। কর্নেলের সঙ্গে আগের কোনো কথার জের টেনে বললেন, "যা বলছিলুম, কর্নেল! সত্যি আমি এতখানি তলিয়ে ভাবিনি। নইলে আপনাকে ব্যাপারটা জানাতুম। বৈজুনাথের সঙ্গে আমার অনেকদিনের কারবার। দুনিয়া জুড়ে ওর ঘাঁটি। অদ্ভুত-অদ্ভুত পুরনো জিনিস জোগাড় করে সে কিউরিও শপে বেচে। আলেকজান্ডারের বাঁটুল আমি তার কাছেই কিনেছিলুম। বাঁটুলটা কেনার পর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। জিনিসটা বেচার ইচ্ছে ছিল না। ভেবে ছিলুম সাজিয়ে রাখব ঘরে। কিন্তু রাখতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর দেখি...."

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, "দেখলেন না যে ওটা দুভাগ হয়ে গেছে এবং ভেতরে আছে একটা প্রকাণ্ড হিরে!"

আমি চমকে উঠলাম। বেণীমাধবের মুখেও বিস্ময় ফুটে উঠল। বললেন, "তাহলে আপনি দেখেছেন।"

"হ্যাঁ।" কর্নেল বললেন। " তবে বাঁটুলটা আমার হাত থেকে দৈবাৎ পড়ে যায়নি। ওর ভেতরে হিরে লুকানো আছে, সেটা আরিয়ানের লেখা সম্রাট আলেকজান্ডারের জীবনী পড়েই জেনেছি।

ওটা দেখতে বাঁটুলেরই মতো এবং গ্রিক যোদ্ধারা আত্মরক্ষার জন্য এ জিনিস কাছে রাখতেন বটে, কিন্তু কিছু বাঁটুলের ভেতর মূল্যবান পাথর রা মণিমুক্তাও লুকিয়ে রাখা হত। সেগুলো আসলে বাঁটুল নয়, কৌটো। বিশেষ করে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কিংবা পররাজ্যে হানা দেবার সময় এই অদ্ভুত কৌটো কাজে লাগাত। লুণ্ঠিত বিশেষ মণিমুক্তা এর ভেতর নিরাপদে রাখা যেত। কেউ টের পেত না। ভাবত, ওটা আত্মরক্ষার অস্ত্র মাত্র।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ফের বললেন, "আপনি বাঁটুলটা দিয়ে গেলে আতস কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম, ওটার মাঝামাঝি জোড়া দেওয়া এবং একটা কালো বিন্দু রয়েছে। সেখানে ছুরির ডগার চাপ দিতে খুলে গেল। অবাক হয়ে দেখলুম, ভেতরে প্রকাণ্ড একটা হিরে ঝলমল করছে। তখন বুঝলুম কেন এটা আপনি আমার জিম্মায় রাখতে দিয়ে গেছেন।"

বেণীমাধব বললেন, "বৈজুনাথ বলেছিল, এরকম গ্রিক বাঁটুল তার কাছে আরো একটা আছে। সেটা নাকি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বাবা ফিলিপের। বৈজুনাথ সেটার দাম দেড়গুণ বেশি চেয়েছিল। আমি তখনও জানি না এর ভেতর কী আছে। তাই বেশি দাম শুনে নিতে রাজি হইনি। পরে পস্তালুম খুব। বৈজুনাথের বিরুদ্ধে দেশবিদেশের প্রত্নদ্রব্য নিয়ে চোরাকারবারের অভিযোগে পুলিশের হুলিয়া ঝুলছে। প্রকাশ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন। সে-ও বরাবর গোপনে দেখা করত। তার এক বন্ধু থাকে পার্কস্ট্রিটে। তাকে বলে এলুম বৈজুনাথ যেন শিগগির দেখা করে আমার সঙ্গে। কিন্তু কদিন পরে বৈজুনাথ আমার দোকানে এল ভিখিরির ছদ্মবেশে। কিন্তু আমার গরজ দেখে সে এবার বাঁটুলটার দাম আরো বাড়িয়ে দিল।"

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, "কত চাইল বৈজুনাথ?"

"আলেকজান্ডারের বাঁটুলের দাম চেয়েছিল পাঁচহাজার টাকা। দরাদরি করে তিনহাজারে কিনেছিলুম। এটার দাম চাইল দশ হাজার টাকা। অথচ প্রথমে চেয়েছিল মোটে ছ'হাজার টাকা।"

"তারপর আপনি কী বললেন ওকে?"

"আমি একটু দ্বিধায় পড়লুম। যদি এ বাঁটুলটার ভেতর হিরে না থাকে? তাছাড়া....." একটু বিষণ্ণভাবে হাসলেন বেণীমাধব। "তাছাড়া বাঁটুলটা যে সত্যিসত্যি ফিলিপের, তার প্রমাণ কী? ওটা জাল বাঁটুলও তো হতে পারে। প্রত্নদ্রব্য হিসেবে এসব জিনিসের বাজার দর প্রচণ্ড। তাই জাল হওয়া খুব স্বাভাবিক।"

"ঠিক বলেছেন। তবে আলেকজান্ডারের বাঁটুলটা অবশ্য জাল নয় বলে মনে হচ্ছে। কারণ ওর ভেতর হিরে আছে এবং আরিয়ান ঠিক তারই আভাস দিয়েছেন জীবনীগ্রন্থে।"

বেণীমাধব বললেন, "বৈজুনাথের সামনে সেটা তো পরীক্ষা করা যায় না। তাছাড়া সে আমাকে দেবেও না গোপনে তার চোখের আড়ালে পরীক্ষা করতে। তাই ইতস্তত করছিলুম। তখন বৈজুনাথ নিজে থেকে প্রস্তাব দিল, ঠিক আছে। টাকা জোগাড় করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন কৌশলে। কারণ আমার পক্ষে আর এখানে আসা সম্ভব হবে না। পুলিশ ওঁত পেতে বেড়াচ্ছে। কোন্ কাগজে কীভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, তাও সে বলে দিয়ে গেল। সে একথাও বলল যে, আমার বাড়িতে যাবে না।"

বৈজুনাথ নামটা তো বাঙালি নয় তাহলে দৈনিক সত্যসেবকে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছিল কেন?"

বেণীমাধব হাসলেন। "বৈজুনাথ ওর ছদ্মনাম। ও আসলে বাঙালি। ওর প্রকৃত নাম আমিও জানি না। অনেকগুলো নাম নিয়ে ও কারবার চালাত।"

"তারপর আপনি বিজ্ঞাপন দিলেন?"

"শেষপর্যন্ত দিলাম। আমার লোভ বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া মনে মনে ঠিক করেছিলুম নির্জন মন্দিরে আমাকে সে বাঁটুলটা বেচামাত্র ওটা খুলে দেখে নেব। যদি হিরে না থাকে, তাহলে...."

"তাহলে পিস্তল দেখিয়ে ওকে ভয় পাইয়ে টাকা ফেরত নেবেন—এই তো?"

"ঠিক বলেছেন।"

"হুঁ—বৈজুনাথ আপনার বাড়ি যেতে চায়নি কেন বোঝা যাচ্ছে। সে ভেবেছিল, বাড়িতে ওকে পেয়ে আপনি ব্ল্যাকমেইল করে কম দাম দেবেন।"

"বৈজনাথ বড় ধুরন্ধর ছিল। কিন্তু বেঘোরে মারা পড়ল শেষ পর্যন্ত!"

এতক্ষণে টের পেলুম, যশোর রোডের সেই মন্দিরে যার মড়া দেখেছি, সেই লোকটা বৈজুনাথ। ভিখিরির ছদ্মবেশেই ওখানে গিয়েছিল সে।

কর্নেল বললেন, "বাঁটুলের ভেতরে হিরের খোঁজ কেউ আগে থেকেই জানত, বেণীমাধববাবু। তাই সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তার সম্পর্কে আমরা এখনও কিছু জানি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যে তার একটা শিক্ষিত শিম্পাঞ্জি আছে। শিম্পাঞ্জিকে দিয়ে সে টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে ক্যাসেট বাজিয়ে ভূতপ্রেতের ভয় দেখিয়েছে আপনাকে। সে ভেবেছিল, আলেকজান্ডারের বাঁটুলের ভেতরকার হিরের খবর আপনি জানেন না। অতএব ভূতের উৎপাতে উত্যক্ত হয়ে ভাববেন ওই বাঁটুলটাই এর মূলে এবং ওটা হাতছাড়া করতে চাইবেন। আচ্ছা বেণীমাধববাবু, কেউ কোনোদিন কি আপনার দোকানে এসে বাঁটুলের খোঁজ করেছিল?"

বেণীমাধববাবু বললেন, "বাঁটুল সম্পর্কে কেউ খোঁজ করেনি। তবে হ্যাঁ—একজন খদ্দের কিছুদিন আগে জিগ্যেস করছিল। খ্রীস্টপূর্ব কোনো গ্রিক প্রত্নদ্রব্য আমার কাছে পাওয়া যায় নাকি।"

"কেমন চেহারা তার, মনে আছে?"

"আপনার মতোই মুখে দাড়ি ছিল। তবে কালো দাড়ি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে। লম্বা গড়ন। গায়ের রঙ ময়লা। লোকটাকে আমার মনে আছে। কারণ..." একটু ভেবে বেণীমাধব বললেন, "হ্যাঁ—ওর নাকটার জন্য। ওরকম বাঁকা লম্বা নাক সচরাচর দেখা যায় না। বাজপাখির মতো কতকটা। তার চোখে সানগ্লাস ছিল। লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। কেমন নাকিস্বরে ইংরেজিতে কথা বলছিল।"

কর্নেল গুম হয়ে কী ভাবতে থাকলেন। চোখ বুজে টাকে একবার হাত বুলিয়ে সাদা দাড়িতে আঁচড় কাটতে থাকলেন অভ্যাসবশে। আমি একটা পত্রিকায় চোখ রাখলুম। বেণীমাধব উসখুস করছিলেন। কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। সেই সময় কর্নেল বললেন, "পার্কস্ট্রিটে বৈজুনাথের সেই বন্ধুর চেহারা কেমন?"

বেণীমাধববাবু বললেন, "নাঃ । সে নয়। সে যত ছদ্মবেশে আসুক, আমি চিনে ফেলব। তাছাড়া সে ফর্সা, মোটাসোটা। তার নাকটা বেঁটে। আমার বয়সী লোক।"

"নাম কী?"

"ভোমরলাল চোপরা। অবাঙালি। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের বড় ব্যবসা আছে। তবে বুঝতেই পারছেন, সে কেমন।"

"ঠিকানাটা লিখে দিন প্লিজ। ফোন নাম্বার জানলে তাও লিখে দিন।"

বেণীমাধব একটুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন। কর্নেল সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললে,, "ঠিক আছে। আপনি কিছু ভাববেন না বেণীমাধববাবু। আপনার মূল্যবান জিনিস নিরাপদেই থাকছে। খুনে শিম্পাঞ্জির মালিককে খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগবে এই যা।"...

বেণীমাধববাবু চলে গেলে বললুম। "ভোমরালালের পক্ষে বাঁটুলের গুপ্তরহস্য জানা খুবই সম্ভব। তাই না কর্নেল?"

কর্নেল একটু হেসে ফোন তুলে ডায়াল করলেন। তারপর ওঁর এইসব কথাবার্তা শুনলুম। ইংরেজিতেই কথা বলেছিলেন কর্নেল।..."হ্যালো! আমি মিঃ চোপরার সঙ্গে কথা বলতে চাই।...ও,

আচ্ছা! কোথায়! ..আচ্ছা, আচ্ছা। ...হ্যাঁ, আমি ওঁর এক বন্ধু কথা বলছি। আমার নাম বি.এম.রায়। কবে ফিরবেন বলে গেছেন? ...কিন্তু আমার যে জরুরি দরকার ওঁর সঙ্গে। ট্রাংক কলে কথা বলব, যদি ঠিকানাটা দয়া করে জানান।।...বুঝেছি! আচ্ছা, ঠিক আছে।"

কর্নেল ফোন রেখে বললেন, "চোপরা গেছে কাশ্মীরে বেড়াতে। শ্রীনগরে দুদিন থেকে যাবে লাডাকে। ওর পি. এ. ফোন ধরেছিল। বলল, ওঁর সঙ্গে ট্রাংককলে যোগাযোগ করা যাবে না, কোথাও থাকার ঠিক নেই।"

হাসতে হাসতে বললুম, "কলকাতার গরম সহ্য হচ্ছিল না।—তাই বুঝি লাডাকে?"

কর্নেল বললেন, "লাডাকের রাজধানী লেহ্। সেখানে নাকি চোপরার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে। ওর পি. এ. বলল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, চোপরা একটু কিছু আঁচ করেই কেটে পড়েছে কলকাতা থেকে। কারণ ওর পি. এ. বলল কবে কলকাতা ফিরবে ঠিক নেই। লাডাক থেকে বিদেশেও যেতে পারে।"

"দেশবিদেশে যাদের কারবার তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক তাই না?"

কর্নেল জবাব না দিয়ে আবার চোখ বুজলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে গিয়ে সেই পুরনো ইংরেজি বইটা নিয়ে এলেন। দ্রুত পাতা উল্টে একখানে চোখ রেখে বললেন, "হুঁ—লাডাক। আরিয়ান লিখেছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্রাটের সন্দেহ ছিল, পলাতক দেহরক্ষী অ্যাস্টিডোনা তাঁর অমূল্য বাঁটুল চুরি করে নিয়ে পূর্বদিকে পালিয়ে গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর এক চীনা পরিব্রাজক আলেকজান্দ্রিয়ায় আমাকে বলেছিলেন, কাশ্মীরের উত্তরে লাডাক রাজ্যে একদল গ্রিককে দেখেছেন। বুঝলুম, ওরা সম্রাটের বাহিনী থেকে পলাতক গ্রিক দেহরক্ষী সেনাদল। বাঁটুল হারিয়ে সম্রাট এত খাপ্পা হয়েছিলেন যে তাঁর দেহরক্ষী পঞ্চাশজন সৈনিককেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অ্যাস্টিডোনা এদের নায়ক ছিল। সে পালিয়ে যায় প্রথমে। পরে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরো চল্লিশজন। বাকি ন'জনের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। চীনা পরিব্রাজকের কথায় জানা গেল, সেই একচল্লিশ জন গ্রিক সৈনিক লাডাক রাজ্যে বাস করছে।"

কর্নেল ওই অংশটুকু পড়ার পর বললেন, "আরিয়ানের প্যাপিরাসে লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার একটি ধ্বংসবশেষে। তা ১৮৯৪ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক হ্যালডেন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই বইটা ১৯০৮ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে পেয়ে গিয়েছিলাম। এটা এত কাজে লাগবে ভাবতেই পারিনি।"

বললুম, "কাজে আর কতটুকু লাগল? শিম্পাঞ্জিওয়ালা খুনীকে যদি ধরিয়ে দিতে পারত, তাহলে বুঝতাম!"

কর্নেল আমার পরিহাসে কান করলেন না। আপনমনে বিড়-বিড় করে কিছুক্ষণ 'লাডাক' এবং 'গ্রিক দেহরক্ষীদল' কথাদুটো উচ্চারণ করলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, "জয়ন্ত! এই প্রচণ্ড গরমে প্রাণ আইঢাই করছে। যাবে নাকি লাডাকে? সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পনেরোহাজার ফুট উঁচুতে লাডাকের অবস্থান। এখন সেখানে দারুণ স্নিগ্ধ আবহাওয়া। চিরবসন্তের দেশ ডার্লিং।"

হুঁ, আমার বৃদ্ধ বন্ধু আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন। বললুম, "যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু সেখানে সেই খুনে শিম্পাঞ্জি, আর তার দুষ্ট মনিবটির সঙ্গে দেখা হবার চান্স আছে কি?"

"থাকতেও পারে!"

"তাহলেই তো মুশকিল!"

"মুশকিল কীসের?" প্রাজ্ঞ গোয়েন্দাপ্রবর নিভে যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, "যেখানে মুশকিল, সেখানেই মুশকিল আসান। ডার্লিং জয়ন্ত, শেষপর্যন্ত এই বুড়োকে কিন্তু সত্যি মুসলিম পীর মুশকিল আসান সাজতে হবে এবং তুমি হবে আমার চেলা।"

"ছদ্মবেশ ধরতে হবে নাকি?"

"হুঁউ। লাডাকের অধিবাসীরা মোটামুটি দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলিম এবং বৌদ্ধ। হিন্দুর সংখ্যা খুবই কম। কাজেই মুসলিম পীর সাজাটা নিরাপদ। কারণ আমাকে বৌদ্ধলামা মানাবে না, যতই নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করি, তাছাড়া..." কর্নেল নিজে সাদা দাড়ি দেখিয়ে বললেন, "লামাদের দাড়ি থাকে না। তাই লামা সাজতে হলে আমার এই সুন্দর দাড়িটা ছেঁটে ফেলতে হবে। জয়ন্ত, প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু এই দাড়ি ত্যাগ করা অসম্ভব।"

উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, "আপনি না হয় সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। মুসলিম মন্ত্র আওড়ানো আপনার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমি ওসব কিছু জানিনে!"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "ভয় নেই। আমি মাঝে মাঝে যা আওড়াব—তুমিও তাই আওড়াবে।"

সায় দিলুম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না।

পীরবাবার কেরামতি

শ্রীনগর থেকে লাডাকের রাজধানী লেহ-এর দূরত্ব ৪৩৪ কিলোমিটার। শোনমার্গ নামে একটা জায়গা থেকে রাস্তার দু'ধারের দৃশ্য বদলাতে শুরু করেছিল। ফুলে-ফুলে ঢাকা মাঠ, দূরে সাদা তুষারে ঢাকা পর্বতশ্রেণি। রাস্তা ক্রমশ এঁকেবেঁকে চড়াইয়ে উঠছিল। তারপর পাহাড়ের রাজ্য। পিলে চমকানো বাঁকের নিচে অতল খাদ দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। আর কী অদ্ভুত গড়নের সব পাহাড়! কত রকম রঙ তাদের—সোনালী, খয়েরী, কালো, কোনোটা নীল। দিগন্তে যেন আদিম যুগের সব অতিকায় ডাইনোসর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনো পাহাড়ের গড়ন বেঁটে, কোনোটা যেন দৈত্যের মতো। কোনোটার মাথায় সেকালের ভাঙাচোরা দুর্গ—নিচে পর্যন্ত পাথর ছড়ানো। বৌদ্ধ মন্দির গুম্ফাও দেখতে পাচ্ছিলুম। হলদে রঙের আলখেল্লাধারী বৌদ্ধ ধর্মগুরু লামাদেরও দেখতে পাচ্ছিলুম। দুপুরে লেহ পৌঁছে বাস থেকে আমরা নেমেছিলুম। তখন ছদ্মবেশ ধরিনি।

যে হোটেলে আমরা উঠলুম, তা থিক্‌সে গুম্ফার কাছাকাছি নিরিবিলি একটা পাহাড়ের গায়ে, হোটেলের নাম 'সানি লজ'। তার মালিক সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার। পাঞ্জাবের লোক। অর্জুন সিং নাম। দেখলুম, উনি কর্নেলের পরিচিত। নিচের উপত্যকায় ঘাসের মাঠে গুজ্জর রাখালরা ভেড়া চরাচ্ছিল। অর্জুন সিং বললেন, "ওরা যাযাবর জাতি। ওদের বলা হয় গুজ্জর বখরাওয়ালা। কর্নেল, আপনি নাগপা উপজাতির কথা জানতে চাইছেন তো? নাগপারা থাকে সামনের ওই পাহাড়টার পেছনে। ওদের চেহারা ভারি সুন্দর। কিংবদন্তি আছে যে ওরা নাকি গ্রিকদের বংশধর। গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে পৌঁছলে কোনো কারণে একদল গ্রিক সৈনিক পালিয়ে এসেছিল লাডাকে। নাগপারা তাদেরই নাকি বংশধর।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ—ওদের কথা বইয়ে পড়েছি। ওদের সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ।"

অর্জুন সিং বললেন, "ঠিক আছে। ওদের একজনের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাকে ডেকে পাঠাব।"

কর্নেল বললেন, 'দরকার নেই। আমি গিয়ে আলাপ করব ওদের সঙ্গে।"

অর্জুন সিং গম্ভীর মুখে বললেন, "নাগপারা এমনিতে খুব ভদ্র। কিন্তু ওরা বাইরের লোকের প্রতি খুব সন্দেহপরায়ণ। তাই বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে চায় না। তাছাড়া ওরা কি দুর্দান্ত হিংস্র প্রকৃতিরও। সাবধানে মেলামেশা করা দরকার।"

কথা হচ্ছিল হোটেলের ব্যালকনিতে বসে। একটু পরেই কর্নেল বললেন, "আচ্ছা ব্রিগেডিয়ার সিং, এখানে কলকাতার ভোমরলাল চোপরা কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে শুনেছিলুম। কোথায় সেটা?" অর্জুন সিং একটু হেসে বললেন, "চোপরাকে চেনেন নাকি?"

"না। নাম শুনেছি।"

"চোপরা বিপজ্জনক লোক। ও আসলে চোরাচালানি। এখান থেকে চীনের কাশগড়ে যাবার একটা রাস্তা আছে। দুর্গম রাস্তা অবশ্য। চোপরা সেই রাস্তায় চীন থেকে বে-আইনিভাবে জিনিসপত্র আমদানি করে। আমাদের সেনাবাহিনী সারা এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। কারণ সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয়। চোপরার ধূর্ততা অসাধারণ। সেনাবাহিনীর চোখ এড়িয়ে কারবার করে।"

"চোপরার অফিসটা কোন্ এলাকায়?"

অর্জুন সিং আঙুল তুলে শহরের দিকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে একটা সাদা বাড়ি—তার নিচে বাজার দেখা যাচ্ছে। বাজারের পেছনে গম্বুজওলা মসজিদের পাশেই চোপরার অফিস। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। টিলার আড়ালে পড়ে গেছে।"

এরপর কর্নেল আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন অর্জুন সিংকে, চুপি চুপি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারপর দেখলুম অর্জুন সিং হা-হা করে হেসে উঠলেন প্রচণ্ড ভুঁড়ি দুলিয়ে। কর্নেল আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঘরে। বললেন, "এবেলা বিশ্রাম করা যাক। সন্ধ্যার মুখে আমরা বেরুব। জয়ন্ত, তখন আমি কিন্তু মুশকিল আসান পীর। আর তুমি আমার চেলা।"

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, "ছদ্মবেশ না ধরলেই কি নয়?"

কর্নেল একটু হেসে শুধু বললেন, "যস্মিন দেশে যদাচার।"

ব্রিগেডিয়ার অর্জুন সিং বিকেল গড়িয়ে আমাদের ঘরে এলেন। চাপা গলায় বললেন, "হ্যাঁ—খবর নিয়েছি। চোপরা এসেছে দিন চারেক আগে।"

কর্নেল বললেন, "আমাদের পোশাক পরা শেষ হলে আমরা বেরুব কিন্তু।"

"করিডর দিয়ে এগিয়ে পেছনের দিকে নেমে যাবার সিঁড়ি আছে। ওদিকটা নির্জন। আপনারা নিশ্চিন্তে বেরুতে পারেন। ওদিকে দরজা আমি খুলে রাখছি। নামবার সময় কিন্তু ভেজিয়ে দিয়ে যাবেন।" বলে অর্জুন সিং চলে গেলেন।

কর্নেল দরজা এঁটে দিয়ে স্যুটকেশ খুলে বললেন, "চিৎপুরে দাশ অ্যাণ্ড কোম্পানি যাত্রা থিয়েটারের পোশাক ভাড়া দেয়। এগুলো তাদের কাছ থেকে জোগাড় করেছি। ডার্লিং, তোমার তো দাড়ি নেই। অতএব নকল দাড়ি পরতে হবে। মুখ আর দু-হাতের চামড়া একটু ময়লা দেখানো দরকার। পেন্ট এনেছি। মেখে নাও। আশা করি, কখনও-কখনও থিয়েটারে নেমেছে। অসুবিধা হলে আমি সাহায্য করব।"

কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ শেষ করে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালুম, না পারলুম নিজেকে চিনতে, না কর্নেলকে চিনতে। দুজনের পরনে দুটো কালো আলখেল্লা। মাথায় নোংরা রঙিন কাপড়ের পাগড়ি। গলায় ইয়া মোটা রঙিন পাথরের মালা। কর্নেলের হাতে একটা হাতলওয়ালা ধূপদানি, আর প্রকাণ্ড কালো চামর। আমার হাতে একটা মস্তবড় লোহার চিমটে। চিমটেয় আংটা পরানো রয়েছে অনেকগুলো। কর্নেল দেখিয়ে দিলেন, কেমন করে চিমটেটা তুলে বুকে মৃদু ঘা মারতে হবে এবং ঝুনঝুন শব্দ উঠবে। সেইসঙ্গে বিড়বিড় করতে হবে—ঠোঁট দুটো সবসময় কাঁপবে। তারপর কী বলতে হবে, তাও শিখিয়ে দিলেন।

ধূপদানিতে একগাদা টিকে ভরে আগুন ধরালেন কর্নেল। তারপর ধূপ ছড়িয়ে দিলেন। ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল। তারপর বেরিয়ে পড়লুম।

হোটেলের পেছনে খাড়া পাহাড়। খাঁজকাটা গা দিয়ে নিচের রাস্তায় নামলুম যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল বেমক্কা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ইয়া পীর মুশকিল আসান।"

ট্রেনিং মতো আমিও চেঁচিয়ে বললুম, "যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।"

রাস্তা ক্রমশ বাজারের দিকে নেমেছে! ঘোড়ার টানা গাড়ি, মোটরগাড়ি, হরেকরকম যানবাহন চলাচল করছে। তত বেশি ভিড় চোখে পড়ল না। পীরবাবা যে দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছেন এবং

ওই বুলি বলে হাঁক দিচ্ছেন, সেই দোকানের লোক এসে ধূপদানির তলার দিকে বাটির মতো গোল পাত্রটাতে ঠকাস করে পয়সা ফেলছে। আর পীরবাবা তার মাথার চামর বুলিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ে 'মুশকিল আসান' করছেন।

কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন, প্রচুর মুসলিম এদেশে বাস করে। গম্বুজওলা মসজিদের সামনের ধাপবন্দী সিঁড়িতে আমরা যখন বসলুম, তখন ধাপের নিচে ভিড় জমে গেল। মসজিদ থেকে প্রার্থনা করে দলে দলে লোক বেরিয়ে এল। তারাও ভিড় করে দাঁড়াল। পীরবাবা সমানে হাঁক দিচ্ছেন, "ইয়া পীর মুশকিল আসান!" আমি পাল্টা চেঁচিয়ে উঠছি, "যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান!"

আড়চোখে দেখছিলুম, বাঁপাশে—রাস্তার ধারে একটা বাড়ির মাথায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে : 'চোপরা অ্যান্ড কোং।' অফিস এখন বন্ধ। দোতলার ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে।

পীরবাবার ধূপদানির তলাকার বাটিটা পয়সার ভরে গেল। তারপর ভিড় ক্রমশ কমে গেল। মনে হল, খুব সকাল সকাল এখানকার লোকেরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। একদল লোক আবার প্রার্থনার জন্য মসজিদে ঢুকল এবং কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল। পীরবাবা আর তার চেলা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। আর কেউ আশীর্বাদ নিতে আসছে না। রাত আটটা বাজে। মসজিদের ভেতর ঘড়ির বাজনা শুনে বুঝলুম সেটা।

এবার কোত্থেকে দুটো রাস্তার কুকুর এসে আমাদের বেজায় ধমকাতে শুরু করল। কিছুতেই তাড়ানো গেল না তাদের। তখন হঠাৎ পীরবাবা গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, "বেটা! বাঁটুলঠো নিকালো! মার দো দোনো কুত্তাকো!"

আমি অবাক হয়ে তাকাচ্ছি। পীরবাবা ফের জোরগলায় ধমক দিলেন, "কাঁহা তেরা বাঁটুল? হাম তুমকো যো বাঁটুল দিয়া, কাঁহা রাখা তুম? দেখো আভি ঢুঁড়কে।"

তারপর কুকুর দুটোর দিকে ঘুরে চেঁচালেন আগের মতো হিন্দিভাষায়—"যে-সে বাঁটুল নয়, পাঁচ-পাঁচশো গ্রাম ওজন। মারলে তোদের মাথা ফুটো হয়ে যাবে জানিস ব্যাটারা?"

কুকুর দুটো কী বুঝল কে জানে, হয়ত মুঠো নাড়া দেখেই কেটে পড়ল লেজ গুটিয়ে। তারপর দেখি চোপরা অ্যান্ড কোং-এর পাশের গলি থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। সে হনহন করে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। পরনে প্যান্টশার্ট, ফর্সা, মোটাসোটা গড়ন। নাকটা মোটা। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "সেলাম পীর বাবা।"

পীরবাবা চামর তুলে মিঠে গলায় বললেন, "এস বেটা! মুশকিল আসান করে দিই!"

লোকটা নিচের সিঁড়িতে ধপাস করে বসে পড়ল।

"বেটা তোমার নাম কী?"

"জী পীরবাবা, আমার নাম ভোমরলাল চোপরা। সামান্য ব্যবসাদার।"

আমি চমকে উঠলুম। তারপর সামলে নিয়ে বিড়বিড় করার ভঙ্গিতে ঠোঁট কাঁপাতে থাকলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কী মুশকিলে পড়েছ, বলো তো বেটা ভোমরলাল?"

ভোমরলাল এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপাগলায় বলল, "পীরবাবা আমার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, আপনি কত লোকের মুশকিল আসান করছেন। তাই আপনার কাছে এলুম। বাবা, আমি বড্ড মুশকিলে পড়েছি। কিন্তু এখানে রাস্তার ধারে সে সব কথা খুলে বলা যাবে না। দয়া করে যদি আমার ঘরে পায়ের ধুলো দেন, ভাল হয়।"

পীরবাবা উঠে দাঁড়ালেন। "ঠিক হ্যায় বেটা! চলো।"

আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ধূর্ত চোপরা নিশ্চয় ঘরের ভেতর উজ্জ্বল আলোয় আমাদের ছদ্মবেশ ধরে ফেলবে। কর্নেল কাজ ঠিক করছেন না। কিন্তু কর্নেল দেখলুম, দিব্যি হেঁটে চলেছেন ওর পেছনে।

পাশের সরু গলিতে ঢুকে একটা দরজা। তারপর সিঁড়ি। ওপরে গিয়ে একটা ঘরে আমাদের বসাল চোপরা। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

পীরবেশী কর্নেল মিষ্টি হেসে বললেন, "এবার বলো বেটা কী মুশকিলে পড়েছ?"

অমনি প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করে বলল, "টুঁ শব্দ করলে মরবে। কৈ বাঁটুলটা বের কর। চটপট। নইলে খুলি উড়িয়ে দেব দুজনের!"

শিম্পাঞ্জির কবলে

হকচকিয়ে গিয়েছিলুম চোপরার কাণ্ড দেখে। লোকটা দেখছি, সত্যি খুনে প্রকৃতির। ইচ্ছে করল, এই ফুট আড়াই লম্বা ও ভারি লোহার চিমটেটা নিয়ে ওর পিস্তলধরা হাতটাকে গুঁড়িয়ে দিই। কিন্তু কর্নেল ততক্ষণে মুখে প্রচণ্ড ভয় ফুটিয়ে ধুপ করে বসে পড়েছেন তারপর হাঁউমাউ করে বললেন, "দিচ্ছি বাবা, আগে তোমার এই সাংঘাতিক জিনিসটা সরাও!"

বলে আমার দিকে ঘুরলেন। "ব্যাটা! তুম ভি বৈঠ যাও।" তখন আমিও করুণ এবং ভীত মুখ করে ওঁর ভঙ্গিতে হাটু দুমড়ে আসন করে বসলুম।

চোপরার একহাতে পিস্তল, অন্য হাতটা বাড়িয়ে আছে। কর্নেল তাঁর আলখেল্লার ভেতর থেকে সত্যি একটা বাঁটুল বের করলেন। ঠিক যেমনটি বেণীমাধব ওঁকে রাখতে দিয়েছেন, তেমনটি। উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবলুম, বেণীমাধবের বাঁটুলটাই কি শয়তান চোপরাকে দিয়ে দিচ্ছে কর্নেল?

চোপরা খপ করে বাঁটুলটা কেড়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এবং নেড়েচেড়ে দেখল। গায়ের ওপরকার খোদাই করা নকশা ও লেখাজোখাও দেখল। দেখে বলল, "এই ব্যাটা ফকির! কোথায় পেলি এ জিনিস?"

কর্নেল বললেন, "নাগপাদের বস্তির কাছে একটা পাহাড়ী গুহায় কুড়িয়ে পেয়েছি বাবা!"

"ওখানে মরতে গিয়েছিলি কেন?"

"ওটাই যে আমার ডেরা বাবা!" কর্নেল মিষ্টি হেসে বললেন। তারপর চোখদুটো ধুরন্ধর লোকের মতো একটু টিপে চাপা গলায় ফের বললেন "মাসখানেক আগে তোমার মতো এক বড়া আদমিকে এমনি একটা জিনিস দিয়েছিলুম। কিন্তু সে তোমার মতো পিস্তল বের করেনি। তাকে খুশি হয়ে দিয়েছিলুম। জিনিসটা খুব পয়মন্ত। ঘরে থাকলে মুশকিল আসান হয়। তারপরে..."

চোপরার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "আর কাউকে দিয়েছিস নাকি?"

কর্নেল বললেন, "আহা, বলতে দাও সেকথা। পয়মন্ত জিনিসটা পেয়ে লোকটার কপাল ফিরে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে এসে বলল, জিনিসটা হারিয়ে ফেলেছে। আর একটা যদি দিই, তার খুব উপকার হয়।"

"তুই আবার দিলি তাকে?"

"হ্যাঁ বাবা। গুহার ভেতর খুঁজলেই এ জিনিস পাওয়া যায়।"

চোপরা পিস্তল পকেটে ভরে বলল, "নাগপারা তোকে থাকতে দেয় ওদের এলাকায়? শুনেছি ওরা খুব দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ। বাইরের লোককে ওদের এলাকায় যেতেই দেয় না!"

কর্নেল হাসলেন। "ব্যাটা আমি খোদার ফকির। পীর মুশকিল আসানের চেলা। আমাকে নাগপারা কিছু বলে না।"

চোপরা বাঁটুলটা আবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "এই ব্যাটা ফকির! জিনিসটার জন্য তোকে দুটো টাকা দিচ্ছি। আর শোন, এ জিনিস আমার আরও চাই। তোকে আরও টাকা দেব। তোর ডেরায় আমাকে নিয়ে চল।'

কর্নেল আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে বললেন, "সর্বনাশ! নাগপারা যদি টের পায়, তাহলে আমাকে

আর আমার চেলাকে তো বটেই, তোমাকেও মেরে ফেলবে। বাবা, একটু ধৈর্য ধরো। আমি কাল সকালে তোমাকে আরও কয়েকটা এনে দেব। ভেব না!"

চোপরা ক্রূর চাহনিতে একবার কর্নেলের দিকে, আরেকবার আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "উঁহু! আজ রাতেই চাই। নে—ওঠ্ শিগগির।"

কর্নেল আরও আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে বললেন, "কথা শোনো বাবা! নাগপা বস্তিতে সাংঘাতিক একপাল কুকুর আছে। তারা রাত জেগে পাহারা দেয়। আমাদের দুজনকে তারা কিছু বলবে না। কিন্তু তোমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারব না।"

চোপরা ফের পিস্তল বের করে বলল, "তবে রে ব্যাটা ফকির। আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে? নাগপা-বস্তি কোথায় আমি জানি না বুঝি? ওরা থাকে উপত্যকার সমতলে। পাহাড়-টাহাড় ওদের বস্তি থেকে খানিকটা দূরে। বস্তি দিয়ে গেলে তবে তো ওদের কুকুরের পাল্লায় পড়ব। আমরা ঘুরপথে যাব। ওঠ্ শিগগির।"

আমি মনে মনে ঘাবড়ে গেলুম। কর্নেলের মুখটাও গম্ভীর দেখলুম। চোপরা পিস্তলটা ওঁর পাগড়িতেই ঠেকাতেই উনি "ওরে বাবা! যাচ্ছি, যাচ্ছি!" বলে উঠে দাঁড়ালেন।

ধুরন্ধর চোপরা হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলল, "এই ব্যাটা ফকিরের চেলা, তুই এখানে থাক। ফকিরবুড়ো যদি আমাকেও কোথাও বেমক্কা ফেলে কেটে পড়ে! তুই জামিন রইলি। গুহাটা দেখে এসে তবে তোকে ছেড়ে দেব। আর ফকিরবুড়ো যদি আমাকে ঠকায়, তাহলে তোর পরিণাম কী হবে আগে দেখে রাখ্। এ বুড়োও দেখে যাক্। তাহলে আমাকে ঠকাবে না।"

বলে সে শিস দিল তিনবার। অমনি অন্যপাশের একটা দরজা ঠেলে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে প্রচণ্ড চমকে উঠলুম। গোয়েন্দাপ্রবর তাহলে ঠিকই আঁচ করেছিলেন!

কালো বীভৎস চেহারার একটা শিম্পাঞ্জি ঘরে ঢুকল। কুত-কুতে চোখে আমাদের দেখতে দেখতে বিকট ভঙ্গিতে হাসবার মতো দাঁত বের করল। চোপরা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "জাম্বু। তুই এই ব্যাটাকে পাহারা দিবি। পালানোর চেষ্টা করলেই ওকে নিকেশ করে ফেলবি।" বলে চোপরা হাত দিয়ে গলা টেপার ইশারা করল।

হতচ্ছাড়া শিম্পাঞ্জিটা আবার দাঁত বের করল আমার দিকে তাকিয়ে। কর্নেলের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে চোপরা তাঁকে বাইরের দরজা দিয়ে নিয়ে গেল। তরপর দরজা বন্ধ করল। বুঝতে পারলুম, দরজায় তালা দিচ্ছে সে।

আমি শিম্পাঞ্জির দিকে তাকিয়ে রইলুম! ভয়ে বুকে টিপটিপ করছে। আমার গায়ের কালো আলখেল্লার ভেতর রিভলবার লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু জন্তুটাকে গুলি করলে চোপরার লোকেরা টের পেয়ে যাবে। তাছাড়া বাইরে যাবার পথ বন্ধ। একা তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না। ওর লোকেদের কাছেও যে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, কে বলতে পারে?

শিম্পাঞ্জিটা হেলে-দুলে গদাইলস্করী চালে আমার দিকে এগিয়ে এল। তারপর দাঁত দেখিয়ে ধমক দেবার ভঙ্গিতে বাঁদুরে ভাষায় কী যেন বলল। আমি ভয়ে-ভয়ে ওর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করলুম। বললুম, "ওহে জাম্বু! এস, এস। তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক্।"

অমনি ভেতরের দরজায় একটা হোঁৎকামোটা চীনাদের মতো চেহারার লোক উঁকি মেরে ধমক দিয়ে বলল, "চুপ্। বাত্চিত্ করলে জাম্বু থাপ্পড় মারবে। চুপচুপ বসে থাক্।"

লোকটার হাতে দেখছি একটা লম্বাটে সেকেলে পিস্তল! সে আবার দরজার পর্দার আড়ালে চলে গেল। বুঝলুম, আমার সত্যিই টুঁ শব্দ করা চলবে না।

ঘরটা বেশ বড়ো। মেঝে কাশ্মীরী কার্পেটে ঢাকা। বাড়িটা কাঠের মনে হল। মেঝেও কাঠের। তাই জাম্বু নড়াচড়া করলেই মচমচ শব্দ হচ্ছে। সে আমাকে কিছুক্ষণ ধমক দিয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি

খেল। তারপর সোফায় চিত হয়ে শুয়ে মানুষের মতো ঠ্যাং নাচাতে থাকল। কিন্তু আমি একটু নড়লেই সে চমকে উঠছিল এবং দাঁত বের করে ধমক দিচ্ছিল। কখনও জিভ বের করে ভেংচি কাটছিল। রাগে আমি অস্থির। কিন্তু কিছু করার নেই। এদিকে কর্নেলের জন্যও ভীষণ ভাবনায় পড়েছি। চোপরা অসম্ভব ধূর্ত লোক বটে। নাগপা বস্তিটা কোথায় কর্নেল সঠিক জানেন না। কোন্ পাহাড়ে গুহা আছে, তাও জানেন না। গুহা যে থাকবেই তারও মানে নেই। কর্নেল কেন যে ছাই ওসব বলতে গেলেন তাকে! হয়তো এবার নিজের প্রাণটিও খোয়াবেন বেঘোরে—আমার প্রাণটিও যাবে শেষ পর্যন্ত।

শিম্পাঞ্জিটা চিত হয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে মুখ কাত করে আমাকে দেখে নিয়ে জিভ বের করে ভেংচি কাটছে। তারপর দাঁত বের করে অদ্ভুত কিচমিচ শব্দে যেন হাসছে। আমার আর সহ্য হল না। ফের সে জিভ বের করে ভেংচি কাটলে আমিও জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটলুম।

তখন সে তড়াক করে উঠে বসল। তারপর হেলে-দুলে এগিয়ে এল। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমার। মরিয়া হয়ে আলখেল্লার ভেতর হাত ভরে রিভলভার বের করব ভাবছি, সে লম্বাটে হাত বাড়িয়ে আমার দুটো কান মুলে দিল। রাগে-দুঃখে আমি গর্জে উঠলুম, "তবে রে হতচ্ছাড়া!" সেই সময় দরজার পর্দা তুলে সেই লোকটা ধমক দিল, "ফের চ্যাঁচাচ্ছিস?"

বললুম, "জান্তু আমার কান মুলে দিচ্ছে দেখছ না?"

লোকটা হ্যা হ্যা করে হাসল। "বেশ করেছে! তুই নড়াচড়া করছিস কেন?"

কানদুটো জ্বালা করছিল। রক্ত বেরুচ্ছে কি না কে জানে! পাগড়ির দুপাশ টেনে কানদুটো ঢেকে ফেললুম। জান্তু এবার আমার সামনেই মেঝেতে চিত হয়ে শুল। এবং চার হাত-পা তুলে স্থির হয়ে রইল। লোকটা আবার আড়ালে চলে গেল।

সময় কাটছে না। কর্নেলের সঙ্গে এতকাল কত সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চারে গেছি, কিন্তু এমন বিপদে কখনও পড়িনি। কর্নেলের বার্ধক্যজনিত বুদ্ধি বিভ্রম ছাড়া একে কী বলব? কেন যে যেচে এমন করে বাঘের মুখে গলা বাড়িয়ে দিতে এলেন!

শিম্পাঞ্জিটা সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে—চোখ বুজে হাত-পা তেমনি ওপরে তুলে রেখেছে। ঘুমোচ্ছে বদমাস খুনে বাঁদরটা! হঠাৎ দরজাটা প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল এবং কর্নেলকে দেখতে পেলুম। সেই পীরবাবার পোশাকটা পরনে। পাগড়ি নেই মাথায়। স্বপ্ন নয় তো?

স্বপ্ন নয়—ব্যাপারটা সত্যি ঘটছে। কর্নেল দরজা খুলেই ইশারা করলেন বেরিয়ে যেতে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু পা বাড়াতেই মেঝেয় শব্দ হল এবং শিম্পাঞ্জিটা চোখ খুলল। তখন একলাফে দরজার দিকে গেলুম। জন্তুটা লাফিয়ে উঠল। ভেতরের দরজার পর্দা তুলে লোকটাও উঁকি মারল। কিন্তু কর্নেল দড়াম করে দরজা আটকে ঝটপট তালা এঁটে দিলেন। ইন্টারলকিং সিস্টেমের দরজা আটকে গেল। তারপর দুজনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলুম। তারপর আরেকটা দরজা পেরিয়ে গলিতে—গলি থেকে রাস্তায়।...

ওল্টি ও হিস্টোফান

হোটেলে আমাদের ঘরে ঢুকে কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, চোপরা এখনও পাহাড়ের চাতালে পড়ে রয়েছে। শীতটা সে এতক্ষণে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। যেটুকু গরম পড়ে, সন্ধ্যার পর থেকে তা চাপা দিতে ঠাণ্ডা হিম সাংঘাতিক একটা হাওয়া আসে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। রাত যত বাড়ে, ঠাণ্ডার দাপটও তত বাড়ে। আশা করি সেটা টের পেয়েছ, ডার্লিং!"

বললুম, "ততটা পাইনি আলখেল্লার দৌলতে। কিন্তু চোপরাকে বেকায়দায় ফেললেন কীভাবে?"

"ওকে নিয়ে এই হোটেলের পাশ দিয়ে গেছি। ঢাল বেয়ে নেমে বাঁদিকে একটা পাহাড়ের চাতালে উঠেছি। তারপর আচমকা ধূপদানিটা ওর পিস্তলধরা হাতের ওপর প্রচণ্ড জোরে মেরেছি। পিস্তলটা খাদে গিয়ে পড়েছে। তখন ওকে জাপটে ধরে কুপোকাত করতে দেরি হয়নি। পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলেছি পাগড়ি দিয়ে। পাগড়িটা এত কাজে লাগবে ভাবতে পারিনি। দশহাত লম্বা পাগড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রেখে ওর পকেট থেকে চাবি নিয়ে দৌড়ে গেছি। যাক্ গে, তুমি আলখেল্লাটা ছেড়ে ফেলো। রাত দশটা বাজে প্রায়।"

আলখেল্লা ছেড়ে রাতের পোশাক পরে বললুম, "সেই বাঁটুলটার কী হল?"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "ওটা তো নকল বাঁটুল। মসজিদের সিঁড়িতে বসে থাকার সময় দুটো কুকুর এসে পড়ায় আমার বুদ্ধি খুলে গিয়েছিল। নইলে আমার উদ্দেশ্য ছিল, সারারাত ওখানে থেকে চোপরার অফিসের দিক লক্ষ্য রাখা। আর কথা নয়। ঘুমনো যাক।"

বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে বললুম, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ওইসব বাঁটুল একটা-দুটো নয়—আরও থাকতে পারে। গ্রিক দেহরক্ষীদের কাছেও নিছক অস্ত্র হিসেবে ওগুলো কি ছিল না? সম্রাটের বাঁটুল কিংবা তাঁর বাবা ফিলিপের বাঁটুল অ্যাস্টিডোনা করেছিল।"

কর্নেল ঘুম জড়ানো গলায় পাশের বিছানা থেকে বললেন, "ফিলিপের বাঁটুলে চোপরা কোনো হিরে পায়নি। সে ওর কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি। সারাপথ ওর সঙ্গে কথা বলে এর আভাস পেয়েছি। চোপরার বিশ্বাস, সব বাঁটুলে হিরে লুকোনো থাকতে নাও পারে। কিন্তু কিছু বাঁটুলে যে থাকবেই, তা নিশ্চিত।"

"হিরের কথা বলেছিল নাকি চোপরা?"

"হিরের কথাটা বলেনি। বলছিল, কিছু বাঁটুল খুব পয়মন্ত তা সে জানে। আবার কিছু বাঁটুল অপয়া, তাও সে জানে। যাক্ এসব কথা। ঘুমোও।"...

বেশ শীত করছিল। কম্বল মুড়ি দিতে হল। বেশ আরামে ঘুমোনো গেল সারারাত। সকালে উঠে দেখি, কর্নেল বিছানায় নেই। ব্যালকনিতে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কফি খেলুম। তারপর কর্নেল ফিরলেন। বুঝলুম, অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। গলা থেকে বাইনোকুলার ঝুলছে। লাডাকের পাখি প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটি করে বেরিয়েছেন সম্ভবত।

একটু হেসে বললেন, "সেই চাতালটা লক্ষ্য করেছি দূর থেকে। বাইনোকুলার দিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। চোপরা নেই। আমার পাগড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। ওর কাছে ছোরাও ছিল বোঝা গেল। তবে ডার্লিং, সেখানে এক মজার দৃশ্য দেখতে পেলুম। দুটো পাহাড়ী ছাগল জাতীয় প্রাণী পাগড়ির টুকরোগুলো মহানন্দে চিবুচ্ছে।"

ব্রিগেডিয়ার অর্জুন সিং এলেন।

কর্নেল বললেন, "ব্যস্ত হবেন না ব্রিগেডিয়ার সিং। কলকাতা থেকে আজ বেণীমাধব এসে পড়ার কথা। ওঁকে দিয়েই ফাঁদে ফেলব চোপরাকে। বৈজুনাথকে যে সে শিম্পাঞ্জি দিয়ে খুন করিয়েছে, সেটা প্রমাণ করা চাই আইনের চোখে। নইলে চোপরাকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করবেন না।"

অর্জুন সিং বললেন, "হ্যাঁ—সেও একটা কথা। তবে পুলিশকে আগেভাগে জানানো উচিত।"

কর্নেল বললেন, "পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দাপুলিশের অফিসাররা ইতিমধ্যে শ্রীনগরে পৌঁছে গেছেন। সেখান থেকে ওঁরা লেহ এসে পৌঁছবেন যেকোনো সময়ে। কাশ্মীরের গোয়েন্দাপুলিশ অনুমতি না দিলে ওঁরা তো চোপরাকে গ্রেফতার করতে পারবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি কলকাতা থেকে।"

অর্জুন সিং হেসে বললেন, "আঁটঘাট না বেঁধে আপনি কাজে নামেন না দেখছি।"

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে রইলুম। আমার বেশি রাগ শিম্পাঞ্জিটার ওপর। পাজি বাঁদরটা আমার কান দুটো মুলে ব্যথা করে ফেলেছে। বাঁদরের হাতে কানমলা খাওয়ার চেয়ে অপমানজনক আর কিছু নেই।

বিকেলে বেণীমাধববাবু এসে পৌঁছলেন। পথে বাস খারাপ হয়েছিল, তাই খুব ভুগেছেন। ওঁর জন্য পাশের ঘর বুক করা ছিল। আমরা কথাবার্তা বলছি, সেই সময় এলেন পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দাপুলিশের এক বড়কর্তা প্রণব রুদ্র। ওঁর সঙ্গে আমার চেনাজানা অনেকদিনের। পর্যটক সেজে এসেছেন দলবল নিয়ে। উঠেছেন অন্য একটা হোটেলে।

প্রণববাবু আর কর্নেল চাপা গলায় কথা বলতে থাকলেন। আমি আর বেণীমাধব ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। দৃশ্য দেখার জন্য আমি একটা ভিউফাইন্ডার নিয়ে গেছি। সেটা চোখে রেখে কথা বলছি বেণীমাধবের সঙ্গে এবং মাঝে মাঝে বেণীমাধবও আমার ভিউফাইন্ডারটা নিয়ে দৃশ্য দেখছেন। তারিফ করছেন।

হঠাৎ উনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবু! দেখুন তো ওই পাহাড়ের রাস্তায় ওটা কী?"

ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে দেখি, খানিকটা দূরে সোনালী রঙের পাহাড়ের গায়ের আঁকাবাঁকা রাস্তায় চোপরার সেই শিম্পাঞ্জিটা হেলে-দুলে চলেছে এবং তার পেছন-পেছন যাচ্ছে একটা লোক। তাকে চিনতে পারলুম না। লোকটার পরনে মাদারির পোশাক। মাথায় পাগড়ি, হাতে একটা ডুগডুগি রয়েছে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

একটু পরে তারা নিচে নামতে থাকল। সমতলে নেমে গেলে আর তাদের দেখতে পেলুম না। সামনে আরেকটা পাহাড়ের আড়াল রয়েছে। কর্নেলকে তক্ষুণি ডেকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলুম।

কর্নেল বললেন, "ওদিকেই নাগপা বস্তি আছে শুনেছি। চোপরার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। যাইহোক, বেণীমাধববাবু, আপনি আর দেরি করবেন না। চোপরার অফিসে চলে যান।"

বেণীমাধব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনাকে দেখে চোপরা নিশ্চয় অবাক হবে। আপনি বলবেন, এতকাল বৈজুনাথের সঙ্গে কারবার করেছেন। বৈজুনাথই বলেছিল, নাগপা বস্তির ওদিকে একটা পাহাড়ের গুহায় বাঁটুল কুড়িয়ে পেয়েছে। এখন বৈজুনাথ নেই। তাই আপনি চোপরার সাহায্য চাইছেন। কাজেই আরও বাঁটুল উদ্ধার করতে পারলে দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেবেন।"

বেণীমাধব চিন্তিতমুখে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল ও প্রণব রুদ্র বেরুলেন তার মিনিট দশেক পরে। কর্নেল আমাকে হোটেলেই থাকতে বলে গেলেন।

চুপচাপ একা বসে থাকতে খারাপ লাগছিল। বিকেলের ঝলমলে রোদে বাইরের অপূর্ব দৃশ্য। এভাবে কাঁহাতক বসে থাকা যায়? কর্নেলের নির্দেশ মানতে ইচ্ছে করছিল না। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লুম।

হোটেলের নিচের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতেই ডানদিকের উপত্যকায় একটা বস্তি চোখে পড়ল। ওটাই কি নাগপা বস্তি? পাহাড়ের ঢালে সবুজ ঘাসে একজন গুজ্জর রাখাল ভেড়া চরাচ্ছিল। তাকে হিন্দিতে জিগ্যেস করতে সে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, ওটাই নাগপা বস্তি।

মাথায় কী খেয়াল চাপল সোজা ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলুম। নিচের উপত্যকায় পৌঁছে কিছুদূর এগিয়ে একটি খাল দেখতে পেলুম। স্বচ্ছ জল বেয়ে যাচ্ছে। খালের ধারে উইলো আর পপলার গাছের জঙ্গল। খালের বুকে অজস্র পাথর। পা রেখে-রেখে সাবধানে ওপারে চলে গেলুম। জঙ্গলের পর ফাঁকা ঘাসের জমিতে যেই গেছি, একটা সাদা কুকুর দৌড়ে এল। শিস দিতেই সে থেমে গেল। তার কাছে এগোব কি না ভাবছি, একটি কমবয়সী মেয়ে—মাথায় স্কার্ফ জড়ানো,

পরনে সুন্দর রঙীন ঘাগরা, একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। অপূর্ব সুন্দর চেহারা মেয়েটির। ফর্সা রঙ। বড়জোর বছর দশেক বয়স।

কুকুরটা ছুটে গিয়ে তার কোলে উঠল। আমি একটু হেসে হিন্দিতো বললুম "তোমার নাম কী?"

মেয়েটি হাসল একটু। কিন্তু কিছু বলল না।

পকেট হাতড়ে ভাগ্যিস কয়েকটা চকোলেট পেয়ে গেলুম। কাল আসার পথে কিনেছিলুম শোনমার্গে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল বারবার। কাঁহাতক জল খাওয়া যায়? তাই চকোলেট চুষছিলাম কর্নেলের পরামর্শে। এখন চকোলেটগুলো কাজে লাগল।

মেয়েটি দ্বিধা না করে সেগুলো নিলো। কুকুরটার মুখেও গুঁজে দিল একটা। তারপর ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলল, "তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ? কোথায় থাকো তুমি?"

বললুম, "আমি কলকাতা থেকে আসছি। খুব সুন্দর তোমাদের দেশ।"

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে বলল, "আমার বাবা বলে কলকাতা আরও সুন্দর দেশ।"

"তাই বুঝি? নাম কী তোমার?"

"ওন্টি।"

"ওন্টি? বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো তোমার।"

ওন্টির সঙ্গে কথা বলছি, সেই সময় ওদিকে কোথায় ডুগ-ডুগির শব্দ শোনা গেল। ওন্টির কানে গেলে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, "মাদারি খেলা দেখাতে এসেছে। আমি খেলা দেখব।"

সে কোল থেকে কুকুরটাকে নামিয়ে দিল। কুকুরটা কিন্তু চাপা গরগর শব্দ করে ওন্টির দুপায়ের ফাঁকের ঢুকে পড়ল। ওন্টি না বুঝলেও আমি বুঝতে পারছিলুম, কুকুরটা তার সহজাত বোধে টের পেয়েছে যে কাছাকাছি একটা বিপজ্জনক জন্তু এসেছে। বললুম, "ওন্টি, চলো! তোমার সঙ্গে মাদারির খেলা দেখব।"

গাছপালার ফাঁকে পাথরের এবড়োখেবড়ো ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। নাগপারা গরিব মানুষ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওন্টির পেছন-পেছন ঘরগুলোর কাছে যেতেই একটা লোক বেরিয়ে এল। সে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। ওন্টি তাকে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলল। তখন সে হাসিমুখে আমাকে 'নমস্তে' করল।

ওন্টির কুকুরটা এগোতে চাইছিল না। ওন্টি অগত্যা তাকে কোলে তুলে নিল আবার। লোকটা ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল, "আপনি কলকাতার লোক শুনে খুশি হলুম স্যার! আমার বড় ইচ্ছে করে কলকাতা যাই। কিন্তু পয়সাকড়ি পাব কোথায় অত?'

ঝটপট ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললুম। লোকটা ওন্টির বাবা। তার নাম হিস্টোফোন। এ নাম যে গ্রিক ভাষার অপভ্রংশ, তাতে ভুল নেই। বংশপরম্পরা প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে এই নাগপারা গ্রিক ভাষার একটা অপভ্রংশ উপভাষা ব্যবহার করে আসছে। হিস্টোফোন সামান্য লেখাপড়া জানে। তাকে কলকাতা নিয়ে যাব বলায় সে খুশি হয়ে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। ততক্ষণে ওন্টি মাদারির খেলা দেখতে উধাও হয়েছে।

ঠাসাঠাসি পাথরের বাড়ি নিয়ে বস্তিটা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িগুলোর অবস্থা জরাজীর্ণ এবং আকারে ছোট। একটা ইদারার কাছে ফাঁকা জায়গায় মাদারি খেলা দেখাচ্ছে। ভিড় করে লোকেরা দেখছে। বস্তির অসংখ্য কুকুর নিরাপদে তফাতে দাঁড়িয়ে বেদম গালাগালি করছে শিম্পাঞ্জিটাকে।

হিস্টোফোন বলল, "মাদারিররা ভালুক বা বাঁদর নিয়ে খেলা দেখাতে আসে। তবে এই মাদারিটাকে এর আগে দেখিনি। ওর ওই জন্তুটা কী বলুন তো স্যার?"

"ওটা একটা শিম্পাঞ্জি।"

হিস্টোফোন অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, "ওটা দেখতে বড্ড কুচ্ছিত। ওর স্বভাবও নিশ্চয় ভাল নয়।"

"তা তো নয়ই। শিম্পাঞ্জি বিপজ্জনক জন্তু।"

হিস্টোফোন তারিফ করে বলল, "তবু কেমন বশ মানিয়েছে দেখুন!"

একটু পরে সে আমাকে এককাপ কড়া চা এনে দিল। চা খেতে খেতে দেখলুম, খেলা শেষ করে 'মাদারি' শিম্পাঞ্জিটাকে নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। ভয় হল, শিম্পাঞ্জিটা আমাকে চিনতে পারবে না তো?

কিন্তু ওদের ঘিরে নিয়ে আসছে নাগপাদের নানা বয়সী মানুষের ভিড়। আমাকে মাদারি বা জাম্বু কেউই দেখতে পেল না ভিড়ের ভেতর থেকে। ওরা এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির সামনে থামল। সেই সময় ওণ্টি ফিরে এসে তার বাবাকে কী বলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। হিস্টোফোন বলল, "মাদারি আর জাম্বুটা আজ রাতে সোলোন নামে একজনের বাড়িতে থাকবে! সোলোন ওকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল।'

জিগ্যেস করলাম, "সোলোন কে?"

"আমাদের সর্দারের ছেলে। এ বস্তিতে একমাত্র সোলোনই আপনাদের কলকাতা গিয়েছিল। আপনি কিন্তু আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবেন স্যার?"

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, "তাহলে উঠি হিস্টোফোন।"

আসার সময় ওণ্টিকে একটু আদর করে এলুম। ওর বাবা হিস্টোফোন আমাকে সেই খাল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এল। তারপর চাপা গলায় বলল, "আপনি যদি আমাকে কলকাতা দেখাতে নিয়ে যান, তাহলে আপনাকে একটা সুন্দর জিনিস উপহার দেব। জিনিসটা ওণ্টি কুড়িয়ে পেয়েছিল।"

"জিনিসটা কী হিস্টোফোন?"

"একটা লোহার বল। বলটার গায়ে ছবি আঁকা আছে।"

হিস্টোফোন এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল, "এ জিনিসের দাম আছে স্যার! একমাস আগে কলকাতার একটা লোক এসেছিল বস্তিতে। সে আমাদের সর্দারকে বলেছিল, লোহার বল কিনতে এসেছে। সর্দার খুব রেগে গিয়েছিল। এসব লোহার বল নাকি দেবতাদের খেলার জিনিস। বস্তির অনেকে কুড়িয়ে পেয়ে ঘরে তুলে রেখেছে। কেউ প্রাণ গেলেও বেচবে না। কারণ, এ বল তো মানুষ তৈরি করেনি। দেবতারা সেকালে তৈরি করেছিলেন খেলবেন বলে। খেলা হয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলেছেন। তো স্যার, সর্দার কলকাতার লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বস্তি থেকে ।"

কান খাড়া করে শুনছিলুম। খুব চমকে উঠেছিলুম ওর কথা শুনে। "বললুম, সেই লোকটা কেমন করে জানল লোহার বলের কথা?"

হিস্টোফোন আরও গলা চেপে বলল, "আমার কলকাতা দেখার খুব ইচ্ছে বলেই বলছি আপনাকে। যেন আর কেউ না জানতে পারে স্যার।"

"জানতে পারবে না। বললো হিস্টোফোন!"

"আমার খুড়ো রাস্টোফানই এর মূলে। খুড়ো শহরের একটা হোটেলে কাজ করে। সেই লোকটার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। তাকে সঙ্গে করে একদিন বস্তিতে নিয়ে এসেছিল খুড়ো। ঘরের তাকে একটা এরকম লোহার বল রাখা ছিল। সেটা দেখে লোকটা আগ্রহ প্রকাশ করল। খুড়ো বলল, এটা দেবতাদের খেলার জিনিস। আপনি আমার অতিথি। ভাল লাগে তো নিন। তবে সর্দার জানলে রাগ করবে!"

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বললুম, "হিস্টোফোন জিনিসটা একবার দেখাবে আমাকে?"

হিস্টোফোন হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। বেলা পড়ে এসেছে। শিগগির অন্ধকার হয়ে যাবে। খালের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে হিস্টোফোনের প্রতীক্ষা করতে থাকলুম। মিনিট পাঁচেক পরে সে ফিরে এল। জামার পকেট থেকে জিনিসটা বের করে বলল, "এই দেখুন স্যার!"

সেই গ্রিক বাঁটুল। একই রকম হিজিবিজি লেখা আর নকশা আঁকা। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললুম, "তোমাকে আমি কিছু টাকা দিচ্ছি হিস্টোফোন! জিনিসটা আমাকে দাও।"

অমনি হিস্টোফোন বাঁটুলটা খপ করে কেড়ে নিল আমার হাত থেকে। গম্ভীর মুখে বলল, "উঁহু! আগে কলকাতা নিয়ে যাবেন। তারপর দেব!"

বুঝলুম, নাগপারা যতই ভদ্র হোক—গোঁয়ার-গোবিন্দ কম নয়। হাসতে হাসতে বললুম, 'ঠিক আছে। তাই দিও। শোন, আমি থাকি সানি লজ হোটেলে। ওই যে দেখছ, পাহাড়ের গায়ে লাল, নীল আলোয় হোটেলের নাম লেখা। তুমি কাল সকালেই যেও বরং। গিয়ে বলো, জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করব।"

হিস্টোফোন আমার নামটা বিড়বিড় করে মুখস্থ করে নিল। আমি সাবধানে খাল পেরিয়ে ওপারে গেলুম, হিস্টোফোন এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে চলে যাচ্ছে।

হোটেলে পৌঁছে দেখি, কর্নেল ফেরেননি। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে রইলুম। উত্তেজনায় মনে মনে ছটফট করছিলুম। হিস্টোফোনের বাঁটুলটার ভেতর কি হিরে আছে? যদি থাকে, হিরেটা ওকে ফেরত দেওয়া উচিত। বেচারা গরিব মানুষ। ওটা বেচলে সে বড়লোক হয়ে যাবে।

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। বললেন, "কোথাও বেরোও নি তো?" বলে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে মুচকি হাসলেন। "উঁহু, বেরিয়েছিলে দেখছি।"

"আপনি কি অন্তর্যামী?"

"না। তবে তোমার জুতোয় আর প্যান্টে লাল ধুলোর ছোপ দেখে বুঝেছি, বেরিয়েছিলে।"

একটু হেসে বললাম, "বসুন অনেক কথা আছে।"

ডাইনির গুহায়

এ রাতে কিছু ঘটেনি। সকালে বেণীমাধব এলেন ঘরে। তখন শুনলুম, চোপরা ভীষণ সতর্ক হয়ে গেছে। বেণীমাধবকে পাত্তাই দেয়নি। বলেছে, ওসব কারবারে সে নেই। ইচ্ছে করলে বেণীমাধব একা বাঁটুলের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারেন। বাঁটুলের ভেতর হিরে থাকার কথা চোপরা নাকি বিশ্বাস করে না।

কর্নেল বললেন, "অসাধারণ ধূর্ত লোক এই চোপরা। আমার এই ফাঁদে সে পা দিল না তাহলে!"

আমি বললুম, "তা দিল না। কিন্তু ওদিকে সে খুনে শিম্পাঞ্জি আর একটা লোককে নাগপা বস্তিতে পাঠিয়েছে যখন, তখন বোঝা যাচ্ছে—সে একটা বাঁটুল সংগ্রহ করতে চায়।"

"ঠিক তাই।" কর্নেল সায় দিয়ে চুরুট টানতে থাকলেন। চোখ বন্ধ। তারপর হঠাৎ নড়ে বসলেন। "জয়ন্ত! তোমার নাগপা বন্ধু হিস্টোফোনের তো আসার কথা এখন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কৈ? আটটা বেজে গেল।"

কর্নেল উঠে গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। চোখে বাইনোকুলার রেখে নাগপা বস্তির দিকটা কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, "ওদের বস্তিতে কী একটা গণ্ডগোল হচ্ছে যেন। অনেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।"

ব্যালকনিতে গিয়ে বললুম, "বাইনোকুলারটা দিন তো দেখি।"

কর্নেল দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা দিলে চোখ রাখলুম। তারপর চমকে উঠলুম। হিস্টোফোন বলেই তো মনে হচ্ছে—সে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যিখানে। আর চারদিক থেকে লোকেরা হাত নেড়ে যেন শাসাচ্ছে। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ কচলাচ্ছে ওণ্টি। তার কোলে সেই সাদা কুকুরটা।

বাইনোকুলার ফেরত দিয়ে ব্যস্তভাবে বললুম, "কী হয়েছো দেখে আসি।"

কর্নেল একটু ইতস্তত করে বললেন, "যাবে? কিন্তু ..."

বেণীমাধব বললেন, "আমি বরং যাই জয়ন্তবাবুর সঙ্গে।"

কর্নেল চিন্তিতভাবে বললেন, "আচ্ছা। কিন্তু সাবধানে থাকবেন।"

আমরা দুজনে হন্তদন্ত হয়ে চললুম। রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে ঢাল বেয়ে নামলুম। ঘাসের ঢালু জমিতে সেই গুজ্জর রাখালকে ভেড়া চরাতে দেখলুম। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

খাল পেরিয়ে যাবার পর আবছা গোলমালের শব্দ এল। বস্তির পেছনে প্রকাণ্ড সব পাথর রয়েছে। তার আড়ালে গিয়ে দুজনে বসে পড়লুম। ওদের ভাষা জানি না। শুধু বুঝলুম, হিস্টোফোনকে ওরা কোনো কারণে গালাগালি করছে আর শাসাচ্ছে যেন। তা কি আমার জন্য। নাগপা বস্তিতে বাইরের লোককে এনে খাতির করেছিল বলে?

একটু পরে ওন্টির কুকুরটা ধুপ করে কোল থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর দৌড়ে আমাদের কাছে চলে এল। পেছন-পেছন দৌড়ে ওকে ধরতে এল ওন্টি। এসেই আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

ইশারায় ওকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, "কী হয়েছে ওন্টি?"

ওন্টি কান্না জড়ানো স্বরে বলল, "বাবা তোমাকে দেবতাদের বল দিয়েছে বলে বাবাকে সবাই বকছে। সর্দার বলছে, বাবার হাত-পা বেঁধে ডাইনির গুহায় ফেলে দিয়ে আসবে।"

"কিন্তু দেবতাদের বল তো তোমার বাবা আমাকে দেয়নি। ওটা ওদের দেখাচ্ছে না কেন তোমার বাবা?"

ওন্টি চোখ মুছতে মুছতে কুকুরটাকে কোলে নিল। তারপর বলল, "বলটা তো আমার। আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। রোজ বলটা নিয়ে আমি খেলতে যাই। রণির সঙ্গে খেলি যে। বাবা জানলে বকবে। তাই লুকিয়ে যাই।"

"তোমার এই কুকুরটার নাম বুঝি রণি?"

ওন্টি মাথা নাড়ল। বলল, "আজ সকালে বলটা নিয়ে খেলছিলুম। মাদারিটা সর্দারের বাড়ির সামনে বসেছিল। ওর বাঁদরটাকে লেলিয়ে দিল আর বাঁদরটা এসে রনির কাছ থেকে কেড়ে নিল।"

খাপ্পা হয়ে বললুম, "মাদারিটা কোথায় এখন?"

"চলে গেছে।" ওন্টি নাক মুছে বলল, "আমি সর্দারকে বললুম—কিন্তু বিশ্বাস করল না। বলল, তুই ঝুট বলছিস। তোর বাবা বলটা সেই কলকাতার লোকটাকে বেচে দিয়েছে।"

এই সময় হট্টগোলটা হঠাৎ বেড়ে গেল। পাথরের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখলুম, লোকেরা হিস্টোফোনকে দড়িতে বাঁধছে। আর থাকতে পারলুম না। দৌড়ে ওদের সামনে হাজির হলুম আমরা। ওরা আমাদের দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। টুলে বসে থাকা একটা লোক। সাদা চুলদাড়ি, হিংস্র চেহারা এবং তার পরনে আঁট পাতলুন আর গায়ে একটা নীলরঙের বেঢপ জ্যাকেট। সে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল। মনে হল এদের সর্দার সে।

কিন্তু কিছু বলার আগেই লোকগুলো ঝাঁপিয়ে এসে আমাকে আর বেণীমাধবকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলল। চ্যাঁচামেচি করেও ফল হল না। এক মিনিটের মধ্যে ওরা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল। পকেটে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও কিছু করা গেল না।

ফার, পাইন, ওকপার পপলার গাছের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা পাহাড়ের ধারে এনে ফেলল আমাদের। তারপর চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল। পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা দেখা যাচ্ছিল। গুহার মুখে ধপাস করে ফেলে দিয়ে ওরা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এই তাহলে ডাইনির গুহা! অজানা আতঙ্কে বুক ধড়াস করে উঠল। আমার পাশে বেণীমাধবকে উপুড় করে ফেলেছে। বেণীমাধব অনেক কষ্টে চিত হয়ে বললেন, "এ কী বিপদে পড়া গেল জয়ন্তবাবু!"

গুহার ভেতর দিকের অন্ধকার থমথম করছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখলুম, একরাশ হাড়গোড় আর কয়েকটা মড়ার খুলি পড়ে আছে। শিউরে উঠলুম। বললুম, "সর্বনাশ! গুহার ভেতর নিশ্চয় মানুষখেকো জন্তু আছে, বেণীমাধববাবু!"

তারপর খসখস শব্দ শুনে বাঁদিকে ঘুরে, দেখি, শুধু আমরা দুজন নই—বেচারা হিস্টোফোনকেও ফেলে দিয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে। হিস্টোফোন গুহার দেয়ালে খাঁজকাটা একটা পাথরে পায়ের দড়িটা জোরে ঘষছে। ডাকলুম, "হিস্টোফোন।"

হিস্টোফোন হিংস্র মুখভঙ্গি করে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলল। তারপর সামনে পায়ের বাঁধনটা ঘষড়াতে থাকল। তার দেখাদেখি আমরাও অন্যপাশের দেয়ালের দিকে গড়িয়ে গেলুম। গুহার মুখে খানিকটা জায়গা বাইরের রোদের আভায় আলোকিত হয়ে আছে। কিন্তু মুখে ঝোপজঙ্গল বলে আলোটা খুব কম। উঁচু ধারাল একটা পাথর খুঁজে আমরা দুজনে পালাক্রমে আগে পায়ের বাঁধনটা ঘষড়াতে শুরু করলুম। হাতের বাঁধন আগে কাটা যাবে না। কারণ আমাদের প্রত্যেকের হাত পিঠের দিকে বাঁধা।

দড়িগুলো শক্ত লতা দিয়ে তৈরি। তাই সহজে ছেঁড়া যায় না। কতক্ষণ পরে হিস্টোফোনের কথা শুনে ঘুরে দেখি, সে বাঁধন কেটে ফেলেছে। হিংস্রমুখে সে বলল, "ডাইনিটা তোমাকে খেয়ে ফেলুক। তোমার জন্য আমার এই দুর্দশা। আমি চললুম।"

বললুম, "হিস্টোফোন! কথা শোনো। তুমি গিয়েও তো বস্তিতে ঢুকতে পারবে না! কিন্তু তোমার মেয়ে ওন্টির কী হবে ভেবে দেখেছ হিস্টোফোন?"

হিস্টোফোন একটু ভড়কে গেল এবার। মুখ গোমড়া করে বলল, "সন্ধে অব্দি কোথাও লুকিয়ে থাকব। তারপর চুপিচুপি ওন্টিকে নিয়ে পালিয়ে যাব।"

"বরং এক কাজ করো হিস্টোফান! তুমি আমাদের বাঁধন খুলে দাও। আমাদের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে থাকবে, তারপর সন্ধ্যায় তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবে। রাতেই তোমাকে নিয়ে কলকাতা চলে যাব।"

হিস্টোফোনের মনে ধরল কথাটা। সে ভয়ের চোখে গুহার ভেতরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু বাঁধন খুলে দিতে দিতে যদি ডাইনিটা এসে পড়ে?"

"আমার প্যান্টের পকেটে রিভলবার আছে। বের করে হাতের কাছে রাখো।"

"আমি গুলি ছুঁড়তে জানি না।"

"তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কী করতে হবে।"

হিস্টোফোন ঝটপট আমার পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে ফেলল। তাকে মুখে বুঝিয়ে দিলাম, ট্রিগার কীভাবে টানতে হবে। সেফটি-ক্যাচ তোলার ঝামেলা নেই। অস্ত্রটা অটোমেটিক। ভাগ্যিস ওরা আমাকে চিত করে ফেলে দিয়েছিল—একটু কাত হলেই চোট খেয়ে গুলি বেরিয়ে যেত।

হিস্টোফোন আমার বাঁধন খুলে দিল। তারপর বেণীমাধবের বাঁধন খুলতে শুরু করল। আমি রিভলভার নিয়ে তৈরি রইলুম। কিন্তু ডাইনি হোক আর যেই হোক, মানুষখেকোটির কোনো সাড়া নেই। বেণীমাধবের বাঁধন খুলে দিলে উনি উঠে পড়লেন। তারপর আমরা তিনজনে গুহা থেকে বের হয়ে এলুম।

কিন্তু যেমনি পা বাড়াতে গেছি, চড়বড় করে গুহার সামনে একরাশ পাথর পড়ল। অমনি পিছিয়ে এলুম। হিস্টোফোন উত্তেজিতভাবে বলল, "সর্বনাশ, বস্তির লোকেরা আড়ালে ওত পেতে আছে। ওরা আমাদের বেরুতে দেবে না। বেরুলেই পাথর ছুঁড়বে।"

রাগে খেপে গিয়ে রিভলবার থেকে পরপর দুটো গুলি ছুড়লুম। পাহাড়ে প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি হল। তারপর তিনজনে বেরিয়ে গেলুম গুহার বাইরে।

কিন্তু আবার চড়বড় করে পাথর পড়া শুরু হল, আবার গুহায় ঢুকতে হল। ওরা আড়ালে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। খামোকা গুলি ছুড়ে লাভ নেই।

হঠাৎ হিস্টোফোন কান খাড়া করে কী শুনে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "গুলির শব্দে ডাইনিটার ঘুম ভেঙে গেছে! সর্বনাশ! এবার কী হবে?"

ঘুরে দেখি গুহার ভেতর অন্ধকারে দুটো হলদে আলো জ্বলজ্বল করছে। অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলুম। আলো দুটো ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। বেণীমাধবের হাতে তাঁর পিস্তলটা দেখতে পেলুম এতক্ষণে। আমি আলো দুটো লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার আগেই উনি পিস্তলের গুলি ছুড়লেন। অমনি কানফাটানো গর্জন শুনলুম। পলকের মধ্যে দেয়ালের ধারে সরে গিয়েছিলুম সহজাত আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির বশেই। কী একটা হলুদ-কালো প্রাণী লাফ দিয়ে পড়ল মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে আমি রিভলভারের ট্রিগারে চাপ দিলুম। আবার বিকট গর্জন শুনলুম। তারপর দেখি, একটা চিতাবাঘ ডিগবাজি খেতে-খেতে বেরিয়ে গেল গুহার বাইরে।

"তাহলে ইনিই নাগপাদের মানুষখেকো ডাইনি।" বেণীমাধব মন্তব্য করলেন।

হিস্টোফোন গম্ভীর মুখে বলল, "ডাইনিটা এখন চিতাবাঘ সেজেছে।"

গুহার মুখে উঁকি মেরে দেখলুম, চিতাবাঘের পিঠে রক্ত দগদগ করছে। সে গড়াতে গড়াতে নেমে চলেছে পাথরের উপর দিয়ে। ওদিকে একদঙ্গল নাগপাকে দেখলুম পড়ি-কী মরি করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়চ্ছে। হিস্টোফোন তাই দেখে হাসতে লাগল। বললুম, "এখানে আর নয়। হিস্টোফোন, ঘুরপথে আমাদের এখনই হোটেলে পৌঁছনো দরকার।"...

শেষ লড়াই

সমতলে জঙ্গল ও পাথরের ভেতর অশেষ কষ্ট ভোগ করে সেই খালটার ধারে পৌঁছলাম আমরা। হিস্টোফোন করুণ মুখে বলল, "ওন্টির জন্য আমার মন কেমন করছে, তার মা বেঁচে থাকলে ভাবনা ছিল না।"

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, "ভেব না। পুলিশের সাহায্যে তাকে তোমার কাছে এনে দেব।"

খালের জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে আমরা সামনে উঁচু রাস্তার দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড নীল রঙের পাথরের আড়ালে ধূসর রঙের টুপি দেখতে পেলুম। চোপরা নয় তো? ইশারায় বেণীমাধব ও হিস্টোফোনকে চুপচাপ আসতে বলে পা টিপে এগিয়ে গেলুম, টুপিওয়ালা লোকটি ওদিকে ঘুরে কী দেখছে। তার পেছনে গিয়ে রিভলভার উঁচিয়ে 'হ্যান্ডস আপ' বলতে গেছি, আর লোকটা চাপা গলায় বলে উঠেছে, "চুপ, চুপ!"

চমকে উঠে গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে আবিষ্কার করলুম এবং হেসে ফেললুম।

কর্নেল আঙুল দিয়ে পাথরের ওপাশে কিছু নির্দেশ করলেন। উঁকি মেরে দেখলুম, একটা ফাঁকা ঘাসজমিতে ওক গাছের ছায়ায় বসে আছে ভোমরালাল চোপরা আর মাদারিবেশী তার সেই চেলা। শিম্পাঞ্জিটা থেবড়ে বসে আপেল খাচ্ছে আর পিঠ চুলকোচ্ছে। বেণীমাধববাবু চাপা স্বরে বললেন, "আরে! চোপরার ওই সঙ্গীটাই আমার দোকানে গিয়েছিল। ওর বাঁকানো বাজপাখির নাকটা দেখুন।"

চোপরার হাতে একটা বাঁটুল। হিস্টোফোন ফিসফিস করে বলল, "ওই দেখুন, দেবতার বলটা আমার মেয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে কি না। খামকা আমাকে ওরা ভোগাল!" একটু পরে চোপরা উঠে দাঁড়াল। বাঁকা নাকওয়ালা সঙ্গীকে কিছু বলল। ওর সঙ্গী ডাকল, "ওঠ্ জাম্বু! খুব হয়েছে।"

জাম্বু পেছনে, ওরা সামনে—কয়েক পা এগিয়েছি, অমনি পাথরের আড়াল থেকে গর্জন করে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত আহত সেই চিতাবাঘটা। জাম্বু পাল্টা গর্জন করল। তারপর চিতাটা তার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে দুটি জানোয়ার মরণপণ লড়াইয়ে নেমে গেল। শিম্পাঞ্জি আর চিতাবাঘ পরস্পর জন্ম-শত্রু।

চোপরা পকেট থেকে পিস্তল বের করেছে, কিন্তু গুলি ছুড়তে পারছে না।—পাছে শিম্পাঞ্জিটার গায়ে গুলি লাগে। দুটি হিংস্র জন্তুর গর্জনে ও লড়াইয়ে তুমুল কাণ্ড চলেছে। চিতাটা আমার গুলিতে জখম না হলে হয়ত পিঠটান দিত শিম্পাঞ্জির এক থাপ্পড় খেয়েই। কিন্তু আহত চিতাবাঘটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে আচমকা শিম্পাঞ্জিটার গলা কামড়ে ধরল। শিম্পাঞ্জিটা নেতিয়ে পড়ল। সেই সুযোগে চোপরা চিতাটার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল। তখন চিতাটাও নেতিয়ে পড়ল। ক্রমশ দুটি প্রাণীর দেহ নিস্পন্দ হয়ে গেল।

দুটি জানোয়ারই মারা পড়েছে। চোপরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় হিস্টোফোন দৌড়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে গিয়ে চোপরার পায়ের তলা থেকে তার বাঁটুলটা কুড়িয়ে নিল। চোপরা তো তার দিকে পিস্তল তাক করে বলল, "এই ব্যাটা নাগপা! ওটা দে, বলছি। নইলে তোর মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।"

কর্নেল আমাদের ইশারা করলেন। আমাদের তিনজনের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। কর্নেল বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "পিস্তল ফেলে দাও ভোমরালাল! চোপরা ভড়কে গিয়ে পিস্তল ফেলে দিল। আর ওর ঢ্যাঙা বাজনেকো সঙ্গীটা গতিক বুঝে দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেল। তাকে তাড়া করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলুম।

চোপরা কোনো কথা বলল না। শিম্পাঞ্জিটার কাছে ধপাস করে বসে পড়ল। কর্নেল বললেন, "শোক প্রকাশ পরে করবেন ভোমরালালজী! এখন আমাদের সঙ্গে আসুন।"

চোপরা ঘাড় গোঁজ করে বসে রইল।

তখন কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, তুমি হোটেলে গিয়ে প্রণববাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করো। ব্রিগেডিয়ার অর্জুন সিংকে বললে উনি যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। তুমি ওদের নিয়ে এস। আসামীকে গ্রেফতার করে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে।"

আমি পা বাড়ালুম। হিস্টোফান বলল, "দেবতার বল ফিরে পেয়েছি— আর আমার ভয় নেই। সর্দারকে গিয়ে দেখালেই আমার সব দোষ মাফ। আমি বস্তিতে ফিরে চললুম।"

সে দৌড়ে খাল পেরিয়ে চলে গেল। আমি চললুম হোটেলের দিকে। উঁচু রাস্তার উঠে বাঁ-দিকে ঘুরে দেখলুম, হিস্টোফানকে দেখে তার মেয়ে ওণ্টি দৌড়ে আসছে। কুকুরটাও তার দিকে দৌড়চ্ছে। বস্তি থেকে দলে-দলে লোকেরা বেরিয়ে অবাক হয়ে ওদের দেখছে। ডাইনির গুহা থেকে যে বেঁচে ফিরতে পেরেছে এবং শুধু তাই নয়, দেবতার বল উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, সম্ভবত বস্তিতে এবার তার সম্মান বেড়ে যাবে।

বাবা-মেয়ের উজ্জ্বল মুখ দূর থেকে রোদ ঝলমল করতে দেখে আমার মন আনন্দে ভরে গেল।

কিন্তু হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছেই ফিরতে হল। ব্রিগেডিয়ার অর্জুন সিং আর প্রণব রুদ্র একদল পুলিশ নিয়ে এদিকেই হন্তদন্ত হয়ে আসছেন।...

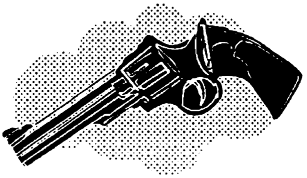

লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার সোফায় হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে চমকে-ওঠা ভঙ্গিতে বললেন, "খাইছে!"

জিজ্ঞেস করলুম, "কে কাকে খেল হালদারমশাই?"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে বললেন, "লাফাং চু!"

"তার মানে?"

"দ্রিদিম্বা!"

বলেই কাগজটা যেমন-তেমন করে দুমড়ে রেখে হালদারমশাই সটান বেরিয়ে গেলেন। ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিস্যু বোঝা গেল না।

এ-কথা ঠিকই যে, হালদারমশাই মাঝে-মাঝে বেমক্কা কিছু-কিছু উদ্ভুট্টে কাণ্ড করে ফেলেন। সেটা সম্ভবত ওঁর ছিটগ্রস্ত স্বভাবের দরুনই বটে। তা ছাড়া সব-তাতে নাক গলানোর অভ্যাসও আছে। একসময় পুলিশে চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। কালে-ভদ্রে দু'-একজন মক্কেল জোটে, অর্থাৎ 'কেস' হাতে পান। সেই কেস জটিল হলে সুখ্যাত রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের এই জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে পরামর্শ নেওয়ার জন্য হাজির হন এবং ঘনঘন নস্যি নেন। এদিন সাতসকালে ওঁর আবির্ভাব দেখে অবশ্যি তেমন কিছু অনুমান করতে পারিনি। কিন্তু ওই দুর্বোধ্য দু'টি শব্দ আওড়ে ওঁর আকস্মিক প্রস্থানের কারণটা কী?

"কী হল ডার্লিং? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?"

ঘুরে দেখি এতক্ষণে ছাদের বাগান থেকে নেমে এসেছেন কর্নেল। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "লাফাং চু।"

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "হুঁ। তো হালদারমশাই কোথায় গেলেন?"

"দ্রিদিম্বা।"

কর্নেল অট্টহাসি হেসে এগিয়ে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। "বোঝা যাচ্ছে খবরটা কাগজেও বেরোবে, সেটা আঁচ করতে পারেননি হালদারমশাই।"

"খবর? কীসের খবর?"

মুখে কপট ভর্ৎসনার ছাপ ফুটিয়ে কর্নেল বললেন, "তুমি একজন সাংবাদিক, জয়ন্ত! সাংবাদিক হিসেবে তোমার যথেষ্ট সুনামও আছে। অথচ আমার অবাক লাগে, নিজের পেশার প্রতি তুমি একেবারে উদাসীন।"

একটু হেসে বললুম, "হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন? হালদারমশাই..."

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, "তোমাদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় খবরটা বেরিয়েছে।"

"কত খবর বেরোয় কাগজে, সব খবর পড়তেই হবে, তার মানে নেই।" বলে হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেনে নিলুম। হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা বোঝার জন্যই।

ষষ্ঠীচরণ কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে এনে টেবিলে রাখল। তারপর চোখে ঝিলিক তুলে চাপা স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "টিকটিকিবাবু বাথরুমে নাকি?"

"নাহ্! ওঁর কফিটা বরং তুমিই গিলে ফেলো গে ষষ্ঠী।"

ষষ্ঠী ডিটেকটিভ বলতে পারে না, কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই 'টিকটিকি' বলে। কারণ সে হালদারমশাইয়ের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে প্রচুর আমোদ পায়। কর্নেল তার দিকে চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই সে বিব্রতভাবে বলল, "খামোকা অতটা দুধ নষ্ট। আজকাল দুধের যা আকাল। টিকটিকিবাবু বেশি দুধ ছাড়া কফি খান না।"

বলে সে আমার পরামর্শমতো অতিরিক্ত দুধ-মেশানো কফির পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "ষষ্ঠী হালদারমশাইকে টিকটিকিবাবু বলে। জয়ন্ত, আশা করি টিকটিকি কথাটা জানো। পুলিশের গোয়েন্দাদের একসময় টিকটিকি বলা হত। সেটা ডিটেকটিভ শব্দটার ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি।"

"কিন্তু খবরটা কোথায়?"

"ছয়ের পাতায় আট নম্বর কলামের মাথায়।"

খবরটা এবার চোখে পড়ল।

রায়গড়ে ভৌতিক উপদ্রব

রায়গড়, ২৩ মার্চ—*সম্প্রতি এখানে এক অদ্ভুত উপদ্রব শুরু হয়েছে। গভীর রাতে অনেক বাড়ির জানলায় কে বা কারা খটখট শব্দ করে ভুতুড়ে গলায় বলে, 'লাফাং চু দ্রিদিম্বা!' কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজে কাউকে দেখা যায় না। এমনকি বাড়ির চারপাশে আলো জ্বললেও এই ঘটনা ঘটছে। সাহসী যুবকরা দলবেঁধে পাহারা দিয়েও এর কিনারা করতে পারেনি। পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশও এ রহস্য ফাঁস করতে ব্যর্থ হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ২০ মার্চ রাতে থানার বড়বাবুর কোয়ার্টারেও এই ভুতুড়ে ঘটনা ঘটেছে। তিনি রিভলভার থেকে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করেন। তাতেও কাজ হয়নি। তার ঘণ্টাটাক পরে 'বনশোভা নার্সারি'র প্রোপ্রাইটর সাধুচরণ লাহার বাড়ির জানলায় 'লাফাং চু দ্রিদিম্বা' শোনা যায়। শ্রীলাহা এবং তাঁর পরিবার প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রথমত উল্লেখ্য, এখানে গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছে যে প্রাচীন শিবমন্দির আছে, সেটি ঐতিহাসিক। রায়গড়ের রাজা কীর্তিমান রায় ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত পঞ্চানন আচার্য মহাশয়ের মতে, রায়গড়বাসীদের অনাচারে ক্রুদ্ধ দেবতা মহাদেব তাঁর ভূতগণকে লেলিয়ে দিয়েছেন। অবিলম্বে তাঁর তুষ্টিসাধনের জন্য মহাযজ্ঞ, বলিদানাদি পুণ্যকৃত্য আবশ্যক।*

খবরটা খুঁটিয়ে পড়ার পর হাসতে হাসতে বললুম, "বোগাস! আসলে অনেক সময় কাগজের পাতা ভরার জন্য আজেবাজে বা উদ্ভট খবর দরকার হয়। যাঁরা খবর জোগাড় করেন, তাঁরাও এই কম্মটি করে থাকেন। তা ছাড়া তিলকে তাল না করলে খবর হয় না। বিশেষ করে লোকে তো মুখরোচক খবরই চায়।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "খবরটা পড়ার পর মনে হচ্ছিল, হালদারমশাইয়ের আবির্ভাব আসন্ন। কারণ ক'দিন আগে উনি ফোনে দুঃখ করে বলছিলেন, কেস-টেস একেবারে পাচ্ছেন না। জীবনটা একঘেয়ে লাগছে। দেশ থেকে রহস্য-টহস্য কমে গেলে ওঁর এজেন্সিই যে তুলে দিতে হবে। ভেবে দ্যাখ জয়ন্ত, গণেশ অ্যাভিনিউয়ে তেতলার ছাদে ছোট্ট একখানা ঘরের ভাড়া পাঁচশো টাকা! হালদারমশাইয়ের মতো রিটায়ার্ড মানুষের পক্ষে কী সাঙ্ঘাতিক সমস্যা তা হলে!"

"কাজেই হালদারমশাই রায়গড়ের ট্রেন ধরতে গেলেন।" কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, "কিন্তু উনি আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে অমনভাবে বেরিয়ে গেলেন, এটাই আশ্চর্য ব্যাপার।"

"একটু আগেই বলেছি, রহস্যটা যে কাগজের খবর হবে সেটা আঁচ করতে পারেননি," কর্নেল অভ্যাসমতো হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। "হুঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ওঁর হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাকেও অবাক করেছে।"

"কিন্তু কর্নেল, তা-ই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন? এমন হতে পারে, হালদারমশাই নেহাত আড্ডা দিতেই এসেছিলেন। খবরটা পড়েই রহস্যের টানে ছুটে গেলেন। ওঁর পাগলামির কথা আমরা ভালোই জানি।"

কর্নেল হাসলেন। "তুমি আসার আগেই হালদারমশাই এসেছিলেন কি না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওঁর মধ্যে কোনো উত্তেজনা দেখিনি।"

"তুমি লক্ষ করোনি, ডার্লিং! উনি এসেই ষষ্ঠীকে ছাদে পাঠিয়েছিলেন আমাকে খবর দিতে। নিজেই যেতে পারতেন। যাননি, তার কারণ তোমার জানা উচিত। তুমিও এসে সোজা ছাদে চলে যেতে। কিন্তু যাওনি।"

"ছাদের দরজায় কী সব সাঙ্ঘাতিক ক্যাকটাস রেখেছেন যে!"

"হুঁ। অ্যাপোরোক্যাকটাস ফ্ল্যাজেলিফর্মিস। এই সিরিউস প্রজাতির ক্যাক্টি ব্যালকনিতে রাখার উপযুক্ত। এরা বৃষ্টি সইতে পারে না। অথচ ঠাণ্ডা পরিবেশ চাই। ভীষণ কাঁটায় ভরা, কতকটা অক্টোপাসের গড়ন। কিন্তু কী অসাধারণ লাল ফুল ফোটে। উঁকি মেরে দেখে এসো বরং।"

"প্লিজ কর্নেল!" বিরক্ত হয়ে বললুম, "হালদারমশাই এবং লাফাং চু ব্রিদিম্বা..."

হাত তুলে কর্নেল বললেন, "ওই ক্যাক্টিগুলো ছাদে ওঠার মুখে রেখেছি, যাতে কেউ হুট করে গিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে না পারে। ক্যাক্টি আর অর্কিড অনেক বেশি মনোযোগ ও সেবা দাবি করে ডার্লিং!"

"এইজন্যই সেদিন এক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, আপনার ওই কর্নেল ভদ্রলোক..."

"নিঃসঙ্কোচে বলো ডার্লিং! আজ আমার মুড খাসা। ওপালটিয়া বাসিলারিস ক্যাক্টির একটা কাটিং মেক্সিকোর সোনোরা থেকে আনিয়েছিলুম। দারুণ ফুল উপহার দিয়েছে। অবিশ্বাস্য!"

"ভদ্রমহিলার মতে, আপনি খুব ন্যাকো।"

কর্নেল হা-হা হো-হো হেসে বললেন, "ব্রিলিয়ান্ট! ভদ্রমহিলা যথার্থ বলেছেন। ন্যাকা কথাটার মানে বলো তো?"

"যে জেনেও না-জানার ভান করে।"

"হুঁ। তবে কথাটা এসেছে আরবি নেক থেকে। নেক মানে পুণ্যবান, ভালোমানুষ। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ঢুকে বিকৃত হয়ে যায়। মানেও বদলে যায়। নেক থেকে নেকা। এ ক্ষেত্রে উচ্চারণ এবং ব্যঙ্গাত্মক অর্থবিকৃতি ঘটেছে। একা যেমন অ্যাকা।"

প্রায় আর্তনাদ করলুম, "আহ্ কর্নেল!"

কর্নেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। একটা নম্বর ডায়াল করে বললেন, "সুপ্রভাত রায়সায়েব! কর্নেল সরকার বলছি। ...আচ্ছা, আপনার বাগানে যে একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ে দেখেছিলুম...হুঁ, আপনি চমৎকার নাম দিয়েছেন কুষ্মাণ্ড ক্যাক্টি...কী বললেন? অকালকুষ্মাণ্ড? হাঃ হাঃ হাঃ! এনিওয়ে, ওগুলো তো রায়গড় থেকে...বনশোভা নার্সারি? আই সি!...কী অবাক! আমি কল্পনাও করিনি আপনি রায়গড়ের ঐতিহাসিক রাজাদের বংশধর। আসলে রাজবংশধররা কুমারবাহাদুর বা প্রিন্স...হুঁ, আপনি পছন্দ করেন না তা হলে। ...শুনুন, ওই অকালকুষ্মাণ্ড আমার দরকার। কীভাবে...ধন্যবাদ। রাখছি।"

কর্নেল ফোন রাখার পর হাই তুলে বললুম, "কোনো এক রায়গড়ে ভূতের পেছনে দৌড়লেন এক ভদ্রলোক। এদিকে আর-এক ভদ্রলোক মনে হচ্ছে অকালকুষ্মাণ্ডের পেছনে দৌড়তে চলেছেন। তবে এই যোগাযোগটা অদ্ভুত রকমের আকস্মিক।"

প্রকৃতিবিদ এতক্ষণে মাথার আঁটো-টুপি খুলে টাকে হাত বুলোচ্ছিলেন। বললেন, "রহস্য জিনিসটার সঙ্গে আকস্মিকতার সম্পর্ক অনিবার্য, জয়ন্ত!"

"আপনার এই অকালকুষ্মাণ্ডে কোনো রহস্য আছে বুঝি?"

"আছে। প্রকৃতির চেয়ে বেশি রহস্য আর কোথায় আছে?"

"নাকি রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই সেরে নিতে চান?"

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সোফার কাছে এগিয়ে নীচে থেকে একটা নোটবুক কুড়িয়ে বললেন, "বলেছি, তুমি হালদারমশাইকে লক্ষ করোনি। করলে চোখে পড়ত, খবরটা পড়ার পর ভদ্রলোক এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, নোটবইটার কথা ভুলে গেছেন। সম্ভবত ওটা আমাকে দেখানোর জন্য হাতে রেখেছিলেন।" কর্নেল নোটবইটার পাতা ওলটাতে থাকলেন। "তারপর আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কাগজ পড়ার জন্য এটা সোফায় রাখেন। এত বড় নোটবই পকেটে ঢোকানো যায় না। এটা ওঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির নোটবই মনে হচ্ছে। যাই হোক, খবরটা পড়ার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো এবং চলে যাওয়ার সময় নোটবইটা নীচে পড়ে যায়।...হুঁ! এই তো! একটা বেনামী চিঠির কপি ছাড়া এটা আর কী হতে পারে? মূল চিঠিটা...জয়ন্ত! ফোনটা ধরো।"

টেলিফোন বাজছিল। সাড়া দিতেই হালদারমশাইয়ের গলা ভেসে এল। "জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেলস্যারকে দিন না, প্লিজ!"

"আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?"

"হাওড়া স্টেশন। আর কইবেন না! নোটবই ফ্যালাইয়া আইছি।"

"ওটা আপনার কর্নেলস্যারের হাতে রয়েছে।"

"ওঁকে ফোনটা দিন! ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।"

হালদারমশাই পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতেও কথা বলেন মাঝে-মাঝে। বিশেষ করে উত্তেজনার সময়। ফোন কর্নেলকে দিলুম। কর্নেল বললেন, "হুঁ, বলুন হালদারমশাই!...বলেন কী!...মক্কেলের নিষেধ? ঠিক আছে। সব পেশাতেই কিছু এথিক্স বা নীতি মেনে চলা হয়। আপনি ডিটেকটিভ। কাজেই...না, না! আপনার কাজ আপনি করুন। ...গোপনে যোগাযোগ রাখবেন? বেশ তো!...ঠিক আছে উইশ ইউ গুড লাক।..."

ফোন রেখে কর্নেল গম্ভীর মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললুম, "কী ব্যাপার?"

কর্নেল নোটবইয়ের একটা পাতা আমার সামনে তুলে ধরলেন। হালদারমশাইয়ের হস্তাক্ষরে লেখা আছে :

২৬ মার্চ রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। তার মধ্যে ত্র্যম্বক না পেলে আদরের নাতি বিশু বলিদান হবে। আবার বলা হচ্ছে, ত্র্যম্বক রেখে আসবে শ্মশানবটের গোড়ায় চৌকো পাথরটার ওপর। পুলিশকে জানালে শিবেরও সাধ্য নেই তোমাকে বাঁচায়। আর-একটা কথা। লাফাং চু দ্রিদিস্বা দিয়ে কাজ হবে না। ওই ভূতটাকে আমরা চিনি। তাকে ফাঁদ পেতে ধরব। সাবধান।

পড়ার পর বললুম, "সর্বনাশ! কিডন্যাপ কেস মনে হচ্ছে যে!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "হ্যাঁ। পঞ্চানন আচার্যের নাতি বিশুকে কারা গুম করে রেখেছে।"

"ত্র্যম্বক তা হলে নিশ্চয় কোনো দামি জিনিস?"

"ত্র্যম্বক শিবের এক নাম। তবে কথাটার মানে, যে-দেবতার তিনটে চোখ আছে।" কর্নেল নোটবইটা নিয়ে তাঁর ইজিচেয়ারে বসলেন। "আমাদের হালদারমশাই নিজের পেশার ব্যাপারে খুব মেথডিক্যাল। ফোনে আমাকে ওঁর মক্কেলের নাম জানাতে চাইলেন না। বললেন, নিষেধ আছে। কিন্তু নোটবইয়ে নাম-ঠিকানা সবই লেখা আছে দেখছি।"

"ওঁর মক্কেল সেই শিবমন্দিরের সেবাইত পঞ্চানন আচার্য, সে তো বোঝা-ই যাচ্ছে!"

"নাহ্ জয়ন্ত!" কর্নেল একটু হাসলেন। "নাতি কিডন্যাপ্ড্ হয়েছে যাঁর, তিনি মোটেও হালদারমশাইয়ের কাছে আসেননি। সম্ভবত তাঁর জানার কথাও নয় যে, কে. কে. হালদার নামে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছেন। হালদারমশাইয়ের মক্কেল হলেন রায়সায়েব, যাঁর সঙ্গে একটু আগে ফোনে কথা বললুম। বালিগঞ্জ লেনের প্রমোদরঞ্জন রায়। ভদ্রলোক ইন্টারন্যাশনাল হর্টিকালচার সোসাইটির একজন মেম্বার।"

অবাক হয়ে বললুম, "ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি!"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন, "অবশ্য এমনও হতে পারে, রায়সাহেব তাঁদের রায়গড় শিবমন্দিরের সেবাইতমশাইয়ের নাতিকে সদিচ্ছাবশেই উদ্ধার করতে চেয়েছেন। হয়তো পঞ্চাননবাবুই ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে। তাই..." কর্নেল হঠাৎ থেমে গিয়ে হেলান দিলেন ইজিচেয়ারে। চোখ বন্ধ করে রইলেন।

"কিন্তু কর্নেল রায়সায়েব কেন হালদারমশাইকে নিজের নাম গোপন রাখতে বলবেন?"

কর্নেল চোখ বন্ধ রেখেই বললেন, "ঠিক, ঠিক। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।"

"রায়সায়েব কি হালদারমশাইয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা জানেন?"

"না জানলেও হালদারমশাই জানিয়ে থাকবেন। তাই..." কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "হুঁ, রায়সায়েব চান না আমি এতে নাক গলাই। তখন ফোনে বললেন, একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ি—সেই অকালকুষ্মাণ্ডের জন্য কষ্ট করে রায়গড়ে আমার যাওয়ার দরকার নেই। উনিই শিগগির পাঠিয়ে দেবেন।"

"তা হলে হালদারমশাই ওঁর অজ্ঞাতে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন?"

"হুঁ।" কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হালদারমশাই খুব মেথডিক্যাল। কিন্তু বড্ড হঠকারী। বহুবার নিজেই নিজের সাঙ্ঘাতিক বিপদ ডেকে এনেছেন, তা তো তুমিও দেখেছ। লাফাং চু দ্রিদিম্বা ভৌতিক রহস্যে আমার মাথাব্যথা ছিল না। অকালকুষ্মাণ্ডও আমি ঘরে বসে পেয়ে যাব। কিন্তু হালদারমশাইয়ের জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে, জয়ন্ত! এই দ্যাখো না! নিজের নোটবইটাই ফেলে গেলেন এবং স্টেশনে গিয়ে সেটার কথা খেয়াল হল। এদিকে রায়সায়েবের এমন লুকোছাপারই বা কারণ কী? তিনি তো আমার পরিচয় ভালোই জানেন। নাহ্ ডার্লিং! আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এটা আমার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। বললুম, "আপনি কি এখনই রওনা দেবেন নাকি?"

"বনশোভা নার্সারিতে আমি বারতিনেক গেছি, জয়ন্ত! প্রোপ্রাইটর সাধুচরণ লাহা আমার চেনা লোক। গঙ্গার ধারে প্রায় তিরিশ একর জমি জুড়ে ওঁর বিশাল নার্সারি। নন্দনকানন বললেই চলে। এমন নার্সারি এদেশে আর দু'টি নেই। লাহাবাবু দুর্লভ প্রজাতির অর্কিড আর ক্যাক্টি গ্র্যাফ্‌টিং করে নানা জায়গায় চালান দেন।"

"ঠিক আছে। উইশ ইউ গুড লাক।"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, "তুমিও যাচ্ছ।"

"সে কী! আমাকে যে আজ মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সে যেতে হবে।"

"চিফ রিপোর্টারকে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দাও, মুখ্যমন্ত্রীমশাইয়ের ভাষণের চেয়ে লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য পাঠকরা বেশি খাবে। বরং ফোনটা আমাকে একবার দিও। বুঝিয়ে দেব।..."

দুই

রায়গড়ে পৌঁছতে প্রায় পৌনে চারটে বেজে গেল। গঙ্গার ধারে একটা পুরোনো গঞ্জের গায়ে একালের ছাপ পড়েছে। নতুন-পুরোনোতে মিলে অদ্ভুত একটা চেহারা। ভিড়ভাট্টা হইচইয়ে তুলকালাম অবস্থা। আমরা একটা সাইকেলরিকশা নিলুম। বসতি এলাকা ডাইনে রেখে রিকশা যে পথে এগোল, তার দু'ধারে ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল হঠাৎ বলে উঠলেন, "রোখ্কে! রোখ্কে! শিবমন্দিরে প্রণাম করে আসি। এক্ মিনিট।"

রিকশাওয়ালা বলল, "বেশি দেরি করবেন না স্যার! নার্সারি থেকে আমাকে একা ফিরতে হবে। বেলা গড়িয়ে যাবে। সুনসান নিরিবিলি রাস্তা।"

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "চোর-ছিনতাইয়ের ভয় আছে নাকি?"

রিকশাওয়ালা তুম্বো মুখে বলল, "না স্যার! ইদানীং এখানে বাবার চেলাদের খুব উপদ্রব শুরু হয়েছে।"

"তুমি কি ভূতপ্রেতের কথা বলছ?"

রিকশাওয়ালা বুকে-কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, "আজ্ঞে, ঠিকমতো সেবাযত্ন না হলে বাবা রাগেন! পেত্থম রাগ পড়েছিল ঠাকুরমশাইয়ের গিন্নির ওপর। রাত্তিরে খিড়কির দোরের কাছে ঘাড় মটকে দিয়েছিলেন। এই তো দু'মাস আগের কথা! ডাক্তার বলল, হার্টফেল! আজকাল ডাক্তারদের এই এক কথা, হার্টফেল। তবে কেউ-কেউ বলেছিল বটে মার্ডারকেস। আমি বিশ্বাস করিনে স্যার!"

কর্নেল ভুরু কুঁচকে কথা শুনছিলেন। বললেন, "তুমি কার কথা বলছ?"

"আজ্ঞে এই মন্দিরের যে ঠাকুরমশাই আছেন, তেনার ওয়াইফ ছিলেন।"

"বুঝেছি। তা..."

"আর দেরি করবেন না স্যার! শিগগির প্রণাম করে আসুন।"

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "মন্দিরে এখন ঠাকুরমশাই আছেন তো?"

"থাকার তো কথা।"

"ওঁর বাড়িতে আর কে আছেন?"

"ওঁর নাতি বিশু। মা-বাপ মরা ছেলে স্যার! ঠাকুরমশাই মানুষ করছেন। ইস্কুলে পড়ে।"

"বিশুও নিশ্চয় আছে এখন? স্কুলের তো ছুটি হয়ে গেছে।"

রিকশাওয়ালা হাসল। "বিশুকে পাওয়া কঠিন। এই আছে তো এই নেই। কোথায়-কোথায় ঘোরে টোটো করে। তবে ছেলেটা বড্ড ভালো স্যার!"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আচ্ছা, এই লাফাং চু দ্রিদিম্বা ব্যাপারটা..."

রিকশাওয়ালা আঁতকে উঠে ফের কপালে-বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, "ওসব কথা বলবেন না স্যার! যান, যান! প্রণাম করে আসুন। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

রাস্তা থেকে একফালি পায়ে চলা পথ এগিয়ে গেছে শিবমন্দিরের জরাজীর্ণ ফটক পর্যন্ত। দু'ধারে ধ্বংসস্তূপ ঢেকে রেখেছে ঝোপঝাড় আর কিছু উঁচু গাছ। কর্নেল যেতে যেতে চাপা স্বরে বললেন, "বোঝা গেল, বিশু কিডন্যাপ্‌ড্ হওয়ার কথা এখানে এখনও সম্ভবত কেউ জানে না।"

সায় দিয়ে বললুম, "আরও একটা কথা জানা গেল, সেবাইত ভদ্রলোকের স্ত্রীর মৃত্যুটা অনেকের কাছে সন্দেহজনক।"

কর্নেল বাইনোকুলার তুলে পাখি দেখার চেষ্টা করছিলেন। বললেন, "একটা নিষেধাজ্ঞা রইল জয়ন্ত, তুমি সবসময় মুখটি বুজে থাকবে—বিশেষ করে যখন আমি কারও সঙ্গে কথা বলব।"

অভিমান চেপে বললুম, "ও কে বস!"

কর্নেল হাসলেন। "না, না। অন্যান্য কথা বলবে। শুধু এই ঘটনাসংক্রান্ত কোনো কথা বাদে। তবে যখন তুমি-আমি একা থাকব, তখন যথেচ্ছ কথা বলার বাধা নেই।"

ফটক দিয়ে ঢুকে একটা চত্বর দেখা গেল। এখানে-ওখানে দেশি ফুল-ফলের গাছ। সামনে প্রকাণ্ড শিবমন্দির। ধাপ বেয়ে উঠতে হয়। ডাইনে একতলা কয়েকটা ঘর। ঘরগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। জুতো খুলে আমরা মন্দিরের দরজায় উঠে গেলুম। ভেতরটা আবছা অন্ধকার। কর্নেল জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে জ্বাললেন। সেই আলোয় একটি কালো পাথরের শিবলিঙ্গ দেখা গেল। সিঁদুরের ছোপ পড়েছে আগাগোড়া। কিছু মিইয়ে যাওয়া ফুল আর বেলপাতা পড়ে আছে। হঠাৎ কর্নেল টর্চ নিভিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "প্রণাম করো ডার্লিং! ঝটপট প্রণাম!"

উনি হাঁটু মুড়ে বসে মাথা ঠেকালে আমি অবাক হয়েছিলুম। কারণ এ যাবৎ আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে কোথাও এমন ভক্তি প্রদর্শন করতে দেখিনি। ওঁর দেখাদেখি আমাকেও মাথা ঠেকাতে হল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দেখি, নীচের চত্বরে এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বাটে গড়ন। পরনে খাটো করে পরা ধুতি আর হাফ ফতুয়া। কপালে লাল তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষমালা। খালি পা।

কর্নেল বিনীতভাবে বললেন, "আমার আন্তরিক ইচ্ছে, পুজো দিই। তা আপনিই কি এই মন্দিরের পুরোহিত?"

"আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি!"

"বনশোভা নার্সারিতে অথবা লাহাবাবুর বাড়িতে..."

"উঁহু। গঙ্গার ধারে। আপনার গলায় সেই যন্তরটাও ঝুলছে দেখছি। কী দ্যাখেন ওই দিয়ে?"

"পাখি-টাখি দেখি। পাখি দেখতে আমার ভালো লাগে ঠাকুরমশাই!"

এর ঠাকুরমশাই তা হলে সেই পঞ্চানন আচার্য। মুচকি হেসে বললেন, "আমার নাতি বিশেটারও ওই নেশা। বুঝলেন? একটা টিয়াপাখি পুষেছিল। রাগ করে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছি। তাতে হতভাগার এমন রাগ যে না-খাওয়া না-দাওয়া, কোথায় উধাও। যা না যেখানে যাবি। ক'দিন কে খেতে দেয় দেখব'খন। আবার এই শর্মার পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই হবে।"

কর্নেল এবং তাঁর পিছনে আমি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম চত্বরে। কর্নেল বললেন, "আপনার নাতির বয়স কত? কোন ক্লাসে পড়ে?"

ঠাকুরমশাই বললেন, "বারো-তেরো হবে। ক্লাস সিক্সে গাড্ডা খেয়ে পড়ে আছে। আর বলবেন না মশাই! বিশু নয়, বিচ্ছু। বুঝলেন? কী বুঝলেন?"

"বিচ্ছু।"

ঠাকুরমশাইয়ের চোখ দু'টি কেমন ঢুলুঢুলু এবং মুখে অমায়িক ভাব। চোখ নাচিয়ে হেসে বললেন, "মশাইদের কি কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" কর্নেল এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বললেন, "ছোট ছেলের এই নিরিবিলি জায়গায় একা থাকতে ভালো লাগবে কেন? তাই হয়তো মাঝে-মাঝে কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি চলে যায়। আপনি খোঁজ নিচ্ছেন না কেন?"

পঞ্চানন আচার্য এবার একটু বিরক্ত হলেন। "ধুর মশাই! আত্মীয়স্বজন বলতে ওর কেউ কোথাও আছে নাকি? রায়গড়েই কারও বাড়ি গিয়ে থাকে। এবারও তা-ই আছে।"

"তা আপনি ওর পাখি খুলে দিলেন কেন?"

"অত কৈফিয়ত দিতে পারব না মশাই!"

কর্নেল পকেট থেকে পার্স বের করে বললেন, "আগামীকাল পুজো দেব। জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য কত অ্যাডভান্স লাগবে বলুন। আমি লাহাবাবুর নার্সারিতে আছি।"

ঠাকুরমশাই পার্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছোট, না মাঝারি, না বড়পুজো?"

"আজ্ঞে?"

"ছোটপুজোর রেট পঞ্চাশ। মাঝারি পাঁচশো। বড় সাড়ে সাতশো।"

"এত তফাত কেন?"

ঠাকুরমশাই হাসলেন। "ছোটতে নিরিমিষ। মাঝারিতে কেজি দশেক, বড়তে কেজি পনেরো থেকে বিশ। পাঁঠার যা দাম বেড়েছে, আর বলবেন না মশাই! ওই তো হাড়িকাঠ দেখতে পাচ্ছেন। অবস্থা দেখুন না ঘুণ ধরে নড়বড় করছে। মাঝারি বা বড়পুজো হলে কেতোকে খবর দিতে হবে। তাকেও মজুরি দিতে হবে।"

কর্নেল পার্স থেকে দুটো দশ টাকার নোট ঠাকুরমশাইয়ের পায়ের কাছে রেখে বললেন, "ছোটই দেব। রক্তটক্ত আমার ধাতে সয় না। এই রইল অ্যাডভান্স।"

ঠাকুরমশাই নোট দুটো দেখতে দেখতে বললেন, "আর-একটা চাই। পুজোসামগ্রীর বেজায় দর।"

কর্নেল আর-একটা দশ টাকার নোট রাখলেন। তারপর বললেন, "কখন আসব বলুন?"

"দাঁড়ান। পাঁজি দেখে আসি।"

টাকা তুলে নিয়ে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে হেঁটে গেলেন ঠাকুরমশাই। একতলা একটা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন। ভেতরে ঢুকে গেলেন।

চাপাস্বরে বললুম, "সত্যিই কি পুজো দেবেন নাকি?"

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, "মাঝে-মাঝে একটু ধর্মকর্ম করলে মনে শান্তি আসে ডার্লিং!"

ঠাকুরমশাই বেরিয়ে আসছিলেন। এবার চোখে চশমা। হাতে পাঁজি। বারান্দা থেকে নামার সময় একটা শূন্য পাখির খাঁচায় মাথার টোক্কর লাগল। অমনি 'হ্যাত্তেরি' বলে খাঁচাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ছুঁড়ে ফেললেন।

তারপর পাঁজির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে এগিয়ে এলেন। "হ্যাঁ! কালবেলা গতে ছয় ঘঃ তেত্তিরিশ মিঃ চুয়াল্লিশ সেঃ মাহেন্দ্রযোগ—আপনারা সূর্য ওঠার আগেই চলে আসুন।"

কর্নেল করজোড়ে প্রণাম করে পা বাড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনি যে খাঁচাটা ফেলে দিলেন, আপনার নাতি এসে রাগ করবে না?"

"বয়ে গেল!" ঠাকুরমশাই বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখালেন। "গত সপ্তায় পাখি উড়িয়ে দিয়েছি। এ-সপ্তায় খাঁচা উড়িয়ে দিলুম। পাখি ফিরে এসে থাকবে কোথায়?" টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন পঞ্চানন আচার্য।

"আপনার নাতি চলে গেল কবে?"

"আজ রোববার। বেস্যুতবার ইস্কুল থেকে বিকেলে এসে বইখাতা রেখে চলে গেল।"

"বলে যায়নি কোথায় যাচ্ছে?"

"বলল, কেতো ওর পাখি দেখতে পেয়েছে। ধরতে যাচ্ছে।"

"কেতো কে?"

"আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এক কোপে একশো পাঁঠা কাটে মশাই! বড়পুজো দিলে দেখতেন!"

রিকশাওয়ালাকে দেখা গেল ফটকের বাইরে। মুখে তিতিবিরক্ত ভাব। ডাকল, "বড্ড লেট হয়ে গেল স্যার! এমন করলে চলে? এতক্ষণ ফিরে গিয়ে আরও কয়েক খেপ পেসেঞ্জার টানতুম ইস্টিশনে।"

ঠাকুরমশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা গিয়ে রিকশায় উঠলুম। রিকশাওয়ালা গজগজ করতে থাকল। "পাঁচুঠাকুরের পাল্লায় পড়তে আছে? সবসময় ভাং-এর নেশায় চুর হয়ে থাকেন। কিন্তু পুজো দিতে চাইলেই টনটনে হুঁশ। শুনেছি, রায়রাজাদের যখের ধন আগলাচ্ছেন সাতপুরুষ ধরে। তবু টাকার লোভ গেল না!"

কর্নেল বললেন, "বলো কী! যখের ধন?"

রিকশাওয়ালা প্যাডেলে পায়ের চাপ দিয়ে বলল, "আজ্ঞে স্যার, আপনারা শিক্ষিত লোক। আপনাদের কি অজানা আছে? শিবঠাকুরের মাথায় থাকেন সাপ। সেই সাপের মাথায় আছে এক মণি। সাতরাজার ধন কি না বলুন স্যার?"

"এই মন্দিরের শিবের মাথায় তো সাপ দেখলুম না হে! ন্যাড়া শিবলিঙ্গ আছে বটে। সাপ তো নেই।"

রিকশাওয়ালা দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, "আছে। ছিল। কে দেখা পায়, কে পায় না। আর মণির কথা যদি বলেন, তা-ও আছে। ছিল। যে জানার সে ঠিকই জানে।"

"কে সে?"

"পাঁচুঠাকুর। আবার কে!"

ডাইনে গঙ্গা দেখা গেল এতক্ষণে। সামনে কিছুটা দূর বনশোভা নার্সারির গেট। দেওয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। রিকশাওয়ালা রায়রাজাদের গপ্প শোনাচ্ছিল। এসব গপ্পের কাঠামো দেখেছি একইরকম। ধার্মিক রাজার সামনে সশরীরে দেবতার আবির্ভাব, পুজোর নির্দেশ, বর দান এবং একটি মন্দির নির্মাণ। এই গপ্পে দেবতা নিজের মাথার সাপের মণিটিও দান করেছিলেন রায়রাজাকে।

ফিসফিস করে কর্নেলকে বললুম, "ত্র্যম্বক!"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালেন শুধু।

নার্সারির গেটে আমরা রিকশা থেকে নামতেই কে ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যালো, কর্নেল সরকার!"

কালো তাগড়াই চেহারা, থুতনিতে দাড়ি, পরনে লাল শার্ট, জিনস আর পায়ে গামবুট, পিঠে সম্ভবত কীটনাশকের খুদে ট্যাঙ্ক বাঁধা, হাতে স্প্রের নল। এক ভদ্রলোক ফুলের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। কর্নেল তাঁকে সম্ভাষণ করে বললেন, "হ্যালো মিঃ বাগ! কেমন আছেন? আপনার কর্তাবাবু কোথায়?"

মিঃ বাগ মুচকি হেসে বললেন, "সাধুদা ভূতের ভয়ে বাড়ি থেকে নার্সারিতে আসছেন না। কাগজে খবর পড়েননি? আজই তো বেরিয়েছে। এনি ওয়ে, ওয়েলকাম! মালিক নেই তো কী হয়েছে? নোকর আপনার সেবার জন্য হাজির।"

কর্নেল বললেন, "আমার কয়েকটা একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ে চাই। রায়সায়েবের বাগানে দেখে দৌড়ে এসেছি।"

মিঃ বাগকে হঠাৎ যেন চমকে উঠতে দেখলুম। নাকি আমার চোখের ভুল? তখনই অবশ্য সহাস্যে বললেন, "আসুন। আসুন। সে হবে 'খন। আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বিশ্রাম করুন।..."

তিন

নার্সারির একটেরে গঙ্গার ধারে বাংলোধাঁচের সুন্দর একটা বাড়ি। ম্যানেজার অরিন্দম বাগ একা থাকেন সেখানে। ভদ্রলোক একজন হর্টিকালচার-বিশেষজ্ঞ। রায়সায়েবের সুপারিশে সাধুবাবু ওঁকে বছর দেড়েক আগে বহাল করেছেন। সাধুবাবু তাই এখন রাতে রায়গড়ের বাড়িতে গিয়ে থাকেন। আগে এই বাংলোতেই থাকতেন। মান্যগণ্য অতিথি এলে তাঁদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। নার্সারির বেশির ভাগ কর্মী স্থানীয় লোক। তাঁরা সন্ধ্যায় বাড়ি চলে যান। জনাতিনেক থাকেন উলটো দিকের একতলা সারবন্দি ঘরগুলোতে। সেখানেই নার্সারির অফিস আছে। গেটের কাছাকাছি ট্রাক ও টেম্পোর গ্যারাজ আছে। রাতের পাহারার জন্য বন্দুকধারী গার্ডও আছে জনা দুই।

কফি খেতে-খেতে কর্নেল এবং মিঃ বাগ ক্যাক্টি নিয়ে দুর্বোধ্য আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তারপর আমার কথা বেমালুম ভুলে দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবত ক্যাক্টি পরিদর্শনে।

বেলা পড়ে এসেছে। জানলা দিয়ে গঙ্গাদর্শনেই মন দিলুম অগত্যা। এইসময় চোখে পড়ল, কর্নেলের বাইনোকুলারটা টেবিলে পড়ে আছে। তুলে নিয়ে চোখে রাখলুম। লেন্স অ্যাডজাস্ট করার পর গঙ্গার ওপার-এপার চমৎকার খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, শিবমন্দিরের দিকে একটা প্রকাণ্ড বটের গাছ এবং সেটাই হয়তো সেই শ্মশানঘাট, তার তলা থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার!

গঙ্গার ধারে নিচু বাঁধে ঘন ঝোপঝাড়। সেখানে ঢুকে ঘাপটি পেতে বসে পড়লেন।

মিনিট পাঁচেক পরে একটা ডিঙি নৌকো এসে শ্মশানবটের কাছে ভিড়ল। ঝোপের আড়াল পড়ায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু হালদারমশাইকে গুড়ি মেরে এগোতে দেখলুম সেদিকে।

একটা কিছু ঘটতে চলেছে নিশ্চয়। হালদারমশাই অদৃশ্য হয়ে গেলে বাইনোকুলার নিয়ে পুবের দরজা খুলে বের হলুম। কিন্তু নিরাশ হতে হল। এদিকের গেটে তালা আঁটা আছে। বেরনো যাবে না। সবুজ রঙের লোহার কপাট অন্তত ফুট ছয়েক উঁচু। তার মাথায় গ্রিল এবং গ্রিলের ওপর কাঁটাতার। নার্সারি না দুর্গ?

ঘরের মেঝে উঁচুতে বলে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। তাই ঘরে ফিরে আবার বাইনোকুলারে চোখ রাখলুম।

সেই নৌকো তরতর করে চলে যাচ্ছে। কোথাও হালদারমশাইকে দেখতে পাওয়া গেল না। আলোর রং ধূসর হয়ে গেছে। সব আবছা হয়ে পড়েছে এবার।

একটু পরে কর্নেল এবং মিঃ বাগের সাড়া পেলুম। কথা বলতে বলতে দু'জনে ঘরে ঢুকলেন। মিঃ বাগ সুইচ টিপে আলো জ্বেলে বললেন, "জয়ন্তবাবু হয়তো লক্ষ করেননি আমরা মাঠেঘাটে থাকলেও সিটিলাইফের আরাম ভোগ করি।"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত মাঝে-মাঝে নেচারকে কাছে পেতে চায়। আমারই সঙ্গদোষে।"

মিঃ বাগ হাসলেন, "সমস্যা হল, নেচার খুব একটা নিরাপদ কিছু নয়। এই নার্সারিতে বেজায় সাপের উৎপাত হয়। অবশ্য এখন মার্চের শেষাশেষি, সাপেদের ঘুমের শেষ প্রহর। এপ্রিলের মাঝামাঝি একবার পাশ ফিরে শোবে। তারপর মে মাসে বেরোতে শুরু করবে। জুনে তো সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। নার্সারি ওদের কামোফ্লেজের পক্ষে চমৎকার জায়গা। গত জুনে ক্যাক্টি ভেবে একটা—নাহ, জয়ন্তবাবু ভাবলেন ওঁকে ভয় দেখাচ্ছি!"

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, "জয়ন্ত অলরেডি ভয় পেয়ে গেছে।"

মিঃ বাগ জিভ কেটে বললেন, "সরি! আচ্ছা, আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি একটু কাজ সেরে নিইগে ততক্ষণ। আর-এক দফা কফিও বলে দিচ্ছি। কর্নেলসায়েব তো ভীষণ কফিভক্ত।"

উনি চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "তোমাকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন ডার্লিং? অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী ভাবছিলে?"

চাপা স্বরে হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা বললুম। নৌকোটার কথাও।

শুনে কর্নেল গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "হালদারমশাইয়ের কাছে রিভলভার আছে। তুমি গুলির শব্দ শুনেছ কি?"

"নাহ্।"

"অবশ্য এত দূর থেকে রিভলভারের শব্দ শোনা অসম্ভব। তবে তোমার বর্ণনা শুনে মনে হল, নৌকোতে ওঁর প্রতিপক্ষের লোক-টোকই ছিল। যদি ওঁর কোনো বিপদ না হয়ে থাকে, শিগগির আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

"উনি কি জানেন আপনিও এখানে এসেছেন?"

"উনি আমাকে আসতে বলেছেন। বনশোভা নার্সারিতে থাকতে বলেছেন।"

"তখন স্টেশন থেকে টেলিফোনে তা-ই বলছিলেন বুঝি?"

"হুঁ।"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়ি টানছিলেন। বললুম, "এই বাগভদ্রলোককে আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। আপনি লক্ষ করেছেন কি না জানি না, তখন গেটে ক্যাক্টির কথা বলামাত্র উনি যেন চমকে উঠলেন।"

"হুঁ।"

"একটু আগে সাপের ভয় দেখাচ্ছিলেন।"

"হুঁ!"

"কী খালি হুঁ-হুঁ করছেন? খুলে আলোচনা করুন।"

কর্নেল সেই পাঁচুঠাকুরের মতো ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, "আমি ছোটপুজোর কথা ভাবছি, জয়ন্ত! আগামীকাল প্রত্যূষে ছয় ঘঃ তেত্তিরিশ মিঃ চুয়াল্লিশ সেঃ মাহেন্দ্রযোগ।"

"আমি কিন্তু যাচ্ছি না।"

"ত্র্যম্বক দর্শনের পুণ্য মিস করা উচিত নয়, ডার্লিং! না, না—আমি মহাদেবের মাথার সাপের মণি-টনির কথা বলছি না। ত্র্যম্বক স্বয়ং মহাদেব।"

আমরা চাপাস্বরে কথা বলছিলুম। এই সময় একটা লোক ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এই লোকটা আগেরবার কফি এনেছিল। কর্নেল বললেন, "এসো হরি! তোমার জন্য হা-পিত্যেশ করছিলুম!"

হরি ট্রে রেখে সেলাম ঠুকে বলল, "একটু দেরি হয়ে গেল স্যার! বাগসায়েবকে কর্তামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। জিপগাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন বাগসায়েব। গণেশড্রাইভারকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। তা গণেশের এদিকে জ্বর। অগত্যা..."

"আচ্ছা হরি, এদিকের গেটের চাবি কার কাছে? একটু গঙ্গার ধারে ঘুরতে যেতুম।"

হরি জিভ কেটে বলল, "এঃ হে! একটু আগে বললে—গেটের চাবি বাগসায়েবের কাছে থাকে। তবে স্যার, আমার মতে, রাতবিরেতে না বেরনোই ভালো। অবস্থা আর আগের মতো নেই। লোকে সন্ধ্যার পর আর বাইরে বেরোচ্ছে না ইদানীং।"

"ভূতপ্রেতের ব্যাপার নাকি?"

হরি মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বলল, "আজ্ঞে তা-ই বটে! রাতবিরেতে জানলার বাইরে কে খোনাগলায় কী যেন বলে। আমিও শুনেছি।"

"বলো কী? কবে শুনেছ?"

"এই তো গত রাত্তিরে। ভয়ে কাউকে বলিনি।"

কর্নেল সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু কী বলে ভূতটা?"

হরি বলার আগে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা?"

"তা-ই বটে, তা-ই বটে!" হরি আড়ষ্টভাবে হাসল। "তবে আমার মনে হয়, উনি বুড়িঠাকরুনের আত্মা। আজ্ঞে স্যার, অপঘাতে মরণ বলে কথা। খিড়কির দোর থেকে আর মাত্তর কয়েক-পা নামলেই মা গঙ্গা। জলে পড়লেই আত্মার উদ্ধার হত। কিন্তু বডি পড়েছিল দোরগোড়ায়।"

কর্নেল বললেন, "তুমি কার কথা বলছ হরি?"

"আজ্ঞে পাঁচুঠাকুরের গিন্নি ছিলেন তিনি। বেজায় দজ্জাল মেয়ে ছিলেন। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে। মারা গিয়েও লোককে জ্বালাচ্ছেন।"

"অপঘাতে মরণ বলছ কেন?"

হরি সতর্ক ভঙ্গিতে চাপা স্বরে বলল, "কাউকে যেন বলবেন না স্যার! ভেতর-ভেতর কথাটা সবাই জানে। পাঁচুঠাকুর নেশাভাং করেন। রোজ একভরি আফিং তাঁর চাই। ঠাকরুনের গয়নাগাঁটি, সোনাদানা সব লুকিয়ে বেচে দিতেন। এই নিয়ে দু'জনকার ঝামেলা। শেষে নাকি দেবতার ধন পর্যন্ত বেচতে চেয়েছিলেন পাঁচুঠাকুর। বেগতিক দেখে ঠাকরুন রাতদুপুরে দেবতার ধন লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন। পাঁচুঠাকুর ঘড়েল লোক। তক্কেতক্কে ছিলেন। যে-ই ঠাকরুন বেরিয়েছেন, অমনি পেছন থেকে গলা টিপে ধরে..."

হরি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে থেমে গেল। কর্নেল বললেন, "কার কাছে শুনেছ এসব কথা?"

"কর্তামশাই আর বাগসায়েব বলাবলি করছিলেন। দয়া করে ওঁদের যেন বলবেন না আমি এসব কথা বলেছি। গরিব মানুষ স্যার! ঘরে একদঙ্গল পুষ্যি।"

"হুঁ।" কর্নেল আস্তে বললেন, "তা হলে দেবতার ধন বেচে দিয়েছেন পাঁচুঠাকুর? কিন্তু দেবতার ধন কিনল কে? কিনলে তো মহাপাপ। তাই না হরি?"

হরি একটু ইতস্তত করে বলল, "আজকাল পাপের ভয় কেউ করে না স্যার। আমার আবার মন্দ..."

বাইরে কেউ হেঁড়েগলায় ডাকল, "হরি! হরি! অ্যাই হোরে!"

হরি বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার মরারও সময় নেই। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই হরি-হরি আর হোরে! পরে বলব স্যার!"

বলে সে বেরিয়ে গেল। বললুম, "দেবতার ধন নিশ্চয় সেই ত্র্যম্বক। কিন্তু কর্নেল, পাঁচুঠাকুর যদি তা কাউকে বেচে দিয়ে থাকেন, তাঁর কাছে তা-ই দাবি করে তাঁর নাতিকে কিডন্যাপ করা হল কেন? উড়োচিঠিটা তাঁকে উদ্দেশ করেই লেখা।"

কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, "একটা চিঠি নয়। দুটো।"

অবাক হয়ে বললুম, "কী করে বুঝলেন দুটো?"

"হালদারমশাই নোটবইয়ে টোকা চিঠিটা দ্বিতীয় চিঠির কপি। কারণ ওতে 'আবার বলা হচ্ছে' এই কথাটা আছে।" কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন। "কিন্তু ঠাকুরমশাইকে দেখে মনে হল, কোনো উড়োচিঠি পাননি এবং নাতিকে গুম করে রাখা হয়েছে, তা-ও জানেন না। আমার অবাক লাগছে এটা।"

"সম্ভবত খুব ধূর্ত লোক। গভীর জলের মাছ।"

কর্নেল হাসলেন। "চিঠিতে 'আদরের নাতি' কথাটা আছে কিন্তু! তা ছাড়া ত্র্যম্বক যে ওঁর কাছেই এখনও আছে, কিডন্যাপার যে বা যারাই হোক, তারা এতে নিঃসন্দেহ। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ

পয়েন্ট, রিকশাওয়ালার কথা শুনে এবং এই নার্সারিতে আসার পর বুঝতে পেরেছি, বিশু কিডন্যাপড হওয়ার কথা এখানে এখনও জানাজানি হয়নি।"

"কর্নেল! পাঁচুঠাকুর বলছিলেন, বিশু কেতোর বাড়ি যাচ্ছে বলে বেরিয়ে যায়। আর ফেরেনি। কে কেতো সেটা জেনে নেওয়া উচিত। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।"

"তার আগে ছোটপুজো ডার্লিং!"

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। পুবের বারান্দায় গিয়ে বসব ভেবে দরজার কাছে গেছি, হঠাৎ আলো নিভে গেল। কর্নেল বললেন, "চুপচাপ ঘরেই বসে থাকো জয়ন্ত। ঠাকরুনের প্রেতাত্মার আবির্ভাব যে-কোনো মুহূর্তে হতে পারে।"

ঘরে-বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস না থাকলেও এমন কথা শুনে গা ছমছম করা স্বাভাবিক। নিজেকে সাহস দিতে শুকনো হাসি হাসলুম। কিন্তু চেয়ার খুঁজতে গিয়ে শোবার খাটের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। কর্নেল টর্চ জ্বাললেন। হাসতে হাসতে বললেন, "সাবধান জয়ন্ত! প্রেতাত্মা এসব চান্স মিস করে না।"

এইসময় বাইরে কে হেঁড়ে গলায় চেঁচাল, "হরি! মুকুন্দকে বল জেনারেটর চালিয়ে দিক।"

হরি ডাকছিল, "মুকুন্দবাবু! মুকুন্দবাবু।"

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর আবার চেঁচামেচি শোনা গেল। এবার অন্যরকম চিৎকার-চেঁচামেচি। তারপর বন্দুকের শব্দ। কর্নেল টর্চ জ্বেলে বেরোলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। অন্ধকার নার্সারিতে এদিকে-ওদিকে টর্চের আলোর ঝলকানি এবং "চোর! চোর! চোর!" বিকট হাঁকডাক ছুটোছুটি চলেছে।

এতক্ষণে কাছাকাছি কোথাও জেনারেটর চালু হল। আলো জ্বলে উঠল। লনে আমাদের দেখে হরি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, "চোর ঢুকেছিল স্যার! একটা চটের থলে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাঁটাতার কেটে পাঁচিল টপকে ঢুকেছিল। কী সাহস দেখুন!"

কর্নেল গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, "চটের থলে?..."

চার

নার্সারিতে চোর পড়ার খবর পেয়ে ম্যানেজার বাগসায়েব হন্তদন্ত ফিরে এসেছিলেন রায়গড় থেকে। এসেই প্রথমে গার্ডদের একচোট নিলেন। উত্তর দিকের পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া কেটে চোর ঢুকেছিল। তখনই সেখানটা জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। চটের থলেটা পড়ে ছিল যেখানে, সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে ক্যাক্টির অজস্র টব। বাগসায়েব ফেরার আগেই কর্নেল থলেটা দেখে এসেছেন। মুখটা বেজায় গম্ভীর। আস্তে বললেন, "চলো জয়ন্ত, ঘরে গিয়ে বসি।"

বাগসায়েবের হম্বিতম্বি আর ছোটাছুটি দেখে হাসি পাচ্ছিল। ঘরে ঢুকে বললুম, "একেই বলে মশা মারতে কামান দাগা। ওইটুকু একটা চটের থলে দেখে বোঝা যাচ্ছে নেহাত ছিঁচকে চোর।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজে টানছিলেন। আমার কথা শুনে বললেন, "কিন্তু তারকাটা চোর!"

"আজকাল এটা কোনো ব্যাপার নয়। আগের দিনে চোরেরা সিঁদকাঠি ব্যবহার করত। এখন তারকাটা প্লাস ব্যবহার করে। হার্ডওয়্যার স্টোরে কিনতে পাওয়া যায়। দামও তত কিছু বেশি নয়।"

"থলেতে কী চুরি করতে এসেছিল বলে তোমার ধারণা?"

"দামি কোনো প্ল্যান্টের কাটিং।"

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে হাসলেন। "ঠিক ধরেছ। এই নার্সারিতে অনেক বিদেশি আর দুষ্প্রাপ্য প্ল্যান্টের কাটিং মজুত রয়েছে। তবে এত ঝুঁকি নিয়ে নার্সারিতে ঢুকেছে যে, সে ওইটুকু থলে এনেছিল কেন, এটাই প্রশ্ন।" বলে একটু চুপ করে থাকলেন কর্নেল। তারপর বললেন, "দ্বিতীয় প্রশ্ন, ওই সময়ই হঠাৎ লোডশেডিং।"

বাইরে জেনারেটরের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এতক্ষণে বন্ধ হল এবং এবার আলো লাল হতে-হতে নিভে গেল। আবার সেই গাঢ় অন্ধকার। তার আধমিনিটটাক পরে উজ্জ্বলতর হয়ে আলো জ্বলে উঠল। বললুম, "কলকাতা হলে অন্তত দু ঘণ্টার আগে কারেন্ট আসত না!"

বাগসায়েব ঘরে ঢুকে ধপাস করে বসে বললেন, "ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, কর্নেল!"

কর্নেল বললেন, "মেন সুইচ কেউ অফ করে দিয়েছিল নাকি?"

মিঃ বাগ চমকে উঠে বললেন, "হ্যাঁঃ!"

"চোরকে সুইচবোর্ডের তালা ভাঙতে হয়েছে তা হলে?"

"আপনি দেখেছেন বুঝতে পারছি!"

"নাহ্ মিঃ বাগ! আমার অনুমান।"

মিঃ বাগ অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এর আগেও নার্সারিতে চোর পড়েছে শুনেছি। তাই পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন সাধুদা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এবার সুইচবোর্ডের তালা ভেঙে মেন সুইচ অফ করে এবং কাঁটাতারের বেড়া কেটে চোর কী চুরি করতে এসেছিল?"

"সম্ভবত অকালকুষ্মাণ্ড।"

"কী বললেন? কী বললেন? অকালকুষ্মাণ্ড?" মিঃ বাগ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখেই বললেন, "ওইটুকু চটের থলেতে বড় জোর ওইরকম জিনিসই চুরি করে নিয়ে যাওয়া যায়।"

"আপনার রসিকতার তুলনা হয় না।" মিঃ বাগ দামি বিদেশি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "যাই হোক, আমি বুঝতে পেরেছি, চোরের সহকারী এই নার্সারিতেই আছে।"

"বাগের ঘরে ঘোগের বাসা আর কি! সরি—বাঘের ঘরে।"

বাগসায়েব আবার একচোট হাসলেন। "একটু রিলিফ পাওয়া গেল। আপনি না থাকলে মেজাজ এখনও কতক্ষণ বিগড়ে থাকত।" বলে একটু ঝুঁকে এলেন কর্নেলের দিকে। চাপা গলায় বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে গণেশ ড্রাইভারকে। সাধুদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জিপ ড্রাইভিং আমার এখনও তত সড়গড় হয়নি। গণেশকে ডাকতে পাঠালুম। হরি এসে বলল, গণেশের নাকি জ্বর। ব্যাটাচ্ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দেব কি না ভাবছি।"

"তার আগে দেখা উচিত, সত্যি-সত্যি জ্বর কি না।"

"ঠিক বলেছেন। দেখে আসি।"

মিঃ বাগ তখনই বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। গঙ্গার দিকের দরজা খুলে বললেন, "এসো জয়ন্ত! এদিকের বারান্দায় বসা যাক।"

বেরিয়ে গিয়ে বললুম, "এই ঠাণ্ডার মধ্যে বসার কোনো মানে হয় না। মার্চের শেষেও এখানে দেখছি শীত চলে যায়নি।"

ছোট্ট বারান্দায় সুন্দর সব নানারকম ক্যাক্টি আর মরসুমি ফুলের টব সাজানো রয়েছে। গেট পর্যন্ত লনের দু'ধারেও পুষ্পসজ্জা, কেয়ারি করা ঝোপ। এদিকটাতেও যথেষ্ট আলো। বেতের চেয়ারে বসে বললুম, "আপনি মিঃ বাগকে অকালকুষ্মাণ্ড বললেন। উনি কথাটা বুঝতে পারেননি।"

"তুমি পেরেছ?"

"হ্যাঁ। সকালে ফোনে রায়সায়েবের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার মুখে শুনেছি। তা ছাড়া সেই অকালকুষ্মাণ্ড নেওয়ার ছলেই আপনি এখানে এসেছেন।"

"হুঁ, একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ি।" বলে কর্নেল আঙুল তুললেন একটা টবের দিকে, "ওই দ্যাখো ডার্লিং, অকালকুষ্মাণ্ড!"

বারান্দার কোনার দিকে টবে অজস্র তীক্ষ্ণ কাঁটায় ভরা গোলাকার একটা ক্যাক্টি দেখতে পেলুম। হঠাৎ কর্নেল উঠে গেলেন টবটার কাছে। টর্চের আলো ফেলে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। বললুম, "অতক্ষণ ধরে কী দেখছেন?"

"ফুল ফোটেনি কেন? আশ্চর্য তো!"

"আপনিই বলছিলেন প্রকৃতিতে প্রচুর রহস্য আছে।"

"আছে।"

কর্নেল আরও কিছুক্ষণ টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে দেখার পর উঠে এলেন। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললুম, "কী ব্যাপার?"

"তুমি ঠিকই বলেছ। বারান্দায় ঠাণ্ডাটা বড্ড বেশি। গঙ্গার ধারে বলেই এদিকটা এত ঠাণ্ডা।"

কর্নেল কথাটা বলেই ঘরের দরজার দিকে ঘুরেছেন এবং আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি, কাছাকাছি কোথাও বিদঘুটে নাকিস্বরে কে বলে উঠল, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা! লাফাং চু দ্রিদিম্বা!"

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। উত্তেজিতভাবে ফিসফিসিয়ে উঠলুম, "কর্নেল!"

কর্নেল প্রায় লাফ দিয়ে বারান্দার নীচে নেমে গেলেন। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। এপাশে-ওপাশে উঁচু গাছপালার আড়ালে অন্ধকার থেকে কে যেন আমাদের দেখছে। এই অস্বস্তিকর অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসেছিল। কর্নেল এদিকে-ওদিকে টর্চের আলো ফেলছিলেন। আর প্রেতাত্মার সাড়া পাওয়া গেল না।

একটু পরে কর্নেল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মিটিমিটি হেসে বললেন, "গুড লাক, ডার্লিং! রায়গড়ে আসা তা হলে সার্থক হল বলো!"

"গলার স্বরটা আমার কিন্তু মেয়েলি বলেই মনে হল।"

"ঠাকরুনের প্রেতাত্মার গলা। কাজেই মেয়েলি হওয়া স্বাভাবিক।"

"ভূত-প্রেত বলে কিছু থাকতে পারে না।"

"কিন্তু তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলে!"

"আচমকা ওইরকম নাকিস্বরে কেউ উদ্ভুট্টে কীসব বলে উঠলে মানুষ একটু চমকে উঠতেই পারে।"

মিঃ বাগ ফিরে এলেন এতক্ষণে। বললেন, "গণেশের সত্যি জ্বর। তবে জ্বর গায়ে সুইচবোর্ডের তালা ভাঙাটা ওর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। গ্যারাজঘরের পাশেই ট্রান্সফর্মার আর সুইচবোর্ড আছে। সাধুদার সঙ্গে পরামর্শ না করে পুলিশে খবর দেওয়া ঠিক হবে না। আবার রায়গড় যেতে হবে। কী ঝামেলা দেখুন তো! আপনার সঙ্গে জম্পেশ করে আড্ডা দেব, তার উপায় নেই। আমার ফিরতে দেরি হলে আপনারা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন। হরিকে বলে যাচ্ছি।"

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, "মিঃ বাগ! একটু আগে আমরা বাইরে কোথাও লাফাং চু দ্রিদিম্বা শুনতে পেয়েছি।"

"কী, কী?" মিঃ বাগ ভুরু কুঁচকে বললেন, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা? আশ্চর্য ব্যাপার তো!"

"হরিও নাকি গত রাতে শুনেছে। আপনাকে বলতে সাহস পায়নি।"

মিঃ বাগ রুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন, "সাধুদাও শুনেছিলেন। এমন ভিতু লোক দেখা যায় না। ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না। ক'দিন ধরে বাড়িতে যাগ-যজ্ঞ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুম চলেছে। যাই

বলুন কর্নেল, মফস্বলের লোকেরা এখনও বড্ড কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তবে দেখুন, আমাকে উত্যক্ত করতে এলে ভূত হোক আর যে-ই হোক, গুলি করে মারব।"

বলে বাগসায়েব জোরে বেরিয়ে গেলেন। বললুম, "ভদ্রলোক কেমন যেন গোঁয়ার-গোবিন্দ টাইপ।"

"হুঁ! তবে হর্টিকালচার বিদ্যায় এমন এক্সপার্ট আমি এ-পর্যন্ত দেখিনি। বিশেষ করে ক্যাক্টি সম্পর্কে উনি আস্ত এনসাইক্লোপিডিয়া!" কর্নেল স্বগতোক্তি করার মতো মিঃ বাগের প্রশস্তি শুরু করলেন। "কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। ওই বারান্দার একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়িতে কেন ফুল ফোটাতে ব্যর্থ হলেন? পরীক্ষা করে দেখলুম, ফুল ফোটানোর জন্য বেচারা তৈরি। অথচ—এক মিনিট!"

কর্নেল পুবের দরজা খুলে আবার বেরোলেন। আমি চুপচাপ বসে রইলুম। আমার প্রকৃতিবিদ বন্ধুর অজস্র বাতিকের সঙ্গে আমি পরিচিত।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে উনি ঘরে ফিরলেন। মুখে প্রশান্ত হাসি। বললেন, 'ফুল না ফোটার কারণ বুঝতে পেরেছি। সত্যিই প্রকৃতি বড় রহস্যময়ী, ডার্লিং! শুধু বুঝতে পারছি না, এই মূল্যবান অকালকুষ্মাণ্ডটা কেন ওখানে হেলাফেলায় রাখা হয়েছে? কেন?" চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চুরুট ধরালেন কর্নেল। চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। আস্তে বলে উঠলেন, "মাই গুডনেস! তা হলে কি চোরের কবল থেকে বাঁচাতেই এমন হেলাফেলা করে রাখা এবং পিছনের দিকের খোলাবারান্দায়? চোর যদি বিশেষ একটা অকালকুষ্মাণ্ড চুরি করতেই আসে, স্বভাবত সে ঢুকবে ক্যাক্টির বাগানে। সেখানেই সে ওটা খুঁজবে। এবং ঠিক তা-ই ঘটেছে। চোর ক্যাক্টির বাগানেই ঢুকেছিল। দৈবাৎ কারও চোখে পড়ায় থলে ফেলে পালিয়ে গেছে। অথচ যেটা সে চুরি করতে এসেছিল, সেটা এখানে থাকার খবর সে জানত না।"

না বলে পারলুম না, "ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো?"

কর্নেল চোখ নাচিয়ে বললেন, "ব্যাপার যাই হোক, ভোরবেলা ছোটপুজো দিতে যাচ্ছি। বিছানা থেকে হিড়হিড় করে টেনে ওঠাব, জয়ন্ত। বাবা ভোলানাথ পুজো দেওয়ার আগেই প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছেন মনে হচ্ছে।"

ভাবনায় পড়ে গেলুম। ভোরে ওঠা অভ্যাস নেই। তা ছাড়া এখানে এখনও শীত চলে যায়নি। কপালে ভোগান্তি আছে মনে হচ্ছে।

রাত দশটা বেজে গেল। তখনও বাগসায়েব ফিরলেন না। হরির তাগাদায় আমরা খেতে গেলুম। খাওয়ার পর হরি আমাদের ঘরে এল বিছানা সাজাতে। মশারি খাটিয়ে দিয়ে সে বলল, "বড্ড মশা হয়েছে ইদানীং। আর-একটা কথা বলি স্যার, রাতবিরেতে যেন বেরোবেন না।"

কর্নেল বললেন, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা?"

হরি সেই রিকশাওয়ালার মতো কপালে হাত ঠেকিয়ে চাপাস্বরে বলল, "দেব্‌তার ধন যতদিন দেব্‌তার কাছে ফেরত না যাচ্ছে, ততদিন ঠাকরুনের আত্মা শান্তি পাবে না।"

"দেবতার ধন গেল কোথায়, হরি?"

হরি ফিসফিস করে বলল, "তখন বলতে-বলতে বলা হল না। আমার সন্দ স্যার, পাঁচুঠাকুর আমাদের কর্তামশাইকেই বেচে দিয়েছে।"

"কেন তোমার এ সন্দেহ হচ্ছে?"

"পাঁচুঠাকুর ইদানীং প্রায়ই কর্তামশাইয়ের কাছে আসত। দু'জনে চুপিচুপি কীসব কথাবার্তা হত। তারপর তো দিদিঠাকরুন রাতবিরেতে বাড়ির আনাচে-কানাচে এসে সাড়া দিতে লাগলেন। অমনই কর্তামশাইয়ের তরাস বাজল। ভয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বুঝুন স্যার! ভয় তো সব্বাই

পেয়েছে। কিন্তু কর্তামশাইয়ের ভয়টা এত বেশি কেন?” হরি একটু হাসল। “কর্তামশাইয়ের বাড়ি রোজ পুজোআচ্চা, অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্তন চলেছে। কিন্তু পাঁচুঠাকুরকে পুজোআচ্চায় ডাকেননি। বুঝুন তা হলে!”

“দেব্‌তার ধন জিনিসটা কী, জানো হরি?”

হরি কপালে ফের হাত ঠেকিয়ে বলল, “বাবার মাথায় থাকেন সাপ, সেই সাপের মাথার মণি।”

“তুমি দেখেছ?”

“না স্যার, শুনেছি।”

হরি চলে গেলে কর্নেল বললেন, “দরজা বন্ধ করে দাও, জয়ন্ত! আর শোনো, হরির কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন কোরো। রাতবিরেতে বাইরে বেরিও না—যা কিছু ঘটুক। সাবধান!”

কর্নেল হাসিমুখে কথাটা বললেও মনে হল, সত্যিই সাবধান করে দিচ্ছেন আমাকে। দরজা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে পড়লুম। নতুন জায়গায় গেলে সহজে ঘুম আসতে চায় না। তা ছাড়া একটা জমজমাট রহস্যের মধ্যে এসে পড়লে তার জট ছাড়ানোর চেষ্টা করাও আমার বরাবর অভ্যাস। কর্নেলকে টেক্কা দেওয়ার ইচ্ছে মাথাচাড়া দেয়। কিন্তু এ এমন এক রহস্য, যার কোনো খেই খুঁজে পাচ্ছি না।

কখন চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল ঘুমের টানে। হঠাৎ ঘুমটা ছিঁড়ে গেল। বাইরে পুবের বারান্দায় কী খুটখাট শব্দ হচ্ছে। জানলা খোলা আছে। কিন্তু উঠে গিয়ে উঁকি মেরে দেখার সাহস হল না। শব্দটা থেমে গেলে চুপিচুপি ডাকলুম, “কর্নেল! কর্নেল!” কর্নেলের নাক ডাকা থামল না। তারপর ঘুম আর আসতেই চায় না।

একসময় কর্নেলের ডাকাডাকিতে চমকে উঠে দেখি, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কর্নেল বললেন, “উঠে পড়ো, ডার্লিং! ছোটপুজো দিতে যেতে হবে। সাড়ে পাঁচটা বাজে। আর শোনো, ব্যাগট্যাগ সব গুছিয়ে নাও। আমরা সম্ভবত আর নার্সারিতে ফিরছি না।”

পাঁচ

বাইরে গাঢ় কুয়াশা জমে আছে। সদর গেট দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটা পোড়ো জমি পেরিয়ে গঙ্গার ধারে নিচু বাঁধে উঠলুম। তারপর গতরাতে বাইরের সেই সন্দেহজনক শব্দটার কথা বললুম কর্নেলকে। কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, “চোরের ওপর বাটপাড়ি হয়ে গেছে বলা চলে। তবে এ চোর অন্য চোর।”

“হেঁয়ালি করার অভ্যাস আপনার গেল না!”

“পুবের বারান্দার সেই অকালকুষ্মাণ্ড টবসমেত উধাও।”

“বলেন কী!”

“জানতুম, টবটা এ-রাতেই উধাও হতে পারে। তাই ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে ওদিকে বেরিয়েছিলুম। দেখলুম, টবটা নেই। যাই হোক, এখন পুজো দিতে যাচ্ছি। আর ও-সব মন্দ কথা নয়। মনকে পবিত্র রাখা উচিত, ডার্লিং!”

হালদারমশাইকে যেখানে বসে থাকতে দেখেছিলুম, তার একটু তফাতে শ্মশানবট। কর্নেলকে জায়গাটা দেখিয়ে দিলুম। কিন্তু উনি গ্রাহ্য করলেন না। বটতলায় গিয়ে দেখি, অজস্র ঝুরি আর শেকড়বাকড়ে ঢাকা মাটিতে পাথরের টুকরো পড়ে আছে। কোনো পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সম্ভবত। বিশুর কিডন্যাপাররা এই বটগাছের গোড়ায় যে চৌকো পাথরে ‘ত্র্যম্বক’ রেখে আসতে

বলেছে, কর্নেল সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পাথরটা বেশ লম্বা-চওড়া। কতকটা বেদির মতো দেখতে। নীচে প্রচুর ছাই পড়ে আছে। সাধুসন্ন্যাসীরা এসে খুনি জ্বেলে বসে থাকেন মনে হল।

চারদিকে কুয়াশা। বটতলায় আবছা আঁধার জমে আছে তখনও। পাথরটা দেখে কর্নেল পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ বটগাছটার আড়াল থেকে দুটো লোক বাঘের মতো কর্নেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি মাত্র হাত তিনেক পিছনে ছিলুম। ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। কর্নেল টাল সামলে নিয়ে কী একটা করলেন কে জানে। মাত্রা দু'-তিন সেকেন্ডের ঘটনা। লোক দুটো দু'ধারে ছিটকে পড়ে ককিয়ে উঠল। কর্নেল ডান দিকের লোকটার পিঠে একটা পা চাপিয়ে দিলেন। এবার আমার হুঁশবুদ্ধি ফিরল। বাঁ দিকের লোকটার ওপর লাফ দিতে গেলুম। সে আমাকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে নিমেষে উধাও হয়ে গেল। ভাগ্যিস, পাথর বা শেকড়ের ওপর পড়িনি। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, কর্নেলের হাতে রিভলভার। লোকটার পিঠে পায়ের চাপ দিতেই সে আবার ককিয়ে উঠল। কর্নেল ঝুঁকে তার জামার কলার ধরে টেনে দাঁড় করালেন।

আন্দাজ বছর পঁচিশেক বয়সের এক যুবক। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। পরনে যেমন-তেমন একটা প্যান্ট আর নোংরা শার্ট। মাথার চুল খুঁটিয়ে ছাঁটা। গলায় একটা তক্তি। খালি পা। কারণ চপ্পল দুটো ছিটকে পড়েছে।

কর্নেল তার কানের পাশে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বললেন, "নাম কী?"

সে হাত দুটো জোড় করে বলল, "আর কখনও এমন করব না স্যার। এবারকার মতো ছেড়ে দিন।"

"নাম কী?"

"ভু-ভু-ভু..."

"ভুতো?"

"হ্যাঁ স্যার। দয়া করে ছেড়ে দিন স্যার। আর কখনও এমন হবে না। নাক-কান মলছি স্যার!"

কর্নেল তাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চললেন। সে কাকুতি-মিনতি করতে থাকল। শিবমন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। কর্নেল বললেন, "ছোটপুজোর বদলে বড়পুজোই দেওয়া যাবে, জয়ন্ত! কী বলো? বাবা মহাদেবের সামনে একে বলি দেব। কেতো এ-সব কাজে নাকি খুব পাকা। ঠাকুরমশাই বলছিলেন, শোনোনি?"

ভুতো হেঁড়ে গলায় কেঁদে উঠল। "ওরে বাবা! কেতো আমাকে পেলে সত্যি বলিদান দেবে। স্যার! স্যার! আপনার পায়ে পড়ি স্যার!"

স্যার তাকে পায়ে পড়ার সুযোগ দিলেন না। মন্দিরের সেই ফটক দিয়ে আমরা চত্বরে ঢুকলুম। ঢুকেই দেখি, পাঁচুঠাকুর তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে পলক নেই। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, "এ ব্যাটাকে কোথায় পেলেন আপনারা?"

কর্নেল বললেন, "বড়পুজোই দেওয়া যাক তা হলে। কী বলেন ঠাকুরমশাই?"

পাঁচুঠাকুর আকর্ণ হেসে বললেন, "কী রে ভুতো? কেতোকে ডেকে আনি তা হলে?"

ভুতো বেজায় কান্নাকাটি জুড়ে দিল। কর্নেল বললেন, "কেতোকে খুব ভয় পায় মনে হচ্ছে?"

পাঁচুঠাকুর বললেন, "সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কেতো ওকে পেলে এক্ষুনি বলি দেবে।"

"কেন বলুন তো?"

"কেন, তা কেতোই জানে। চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। যাকগে, পুজোর সময় হয়ে এল। যান, গঙ্গায় চান করে আসুন। আপনিও যান মশাই!" বলে পাঁচুঠাকুর আমাকেও চোখের ইশারায় খিড়কির দরজা দেখিয়ে দিলেন।

আঁতকে উঠে বললুম, "চান করতে হবে নাকি?"

"গঙ্গায় চান না করে এলে পুজো দেবেন কী করে? নিয়ম মেনে চলতে হবে না?"

কর্নেল বললেন, "কিন্তু এই ভুতোর কী হবে? এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বটতলায় আমার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর সঙ্গে আর একজন ছিল।"

পাঁচুঠাকুর ভুতোকে বললেন, "সঙ্গে কে ছিল রে? সত্যি করে বল। তা হলে ছাড়া পাবি। নইলে খ্যাচাং করে বলিদান হয়ে যাবি। কেতো তক্কেতক্কে আছে।"

ভুতো নাক ঝেড়ে বলল, "ব্যাঙাদা ছিল।"

পাঁচুঠাকুর চোখ কপালে তুলে বললেন, "ব্যাঙা তোর মতো ছিনতাইবাজ হল কবে থেকে? সে তো লাহাবাবুর নার্সারিতে চাকরি করে। ভালো মাইনেকড়ি পায়।"

ভুতো ফোঁস-ফোঁস করে বলল, "তা জানি না ঠাকুরমশাই! মাইরি, বাবা মহাদেবের দিব্যি। শেষ রাত্তিরে আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে এনেছিল। এই বুড়ো সায়েবের কাছে কী দামি জিনিস আছে, ছিনতাই করতে হবে। ব্যাঙাদা বলল, তুই জাপটে ধরবি। আমি জিনিসটা ছিনতাই করব।"

পাঁচুঠাকুর গুম হয়ে গেলেন এবার। আস্তে বললেন, "ক'টা বাজল। দেখুন তো মশাই?"

কর্নেল বললেন, "ছ'টা।"

"সময় আছে। আমি কেতোকে ডেকে নিয়ে আসি। এর একটা বিহিত করা দরকার। ব্যাটাকে ছাড়বেন না যেন।" বলে পাঁচুঠাকুর হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

ভুতো আবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, "ভুতো! তোমাকে ছেড়ে দেব, যদি একটা কথার সত্যি জবাব দাও।"

ভুতো কান্না থামিয়ে বলল, "বলব স্যার! বাবা মহাদেবের দিব্যি।"

"কেতোর সঙ্গে তোমার কীসের বিবাদ?"

ভুতো ফিসফিস করে বলল, "কেতো লাহাবাবুর নার্সারিতে চুরি করতে যাবে বলেছিল। আমি যেন ওর সঙ্গে থাকি। কিন্তু ব্যাঙাদা আমার মাসতুতো দাদা, স্যার। তাই ভাবলুম, ব্যাঙাদাকে দলে টানতে পারলে ভালো হয়। আমি তো জানতুম না ব্যাঙাদার সঙ্গে কেতোর আদায়-কাঁচকলায় সম্পক্ক। ব্যাঙাদাকে কথাটা বললুম। অমনই ব্যাঙাদা পইপই করে আমাকে বারণ করল। তারপর এক কেলেঙ্কারি। সেদিনই বিকেলে লাহাবাবু আর ম্যানেজারবাবু পুলিশ নিয়ে কেতোর বাড়ি হাজির। বেগতিক দেখে গা-ঢাকা দিলুম। দারোগাবাবু কেতোকে থানায় নিয়ে গিয়ে ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দিলেন। সেই থেকে কেতোর আমার ওপর রাগ।"

"গত রাতে নার্সারিতে চোর ঢুকেছিল জানো তো?"

ভুতো পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, "ব্যাঙাদা বলছিল। এতক্ষণ কেতোকে ধরতে পুলিশ বেরিয়েছে।"

"তা হলে আর কেতোর ভয় করছ কেন?"

"কিছু বলা যায় না স্যার। এবার কেতো কোথাও লুকিয়ে আছে। ঠাকুরমশাই নিশ্চয় জানেন। তাই ওকে ডাকতে গেলেন।" বলে ভুতো কর্নেলের পা ধরার চেষ্টা করল। "আমাকে ছেড়ে দিন স্যার! আর কক্ষনো এমন কাজ করব না।"

কর্নেল তাকে ছেড়ে দিতেই সে খিড়কির দরজা খুলে গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল। পাঁচুঠাকুরও এসে গেলেন তক্ষুনি। মুখটা বেজায় তুম্বো। সঙ্গে কেউ নেই। বললেন, "ব্যাটাটা কই?"

কর্নেল বললেন, "হাত ফসকে পালিয়ে গেল।"

পাঁচুঠাকুর প্রায় ভেংচি কেটে বললেন, "পালিয়ে গেল! আপনার হাতে পিস্তল ছিল। তবু পালিয়ে গেল? খেলনা পিস্তল নাকি?"

"ঠিক ধরেছেন। কিন্তু আপনার কেতো কই?"

"নেই। ওর বউ বলল, গত রাত্তিরে বেরিয়েছে। এখনও বাড়ি ফেরেনি। মরবে হতচ্ছাড়া।"

"আপনার নাতির খবর কী?"

"আছে কোথাও।" পাঁচুঠাকুর তাড়া দিলেন, "যান। চান করে আসুন। পুজোর জোগাড় করি। আর শুনুন, ওই ম্লেচ্ছ বস্ত্র পরে থাকলে তো চলবে না। সঙ্গে ধুতি পট্টবস্ত্রাদি আছে তো?"

"তা তো নেই!"

"ঠিক আছে। কলিতে সবই জলচল। আর দশটা টাকা ধরে দেবেন।"

গতিক বুঝে বললুম, "আচ্ছা ঠাকুরমশাই, কলিতে বিনা স্নানেও কি চলবে না? যদি আর দশটা টাকা ধরে দিই?"

পাঁচুঠাকুর মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে বললেন, "তা হলে অন্তত আচমনটা করে আসুন। হ্যাঁ—হিসেবটা বুঝিয়ে দিই। পুজোর বাকি পাওনা হল গে কুড়ি। বস্ত্রের দশ। চানের বাবদ দশ। একুনে চল্লিশ।"

খিড়কির দরজার নীচেই পুরোনো ঘাট ধাপে-ধাপে নেমে গেছে গঙ্গায়। শ্যাওলা আর ঘাস গজিয়ে আছে। গঙ্গার জলে লাল আভা ছড়িয়ে রয়েছে। ওপারে কুয়াশাঢাকা গাছপালার মাথায় লালচে ছটা। কর্নেল বাইনোকুলারে ওপারটা দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "মাই গুডনেস!"

"কী হল?"

"ওটা দেখছি একটা দহ।"

"তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?"

"আছে। কারণ এই ঠাণ্ডা হিম জলে সাঁতার কেটে এপারে আসছেন,—হুঁ, আমাদের হালদারমশাই-ই বটে। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার মানুষ। তাতে পুলিশে চাকরি করতেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, শেষ মার্চের এই ভোরবেলা ওঁর সাঁতার কাটার ইচ্ছে হল কেন?"

এতক্ষণে দূরে কালো একটি বস্তুর নড়াচড়া দেখতে পেলুম। বাতাস বন্ধ। তাই জল নিস্তরঙ্গ। বললুম, "কী সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী আছে? এর আগেও বহুবার হালদারমশাইকে গঙ্গায় সাঁতার কাটতে দেখেছি। তুমিও নিশ্চয় দেখেছ। কেন? গতবার সেই কাটরার মাঠে তুলারাম দণ্ডীমশাইয়ের ফার্মে কাকতাড়ুয়া রহস্যের কথা ভুলে গেলে?"

আমি কিছু বলার আগেই পিছনে পাঁচুঠাকুরের সাড়া পেলুম। "কী? এখনও আচমন হয়নি?"

কর্নেল বললেন, "সাঁতার কাটা দেখছি ঠাকুরমশাই!"

"অ্যাঁ! সাঁতার কাটা? এদিকটায় অথৈ দহ। কার সাধ্যি সাঁতার কাটে?"

"ওই দেখুন, কালো একটা মুণ্ডু।"

পাঁচুঠাকুর কিছুক্ষণ চেষ্টার পর দেখতে পেয়ে বললেন, "মরবে! এক্কেবারে মারা পড়বে। তা মরুক গে! গঙ্গায় ডুবে ম'লে মোক্ষ। আপনারা আসুন। মাহেন্দ্রযোগ বেশিক্ষণ থাকে না।"

"আপনি পুজোয় বসুন। যাচ্ছি।"

পাঁচুঠাকুর চলে গেলেন। হালদারমশাই কোনাকুনি সাঁতার কেটে আসছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘাটে পৌঁছে গেলেন। উনি ধাপে উঠে বসতে দেখলুম, পরনে প্যান্টশার্ট লেপটে আছে। পায়ে জুতো নেই। মুখ থেকে জল মুছতে থাকলেন। কর্নেল ডাকলেন, "হালদারমশাই!"

"ক্কী?" বলে ঘুরলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। আবার চোখ দুটো মুছে তাকালেন গুলিগুলি চোখে। "ওটা কেডা? জয়ন্তবাবু না?"

বললুম, "আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না হালদারমশাই?"

"লাগলে আর কী করুম! এট্টু রেস্ট লই। জাস্ট আ মিনিট!"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, তোমার ব্যাগে কাপড়চোপড় আছে। বের করো। আগে তোয়ালেটা!"

হালদারমশাই উঠে এলেন ধাপ বেয়ে। তারপর কোনো কথা না বলে দৌড়ে চললেন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। উনি উধাও হয়ে গেলে বললুম, "ওঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার তুলে ওঁর গতিবিধি দেখতে থাকলেন। একটু পরে বললেন, "অসাধারণ! এই না হলে ডিটেকটিভ? জয়ন্ত, হালদারমশাই শ্মশানবটে প্রকৃত টিকটিকির মতোই উঠে যাচ্ছেন। আই সি! ওঁর কিটব্যাগটা লুকনো ছিল দেখছি।"

পাঁচুঠাকুর এলেন আবার। "বিনি যজমানেই পুজো হয়ে গেল। কই, চল্লিশ টাকা দিন।"

কর্নেল বললেন, "চলুন, দিচ্ছি। আমাদের এক বন্ধু আসছেন। একটু অপেক্ষা করুন।"

পাঁচুঠাকুর বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে হালদারমশাই আর-এক প্রস্থ প্যান্টশার্ট পরে কাঁধে কিটব্যাগ ঝুলিয়ে এসে পড়লেন। বাঁ হাতে ভিজে নিংড়ানো কাপড়চোপড়। পায়ে রবারের স্যান্ডেল। মুখে প্রসন্ন হাসি। বললেন, "কর্নেল স্যারের সঙ্গে কনট্যাক্ট করার সুযোগ পাইনি রাত্তিরে। ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলুম। নৌকোয় করে ওই চরে নিয়ে গিয়ে তারপর লোকটা 'আসছি' বলে নিপাত্তা। রাত্তিরে গঙ্গায় সাঁতার কাটার সাহস হল না। তাই দিনের আলো ফুটলে—আরে! ভদ্রলোক গেলেন কোথায়? উনিই তো আমাকে...খাইছে!"

ঘুরে দেখি, পাঁচুঠাকুর নেই। মন্দির চত্বরে ঢুকেও ওঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

ছয়

হালদারমশাই বিড়বিড় করছিলেন, "কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!"

কর্নেলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই : এখানে এসে মক্কেলের নির্দেশমতো হালদারমশাই পাঁচুঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কারণ পাঁচুঠাকুরই দুটো বেনামী চিঠি পেয়ে সেই মক্কেল ভদ্রলোককে অনুরোধ করেছিলেন, নাতিকে যেন উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। হালদারমশাইকে পাঁচুঠাকুর বলেন, তাঁর ধারণা গঙ্গার ওই চরে তাঁর নাতিকে আটকে রেখেছে কারা। সন্ধের মুখে নৌকোয় সেখানে পৌঁছে দেবেন হালদারমশাইকে। তবে চুপিচুপি যেতে হবে। হালদারমশাই শ্মশানবটের ওদিকে অপেক্ষা করবেন। পাঁচুঠাকুর নৌকো ভাড়া করে আনবেন। কথামতো নৌকো এল। পাঁচুঠাকুরও এলেন। তারপর নৌকো চরে পৌঁছলে পাঁচুঠাকুর মাঝিদের অপেক্ষা করতে বলে হালদারমশাইকে নিয়ে চরের জঙ্গলে ঢোকেন। একখানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে 'আসছি' বলে পাঁচুঠাকুর চলে যান। তারপর আর তাঁর পাত্তা নেই। নৌকোর খোঁজে এসে দ্যাখেন, নৌকোও নেই। কিটব্যাগটা কী ভেবে সঙ্গে নিয়ে যাননি। বটগাছের গুঁড়ির ওপর লুকিয়ে রেখেছিলেন। শুধু টর্চ আর রিভলভার সম্বল। সারারাত চরের জঙ্গলে কী কষ্টে যে কাটান, বলার নয়। ভোরবেলা রিভলভার আর টর্চটা নরম বালিতে পুঁতে রেখে 'জয় মা' বলে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। এখন আবার নৌকো ভাড়া করে ওই জিনিস দুটো আনতে যেতে হবে। কিন্তু কথা হল, পাঁচুঠাকুর কেন এমন অদ্ভুত ব্যবহার করলেন, গোয়েন্দা ভদ্রলোক বুঝতে পারছেন না।

হালদারমশাই কথা শেষ করে পা বাড়ালেন। "মক্কেলকে গিয়ে বলি। একটা নৌকোর ব্যবস্থা করতে হবে।"

"এক মিনিট হালদারমশাই!" কর্নেল বললেন, "আপনার নোটবই!"

"হঃ!" বলে ঘুরে হাত বাড়ালেন ডিটেকটিভ।

কর্নেল তাঁর পিঠে আটকানো ব্যাগ থেকে নোটবইটা বের করে দিয়ে বললেন, "আমার একটা ভুল হয়েছিল। স্বীকার করা উচিত। নোটবইয়ে রায়সাহেবের নাম ঠিকানা টোকা দেখেই আমি ভলটা করেছি। এখন বুঝতে পারছি, আপনার মক্কেল রায়গড়ের সাধুচরণ লাহা।"

"হঃ!" বলে হালদারমশাই হন্তদন্ত চলে গেলেন।

আমি এবার হালদারমশাইয়ের ভঙ্গিতে বললুম, "কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!"

"আশ্চর্য হওয়ার সময় পরে আরও পাবে, ডার্লিং! পাঁচুঠাকুর আর এবেলার মতো ডেরায় ফিরবেন না মনে হচ্ছে। ততক্ষণে ওঁর ঘরটা একটু দেখা দরকার।" বলে কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর থেকে যে জিনিসটা বের করলেন, সেটা সম্ভবত 'মাস্টার-কি' ওই যন্ত্রটি দিয়ে যে-কোনো সাধারণ তালা খোলা যায়।

জানলাগুলো খোলা ছিল। ঘরের ভেতর একটা সেকেলে প্রকাণ্ড খাট। নোংরা বিছানা পাতা আছে। দেওয়াল-আলমারিতে পাঁজিপুঁথি ধর্মশাস্ত্রের বই ঠাসা। তলার তাকে স্কুলের বই, খাতাপত্তর, অনেক ডটপেন। আলমারির কাচ কবে ভেঙেচুরে গেছে। কোনার দিকে একটা কাঠের সিন্দুক। দড়িতে কিছু কাপড়চোপড় ঝুলছে। বিশুর প্যান্টশার্ট দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারাকে কারা কোথায় আটকে রেখেছে। এখনও অবশ্য প্রায় ৪৫ ঘণ্টা সময় আছে হাতে। এই সময়ের মধ্যে ত্র্যম্বক না পেলে কিডন্যাপাররা তাকে...

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ওঃ!"

কর্নেল বিশুর খাতাপত্তর ঘাঁটছিলেন। বললেন, "হুঁ, বড্ড মশা!"

"মশা নয়। বেচারা বিশুর কথা ভাবছি।"

কর্নেল খাতাগুলো রেখে খাটের কাছে গেলেন। বালিশের তলা খুঁজলেন, তারপর গদির তলায় হাত ভরলেন। বললেন, "তুমি একটু বারান্দায় যাও, জয়ন্ত! কাউকে আসতে দেখলে জানাবে।"

বারান্দায় গিয়ে নজর রাখলুম। কেউ কোথাও নেই। সেই পাখির খাঁচাটা তেমনই পড়ে আছে জঞ্জালের গাদায়। একটু পরে কর্নেল বেরিয়ে বললেন, "পাঁচুঠাকুর লোকটি সত্যিই বড় অদ্ভুত। হরির কথা ঠিক। উনি লাহাবাবুকে ত্র্যম্বক বেচেছিলেন। রায়সাহেবের কয়েকটা চিঠি থেকে বোঝা গেল, পূর্বপুরুষের দেবতার ধন হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনে রায়সাহেব পাঁচুঠাকুরের ওপর বেজায় খাপ্পা। তাঁরও সন্দেহ, পাঁচুঠাকুরই ওটা কাউকে বেচে দিয়েছেন। ওটা না পেলে এবার পুলিশকে জানাবেন। বেগতিক দেখে ঠাকুরমশাই অগত্যা একটা চাল চেলেছেন মনে হচ্ছে। জয়ন্ত, এখনই আমাদের লাহাবাবুর কাছে যাওয়া দরকার।"

দরজার তালাটা কোনোরকমে আটকে কর্নেল বারান্দা থেকে নামলেন। ফের বললেন, "কুইক! এখানে থাকা আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না।"

রাস্তায় কিছুক্ষণ হেঁটে একটা সাইকেলরিকশা পাওয়া গেল। লাহাবাবুর বাড়ি রায়গড় বাজার এলাকা ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে। মাইকে সঙ্কীর্তনের ঘটা শুনেই বুঝলুম, লাহাবাবুর বাড়ি এসে গেছি। দোতলা বিরাট বাড়ি। ভেতর দিকে সঙ্কীর্তন চলেছে। গেটেই হালদারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। "আসুন! আসুন!" বলে সম্ভাষণ করে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের। যেন হালদারমশাইয়েরই বাড়ি।

সোফায় ছড়ি হাতে বেঁটে প্রকাণ্ড এক ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। কপালে লাল তিলক। কর্নেলকে দেখে তাঁর মুখে একটু করুণ হাসি ফুটল। বললেন, "এ-সবই

আমার পাপের ফল স্যার! আর বেশি কী বলব? ওই বদমাশ পাঁচুঠাকুরের পেটে এত কুবুদ্ধি তা কি জানতুম?"

একটু চুপ করে থেকে লাহাবাবু বললেন, "আপনার মনে পড়তে পারে। বলেছিলুম, নার্সারিতে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করব। গত শিবচতুর্দশীতে তার ভিত হয়ে গেছে। তারপর ত্র্যম্বক আমার হাতে এল। নার্সারিতে নিয়ে গিয়ে দেবতার ধন যত্ন করে রাখলুম। একটু অসাবধান হয়েছিলুম। দেবতার ধনে কে আর হাত দেবে? ব্যস! রাতারাতি চুরি গেল আলমারি থেকে। অথচ আলমারির তালাও কেউ ভাঙেনি।"

"সে রাতে আপনি নার্সারিতে ছিলেন না?"

"না। যাই হোক, রায়রাজাদের সম্পত্তি। গোপনে কিনেছিলুম। গোপনে শিবমন্দিরেই রাখতুম। চুরি গেলে তাই তা নিয়ে হইচই করিনি। হঠাৎ ওই রাতবিরেতে ভৌতিক উপদ্রব। লোকে বলত। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। সে রাতে আমার ঘরের জানলার বাইরে—দোতলায়, বুঝলেন? একেবারে মেয়েলি গলায় বলছে, লা..."

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন, "বলছে, লাহাবাবু আমি বিশুর দিদিমা!"

লাহাবাবু নড়ে বসলেন। "ঠিক, ঠিক। সবাই শুনছে লাফাং চু দ্রিদিম্বা। কিন্তু আমি শোনামাত্র বুঝতে পারলুম কে কী বলছে।" লাহাবাবু চোখ বুজে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করে করজোড়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

হালদারমশাই 'খাইছে' বলে একটিপ নস্যি গুঁজলেন নাকে।

কর্নেল বললেন, "তারপর কী হল বলুন?"

লাহাবাবু বললেন, "তার পরদিন পাঁচুঠাকুর এসে হাজির। ওর হাতে দুটো বেনামী চিঠি। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, ত্র্যম্বকের টাকা শোধ দেবে কিস্তিতে। ওর নাতিকে বাঁচাতে হবে। বিপদে পড়ে গেলুম। ত্র্যম্বক তো চুরি গেছে। সম্প্রতি কাগজে এই ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম। কাটিং রাখা ছিল। চুরি যাওয়া ত্র্যম্বক উদ্ধার করার কথা ভেবেই ওটা রেখেছিলুম। এবার ভাবলুম, ত্র্যম্বক এবং বিশু উভয়কেই ভালোয়-ভালোয় উদ্ধার করা যায় কি না। তাই চুপিচুপি গত পরশু কলকাতা চলে গেলুম। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য নাম-ঠিকানা কাউকে জানাতে নিষেধ করলুম। কিন্তু তখনও কি জানি, আপনিও একজন আরও পাকা ডিটেকটিভ? এইমাত্র হালদারবাবু সব বললেন।"

হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন, "আপনারা কথা বলুন। আমি দেখি, নৌকো পাই নাকি।"

কর্নেল বললেন, "সেই চিঠি দুটো কি আপনি হালদারমশাইকে দিয়েছেন?"

হালদারমশাই বললেন, "না কর্নেল সাব! আমি শুধু শেষ চিঠিটার কপি রেখেছি। আচ্ছা চলি! উইপন হাতে না থাকলে কাজে নামা রিস্কি।"

উনি বেরিয়ে গেলে লাহাবাবু পাঞ্জাবির তলায় ফতুয়ার ভেতরকার পকেট থেকে দু'টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল চিঠি দুটো খুলে পড়ার পর বললেন, "হুঁ, শ্রীমান বিশুর খাতা থেকে ছেঁড়া কাগজ। আর হাতের লেখাটাও শ্রীমান বিশুর।"

লাহাবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, "অ্যাঁ! তা হলে দাদু-নাতি মিলে আমার কাছ থেকে ত্র্যম্বক আদায়ের ফন্দি? ওরে বাবা! ছেলেটাকে সবাই যে বিচ্ছু বলে, ঠিকই বলে দেখছি।"

"বিশু হয়তো দাদামশাইয়ের কথা শুনে মজা পেয়েই এমনটা করেছে। তার দেখা যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ তাকে দোষী করা উচিত হবে না।" কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন ফের, "গত রাতে আপনার ফার্মে চোর পড়েছিল শুনেছেন নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ। বাগ রাত্তিরে এসে সব বলল। পাঁচুঠাকুরের স্যাঙাত ওই কেতোর কাজ। বাগ পুলিশকে জানিয়েছে। এর আগেও কেতো চুরির প্ল্যান করেছিল। ক্যাক্টি বা বিদেশি প্ল্যান্টের খদ্দের প্রচুর। আজকাল সবাই গার্ডেনিংয়ের নেশায় পড়ে গেছে। কম দামে পেলে তো কথাই নেই।"

"ব্যাঙা নামে আপনার নার্সারিতে একটা লোক আছে?"

"চোর। এক নম্বর চোর। বাগের অনুরোধে ওকে তাড়াচ্ছি না।"

"বাগসায়েব সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

লাহাবাবু হাসলেন, "বাগ আমার ছেলের মতো। আমার ছেলেপুলে তো নেই। ও অবশ্য আমাকে সাধুদা বলে ডাকে। রায়সায়েবকে একজন হর্টিকালচার-এক্সপার্ট দেখে দিতে বলেছিলুম। আমার বয়স হয়েছে আর অত ছোটাছুটি করতে পারিনে। তো..." লাহাবাবু জিভ কেটে উঠে দাঁড়ালেন। "আপনাদের খালিমুখে বসিয়ে রেখেছি। একটু বসুন। গোপাল! হারাধন! কই রে সব? কেত্তনে মেতে আছে, বুঝলেন?"

উনি ডাকতে-ডাকতে ছড়ি খুটখুট করে চলে গেলেন ভেতরে। এতক্ষণে বললুম, "বিশুর হাতে লেখা চিঠি! তা হলে বিশু কিডন্যাপড হয়নি। তাই না কর্নেল?"

কর্নেল এ-কথার জবাব না দিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, "মাথার মণি হারিয়ে সাপটা এখন পাগল হয়ে উঠেছে। দেখলেই ছোবল দেবে। শুধু বোঝা যাচ্ছে না, কেতো কেমন করে জানল ত্র্যম্বক কোথায় লুকনো আছে? ব্যাঙা তার শত্রু। অতএব নার্সারিতে অন্য কেউ আছে, যে কি না কেতোকে খবরটা পাচার করেছে। এটা ঠিক, সে জানত না জিনিসটা ঠিক কোনখানে কীভাবে লুকনো আছে। শুধু জানত, কোনো একটা ক্যাক্টির মধ্যেই আছে। হয়তো মণিচোরকে দৈবাৎ মণিটা লুকনোর ব্যবস্থা করতে দূর থেকে দেখেছিল। সেই ক্যাক্টিটা ছোট্ট থলেয় ঢোকানো যায়। অথচ তীক্ষ্ণ কাঁটার জন্য চটের পুরু থলে চাই।"

অবাক হয়ে বললুম, "অ্যাঁ?"

কর্নেল দাড়ি নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ!"

"তার মানে সেই অকালকুষ্মাণ্ডটা? সেটা তো আপনি..."

"চুপ। চুপ। দেওয়ালের কান আছে।"

উত্তেজনা চেপে বললুম, "ওক্কে বস।"

লাহাবাবুকে আশ্বাস দিয়ে কর্নেল বেরোলেন। তখন প্রায় ন'টা বেজে গেছে। কর্নেল একটা সাইকেলরিকশা ডাকলেন। বললেন, "রায়রাজাদের শিবমন্দির দর্শনে যাব।"

রিকশায় যেতে-যেতে বললুম, "আবার ওখানে কেন?"

"শ্রীমান বিশুকে খুঁজে বের করা দরকার।"

শিবমন্দির এলাকা এখনও তেমনই নিরিবিলি সুনসান। সাইকেলরিকশাটা চলে যাওয়ার পর কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে আস্তে বললেন, "পাঁচিলের এপাশে গুঁড়ি মেরে এগোতে হবে। সাবধান।"

কথা না বাড়িয়ে ওঁকে অনুসরণ করলুম। একতলা বাড়ির দিকটায় পাঁচিলে একটা প্রকাণ্ড ফোকর দেখা গেল। সেখানে গিয়ে কর্নেল উঁকি দিলেন। আমিও উঁকি দিলুম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পাঁচুঠাকুর এদিক-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। হাতে একটা ছোট্ট রেকাবি। পুজোর নৈবেদ্য ছাড়া আর কী হতে পারে?

কর্নেল ফোকর দিয়ে ঢুকলেন। আমিও ঢুকলুম। তারপর পা টিপেটিপে হেঁটে মন্দিরের পেছনে চলে গেলুম দু'জনে। চত্বর থেকে মন্দিরের মেঝে প্রায় ফুট পাঁচেক উঁচু। এদিকে একটা ছোট্ট

ঘুলঘুলি। লোহার গরাদ আছে। কর্নেল উঁকি মেরে কিছু দেখার পর চোখের ইশারায় আমাকেও দেখতে বললেন। কর্নেলের মুখে মিটিমিটি হাসি। ঘুলঘুলিতে চোখ রাখতেই দেখলুম, অন্যদিকের ঘুলঘুলি থেকে রোদ ঢুকেছে এবং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পাতালঘরের মেঝেয় একটা যেমন-তেমন বিছানা পাতা। সেই বিছানায় বসে পাঁচুঠাকুর একটা বছর দশ-বারো বয়সের ছেলেকে আদর করে খাওয়াচ্ছেন। দু'জনের চাপাস্বরে কথাবার্তাও কানে এল।

"আর আজকের দিনটা একটু কষ্ট করে থাক। কাল ভোরবেলা দু'জনে তোর মাসির বাড়ি চলে যাব। দেখি না ত্র্যম্বক দেয় নাকি লাহাবাবু?"

"এখানে আমার আর থাকতে ইচ্ছে করছে না দাদামশাই! বড্ড ভয় করছে।"

"আঃ! কাঁদে না। আমি তো রাত্তিরে তোর কাছে থাকি। না কি? ভয় কীসের?"

"ত্র্যম্বক লাহাবাবু যদি না দেয়?"

"না দিলে রায়সায়েব আমাকে খুন করে ফেলতেন। ওই কেতো হারামজাদাটা কী লাগিয়ে এসেছে ওঁর কানে। না হলে উনিই বা কেমন করে জানবেন?"

"তুমি আমার পাখি উড়িয়ে দিলে কেন বলো?"

"সাধে কি তোকে বোকা বলি? তুই খেয়ে নে। আমি একবার শ্মশানতলা দেখে আসি, ত্র্যম্বক রেখে গেছে নাকি।"

কর্নেল আমাকে টেনে সরিয়ে আনলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "কুইক! চলে এসো।"

দু'জনে সাবধানে সেই ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। হাঁটতে-হাঁটতে শ্মশানবটের কাছে পৌঁছে কর্নেল বললেন, "তুমি ওই ঝোপের আড়ালে চলে যাও।"

ঝোপের আড়াল থেকে দেখলুম, কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা কালো কাগজে মোড়া ছোট্ট কী একটা জিনিস গুঁড়ির নীচে সেই চৌকো পাথরটার ওপর রাখলেন। তারপর চলে এলেন আমার কাছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পাঁচুঠাকুর আসছেন। চঞ্চল চাউনি। পা টিপেটিপে এসে থমকে দাঁড়ালেন। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "জয় বাবা! জয় বাবা!" বলে করজোড়ে চৌকো পাথরটার সামনে এসে ভূমিষ্ঠ হলেন। দেখলুম, দু'চোখে জল গড়াচ্ছে।

কিন্তু যেই দু'হাতে কাগজে মোড়া জিনিসটা উনি তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়েছেন, গুঁড়ির আড়াল থেকে বাগসায়েব বেরিয়ে এলেন। "অ্যাই বিচ্ছু! দে ওটা। নইলে গুলিতে খুলি ছ্যাঁদা করে দেব।"

বাগসায়েবের হাতে রিভলভার। পাঁচুঠাকুর ককিয়ে উঠে মোড়কটা ওঁর হাতে দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় বটগাছের ডাল থেকে কে বাগসায়েবের কাঁধে পড়ল। বাগসায়েবের রিভলভার থেকে গুলি বেরিয়ে গেল। পাখিরা চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল। দু'জনে ধস্তাধস্তি চলেছে, পাঁচুঠাকুর সেই সুযোগে কেটে পড়ার তালে ছিলেন। হঠাৎ এক স্যুটপরা স্মার্ট চেহারার ভদ্রলোককে মন্দিরের দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। পাঁচুঠাকুর তাঁকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, "রায়সায়েব! রায়সায়েব! এই নিন আপনাদের ত্র্যম্বক!"

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাল্লো রায়সায়েব!"

রায়সায়েব হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন। এতক্ষণে বাগসায়েবের কাঁধে ঝাঁপিয়ে-পড়া লোকটাকে চিনতে পারলুম। আমাদের হালদারমশাই বাগসায়েবের পিঠে চেপে বসে আছেন। বললেন, "ঘুঘু দ্যাখছে, ফাঁদ দ্যাখে নাই!"

কর্নেল বললেন, "ঘুঘু নয় হালদারমশাই! টিয়ে! ওই শুনুন!"

গাছের উঁচু ডালপালার ভেতর থেকে শোনা গেল, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা!"

হালদারমশাই ভড়কে গেলেন। অমনই তাঁকে উলটে দিয়ে ধরাশায়ী করে অরিন্দম বাগ ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। হালদারমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "পাকড়ো! পাকড়ো!"

কর্নেল বললেন, "ছেড়ে দিন। বাগসায়েবের চাইতে লাফাং চু দ্রিদিম্বা-বলা পাখিটাকে ধরার চেষ্টা করুন।"

পাঁচুঠাকুর আকর্ণ হেসে বললেন, "আমার নাতি ওই বুলি শিখিয়েছিল স্যার। লাহাবাবুকে ভয় দেখিয়ে ত্র্যম্বক আদায় করতে চেয়েছিল। তবে দোষটা আমারই।"

কর্নেল বললেন, "এখন আপনি নাতিকে মন্দিরের পাতালঘর থেকে বের করে আনুন। বেচারা বড় মুষড়ে পড়েছে।"

রায়সায়েব বললেন, "এটা আমার পূর্বপুরুষের ধন, কর্নেল! একে বলে ক্যাটস আই। বৈদূর্যমণি। কেতোকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। দেখি, ওকে বাঁচানো যায় কি না।"

পাঁচুঠাকুর দৌড়ে মন্দিরের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বিশুকে বের করে আনলেন পাতালঘর থেকে। বিশু বেরিয়ে এসে শিস দিতেই টিয়াপাখিটা ওর কাঁধে এসে বসল। বিশু খিকখিক করে হেসে বলল, "লাহাবাবু খুব ভয় পেয়েছিল। ওকে ভয় দেখাতেই পাখিটাকে শিখিয়েছিলুম, 'লাহাবাবু, আমি বিশুর দিদিমা!' লোকে ভাবত লাফাং চু দ্রিদিম্বা।"...

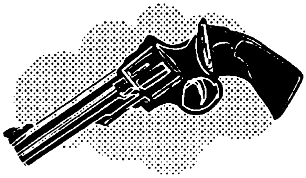

বলে গেছেন রাম শন্না

সেদিন কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘর-সদৃশ ড্রয়িংরুমে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেলুম। বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বেজায় গম্ভীরমুখে কোনার দিকে বসে আছেন এবং ভুরু কুঁচকে জানালার বাইরে কার উদ্দেশে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। ওঁর ঋষিতুল্য সাদা দাড়িতে একটা কালো চকরাবকরা প্রজাপতি নিশ্চুপ বসে আছে, নিশ্চয় ওঁর সংগ্রহশালার কোনো দুর্লভ প্রজাতি। কিন্তু কর্নেলের এ-ব্যাপারে কোনো দৃকপাত নেই।

ওই জানালার বাইরে এক বিশাল নিমগাছ। সেখানে ঝাঁকে-ঝাঁকে শীতের কুচকুচে কালো কাক তুমুল চ্যাঁচামেচি করছে। সেটাই কি আমার বৃদ্ধ বন্ধুর বিরক্তির কারণ? উনি কি ওদের শাপমন্যি করছেন? করারই কথা। ওই কদাকার পাখিগুলো ছাদের যত্নলালিত প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডের দুষ্প্রাপ্য অর্কিড এবং ক্যাকটাসের ওপর প্রায়ই হামলা করে।

'গুড মর্নিং' সম্ভাষণের জবাব না পেয়ে একটু ইতস্তত করার পর সোফায় বসে পড়লুম। একটু পরে ষষ্ঠীচরণ নিঃশব্দে কফির পেয়ালা রেখে গেল। তার মুখখানাও বেশ তুম্বো। অনুমান করলুম —তাহলে নির্ঘাত এই সুন্দর শীতের সকালে প্রভু-ভৃত্যে কোনো মনকষাকষি হয়ে থাকবে এবং প্রভু-ভদ্রলোক পেয়ারের ভৃত্যের উদ্দেশেই গোপনে শাপান্ত করছেন।

কিন্তু কী করে থাকতে পারে ষষ্ঠীচরণ? কোনো প্রজাপতির ঠ্যাং ভেঙে ফেলেছে? নাকি টোরা দ্বীপ থেকে সংগৃহীত তিনপেয়ে অলুক্ষুণে বাদুড়টির খাঁচা খুলে দিয়েছে? যতদূর জানি, ষষ্ঠী ওই কিম্ভূত স্তন্যপায়ী উড়ুক্কু জন্তুটিকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না।

কফিতে চুমুক দিয়ে আড়চোখে দেখলুম কর্নেল এবার টেবিলের দিকে ঝুঁকে কী যেন লিখছেন। মিনিট দুই পরে উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং পায়চারির ভঙ্গিতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তখন বললুম,—ষষ্ঠীচরণটা বড্ড বাজে।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু গলার ভেতর বললেন,—ষষ্ঠীর চেয়ে বাজে লোক জগমোহন বোস।

—জগমোহন আবার কে?

কর্নেল একটা ভারী শ্বাস ছেড়ে বললেন,—আসলে লোকটা প্রচণ্ড অর্থপিশাচ। দেখো জয়ন্ত, টাকার চেয়ে দামি জিনিস হল মুখের কথা। কথা দিয়ে যে কথা রাখে না তার মতো পাপী আর কে?

—ঠিক, ঠিক। কিন্তু কী কথা দিয়ে কথা রাখেনি আপনার এই জগমোহন?

দুঃখিত স্বরে কর্নেল বললেন,—আগেও লোকটা ঠিক এরকম করেছিল। এম্মানুয়েল দ্য সামসার লেখা 'দা ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা অফ ক্রিসো আইল্যান্ডস' বইটার দরদাম ঠিক করে এলুম। পরদিন আনতে গিয়ে শুনি, বেশি দাম পেয়ে কাকে বেচে দিয়েছে। ১৭৮৪ সালের বই। অতি দুষ্প্রাপ্য। আমার ক্ষোভের কারণ শুধু তাই নয়, জগমোহন দাঁত বের করে হাসছিল। ভাবতে পারো?

সহানুভূতি দেখিয়ে বললুম,—ভীষণ অন্যায়।

ফোঁস করে ফের শ্বাস ছেড়ে কর্নেল বললেন,—তুমি কি এই প্রবাদ শুনেছ ডার্লিং? যত হাসি তত কান্না—বলে গেছেন রাম শন্না।

—শুনেছি। সত্যি তো হাসি ভালো নয়। জগমোহন কেঁদে কূল পাবে না পরে।

কর্নেল বললেন,—রাম শন্না অর্থাৎ রামশংকর শর্মা ১৮৫৯ সালে 'আত্মচরিত' নামে নিজের জীবনী লেখেন। খুব রোমাঞ্চকর তাঁর জীবন। কম বয়সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে সি-বয়ের চাকরিতে ঢোকেন। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। বৃদ্ধ বয়সে নদীয়ার গ্রামে ফিরে পৈতৃক ভিটেতে প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরি করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়। রামশংকর গোপনে বিদ্রোহীদের অর্থসাহায্য করতেন। তার ফলে ইংরেজ শাসকদের কোপে পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসিসেলে থাকার সময় তিনি ওই আত্মচরিতখানি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সরকারের অনুমতি নিয়ে তাঁর ভাই শ্যামশংকর বইটি ছেপে বের করেন। বইটি সত্যি মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। জগমোহনকে কিছুদিন যাবত তাগিদ দিচ্ছিলুম, বইটি যদি জোগাড় করতে পারে।

বাধা দিয়ে বললুম,—জগমোহনের কি বইয়ের দোকান আছে?

—হুঁ। কলেজ স্ট্রিটে গেলে দেখতে পাবে, সাইনবোর্ডে লেখা আছে : 'হারানো বই'। ঘুপচি ঘরের ভেতর আগাপাশতলা পুরোনো বইতে ঠাসা। দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। ফুটপাথ থেকে কথা বলতে হবে। তবে জগমোহনকে তুমি পুরোপুরি দেখতে পাবে না। বইয়ের গাদার ফাঁকে ওর নাকটুকু ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না। শরীরের বাকি অংশ দেখতে হলে তোমাকে টাকা বের করতে হবে। তখন দেখবে বইয়ের সুড়ঙ্গ থেকে ফ্যাকাশে একটা হাতের তালু বেরিয়ে আসছে।

কর্নেল করুণ হাসলেন। ফের বললেন,—গতকাল সন্ধ্যায় সে ফোনে বলল : শিগগির চলে আসুন। বইটা পাওয়া গেছে। কিন্তু এদিকে হতচ্ছাড়া ষষ্ঠী এমন কীর্তি করে বসে আছে যে তখন আমার মরবারও ফুরসত নেই। পাগল হয়ে খুঁজছি।

—কী?

—বৈজ্ঞানিক নাম হল ভ্যানেসা আর্টিসি। বাংলায় বলতে পারো কাছিম-প্রজাপতি। কারণ দূর থেকে দেখলে মনে হবে লিলিপুট কাছিম। উড়লেই কিন্তু ঝলমলে পরী। আমার বিশ্বাস, নচ্ছার ষষ্ঠী ওটাকে ওড়াতে চেয়েছিল। অমনি হাত ফসকে পালিয়েছে। ওঃ জয়ন্ত! কী কষ্ট করে না ওটা জোগাড় করে এনেছিলুম। তুমি জানো, এই শীতে ওদের ঘুমোবার সময়! বেচারাকে ঘুম থেকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে ব্যাটাচ্ছেলে ষষ্ঠীচরণ...

ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—রাম শন্নার বইটা আর পাবেন কি না জানি না, তবে আপনার প্রজাপতিটা আপনি পাবেন—যদি স্থির হয়ে একটু দাঁড়ান।

ওঁকে ভীষণ চমকে দিয়ে ওঁর দাড়ি থেকে খপ করে প্রজাপতিটা ধরে ফেললুম। কর্নেল বিস্ময় ও আনন্দে এক চিক্কুর ছেড়ে আমার হাত থেকে প্রিয় প্রজাপতিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে দৌড়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—ডার্লিং! এবেলা তোমার লাঞ্চে নেমন্তন্ন।

কিছুক্ষণ বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ যেন শিশু হয়ে গেলেন। ষষ্ঠীচরণকে ক্ষমা করে দিলেন। মুখ টিপে হেসে সে ঝটপট ফের দুপেয়ালা কফি এবং প্লেটভর্তি স্ন্যাক্স রেখে গেল। কফি খেতে-খেতে কর্নেলকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, এত হাসি হয়তো ভালো না। কারণ রাম শন্না বলে গেছেন, যত হাসি তত কান্না।

কর্নেল বললেন : হ্যাঁ—জগমোহনের আচরণে সত্যি দুঃখ পেয়েছি, জয়ন্ত। কাল রাত নটায় দোকান বন্ধ করার সময় ফোন করে বলেছে, আমি যাইনি বলে অন্য এক খদ্দেরকে বইটা বেচে দিয়েছে। দেখো ওর কাণ্ড। সন্ধ্যা সাতটায় বইটা পেয়েছে বলে খবর দিল। তার দু'ঘণ্টা পরে জানাল, অন্য একজনকে বেচে দিয়েছে। আবার সেই সঙ্গে ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসি।

—কী আছে বইটাতে যে, এত আফসোস হচ্ছে আপনার?

কর্নেল হঠাৎ কোনার সেই টেবিলটার দিকে উঠে গেলেন। তারপর একটুকরো কাগজ হাতে নিয়ে ফিরলেন। কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটুখানি বিড়বিড় করার পর বললেন,—আচ্ছা জয়ন্ত, এমন পাঁচটা পাখির নাম করো তো, যা ক অক্ষর দিয়ে শুরু।

ভেবে নিয়ে বললুম,—কাক, কোকিল, কাঠঠোকরা, কাকাতুয়া, কাদাখোঁচা...

—খাসা জয়ন্ত, খাসা! দিশি মতে ক অক্ষর খুব পয়মন্ত। ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর। হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণের নাম এই অক্ষর দিয়ে শুরু। ভক্ত প্রহ্লাদের গল্পে আছে, পাঠশালায় বালক প্রহ্লাদ ক পড়তে গিয়ে কেঁদে ফেলত। তো জয়ন্ত, তুমি যে পঞ্চপাখির নাম বললে,—প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপিতে তারা ছিল পাঁচটি পবিত্র শব্দের প্রতীক। স্যাটর, আরেপো, টেনেট, অপেরা, রোটাস। মিশরে রোমানদের রাজত্বকালে এই শব্দগুলো দিয়ে এক আশ্চর্য ধাঁধা বানানো হয়েছিল। এই দেখো।

তাহলে তখন আমার বিজ্ঞ বন্ধু কাগজে এই ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কাগজটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। তাতে লেখা আছে :

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

চুপ করে আছি দেখে কর্নেল বললেন,—কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে না?

—হ্যাঁ। যেদিক থেকে যে অক্ষর ধরে পড়ি, পাঁচটা একই শব্দ পাচ্ছি। মিশরীয়রা মাথা খাটিয়ে অদ্ভুত সাজিয়েছে তো!

—শুধু তাই নয়। ছকটা চারদিকে SATOR শব্দ দিয়ে ঘেরা। রোমানরা একে বলত Cirencester Word Square এবং এ নাকি এক রহস্যময় শব্দবর্গ। সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে প্যাপিরাসে মিশরীয় চিত্রলিপিতে এই শব্দবর্গ লেখা হয়। উনিশ শতকে এটি উদ্ধার করা হয়। হিড়িক পড়ে যায় এই ধাঁধার জট ছাড়াতে। আপাতদৃষ্টে রোমান ভাষায় শব্দগুলো পর পর রেখে মানে করলে দাঁড়ায় : The Sower Arepo holds the wheels carefully. অর্থাৎ সোজা কথায় : 'আরেপো নামে একটা লোক শস্যের বীজ ছড়ানোর সময় বীজ ছড়ানো যন্ত্রের চাকাগুলো সাবধানে ধরে থাকে।' কিন্তু এ কথায় কী বলতে চাওয়া হয়েছে? নানা জনে নানা মানে বের করলেন। তারপর ১৮৪৭ সালে এক ইংরেজ আবিষ্কার করলেন একটা অদ্ভুত জিনিস। সিন্দুকের ভেতর পাঁচটা চামড়ার মোড়ক। মোড়কের ভেতর একটা করে প্রকাণ্ড পেরেক। আর মোড়কগুলোর গায়ে রোমান হরফে লেখা আছে SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS। প্রতিটি পেরেকে নাকি রক্তের দাগ এবং রোমান ভাষায় কিছু খোদাই করা বাক্য। ইউরোপে আরও হইচই পড়ে গেল। পণ্ডিতরা একবাক্যে রায় দিলেন, তাহলে এই হচ্ছে সেই পাঁচটা পেরেক, যা বিঁধিয়ে যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ভ্যাটিকানে যিশুর পবিত্র রক্তমাখা পেরেকগুলো রাখার আয়োজন হল। বিশেষ জাহাজ গেল সেই উদ্দেশে। কিন্তু ফেরার পথে ভূমধ্যসাগরে জাহাজটা ডুবে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগে। ব্যস, সেখানেই এই ঘটনার শেষ।

বললুম,—তাহলে বোঝা যাচ্ছে শব্দগুলো পাঁচটা পেরেকের নাম। কিন্তু এতকাল পরে ওগুলো আপনার মগজে বিঁধিয়ে দিল কে?

—রামশংকর শর্মা ওরফে রাম শন্না।

—সে কী!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—গতকাল ভৈরবগড় রাজবাড়িতে ওঁদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে বইটা দেখি। ২০৪ পৃষ্ঠার বই। খুব জীর্ণ অবস্থা। একরাতেই পড়ে শেষ করি। এক অসাধারণ বাঙালি অ্যাডভেঞ্চারিস্টের আশ্চর্য কীর্তিকলাপ। কিন্তু এক জায়গায় রামশংকর লিখেছেন : ত্রিনিদাদের গ্রামে বাস করার সময় ঝড়জলের রাতে একজন রুগ্ন স্প্যানিশ পাদ্রি তাঁর ঘরে আশ্রয় নেন। শেষরাতে তিনি মারা যান। তাঁর আলখাল্লার মধ্যে চামড়ার একটা মোড়ক ছিল। স্থানীয় গির্জায় পাদ্রির জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার আগে কৌতূহলবশে রামশংকর মোড়কটা খোলেন। তার ভেতর ফুটখানেক লম্বা কালো মোটা একটা লোহার পেরেক ছিল, তার গায়ে রোমান হরফে কীসব লেখা ছিল। পেরেকটাতে একটুও মরচে ধরেনি এবং আশ্চর্য ব্যাপার, তাতে রক্তের দাগ ছিল। চামড়ার মোড়কেও রোমান হরফে লেখা ছিল SATOR; কী ভেবে ওটা রামশংকর ফেরত দেননি। পরে এক বিশপের কাছে কথাটার মানে জিজ্ঞেস করে রহস্যটা টের পান। তাহলে জাহাজডুবির সময় অন্তত একটা পেরেক কেউ বাঁচাতে পেরেছিল—হয়তো সেই রুগ্ন পাদ্রিই।

জিজ্ঞেস করলুম,—রাম শন্না কী করলেন পেরেকটা?

সেটাই প্রশ্ন। আত্মচরিতে কোথাও সেকথা লেখা নেই। এমনকি, পরে ওটার উল্লেখ পর্যন্ত নেই।—কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে বললেন, বইটা রাজাবাহাদুরকে উপহার দিয়েছেন রামশংকরেরই এক বংশধর প্রণবশংকর বাঁড়ুজ্জে। খুব দুষ্প্রাপ্য বই। সঙ্গে মাইক্রোফিল্মের সরঞ্জাম ছিল না। ভাবলুম সময়মতো এসে মাইক্রোফিল্ম কপি করে নেব। তো আমার বরাত। কদিন আগে রাজাবাহাদুর ট্রাংককলে জানালেন, বইটা চুরি গেছে। তাঁর সন্দেহ, রাজবাড়ির আশ্রিত এক ভদ্রলোকের জুয়াড়ি নেশাখোর ছেলে হরিসাধনই একাজ করেছে। কারণ ইতিপূর্বে তাঁর লাইব্রেরি থেকে কিছু দুষ্প্রাপ্য বই চুরি গেছে।

—তাই আপনি কলেজ স্ট্রিটে জগমোহনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন?

—তা তো বটেই! বইটা ফেরত পেলে রাজাবাহাদুর খুশি হতেন, আমারও মাইক্রোফিল্ম কপি হয়ে যেত।

—এবং পেরেক-উদ্ধারে অবতীর্ণ হতেন!

আমার মন্তব্য শুনে গোয়েন্দাপ্রবর একটু হাসলেন। —ব্যাপারটা বোধ করি অত সহজ নয়, ডার্লিং! তবে আত্মচরিতের পরিশিষ্ট অংশটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, কথাগুলোর মধ্যে কী যেন ইঙ্গিত আছে। তো...

ষষ্ঠীচরণ এসে বলল,—এক ভদ্রলোক এয়েছেন! খুব হাঁফাচ্ছেন। চোখ-মুখ লাল হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু ভদ্রলোক অনুমতির অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে আমার পাশে ধপাস করে বসে পড়লেন। ষষ্ঠীচরণ কড়াচোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোকের গড়ন নাদুসনুদুস। পরনে দামি স্যুট। হাতে ব্রিফকেস। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুরু কাঁচাপাকা গোঁফ আর মাথায় অল্প টাক আছে। রুমালে মুখ ঘষে বললেন,—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার! দু'লক্ষ টাকার মাল সাপ্লাইয়ের অর্ডার বাতিল হতে চলেছে! আমায় বাঁচান!

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে লক্ষ করছিলেন ভদ্রলোককে। বললেন,—কে আপনি?

—আজ্ঞে, আমার নাম রামদুলাল সিনহা। আরবমুলুকে ইলেকট্রনিক গুডস রফতানির কারবার আছে। স্যার, পার্ক স্ট্রিটে আমার সিনহা ট্রেডিং কোম্পানির পাশের চেম্বারে আপনি যাতায়াত করেন।...

—হুঁ, ডক্টর বৈদ্য আমার বন্ধু।

—তিনিই পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে আসতে।

—কিন্তু সাপ্লাই অর্ডার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

—না স্যার, না! সেজন্য আসিনি। একখানা বই চুরি গেছে।

ভুরু কুঁচকে তাকালেন গোয়েন্দাপ্রবর। —বই? কী বই?

এক মিনিট স্যার! বলছি। —রামদুলালবাবু ব্রিফকেস খুলে একটুকরো কাগজ বের করলেন। কর্নেলের হাতে দিয়ে বললেন, এই দেখুন বইটার নাম-টাম সব লেখা আছে। কলেজ স্ট্রিটের জগমোহন বোস আমার সম্পর্কে বেয়াই হন। তাঁকে বলে রেখেছিলুম বইটার জন্য। কাল সন্ধ্যাবেলা উনি ফোন করলেন, বইটা পাওয়া গেছে। পাঁচশো টাকার এক পয়সা কমে হবে না। পার্টি দাঁড়িয়ে আছে বই নিয়ে। দু-লাখ টাকার ডিল স্যার! দৌড়ে গেলুম টাকা নিয়ে।

—দাঁড়ান! এই হাতের লেখা কার?

—যাঁকে প্রেজেন্ট করতুম, তাঁর স্যার। ওনার মাধ্যমেই তো অর্ডারটা পেয়েছি স্যার!

—ইংরেজিতে লেখা কেন?

—উনি যে বাংলা জানেন না স্যার!

—কী নাম?

—এক রোডরিগ। গোয়ার লোক স্যার! থাকেন বোম্বেতে।

—উনি বাংলা বই কী করবেন?

রামদুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—তা তো জানি না স্যার! ক'দিন আগে বোম্বে গেলুম, তখন এই কাগজে লিখে দিয়ে বললেন, বইটা জোগাড় করে দিলে দু'লাখ টাকার অর্ডার পাইয়ে দেবেন।

—বেশ। এবার বলুন—বইটা কীভাবে চুরি গেল?

রামদুলালবাবু বললেন,—এক গেলাস জল খাব স্যার।

ষষ্ঠীচরণ ভেতরের পর্দা তুলে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। কর্নেল বলার আগেই জল দিয়ে গেল। রামদুলালবাবু জলটা ঢকঢক করে খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বললেন,—বইটা অফিসেই টেবিলের ড্রয়ারে রেখে বাড়ি গিয়েছিলুম। অফিসে কিছু কাজ ছিল। সারতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। আজ সওয়া বারোটার ফ্লাইটে বোম্বে যেতুম বইটা সঙ্গে নিয়ে। অফিসের কিছু কাগজপত্রও নেওয়ার দরকার ছিল। তাছাড়া থাকি সেই বেহালায়। ভেবেছিলুম, যাওয়ার পথে অফিস হয়ে সব নিয়ে যাব। তো অফিসে এসে দেখি, বইটা নেই। তন্নতন্ন খুঁজে অফিসের সব্বাইকে জিজ্ঞেস করে কোনো হদিশ পেলুম না।

—ড্রয়ারে তালা দেওয়া ছিল?

—ঠিক খেয়াল হচ্ছে না স্যার! এসে দেখলুম তালা দেওয়া নেই। ড্রয়ারের তালা কিন্তু ভাঙা নেই।

—চাবি আপনার কাছে থাকে তো?

—হ্যাঁ স্যার! তবে অফিসের চাবি দারোয়ানের কাছে থাকে। কিন্তু দারোয়ান কেন বই চুরি করবে?

—অফিসে রাতে দারোয়ান ছাড়া আর কে থাকে?

রামদুলালবাবু চমকে উঠলেন।—আর কেউ থাকে না। তবে গত রাতে... স্যার! তাহলে কি সেই লোকটাই?

—কোন্ লোকটা?

—রোডরিগ সায়েবের রিপ্রেজেন্টেটিভ। কাল বিকেলে বোম্বে থেকে ভদ্রলোক এসেছিলেন। কার্ড দেখালেন। বললেন, রাত্তিরটা থেকে গৌহাটি যাবেন ভোরের ফ্লাইটে। আমি বললুম, তাহলে কষ্ট করে হোটেলে গিয়ে লাভ কী? অফিসে দুখানা ঘর—মাঝখানে পার্টিশান। ওঁকে পাশের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। সকালে অফিসে এসে দারোয়ানের কাছে জিজ্ঞেস করলুম। বলল, —ভদ্রলোক ভোরে চলে গেছেন।

—কী নাম?

একটু ভেবে নিয়ে রামদুলালবাবু বললেন,—কী যেন—আর মৈত্র, নাকি এস মৈত্র। তবে স্যার, অবিশ্বাস করব কেমন করে? রোডরিগ সায়েবের কত রিপ্রেজেন্টেটিভ তো মাঝে-মাঝে কলকাতা আসে। আমার অফিসে রাত কাটিয়ে যায়।

—কেমন চেহারা?

—ছিপছিপে গড়ন। ফর্সা রং। মুখে দাড়ি।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ঠিক আছে। আপনি এখন আসুন। আমি দেখছি।

রামদুলালবাবু কর্নেলের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন,—আমার সাংঘাতিক ক্ষতি হবে স্যার, বইটা না পেলে। বেয়াই বলেছে ও বই মাথা ভাঙলেও আর পাওয়া যাবে না কোথাও। মাত্র ওই একটা কপি ছিল। তাছাড়া, আমি আবার বেয়াইয়ের দোকানে গিয়েছিলুম স্যার! সেখান থেকেই আসছি। জগমোহন বোস একই কথা বলল।

আরও কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে রামদুলালবাবু বিদায় নিলেন।

কর্নেল গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। বললুম,—জগমোহন এর পেছনে নেই তো? হয়তো বইটার আরও শাঁসালো খদ্দের জুটে গেছে।

কর্নেল বললেন,—অনেক ক্ষেত্রে জগমোহন বইচোরের সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত তো। রোডরিগ নামে একটা লোকের এ বই কেন দরকার হল! জয়ন্ত, সময় আছে তোমার?

—আজ আমার অফ-ডে। কেন?

—চলো তো একবার কলেজ স্ট্রিট ঘুরে আসি।

দুই

কলেজ স্ট্রিট-মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। লোকে লোকারণ্য। আমার গাড়ি আটকে গেল জটে। মিছিল কিংবা পথসভা নাকি? এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলুম,—কী ব্যাপার দাদা?

দাদা-ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন,—আর বলবেন না মশাই! দিনে-দিনে এ হচ্ছেটা কী? প্রকাশ্য দিবালোকে একগাদা লোকের চোখের সামনে খুনখারাপি! উঃ আমার মাথাটা কেমন করছে। স্ট্রোক না হলে বাঁচি।

আরেক পথচারী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,—কে খুন হল? কোথায় খুন হল?

—ওই যে, দেখুন গে না স্বচক্ষে। একটা মুখোশপরা লোক বইয়ের দোকানদারকে গুলি করে পালিয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে পেন বেচছিল এক হকার। সে মন্তব্য করল,—জগাইদাটা মরবে আমি জানতুম। কার বই চুরি করে কাকে বেচত। দেখেশুনে ওর দোকানের সেলসম্যানগিরি ছেড়ে রাস্তায় নেমেছি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কর্নেল গাড়ি থেকে মুখ বের করে দেখে বললেন,—জগাইদা মানে জগমোহন মনে হচ্ছে, জয়ন্ত! ওর দোকানের সামনেই ভিড়টা বেশি দেখছি। তুমি গাড়িটা কাছাকাছি রেখে অপেক্ষা করো। আসছি।

এতক্ষণে আমার পিলে চমকাল। বললুম,—সর্বনাশ! জগমোহন খুন হয়ে গেল তাহলে?

কর্নেল নির্বিকার মুখে বেরিয়ে গেলেন। পেনওয়ালা হকার আমার কথাটা শুনতে পেয়েছিল। বলল,—হ্যাঁ স্যার! নাকি জিপগাড়ি চেপে একটা লোক এসেছিল। এসেই টিস্যুম-টিস্যুম করে দুই গুলি!

লোকটা আমার দিকে তাক করছিল কয়েকটা কলম নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ ট্রাফিকজট খুলতে শুরু করল। হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা হতে থাকল। বাঁ-পাশে খালি পেয়ে একটু এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করালুম। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকলুম।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, গোয়েন্দাপ্রবর আসছেন। এসে হাসতে-হাসতে বললেন,—চলো! ফেরা যাক!

উনি গাড়ির ভেতর ঢুকে আরাম করে বসলে, বললুম,—হাসছেন যে? বডি দেখলেন—নাকি নিয়ে গেছে হাসপাতালে?

—কার বডির কথা বলছ ডার্লিং? জগমোহনের?

—হ্যাঁ। আবার কার?

লোকটা অসম্ভব ধূর্ত। —কর্নেল চুরুট ধরালেন। গাড়ি মোড় ঘুরে এবার মহাত্মা গান্ধী রোডে পৌঁছেছে। কর্নেল বললেন,—তবে একথা সত্যি যে একটা মুখোশধারী লোক এসে ওর দোকানে হানা দিয়েছিল। তারপর ফটফট আওয়াজও শোনা গেছে। কিন্তু জগমোহন বহাল তবিয়তেই আছে।

আশ্বস্ত হয়ে বললুম,—তাহলে খুব জোর বেঁচে গেছে বেচারা।

খুব ভয় পেয়ে গেছে জগমোহন।—কর্নেল হাসতে থাকলেন। আমাকে দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বলল, ভাগ্যিস বইয়ের আড়ালে ছিল সে, নইলে রক্তারক্তি হয়ে পড়ে থাকত।

—কিন্তু এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! প্রথম চোটে গুলি ফসকেছে বলে বারবার ফসকাবে না।

কর্নেল কোনো কথা বললেন না। চোখ বুজে সিটে হেলান দিয়ে মৃদু-মৃদু টান দিতে থাকলেন চুরুটে। সেইসঙ্গে একটা-একটা করে ওপড়ানোর ভঙ্গিতে দাড়ি টানতে থাকলেন। বরাবর দেখেছি, রহস্যের গোলকধাঁধায় ঢুকে যখন বেরুবার পথ পান না, তখন এমন দাড়ি ছেঁড়ার তাল করেন।...

ওঁর ফ্ল্যাটে আমার আজ লাঞ্চের নেমন্তন্ন। ষষ্ঠীচরণ আয়োজন করেছিল প্রচুর। ঘুঘুমশাই সেই যে চুপ করেছেন তো করেছেন। কথাবার্তা বিশেষ বলছিলেন না। খাওয়ার পর ছাদে চলে গেলেন ওঁর 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে'। আমার ভাত-ঘুমের অভ্যাস প্রবল। সোফায় হেলান দিয়ে চমৎকার একটা ভাত-ঘুম হয়ে গেল। শীতের বেলা কখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। চোখ মেলে দেখি, ঋষিসুলভ চেহারা নিয়ে এবং প্রসারিত হাতে কফির পেয়ালা নিয়ে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। সস্নেহে বললেন,—নাও ডার্লিং! জড়তা ঘুচিয়ে দিতে কফির তুল্য পানীয় আর নেই। আর শোনো, ও-ঘরে জগমোহন এসে বসে আছেন। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ওঁকে। এবার ডাকা যেতে পারে।

ষষ্ঠী জগমোহনকে ডেকে আনল কর্নেলের নির্দেশে। সেইসঙ্গে তাঁকেও কফি দিয়ে গেল। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিলুম, কী অবস্থা হয়েছে মনের। যেন ব্লটিংপেপারে আঁকা স্কেচ। মোটাসোটা নাদুসনুদুস গড়নের মানুষ। মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল। চশমা নাকের ডগায় আটকে আছে কোনোরকমে। কপালে একটা টাটকা সিঁদুরের ফোঁটা—সম্ভবত কালীঘাটে দৌড়েছিলেন পুজো দিতে। সেখান থেকেই হয়তো আসছেন। কফির দিকে তাকিয়ে খাবেন কি না

ঠিক করতে পারলেন না কয়েক সেকেন্ড। শেষে সিদ্ধান্ত করলেন খাবেন এবং এক চুমুকে পেয়ালা অর্ধেক শুষে বলবেন,—আমি গেছি। এক্কেরে গেছি!

কর্নেল চোখ পাকিয়ে বললেন,—আপনি যাবেন না তো আর কে যাবে?

জগমোহন হাত নেড়ে আর্তনাদ করলেন,—আর কখনও এমন হইব না স্যার! যদি হয়, আমার কানদুটো কাইট্যা কুত্তার গলায় লটকাইয়া দিয়েন!

কর্নেল ধমক দিলেন,—তাহলে বুঝতে পারছেন, কীসের গর্তে হাত ভরেছিলেন?

পারছি না স্যার? খুব পারছি।—জগমোহন করুণস্বরে বললেন, আপনের কাছে মিথ্যা কওনের সাধ্যি নাই। হ, বইখান ভৈরবগড় রাজবাড়ির। ওই পোড়াকপাইলা হরিসাধন আমার এ সর্বনাশ করল! আপনে যেমন অর্ডার দিছলেন, আমার বেয়াইমশয় সিঙ্গিবাবুও দিছিল। তো কথা হইল...

কর্নেল বললেন,—সিঙ্গিমশায়ের অফিস থেকে বইটা চুরি গেছে।

জগমোহন ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। তারপর গলায় কাকুতিমিনতি ফুটিয়ে বললেন,—যা লইয়া দিব্যি করতে বলবেন, করুম স্যার! আর যার লগে করি, বেয়াইমশয়ের লগে তঞ্চকতা করুম না।

—শুনুন জগমোহনবাবু! যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর কখনও রামশংকর শর্মার আত্মচরিতের ধারেকাছে যাবেন না। কেউ লক্ষ টাকা দিতে চাইলেও ও বই জোগাড় করার চেষ্টা করবেন না। সোজা বলে দেবেন, পাওয়া যাবে না।

—আবার? মুখোশপরা লোকটাও হেই কথা কইয়া গুলি ছুড়ছিল না? বইয়ের গাদায় গুলি লাগল। হেই না বাঁইচ্যা গেলাম স্যার!

—ঠিক আছে। আপনি আসুন।

জগমোহন দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরলেন। কর্নেল বললেন,—কিছু বলবেন?

যে কথাটা জিগাইতে আইছিলাম, হেই কথাটাই বাদ। —জগমোহন একটু হাসলেন। রেয়ার বুকসের কারবার করিয়া চুল পাকাইলাম স্যার! কিন্তু রামশংকর শর্মার আত্মচরিত কী এমন বই যে এত গণ্ডগুল বাধছে? এদিকে আপনিও কইলেন, সাপের গর্তে হাত ভরছিলাম। ক্যান একথা কইলেন স্যার?

জগমোহনবাবু!—কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, বইখানা আসলে ভীষণ অপয়া। ওই বই নিয়ে বেশি মাথা না ঘামালেই ভালো। জানেন তো? যত হাসি তত কান্না—বলে গেছেন রাম শন্না। ইনি হলেন সেই রাম শন্না। অতএব যা বললুম—মনে রাখবেন।

হ, বুঝছি। —বলে জগমোহন চলে গেলেন। কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। হয়তো বুঝলেন, হাসতে মানা।

ঘরের ভেতর দিনশেষের ছায়া গাঢ় হচ্ছিল। কর্নেল সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দিলেন। তারপর পায়চারি করতে-করতে বললেন,—তাহলে ব্যাপারটা কেমন জট পাকিয়ে গেল, জয়ন্ত! বোম্বের কে এক রোডরিগ সায়েব রামশর্মার আত্মচরিতের খবর রাখেন। রামদুলাল সিংহকে বইটা জোগাড় করে দিতে বলেছিলেন তিনি। জগমোহন হল সিঙ্গিমশায়ের বেয়াই। ভৈরবগড় রাজবাড়ি থেকে হরিসাধন এর আগে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই চুরি করে এনেছে। কাজেই জগমোহন তার শরণাপন্ন হল। হরিসাধন বই চুরি করে এনে বেচল। তারপর দুটো ঘটনা ঘটল। রামদুলালের অফিস থেকে সেই বই চুরি এবং জগমোহনের দোকানে মুখোশধারীর হামলা। সত্যিকার পিস্তল ছোড়েনি সে। বইয়ের গাদায় গুলির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি। তার মানে, থিয়েটারের পিস্তল নিয়ে এসেছিল। হঁ—জগমোহনকে ভয় দেখাতেই এসেছিল।... জয়ন্ত, আমার অনুমান সত্য। সে আসলে

জগমোহনকে বোঝাতে চেয়েছে যে, এই বই আর যেন বেচাকেনা না করে জগমোহন।... কিন্তু কেন?

—তাহলে তার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না।

—কী ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না বলতে চাইছ তুমি?

—পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেকের—যার দাম হয়তো বিদেশে কোটি-কোটি ডলার।

কর্নেল হাসলেন।—তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ, ডার্লিং! একজ্যাক্টলি তাই। কেউ বা কারা টের পেয়েছে, রামশর্মার আত্মচরিতের ভেতর স্যাটর নামে ঐতিহাসিক পেরেক লুকিয়ে রাখার কোনো সূত্র আছে।... হুঁ, রোডরিগেরও উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে টেক্কা দিয়ে বইটা হয়তো অন্য একজন হাতিয়ে নিল।

—সিঙ্গিমশায়ের অফিসে আর. মৈত্র না এস. মৈত্র নামে যে লোকটা এসেছিল, সে নয় তো?

গোয়েন্দাপ্রবর সায় দিলেন। —ঠিক, ঠিক। এখন কথা হচ্ছে, এই মৈত্র লোকটা যেই হোক, সে রোডরিগের পরিচিত। তার পরিচিত নয় শুধু, তার অন্তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। সে রোডরিগের সঙ্গে সিঙ্গিমশায়ের যোগাযোগের কথা জানতে পেরেছিল। তারপর ছুটে এসেছিল কলকাতায়।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন। তারপর আপনমনে বললেন,—কিন্তু কোথায় আছে সেই পেরেক? মিশরীয় চিত্রলিপিতে পাঁচটা পাখি! তার একটা অর্থ : The Sower Arepo holds the wheels carefully. প্রথমে গলগথা বধ্যভূমি থেকে যিশুর দেহ কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন পেরেক পাঁচটা কেউ খুলে নিয়েছিল ক্রশ থেকে। তাহলে কি আরেপো নামে এক চাষির চতুষ্কোণ শস্যক্ষেত্রে সেগুলো পুঁতে রাখা হয়েছিল?... তারপর কেউ উদ্ধার করে ইথিওপিয়ার দুর্গে নিয়ে যায়।... একটা পেরেক পেলেন রামশংকর শর্মা।... SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS? রহস্যময় শব্দবর্গ! শব্দগুলোতে লেগেছে R O A T S E P মোট সাতটা বর্ণ। এই সাতটা বর্ণে কতগুলো অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করা যায়, দেখা যাক।

হঠাৎ উঠে গিয়ে কোণের টেবিলে বসলেন কর্নেল। তারপর প্যাডের ওপর কলম নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। বুঝলুম, বুড়োকে এবার ভূতে পেয়েছে। এ ভূত ঘাড় থেকে নামতে রাত পুইয়ে যেতেও পারে। তাই ষষ্ঠীচরণের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললুম,—তোমার বাবামশাইকে বলে দিও, আমি গেলুম।

ষষ্ঠী ঘাড় নাড়ল। মুখে মুচকি হাসি।...

সেদিনই অনেক রাতে টেলিফোনের বিরক্তিকর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। সাংবাদিক হওয়ার এই এক জ্বালা। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কোনো কর্তাব্যক্তি না হয়ে যান না। হয়তো কোথায় গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনা, মন্ত্রীর ওপর বোমা, কিংবা কোনো ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুরে কী গণ্ডগোল। হয়তো শুনব, এখনই রওনা হও অকুস্থলে। জ্বালাতন!

খাপ্পা হয়ে ফোন তুলে বললুম,—কী হয়েছে? তারপর আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর গলা শুনতে পেলুম।

—ডার্লিং! রাত দুটোয় তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য খুবই দুঃখিত।

বুড়োমানুষরা অনিদ্রায় ভোগেন, অন্যদেরও ভোগান।

—বলুন।

—জয়ন্ত! সেই সাতটা অক্ষর থেকে এইমাত্র একটা নতুন শব্দ বেরিয়ে এসেছে। বিস্ময়কর যোগাযোগ, ডার্লিং! নদীয়া জেলার যে গ্রামে রামশর্মার বাড়ি ছিল, তার প্রাচীন নাম কি ছিল জানো? সাতপুর।

—বেশ তো। সেজন্য এত রাতে ফোন করার কী দরকার হল?

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! সাতপুরকে বিদেশি উচ্চারণে রোমান হরফে পেয়েছি। SATPORE!

—খুব ভালো কথা। তাতে কী হয়েছে?

SATOR, AREPO, TENET, ROTAS, OPERA থেকে কী আশ্চর্যভাবে বেরিয়ে এল SATPORE? প্রাচীন পৃথিবী রহস্যময়, জয়ন্ত! আর শোনো, কাল সকাল নটায় তৈরি থেকো। আমরা সাতপুর অর্থাৎ বর্তমান রামশংকরপুরে যাচ্ছি। সাড়ে নটায় শেয়ালদায় ট্রেন।

—কাল আমার অফ-ডে নেই। সপ্তাহে মাত্র একদিন অফ-ডে পাই।

—জয়ন্ত, একটু আগে রামশংকরপুর থেকে রাম শন্নার বংশধর প্রণবশংকর বাঁড়ুজ্জে ট্রাংককল করেছিলেন। ভৈরবগড়ের রাজাবাহাদুর ওঁর কুটুম্ব। রাজাবাহাদুরের পরামর্শে আমাকে ট্রাংককল করা। রাত দশটায় প্রণবশংকরের বাড়ির পেছনের বাগানে ওঁর নিরুদ্দিষ্ট ভাই উমাশংকরের ডেডবডি পাওয়া গেছে। বুঝতে পারছ? তিনমাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন উমাশংকর। হঠাৎ ওঁর ডেডবডি...

কথা কেড়ে বললুম, ঠিক আছে। সকাল ৯টায় তৈরি থাকব।—তারপর ফোন রেখে চিত হয়ে শুয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। টের পেলুম, আমার মাথার ভেতর ঘুঘু ডাকছে।...

তিন

শহরে-গ্রামে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেলে যা দাঁড়ায়, তার নাম রামশংকরপুর। গঙ্গার ধারে একেবারে শেষপ্রান্তে রাম শন্নার তৈরি বিরাট ঐতিহাসিক দালানবাড়ি। নিরিবিলি জায়গা বলা যায়। ঘন গাছগাছালি আর এন্তার ঝোপজঙ্গল গঙ্গাতীরের উর্বর মাটিতে যথেষ্ট গজিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই বাঁড়ুজ্জেবাড়ি থেকে উত্তরে একটুখানি এগোলেই অন্যরকম দৃশ্য। বাজার, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, থানা, কোর্টকাছারিতে জমজমাট। শহরের মতো লোকের ভিড় আর যানবাহনের দাপট।

একর-সাতেক জায়গার ঠিক মাঝখানে দোতলা প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ি। চারদিকে কোথাও ফাঁকা ঘাসজমি, কোথাও সবজিখেত, কোথাও ফুলফলের ক্ষয়াটে বাগান। একটা পুকুর পর্যন্ত আছে। সারা চৌহদ্দি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু সে-পাঁচিলের অবস্থা বাড়িটার চেয়ে জরাজীর্ণ। কোথাও ভেঙেচুরে গেছে; কোথাও পাঁচিল ফুঁড়ে গাছও গজিয়েছে। পশ্চিমে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের দশাও করুণ। গঙ্গা ঘাট থেকে একটু দূরে সরে গেছে কালক্রমে। এই দেউড়ির কপাট কবে লোপাট হয়ে গেছে। সেখান দিয়ে ঢুকলে বর্মি বাঁশের একটা ঝাড়। তার পাশে পুরোনো এক ফোয়ারা। কবে মরেহেজে গেছে ফোয়ারাটা। তার পাথুরে গা ফাটিয়ে আগাছা গজিয়েছে। মাঝখানে টুটাফাটা স্তম্ভের ওপর একটু ঝুঁকে যেন ঝারিতে জল ভরছে এক অপ্সরা। কিন্তু তার মাথাটাই নেই।

মুণ্ডুকাটা অপ্সরার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন,—রাম শর্মা দেশে ফিরে রাজা-রাজড়ার মতো জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। তার একটা নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছ! এই অপ্সরামূর্তি কিন্তু মোটেও দিশি নয়। ত্রিনিদাদের বাড়ি থেকে বহু ঝক্কি পুইয়ে বয়ে এতদূরে এনেছিলেন শর্মামশাই। উনি বেঁচে থাকলে অপ্সরার মুণ্ডু নেই দেখে খুব কষ্ট পেতেন।

প্রণবশংকর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন,—১৯৪২ সালের ঝড়ে ওখানে একটা প্রকাণ্ড শিরীষগাছ ভেঙে পড়েছিল। একটা ডালের ধাক্কায় মুণ্ডুটা ভেঙে গিয়েছিল।

কর্নেল বললেন,—ফোয়ারাটা পাঁচকোনা দেখছি!... হুঁ, ভেনিসের ব্রুগো স্কোয়ারে ঠিক এমনি একটা ফোয়ারা দেখেছিলুম। তবে তার কেন্দ্রে পেতলের যে মূর্তি আছে, সেটা সম্ভবত দেবী

ইস্তারের। ইস্তার ছিলেন প্রাচীন সুমেরের যুদ্ধদেবী। কিন্তু তাঁর মূর্তির পায়ের তলায় পাঁচকোনা ফোয়ারা হল খ্রিস্টীয় পবিত্র নক্ষত্রের প্রতীক। ওই নক্ষত্র দেখে পুবদেশের জ্ঞানীরা টের পেয়েছিলেন যিশু জন্মেছেন। তাঁরা নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে বেথেলহেমের আস্তাবলে পৌছান। —বলে কর্নেল পায়ের কাছে ঘাস থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিলেন। হলদে রঙের ছেঁড়া কাগজকুচি মনে হল। সেটা ভালো করে দেখে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর চারপাশের ঘাসে কিছু খুঁজতে থাকলেন। ঘাসফড়িং হতে পারে। ঘাসফড়িংও ওঁর চর্চার বিষয় বলে জানি। প্রণবশংকর কিন্তু কর্নেলের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বোধ করি মনে-মনে বিরক্ত হয়েছেন। বারোটা নাগাদ পৌছুনোর পরেই উনি আমাদের হত্যাকাণ্ডের জায়গাটা দেখাতে নিয়ে এসেছেন। ফোয়ারার কাছেই ওঁর নিরুদ্দিষ্ট ভাই উমাশংকরকে খুন করা হয়েছে। বডি সকালে পুলিশ মর্গে নিয়ে গেছে। আচমকা কেউ উমাশংকরের মাথায় সম্ভবত লোহার রড দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। এক আঘাতেই মৃত্যু হয়—কারণ শরীরে আর কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

কর্নেল ওসব বিবরণে একটুও কান করেননি। শুধু রাম শর্মার কথা নিয়েই বকবক করছেন। এতে আমারও বিরক্তি আসছিল। কর্নেল এবার গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলার চোখে রেখে গাছের পাখি দেখছেন। প্রণবশংকরকে সহানুভূতি দেখানোর জন্য ওঁর ভাইয়ের প্রসঙ্গে কথা বললুম, —উমাশংকর কতদিন আগে নিখোঁজ হন, মিঃ ব্যানার্জি?

—তা মাস তিনেক হবে।

—কোনো ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

কোনো ঝগড়াঝাটির প্রশ্নই ওঠে না। তবে ছোটকু একটু জেদি প্রকৃতির ছিল। মাঝে-মাঝে তুচ্ছ কথায় ভীষণ রেগে যেত। কিন্তু হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার আগের রাতে ওর মেজাজ অত্যন্ত শান্ত দেখেছিলুম। রাতে একসঙ্গে দু-ভাই মিলে খাওয়াদাওয়া করলুম। দিব্যি স্বাভাবিকভাবে গল্পগুজব করল। শুতে গেল। সকালে গঙ্গাধর ওর ঘরে চা নিয়ে গিয়ে দেখে, নেই। ভাবল, বাথরুমে আছে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার পাত্তা নেই।...

প্রণবশংকর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন,—আমার ছেলেপিলে নেই। স্ত্রী মারা গেছেন বছর দুই আগে। আমার বয়স ৬৫ বছর হতে চলল। ওই ছোটকুই ছিল আমার বেঁচে থাকার সম্বল। অথচ কী দুর্ভাগা আমি, দেখুন জয়ন্তবাবু! হঠাৎ অমন করে সেই ছোটকু নিপাত্তা হয়ে গেল। কত খোঁজখবর করলুম। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম। তারপর এতদিনে ওর ডেডবডি ফিরে পেলুম।

—ডেডবডি প্রথম কে দেখেছিল?

গঙ্গাধর।—প্রণবশংকর রুমালে চোখ মুছলেন।—গঙ্গাধর এ-বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে আছে। ছোটকুকে সে ছেলের মতো ভালোবাসত। গতরাতে, তখন আটটা-সাড়ে আটটা হবে, গঙ্গাধর তার ঘর থেকে একটা আবছা চিৎকার শুনেছিল। ও ভেবেছিল, চোর ঢুকেছে বাগানে— প্রায়ই রাতবিরেতে চোর আসে। গোবিন্দ-মালি হয়তো তাই চেঁচিয়ে তাকে ডাকছে। জ্যোৎস্না ছিল। গঙ্গাধর পশ্চিমের এই বারান্দায় বেরিয়ে আসে। তারপরই দেখতে পায় কে পালিয়ে যাচ্ছে। তাড়া করে এখানে এসেই ছোটকুর বডিতে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যায় গঙ্গাধর। তারপর...

কর্নেল এগিয়ে এসে বললেন,—মিঃ ব্যানার্জি, এখানে আপাতত আর কিছু দেখার নেই। এবার চলুন, উমাশংকরবাবুর ব্যাগটা আমি দেখতে চাই।

প্রণবশংকর পা বাড়িয়ে বললেন,—চলুন। দেখাচ্ছি।

যেতে-যেতে কর্নেল বললেন,—পুলিশের কী ধারণা মিঃ ব্যানার্জি? কিছু জানতে পেরেছেন?

—হুঁ। পুলিশের ধারণা, উমাশংকর কোনো শত্রুর ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। সেই শত্রু তাকে তাকে ছিল। তা না হলে সে পিছনের ফটক দিয়ে বাড়ি ঢুকবে কেন?

—আপনার কী মনে হয়?

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। শুধু আশ্চর্য লাগছে যে, ছোটকুর শত্রু ছিল, অথচ আমায় কেন বলেনি?

—আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, নিখোঁজ হওয়ার আগে উমাশংকরবাবুর হাবভাবে কোনো গণ্ডগোল চোখে পড়েনি?

—তেমন কিছু তো দেখিনি। তবে কিছুদিন থেকে একটু আনমনা হয়ে থাকত যেন। চুপচাপ একা বসে কী যেন ভাবত। রাত জেগে কী সব করত। অনেক রাতে ওর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলে হেসে বলত, কিছু না।

—কিন্তু উমাশংকরবাবুর সঙ্গে শত্রুতা থাকতে পারে কার?

—সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। তবে একালের ছেলে। কিছু বলা যায় না। হয়তো ভেতর-ভেতর রাজনৈতিক দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য ওকে প্রকাশ্যে কোনোদিন রাজনৈতিক ব্যাপারে দেখিনি। আমার সঙ্গে কোনোরকম রাজনৈতিক আলোচনাও করত না।

বাড়ির নীচের তলায় দক্ষিণের একটা বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রণবশংকর তাঁর ভাইয়ের ব্যাগটা আনতে গেলেন।

কর্নেল গম্ভীরমুখে আরামকেদারায় বসে চুরুট ধরালেন। বললুম,—ফোয়ারার ওখানে সম্ভবত একটা ক্লু সংগ্রহ করেছেন। একটু শুনি, কী ধরনের ক্লু।

কর্নেল ঠোঁটের কোনায় হাসলেন।—গোয়েন্দারা ক্লু খুঁজলেই নাকি পেয়ে যায়। এটাই সাবেকি পদ্ধতি, ডার্লিং! হ্যাঁ—আমিও একটা কিছু পেয়েছি। তবে সেটা ক্লু কি না জানি না। একটুকরো ছেঁড়া ময়লা কাগজ—মাত্র একবর্গ ইঞ্চি মাপের। তবে কাগজটুকুর বৈশিষ্ট্য হল, তা খুব পুরোনো এবং একটু চাপ লাগলেই গুঁড়ো হয়ে যায়।

প্রণবশংকর একটা সাধারণ কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন,—ব্যাগটা একটু তফাতে পড়েছিল ঝোপের ভেতর। আপনারা আসবার কিছুক্ষণ আগে গোবিন্দ ওটা কুড়িয়ে পেয়েছে। ব্যাগটা ছোটকুরই বটে। কারণ এই দেখুন ওর প্যান্ট, শার্ট, তোয়ালে, আর সব টুকিটাকি জিনিস।... আরে! এটা আবার কী?

জিনিসগুলো বের করে টেবিলে রাখছিলেন প্রণবশংকর। চৌকো জিনিসটা দেখে কর্নেল বললেন,—এটা একটা ব্যাটারিচালিত মেটাল-ডিটেক্টর। কোথাও কোনো ধাতব জিনিস লুকোনো থাকলে এর সাহায্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—তাহলে কি উমাশংকরবাবু...

গোয়েন্দাপ্রবর এমন কটমটিয়ে তাকালেন যে মুখ বন্ধ করলুম তক্ষুনি। প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন,—মেটাল-ডিটেক্টর দিয়ে কী করত ছোটকু?

সে-কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল ব্যাগের ভেতর হাতড়ে বললেন,—হুঁ, বুঝেছি। আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, ভৈরবগড়ের রাজাবাহাদুরকে রামশংকর শর্মার আত্মচরিত কবে আপনি উপহার দিয়েছিলেন?

প্রণবশংকর স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন,—গত অগস্ট মাসে। এ অঞ্চলে কী একটা কাজে উনি এসেছিলেন। এদিকে এলেই আমার বাড়িতে ওঠেন। বৈবাহিকসূত্রে ওঁদের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতার সম্পর্ক।

—রাজাবাহাদুরকে বইটা দেওয়ার জন্য উমাশংকরবাবু কি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভীষণ খাপ্পা হয়েছিল আমার ওপর। আমি ওকে বুঝিয়ে বললুম, বইটা এখানে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। বরং রাজাবাহাদুরের লাইব্রেরিতে থাকলে যত্ন হবে। তাছাড়া রাজাবাহাদুরও বলেছিলেন, বইটা আবার উনি ছাপার ব্যবস্থা করবেন।

—রাজাবাহাদুরের সঙ্গে উমাশংকরের সম্পর্ক কেমন ছিল?

প্রণবশংকর একটু ইতস্তত করে বললেন,—এটুকু বলতে পারি, রাজাবাহাদুর এ-বাড়ি এলে ছোটকু ওঁকে এড়িয়ে থাকত। আড়ালে ওঁর হামবড়াই ভাবের জন্য খুব ঠাট্টা-তামাশা করত। বলত, যাত্রাদলের রাজা। আসলে ছোটকুটা বরাবর একটু বিদ্রোহী-টাইপের মানুষ ছিল। সবাই যাকে সম্মান করছে, ও তাকে তুচ্ছ করবেই করবে।

—উনি কি ভৈরবগড় রাজবাড়িতে যেতেন?

কে? ছোটকু? —প্রণবশংকর মাথা নাড়লেন।—সেই ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে যা গেছে- টেছে। বড় হয়ে আর যায়নি। বলত, রাজাগজাদের যা গুমোর, গেলে চাকর ভেবে পা টিপতে বলবে। দরকার নেই গিয়ে।

কর্নেল মন্তব্য করলেন,—হুঁ, উমাশংকরবাবুর মানসিক গঠনটা বুঝতে পারছি। —তারপর ব্যাগের তলা থেকে একটা কাগজকুচি বের করে পরীক্ষা করতে থাকলেন।

প্রণবশংকর অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর রাখা ছোটভাইয়ের শার্টটা ভাঁজ করছিলেন। বললেন,—ব্যাগে কী আছে ভালো করে এখনও দেখিনি। মানিব্যাগটা অবশ্য পাওয়া গেছে। যে প্যান্টটা পরেছিল, তার হিপ পকেটে ওটা পাওয়া গেছে। টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না।

কর্নেল বললেন,—মানিব্যাগটা একটু কষ্ট করে নিয়ে আসবেন?

এনে দিচ্ছি। —বলে প্রণবশংকর চলে গেলেন।

কর্নেল এবার ব্যাগ রেখে প্যান্ট ও শার্টটা নিয়ে পড়লেন। শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করে খুলে দেখলেন। চুপচাপ বসে ঘুঘুমশাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখছিলুম। চোখে চোখ পড়লে বললেন,—জন্মান্তরবাদে আমার বিশ্বাস নেই জয়ন্ত! কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। যেমন ধরো, রামশংকর শর্মা! এক দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত সবসময়। তিনিই যেন তাঁর বংশধর উমাশংকরের মধ্যে পুনর্জন্ম নিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।...

প্রণবশংকর মানিব্যাগটা নিয়ে এলে কর্নেল কথা থামিয়ে সেটা নিলেন। বললেন,—কিছু বের করা হয়নি তো মিঃ ব্যানার্জি?

—না, না! বের করার প্রশ্নই ওঠে না।

কর্নেল মানিব্যাগের ভেতর থেকে কয়েকটি মুদ্রা বের করে বললেন,—হুঁ, যা ভেবেছিলুম। এই মুদ্রাগুলোর মধ্যে দুটো মুদ্রা ত্রিনিদাদের।

প্রণবশংকর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম,—ত্রিনিদাদের মুদ্রা কোত্থেকে পেলেন উমাশংকর?

কর্নেল বললেন,—ত্রিনিদাদে। আবার কোথায় পাবেন?

প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন,—সে কী! ছোটকু ত্রিনিদাদ গিয়েছিল নাকি?

—হ্যাঁ, মিঃ ব্যানার্জি! ওঁর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

প্রণবশংকর বললেন,—আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। রাম শর্মা শুনেছি ত্রিনিদাদ মুলুকে ছিলেন। সেখানে ঘরবাড়িও করেছিলেন। ওঁর আত্মচরিত ভালো করে পড়িনি অবশ্য। তবে

ছোটকু... হ্যাঁ, হ্যাঁ! মনে পড়েছে বটে, ছোটকু মাঝে-মাঝে বলত, রাম শর্মার ভিটে দেখতে যাবে। কিন্তু সে তো সেই সাউথ আমেরিকার মাথায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে।

আমি বললুম,—তাহলে পাসপোর্ট থাকা উচিত সঙ্গে। পাসপোর্ট কোথায়?

কর্নেল বললেন,—বোঝা যাচ্ছে না পাসপোর্টটা কী হল। যাই হোক, মিঃ ব্যানার্জি, একটা জিনিস হাতানো খুনির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেটা সে হাতাতে পেরেছে। কারণ, ব্যাগের ভেতর এবং ফোয়ারার কাছে আমি দুকুচি নমুনা খুঁজে পেয়েছি।

প্রণবশংকর বললেন,—কী বলুন তো?

রামশংকর শর্মার আত্মচরিত। —বলে কর্নেল এবার পকেট-নোটবইটার পাতা ওলটাতে থাকলেন।—হুঁ—পাসপোর্টের নাম্বার টোকা আছে। তার মানে পাসপোর্ট ছিল।... এখানে দেখছি ইংরেজিতে দু' লাইন নোট। 'Reported to Police. Trabanka P.S. Case No. P.F. 223 dated 15.10.80.' তার মানে পাসপোর্টটা নিশ্চয়ই চুরি গিয়েছিল। ত্রাবাংকা নামে কোনো জায়গার থানায় ডাইরি করেছিলেন। কোন্ তারিখে উনি নিপাত্তা হন মিঃ ব্যানার্জি?

—সাতই অক্টোবর

—হুঁ—আরে। এখানে দেখছি : Appointment with F. Rodrigue at 6 P.M.' সেই রোডরিগ! রামদয়াল সিঙ্গিকে যে বইটা জোগাড় করে দিতে বলেছিল!—কর্নেল মুখ তুলে বললেন, মিঃ ব্যানার্জি, আপনার ভাই ত্রিনিদাদ গিয়ে পাসপোর্ট এবং সম্ভবত টাকাকড়িও চুরি গিয়ে বিপদে পড়েন। সেখানে রোডরিগ নামে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। এটুকু বুঝতে পেরেছি, রোডরিগ পয়সাওলা ব্যবসায়ী। নানা দেশে তাঁর ব্যাবসা-বাণিজ্য আছে। উমাশংকরবাবু তাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন এবং তাঁর সাহায্য পেয়েই ত্রিনিদাদে তিন মাস তিনি থাকতে পেরেছিলেন। শুধু একটা ভুল করেছিলেন। রোডরিগকে আত্মচরিতের কথাটা বলা ঠিক হয়নি। জিনিসটার দাম কোটি-কোটি ডলার—যদি উদ্ধার করা হয়।... হুঁ, জট অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। কিন্তু রোডরিগ তো এখন বোম্বেতে। এতদূরে ঠিক সময়মতো লোক পাঠিয়ে উমাশংকরের কাছ থেকে আত্মচরিত হাতানো... নাঃ! এখনও জট থেকে যাচ্ছে।

প্রণবশংকর হাঁ করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। এই সময় গঙ্গাধর এসে বলল, —খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে বড়বাবু। পিসিমা বললেন, দুটো বাজতে চলল। ওঁদের খবর দে।

প্রণবশংকর উঠলেন।—তাই তো! ছি, ছি—বড্ড দেরি হয়ে গেল খেতে। দয়া করে এবার আসুন কর্নেল! কথাবার্তা যা হওয়ার পরে হবে। আমাদের তো অরন্ধন। নেহাত আপনাদের জন্য দু-মুঠো ডাল ভাতের ব্যবস্থা করেছি।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, স্নান করবে নাকি? আমি অবশ্য ভোরে ও-কাজ সেরেই বেরিয়েছি।

আঁতকে উঠে বললুম,—এই হাড়কাঁপানো শীতে মফস্বলের জলে স্নান? বাপ্‌স! কী ঠান্ডা এখানে!

গঙ্গাধর বলল,—গরম জল করে দেব স্যার?

—থাক।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—তুমি নিশ্চয়ই আগের জন্মে বেড়াল ছিলে ডার্লিং! তাই জলকে এত ভয়।

বললুম,—আপনি তাহলে আগের জন্মে উদবেড়াল ছিলেন। তাই শীতের ভোরে জল মাখতে ভালোবাসেন।

চার

খাওয়ার সময় তদারক করছিলেন এক বৃদ্ধা। প্রণবশংকর আলাপ করিয়ে দিলেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। উনি ছাড়া আর কোনো মহিলা এ-বাড়িতে নেই। ওঁর নাম কুমুদিনী। খুব স্নেহপ্রবণ মহিলা। আদরযত্ন করে খাওয়াচ্ছিলেন। কথায়-কথায় দুঃখ করে বললেন,—ছোটকু বেঁচে থাকলে অতিথিদের জন্য কী যে ছুটোছুটি করত! পরিতোষকে বললুম ব্যবস্থা করতে। পরিতোষের হাজারটা কাজ। তবে বাবা, আজ তো অরন্ধন বাড়িতে। আপনাদের জন্য নিয়মভঙ্গ করতে হল।

প্রণবশংকর বললেন,—পরিতোষ বেচারার দোষ নেই, কাল সারারাত জেগেছে। থানা-পুলিশের হাঙ্গামা তো কম নয়। সকালে আবার দৌড়ল থানায়। সেখান থেকে মর্গে। যতক্ষণ না বডি নিয়ে আসবে, ততক্ষণ হয়তো ওর শান্তি নেই। তারপর আর আসেনি পরিতোষ?

কুমুদিনী বললেন,—এসেছিল একটু আগে। আবার বেরুল।

—আজ আর ওর ফার্মে যাওয়া হল না। কী যে হচ্ছে সেখানে কে জানে! পরিতোষের ভয়ে কেউ ফসলে হাত দিতে সাহস পায় না!

কর্নেল বললেন,—পরিতোষ কে?

প্রণবশংকর বললেন,—এ বাড়ির কেয়ারটেকার বলতে পারেন, ম্যানেজারও বলতে পারেন। ছোটবেলা থেকে এ-বাড়িতে আছে। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মাঠে কৃষিখামার করেছি। তাও দেখাশোনা করে। বাড়িরও সবকিছু তদারক করে। ও না থাকলে আমাকে পথে বসতে হত। ছোটকু তো বরাবর নিষ্ক্রিয়—কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে সে থাকেনি। বলত, 'নুটু থাকতে আবার আমায় কেন! নুটু একা একশো।' সত্যি তাই। তবে পরিতোষ বেচারার মুখের দিকে এখন তাকানো যায় না। ছোটকুর ব্যাপারে সে একেবারে ভেঙে পড়ার দাখিল। ছেলেবেলা থেকে দুটিতে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। পড়াশুনা করেছে। দুটিতে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। ছোটকু নিরুদ্দেশ হলে পরিতোষ সারা ভারত ওর খোঁজে ছোটাছুটি করেছিল। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। সে এক অবস্থা!

—পরিতোষবাবু এলে একটু পাঠিয়ে দেবেন? ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—আসুক। বলব'খন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে কর্নেল বললেন,—আপনার টেলিফোন কোন্ ঘরে আছে মিঃ ব্যানার্জি?

—নীচের ঘরে। ওখানে পরিতোষ অফিসমতো করেছে। সবই ওর দায়িত্বে। আমার বয়স হয়েছে—কিছু দেখাশোনা করতে পারিনে।

—আমি একটা ট্রাংককল বুক করতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে। আসুন, আসুন।

আমি ওঁদের সঙ্গে গেলুম না। ভাতঘুমের টান ধরেছে সঙ্গে-সঙ্গে। একতলায় নেমে সটান আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ার আগে বারান্দার রোদ্দুরে বসে মৌজ করে সিগারেট টানতে থাকলুম। বরাবর এটাই অভ্যাস। সিগারেট শেষ করে ঘরের ভেতর বিছানায় কম্বলটার দিকে লোলুপদৃষ্টে তাকাচ্ছি, কর্নেল এসে গেলেন। এসেই চোখ পাকিয়ে বললেন,—উঁহু! দিনদুপুরে ঘুমোনো মোটেই ভালো কথা নয়। আয়ুক্ষয় হয়। বরং চলো, আমরা একবার ঝটপট ভৈরবগড় ঘুরে আসি।

—ভৈরবগড়! সে আবার কোথায়?

—বেশি দূরে নয়। গঙ্গা পেরুলে বাস। বাসে চেপে মাইল-পাঁচেক মাত্র।

মনে-মনে বুড়োর মুণ্ডুপাত করতে-করতে পা বাড়ালুম। বাজার এলাকার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বললুম—হঠাৎ ভৈরবগড়ে কী ব্যাপার বলুন তো?

—রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে আসি—এত কাছে এসে পড়েছি যখন। তাছাড়া হরিসাধনেরও খোঁজখবর নেব।

—হরিসাধন—মানে সেই নেশাখোর বইচোর! তাকে কি রাজাবাহাদুর আর বাড়ি ঢুকতে দিয়েছেন?

—চলো তো, দেখি।

বাজার এলাকার ভিড় ঠেলে আমরা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছলুম। একটা নৌকো ভাড়া করে ওপারে পৌঁছতে প্রায় একটা ঘণ্টা লেগে গেল। কিন্তু খুব সুন্দর এই জার্নি। কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে পড়ন্ত শীতের বেলায় জলপাখি দেখে নিলেন।

বাসের ভিড় দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। কলকাতার বাসে ভিড় হয় বটে, কিন্তু এর তুলনায় সে-ভিড় কিছুই না। বাসটার আগাপাশতলা লোক ভর্তি। তবু কন্ডাক্টার চ্যাঁচাচ্ছে,—চলে আসেন! চলে আসেন! ছেড়ে গেল! ছেড়ে গেল ভৈরবগড়-দাঁইহাট-কাটোয়া-আ-আ!

হয়তো কর্নেলের সায়েবি চেহারা ও বেশভূষা, কিংবা দাড়িটাড়ি দেখে কন্ডাক্টার ড্রাইভারের ডান ও বাঁ-পাশ থেকে দুই বেচারাকে হিড়হিড় করে নামিয়ে আমাদের জায়গা করে দিল। হতভাগা যাত্রীদ্বয়কে সে কোথায় গুঁজল কে জানে! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—পৃথিবীটা যে নিছক সুখের জায়গা, মাঝে-মাঝে এটা টের পাওয়া দরকার ডার্লিং!

—কিন্তু অন্যদের বঞ্চিত করে এভাবে জায়গা নেওয়া কি উচিত হল?

ড্রাইভার একগাল হেসে বলল,—ওদের কথা ভাববেন না স্যার। ওরা আমার নিজের লোক। বিনিপয়সায় যাচ্ছে। ভৈরবগড়ে আপনারা নামলে ওদের ডেকে নেব।

দুধারের গাছপালাঘেরা পিচের রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলেছে। পাঁচ মাইল যেতে অন্তত বারপাঁচেক বাস থামল। কিছু যাত্রী নামল, উঠল তার দ্বিগুণ। আমাদের নামিয়ে যখন বাসটা চলে গেল, তখন তাকে দেখাচ্ছিল যেন চলন্ত মৌচাক—তবে মৌমাছিগুলো মানুষ এই যা।

বাস-রাস্তার মোড় থেকে সাইকেলরিকশা করে এগিয়ে আমরা রাজবাড়ির ফটকের কাছে নামলুম। একজন দারোয়ান কর্নেলকে দেখামাত্র মিলিটারি সেলাম ঠুকল। বুঝলুম কর্নেলকে সে চিনতে পেরেছে। ওপাশের একতলা সারিবদ্ধ ঘরের বারান্দায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে চায়ের পেয়ালা। তিনি দৌড়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

একটু পরে রাজবাড়ির বিশাল ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করতে-করতে রাজাবাহাদুর এসে গেলেন। প্রণবশংকরের বয়সি মানুষ। পরনে সাদাসিধে পাঞ্জাবি-পাজামা। চোখে পুরু লেন্সের কালো চশমা। কিন্তু রোগা টিঙটিঙে গড়ন। বললেন,—খুব শিগগির এসে পড়েছেন আপনারা। আমি ভেবেছিলুম, ছটার আগে পৌঁছতে পারবেন না। তবে দেখুন কর্নেল, আমার কিন্তু কোনো অপরাধ নেই। আমি জিপ পাঠাতে চাইলুম, আপনি বারণ করে দিলেন।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—আমার এই তরুণ বন্ধু একজন সাংবাদিক। ওকে দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে একটুখানি অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছি। এবার কলকাতা ফিরে দৈনিক সত্যসেবকে মফস্বলের বাসযাত্রীদের কথা লিখবে, আশা করি।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে বুঝতে পারলুম, কর্নেল রামশংকরপুরে প্রণবশংকরের বাড়ি থেকে ফোন করে আসার কথা জানিয়েছেন। আলাপ-পরিচয় এবং কফি খাওয়ার পর উমাশংকরবাবুর হত্যাকাণ্ডের কথা উঠল। রাজাবাহাদুর গম্ভীরমুখে বললেন,—ঘটনাটা ভারি অদ্ভুত। উমাশংকর

একটু তেজি স্বভাবের ছিল বটে; কিন্তু ওকে কেউ খুন করবে ভাবাও যায় না। তাছাড়া তিন মাস গা-ঢাকা দিয়েই বা কেন রইল, আমার কাছে সবটাই একটা রহস্য। তাই গত রাতে প্রণবদা ফোনে ঘটনাটা যখনই আমাকে জানালেন, আমার মনে হল, আপনার শরণাপন্ন হওয়া উচিত। পুলিশ এ-ব্যাপারে কতদূর কী করবে ভরসা হয় না। তো, আমি নিজেও বহুবার আপনার লাইন পাওয়ার চেষ্টা করলুম। এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ওয়ার্থলেস। কলকাতা ধরতেই পারল না। তখন প্রণবদাকে ফের ফোন করে বললুম, আপনি দেখুন চেষ্টা করে। নাম্বার দিচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—হরিসাধনবাবুর খবর কী?

হরিসাধন? —রাজাবাহাদুর বাঁকামুখে বললেন, বইটা চুরি করে ব্যাটাচ্ছেলে আর এ বাড়ি ঢোকেনি। বুঝে গেছে, এবার ত্রিসীমানায় দেখলেই মাথাটি ন্যাড়া করে দেব।

—আচ্ছা, একটা কথা রাজাবাহাদুর! রাম শর্মার আত্মচরিত প্রণবশংকরের কাছে আপনি উপহার পান গত আগস্ট মাসে। আপনার লাইব্রেরিতে রাখার পর আর কাউকে কি পড়তে দিয়েছিলেন!

রাজাবাহাদুর মাথা নেড়ে বললেন,—না। লাইব্রেরিতে বইটা রেখেছিলুম দুষ্প্রাপ্য বইয়ের শেলফে। আপনি বাদে কাউকে পড়তে দিইনি। বইটার কথা আর কেউ জানে বলেও মনে হয় না। নইলে যাঁরা উনিশ শতক নিয়ে রিসার্চ করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই খোঁজখবর করতেন। তাছাড়া আমি তো বিস্তর বইটই পড়ি। কোথাও এ বইয়ের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত পাইনি। এর একটাই কারণ থাকতে পারে। ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ে যাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছে, তাঁর ভাই শ্যামশংকর সাহস করে বইটা ছাপলেও বোধ করি এক কপিও কেউ সাহস করে কেনেননি। জগমোহন বোসের মতো লোক, যে এ ধরনের দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজখবর রাখে, সে পর্যন্ত বইটার নাম শোনেনি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন বলুন তো কর্নেল?

কর্নেল একটু হাসলেন। —উমাশংকর খুন হওয়ার সঙ্গে বইটার যোগাযোগ রয়েছে।

—সে কী!

—উমাশংকর বইটা নিয়ে বহুদিন ধরে মাথা ঘামাচ্ছিলেন।

—বলেন কী! কেন?

—অক্টোবরে এসে বইটা পড়ার পর আপনার সঙ্গে পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেক 'স্যাটর' নিয়ে আলোচনা করেছিলুম, মনে আছে তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ খুব মনে আছে। বলেছিলেন, পেরেকটা সম্পর্কে রামশংকর কেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন!

—প্রণবশংকর হঠাৎ আপনাকে বইটা উপহার দেওয়ায় উমাশংকর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ, উনি পেরেকটার হদিস বই থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পরে যেভাবেই হোক, ওঁর মাথায় ঢুকেছিল, রামশংকর ত্রিনিদাদে ত্রাবাংকা নামে একটা জায়গায় যে বাড়ি করেছিলেন, সেই বাড়িতেই কোথাও ওটা লুকানো আছে। তাই উনি ত্রিনিদাদে পাড়ি দেন। দাদাকে বলেননি। কারণ, দাদা তাঁকে কিছুতেই যেতে দিতেন না।

—কিন্তু ত্রিনিদাদে গিয়েও তো জানাতে পারত। এদিকে সবাই ওর জন্য কষ্ট পাচ্ছে।

—প্রণবশংকরকে তো জানেন। আমার ধারণা হয়েছে, ভদ্রলোক কোনো ব্যাপারে গোপনীয়তা কাকে বলে জানেন না। খুব খোলা মনের মানুষ। পাঁচকান করবেন বলেই হয়তো জানাননি উমাশংকর।

—ঠিক বলেছেন। প্রণবদার পেটে কথা থাকে না।

—উমাশংকর ত্রিনিদাদে যাওয়ার পর ওঁর পাসপোর্ট আর টাকাকড়ি চুরি গিয়ে বিপদে পড়েন। সেই সময় রোডরিগ নামে গোয়ার এক বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। অনুমান করা যায়,

রোডরিগকে তিনি হতাশা ও ব্যর্থতার চাপে তাঁর ত্রিনিদাদে আসার উদ্দেশ্য খুলে বলেছিলেন। পেরেকটার দাম কোটি-কোটি ডলার এখন! এটা কোন্ বড়লোক না সংগ্রহশালায় রাখতে চাইবে। বহু দেশের সরকারও চাইবেন, এটা তাঁদের জাদুঘরে থাক। ভ্যাটিকানে রাখার জন্যও খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুরা এই পবিত্র জিনিসটি দাবি করবেন।

রাজাবাহাদুর সায় দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ—আপনি সেবারও এসব কথা বলেছিলেন।

—রোডরিগের সাহায্যে উমাশংকর রাম শর্মার বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। বিস্তারিত কিছু জানি না। তবে বোঝা যায়, কী ঘটেছিল। পেরেক আবিষ্কার করতে না পেরে রোডরিগের সঙ্গে উমাশংকর ফিরে আসেন। তারপর আমরা কিছু ঘটনা ঘটতে দেখেছি। রোডরিগ বোম্বে এসেই কলকাতার ব্যবসায়ী রামদয়াল সিঙ্গিকে বইটা জোগাড় করতে বলে। তার বদলে সিঙ্গিমশাইকে দু'লক্ষ টাকার অর্ডার পাইয়ে দেবার লোভ দেখায়। যেভাবেই হোক, সেটা জানতে পেরে উমাশংকর সতর্ক হয়ে যান। কলকাতায় ছুটে আসেন। ঘটনাচক্রে সেই দিনই সিঙ্গিমশাই বইটা জোগাড় করেছেন জগমোহনের কাছে।

—ঠিক, ঠিক। ব্যাটাচ্ছেলে হরিসাধনকে দিয়েই জগমোহন এ-কর্মটি করেছিল—এখন বুঝতে পারছি।

—উমাশংকর জনৈক মৈত্র নাম নিয়ে রোডরিগের ব্যবসার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে সিঙ্গিমশায়ের অফিসে রাত কাটান এবং বইটা পেয়ে যান। তারপর মুখোশ পরে জগমোহনের দোকানে ঢুকে টয়পিস্তল দেখিয়ে তাকে শাসিয়ে যান, যেন এ বইয়ের বেচাকেনা আর না করে। সেই বই নিয়ে সন্ধ্যার পর চুপি-চুপি পেছনের ফটক দিয়ে উনি বাড়ি ঢুকছিলেন। কেউ ওত পেতে ছিল। তাঁর মাথায় বাড়ি মেরে বইটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

—নিশ্চয়ই রোডরিগের লোক?

কর্নেল মাথা নাড়লেন,—বোঝা যাচ্ছে না। চুপিচুপি বাড়ি ঢোকার কারণ—উমাশংকর সম্ভবত দাদার বকুনি খাওয়ার ভয়ে সরাসরি প্রথমেই দাদার মুখোমুখি হতে চাননি। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স হলেও উমাশংকর একটু খেয়ালি ছিলেন। ছেলেমানুষি করতেন বিস্তর। কুমুদিনী দেবীর কাছে এসব কথা শুনলুম।

—তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু রোডরিগ ছাড়া আর কার পেরেক নিয়ে মাথাব্যথা থাকা সম্ভব! সে জানবেই বা কী করে যে ছোটকু ওই সময় পেছনের ফটক দিয়ে বাড়ি ঢুকবে?

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন,—একজ্যাক্টলি! এটাই হল আদত প্রশ্ন। সেইজন্যে আমি গোপনে আপনার কাছে জানতে এসেছি, রামশংকরপুরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন কেউ কি আপনার কাছে বইটার খোঁজে এসেছিল?

কেউ আসেনি। —রাজাবাহাদুর চিন্তিত মুখে বললেন।

—একটু স্মরণ করে দেখুন তো!

কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করার পর রাজাবাহাদুর বললেন,—নাঃ! মনে পড়ছে না তেমন কিছু।

—বইটা আপনি আবার ছেপে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন?

রাজাবাহাদুর বললেন,—হ্যাঁ। মার্চ নাগাদ বের করব ভেবে রেখেছিলুম। আপনাকে তো বলেওছিলুম সে কথা। এ মাসেই কলকাতা গিয়ে ভালো একটা প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করতুম। এই তো কিছুদিন আগে প্রণবদা ফোন করে জানতে চাইলেন, কবে বইটা ছাপছি।...

কর্নেল নড়ে বসলেন। ওঁর চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—প্রণবশংকর জানতে চাইছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কেন হঠাৎ একথা জানতে চাইলেন প্রণবশংকর? উনি তো বইটই নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মানুষ নন। সব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন।

রাজাবাহাদুর হাসলেন। —হ্যাঁ—আমি ওঁকে ঠাট্টা করে বললুম, এতকাল ধরে বইটা যে নষ্ট হচ্ছিল, আপনাদেরই ছাপানো উচিত ছিল। পূর্বপুরুষের লেখা বই। দৈবাৎ আমার চোখে না পড়লে তো নষ্ট হয়েই যেত।... প্রণবদা বললেন, ঠিকই বলেছ। তখন বইটার মূল্য বুঝিনি।

—প্রণবশংকর তাই বললেন?

রাজাবাহাদুর কর্নেলের উত্তেজনা লক্ষ করে অবাক হলেন। —আপনি কি প্রণবদাকে...

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, না, না। তা নয়। —তারপর উঠে দাঁড়ালেন। তবে এই কথাটাই জানতে চেয়েছিলুম অবশ্য। যাই হোক, রাজাবাহাদুর, আমি এখনই রামশংকরপুরে ফিরতে চাই। এবার কিন্তু আপনার জিপগাড়িটা চাইছি।

—অবশ্য, অবশ্য। এক মিনিট, আমি রমেনকে বলে দিচ্ছি। আপনাদের একবারে প্রণবদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। গঙ্গায় জিপ পার করার নৌকা আছে। অসুবিধে হবে না।

ফেরার পথে কর্নেলকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করিনি। জিপে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছুতে মিনিট কুড়িরও কম লাগল। নৌকোয় জিপসুদ্ধ পেরুতে মোটে মিনিট-দশেক। যন্ত্রচালিত নৌকোয় গাড়ি পার করার ব্যবস্থা আছে।

বাঁড়ুজ্জেবাড়ির ফটকে আমাদের নামিয়ে দিয়ে রাজাবাহাদুরের জিপগাড়ি চলে গেল। সাতটা বেজে গেছে। বাড়িটা একেবারে নিশুতি নিঝুম হয়ে রয়েছে। জ্যোৎস্না ও কুয়াশায় চারদিকে কেমন ঝিমন্ত দশা।

প্রণবশংকর দাঁড়িয়েছিলেন বসার ঘরের বারান্দায়। বললেন,—ফিরে এলেন ভৈরবগড় থেকে? দেখা হল রাজাবাহাদুরের সঙ্গে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। উমাশংকরবাবুর বডি ফেরত আসেনি মর্গ থেকে?

—চারটেয় এল। সব রেডি ছিল। দাহ হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। এই মিনিট-কুড়ি হল শ্মশান থেকে ফিরছি।

কথা বলতে-বলতে আমরা দক্ষিণের সেই ঘরে গেলুম—যে ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। একটু পরে গঙ্গাধর চা দিয়ে গেল। একথা-ওকথার পর কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, কিছুদিন আগে আপনি রাজাবাহাদুরকে ফোনে রাম শর্মার আত্মচরিত ছাপানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

প্রণবশংকর হঠাৎ এ-কথায় হকচকিয়ে গিয়ে বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করেছিলুম। কে বলুন তো? জিজ্ঞেস করা কি ভুল হয়েছে?

না, না। ভুল নয়। —কর্নেল হাসলেন, আমার জানবার উদ্দেশ্য, হঠাৎ কেন আপনি কথাটা জানতে চাইলেন রাজাবাহাদুরের কাছে?

প্রণবশংকর বিব্রতভাবে বললেন,—দেখুন, ও-সব বই-টইয়ের আমি কিছু বুঝিও না। ইন্টারেস্টও নেই। কোনো ব্যাপারেই নেই। ওই পরিতোষ একদিন বলল যে, বইটা আমাদেরই বের করা উচিত ছিল। আফটার অল, এ-বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা এবং আমাদের পূর্বপুরুষ। রাজাবাহাদুর সত্যি-সত্যি ছাপবেন কি না কে জানে! তাই শুনে আমি বললুম, দেখছি খোঁজ নিয়ে।

—পরিতোষবাবুকে একবার ডাকবেন?

প্রণবশংকর ব্যস্ত হয়ে বললেন,—ওকে আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছি। কিন্তু এত ধকলে বেচারার জ্বর এসে গেছে। শ্মশান থেকে ফিরেই শুয়ে পড়েছে লেপমুড়ি দিয়ে। চলুন বরং, ওর ঘরেই যাওয়া যাক।

আমরা বাড়ির দক্ষিণ ও পূর্বদিক ঘুরে উত্তর-পূর্ব কোণের একটা ঘরের সামনে পৌঁছলুম। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। প্রণবশংকর ডাকলেন,—নুটু! ও নুটু! তারপর দরজায় টোকা দিলেন। সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেললেন এবার। দরজাটা ভেজানো ছিল। খুলে গেল।

বিছানায় আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। প্রণবশংকর আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—সর্বনাশ! জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি? নুটু, ও নুটু! বলে তিনি মাথার দিকের লেপ খানিকটা সরালেন।

কিন্তু সেখানে বালিশের ওপর পরিতোষবাবুর মাথার বদলে একটা লম্বা পাশবালিশের একটু অংশ দেখা গেল। প্রণবশংকর চমকে উঠেছিলেন। কর্নেল এক টানে লেপটা সরিয়ে দিতেই দেখলুম, বিছানায় পাশবালিশটা মানুষের মতো লম্বালম্বি শোয়ানো রয়েছে। প্রণবশংকর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন,—এর অর্থ?

কর্নেল বললেন,—পরিষ্কার। পরিতোষবাবু গতিক বুঝে গা ঢাকা দিয়েছেন।

অসম্ভব! এ হতেই পারে না। —বলে প্রণবশংকর খাপ্পা হয়ে বেরুলেন। বাইরে তাঁর হাঁকডাক শোনা গেল। গঙ্গাধরকে ডাকাডাকি করছেন। বলছেন,—দ্যাখ তো গঙ্গু, নুটু কোথায় গেল?

আমি প্রাজ্ঞ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালুম। উনি ঘরের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখছেন। বালিশ তোশক উলটে টেবিলের কাছে গেলেন। ড্রয়ার টেনে দেখলেন, খোলা। ভেতরে কী সব হাতড়ালেন। তারপর টেবিলের ওপাশে বইয়ের র‍্যাকের কাছে গেলেন। পকেট থেকে টর্চ বেরুল এবার। বললেন,—মাই গুডনেস! এ-সব কী! দেখছ জয়ন্ত, কী কাণ্ড?

বুঝতে না পেরে বললুম,—না তো। কিচ্ছু ঢুকছে না মাথায়।

—জয়ন্ত, এই বইগুলো দেখতে পাচ্ছ না? মোরহেডের লেখা 'মিশরীয় চিত্রলিপির রহস্য।' লর্ড কারনারভনের লেখা 'মমিপ্রথার ইতিহাস।' আর এই দেখো, 'মিশরে রোমানযুগের ইতিহাস'। এটা হল বিখ্যাত বই—'যিশুখ্রিস্ট এবং হারানো পাঁচটি পেরেক।' পরিতোষের ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!

বলে গোয়েন্দাপ্রবর টেবিলের তলা থেকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট টেনে বের করলেন। তারপর দলাপাকানো কাগজ, অ্যাশট্রে থেকে ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো, এইসব আবর্জনা ঘাঁটতে শুরু করলেন।

একটু পরে দেখি, কয়েকটা দলাপাকানো কাগজ টেনে সমান করে ফেললেন এবং পকেটে ভরতে দেরি করলেন না। তারপর কাগজকুচি কুড়িয়ে মেঝেয় ফেলে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। প্রণবশংকর হন্তদন্ত এসে বললেন,—পরিতোষের এ-আচরণের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। কেন সে এমন অদ্ভুত কাজ করল?

সে কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মিঃ ব্যানার্জি, গতকাল সকালে কিংবা আগের রাত্রে কলকাতা থেকে কোনো ট্রাংককল এসেছিল কি?

—এসেছিল। তখন সবে আমি ঘুম থেকে উঠেছি। গঙ্গু বলছিল, নুটুবাবুর কল এসেছে কলকাতা থেকে।

—কী কথাবার্তা হচ্ছিল শোনেননি?

গঙ্গাধর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বলল,—নুটুবাবু কাউকে বারবার বলছিল, বড়বাবু রেগে আছেন। লুকিয়ে সন্ধ্যার পর এসো। আর বলছিল, চোরের ওপর বাটপাড়ি? খুব হাসছিল। ওই দুটো কথা মনে আছে স্যার।

কর্নেল বললেন,—উমাশংকরের দ্বিতীয় ভুল এটা।...

পাঁচ

আমাদের আস্তানায় ফিরে কর্নেল টেবিলের ওপর কাগজগুলো বিছিয়ে বললেন,—এবার দেখো, জয়ন্ত! অবাক হবে। দেখে সত্যি অবাক হলুম। কর্নেলের কাছে যে শব্দবর্গ দেখেছিলুম, একটা কাগজে সেটা লেখা রয়েছে।

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

পরের কাগজগুলোতে লেখা আছে :

কাক, কোকিল, কাঠঠোকরা, কাকাতুয়া, কাদাখোঁচা...

AEORPST SATPORE–সাতপুর...

রমাকান্ত কামার/সুবল বসু/রায়মণি ময়রা/সদা দাস...

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—এই বাংলা নামগুলো সম্ভবত নিছক খেলা। ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে থেকে পড়বে, নামগুলো একই থাকে। খেলা বলার কারণ, ওর তলায় লেখা আছে : কনক/জলজ/নতুন/নন্দন/কণ্টক, চামচা/মলম... খুব জটিল ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামানোর পর এই একটু রিলিফ আর কি!

প্রণবশংকর ওঁর মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়েছিলেন। বললেন,—কর্নেল! দোহাই আপনার! দয়া করে বলুন, পরিতোষই কি ছোটকুকে খুন করেছে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। পরিতোষের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বই হাতানো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খতম।

তাহলে কথাটা পুলিশকে এখনই জানানো দরকার। দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম—সেই সাপের বিষদাঁত ভাঙা দরকার।

প্রণবশংকর রাগে থরথর করে কাঁপছিলেন। কর্নেল তাঁকে শান্ত করতে বললেন,—প্লিজ, আর-একটু ধৈর্য ধরুন। এখনও মোক্ষম প্রমাণ আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।

—কী সেটা?

—মার্ডার উইপন—যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

—সে কি কেউ রাখে? ওই তো পা বাড়ালেই গঙ্গা। ফেলে দিয়েছে।

ফেলে দিলেই বরং ধরা পড়ার চান্স ছিল। কারণ গোবিন্দ-মালি...এক মিনিট। আসছি। বলে কর্নেল হঠাৎ হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন।

প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন,—কোথায় গেলেন অমন করে, বলুন তো জয়ন্তবাবু?

—মনে হচ্ছে, গোবিন্দ মালির কাছে।

প্রণবশংকর গুম হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

ক্রমশ শীত বাড়ছিল। মফস্বলে এত বেশি শীত আন্দাজ করতে পারিনি। যেমন-তেমন একটা জ্যাকেট চড়িয়ে এসেছিলুম। বিছানা থেকে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে আরামকেদারায় বসতে যাচ্ছি। আলো নিভে গেল। নিশ্চয়ই লোডশেডিং। বাড়ির ওপরতলায় প্রণবশংকরের ডাকাডাকি শুনলুম। গঙ্গাধরকে হ্যারিকেন জ্বালতে বলছেন।

বাইরে জ্যোৎস্নায় কুয়াশা জমেছে। প্রাঙ্গণ এবং গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে গা ছমছম করছিল। মিনিট-পাঁচেক হয়ে গেল, তবু গঙ্গাধর আলো দিয়ে গেল না। ভাবলুম, ওকে ডেকে অন্তত একটা

মোমবাতি দিতে বলি। দরজায় গিয়ে 'গঙ্গাধর' বলে ডেকেছি, সেইসময় আবছা একটা শব্দ হল ঘরের ভেতর। ভেতরের দিকের দরজাটাও খোলা রয়েছে। ঘুরে দেখি, আবছা একটা মূর্তি কী যেন করছে—খসখস শব্দ হচ্ছে। বাইরের ময়লা জ্যোৎস্না এদিকের দরজা দিয়ে যেটুকু ছটা পাঠাতে পেরেছে, তা অন্ধকারেরই মতো। বললুম,—কে? কে ওখানে?

অমনি হিসহিস করে কে গলার ভেতর বলে উঠল,—চুপ। খতম করে ফেলব।

কেন যে ছাই টর্চটা বের করে রাখিনি অ্যাটাচি থেকে! তবে আমিও দমবার পাত্র নই। 'গঙ্গাধর! গঙ্গাধর! চোর! চোর!' বলে যেই চিৎকার ছেড়েছি, চোর হতচ্ছাড়া আমাকে এক ধাক্কায় কুপোকাত করে বেরিয়ে গেল। কম্বলজড়ানো অবস্থায় মেঝেয় পড়ে আমার দশা হল ফাঁদে পড়া শেয়ালের মতো। কম্বল থেকে বেরিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালুম, তখন গঙ্গাধরের সাড়া এল। সে হ্যারিকেন নিয়ে দৌড়ে আসছিল।

গঙ্গাধর হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—কী হয়েছে স্যার? চোর ঢুকেছিল?

গম্ভীরভাবে 'হুঁ' বলে টেবিলের দিকে তাকালুম। সেই কাগজগুলো নেই। বুঝলুম, আড়াল থেকে চোর নজরে রেখেছিল তাহলে। কিন্তু ওগুলো নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা? তাছাড়া আর কী হতে পারে?

গঙ্গাধর গোমড়ামুখে তাকিয়েছিল আমার দিকে। বলল,—ওদিকে আরেক কাণ্ড। সেজন্যে আলো আনতে দেরি হল। নুটুবাবুর ঘরেও চোর ঢুকেছিল।

—বলো কী! কিছু চুরি গেছে নাকি?

—বইয়ের র‍্যাক খালি করে বইগুলো নিয়ে গেছে।

—হুঁ, প্রমাণ লোপের চেষ্টা।

গঙ্গাধর বুঝতে না পেরে বলল,—আজ্ঞে?

—কিছু না। তুমি আর-একবার কড়া করে চা খাওয়াতে পারো গঙ্গাধর?

আনছি স্যার। —বলে সে চলে গেল।

এবার চোর পালিয়ে বুদ্ধি বেড়েছে আমার। টর্চ আর খুদে ২২ ক্যালিবারের রিভলভারটা বের করে ফেললুম। কতক্ষণ পরে গঙ্গাধর চা দিয়ে গেল। বলে গেল,—বড়বাবুর শরীর খারাপ করেছে। উনি শুয়ে রয়েছেন। বললেন, ওনারা যেন কিছু না মনে করেন।...

ঘণ্টা-দুই পরে কর্নেল ফিরে এলেন। হাসতে-হাসতে বললেন,—গঙ্গাধরের মুখে সব শুনলুম। আশা করি, বহাল তবিয়তে আছ ডার্লিং!

—আছি। কিন্তু চোর সেই কাগজগুলো নিয়ে পালিয়েছে। ওদিকে পরিতোষবাবুর ঘর থেকে...

হাত তুলে গোয়েন্দামশাই বললেন, শুনলুম। তাতে কী? —বলে বসলেন এবং আস্তেসুস্থে চুরুট ধরালেন।

জিজ্ঞেস করলুম,—কোথায় গিয়েছিলেন?

কর্নেল হেলান দিয়ে বসে বললেন,—আমার বাহাত্তুরে ধরতে যে বেশি বাকি নেই, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে টের পেয়ে যাই। এ বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো লোক গোবিন্দ দাস। না ডার্লিং, পদাবলি রচয়িতা সেই কবি নন, ইনি মালি। আমার দোসর বলতে পারো। কারণ ক্যাকটাস চেনে। অর্কিড চেনে। এ বাড়ির সব পুরোনো গাছের গুঁড়ির ওপর এবং বিভিন্ন ডালে আশ্চর্য সুন্দর এক জাতের অর্কিড আছে। গোড়ার দিকটা লাল, ডগা নীল। এই শীতে তারা ফুল ফোটায়। সাদা থোকা-থোকা ফুল। গোবিন্দ বলল, রাম শন্না কোন্ মুলুক থেকে এনেছিলেন। পাঁচ পুরুষ ধরে তারা এ-গাছ সে-গাছে জন্মাচ্ছে। মরছে, আবার জন্মাচ্ছে।

—সেই অর্কিডের গল্প শুনছিলেন গোবিন্দের কাছে?

—হ্যাঁ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গোবিন্দ এ-বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় সেকেলে আসবাবের মতো। দয়া করে তাকে এখনও আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়নি। তার খুরপিতে মরচে ধরে ভেঙে গেলে তাকে আর নতুন খুরপি এনে দেওয়া হয় না। বড়বাবু তো থেকেও নেই। ম্যানেজারবাবুর যত ঝোঁক চাষবাসে। এমনকি, ওই স্কয়াটে ফুলফলের বাগানে নাকি আলু ফলাবেন বলে শাসিয়েছেন।

—ম্যানেজার কে?

নুটুবাবু—মানে, পরিতোষ।—কর্নেল চোখ বুজে চুরুটে মৃদু টান দিয়ে বললেন, বেচারা গোবিন্দের ছোট শাবলটা আজ সকাল থেকে উধাও। গোরুছাগলের অত্যাচারে অস্থির। সে একটা বেড়া দেবে ভাবছিল। কিন্তু গর্ত খোঁড়ার শাবলটাও কে চুরি করে নিয়ে যায়। কখন চুরি গিয়েছিল সে জানে না। গতকাল বিকেলেও দেখেছিল।

—কর্নেল! আপনি কি...

প্রাজ্ঞ গোয়েন্দা বললেন,—আনন্দের কথা, শাবলের জন্য বড়বাবুর কাছে নালিশের আগেই সেটা সে যথাস্থানে দেখতে পেয়ে খুব অবাক হয়েছে। হ্যাঁ ডার্লিং, ওটা আর ফিরে না এলে গোবিন্দ বড়বাবুকে নালিশ করত। শাবলটা হঠাৎ ওভাবে নিপাত্তা হওয়া নিয়ে জল্পনাকল্পনা হত—বিশেষ করে উমাশংকরের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে।

কর্নেল ফুঁ দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া সরিয়ে ফের বললেন,—কিন্তু শাবলটা যথাস্থানে ফিরে পেয়ে গোবিন্দ খুশি। —তার আর নালিশ জানাবার কারণ রইল না। হ্যাঁ—পরিতোষ তাই শাবলটা গঙ্গায় ফেলে দেয়নি। জানত, গোবিন্দ ও-নিয়ে মাথা ঘামানোর মানুষ নয়। বরং আর ফিরে না পেলেই মাথা ঘামাত। অন্যদের বলত।

—শাবলটা দেখলেন?

মাথা দুলিয়ে কর্নেল বললেন,—নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে শাবলটার কথা আমাকে বলল গোবিন্দ। নইলে ওটা তার কাছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়—অন্তত হারানিধি ফিরে পাওয়ার পর। এখন কথা হচ্ছে, লোহার শাবল দিয়ে মাথার পেছনে আঘাত করলে শাবলে রক্ত লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। রক্ত ছিটকে বেরোতে যত কম হোক, একটু সময় লাগে। ভোঁতা জিনিস দিয়ে চুলের ওপর আঘাত। ধরো, রক্ত ছিটকে বেরোতে অন্তত তিন-চার সেকেন্ড দেরি হবে। তার মধ্যে জিনিসটা সরে এসেছে। কাজেই রক্ত নাও লাগতে পারে। কিংবা যদি লাগে, অনেকসময় খালি চোখে তা দেখা নাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে ফরেনসিক পরীক্ষা ছাড়া কিছু করার নেই। গোবিন্দের শাবলের ওপর এই জোরালো টর্চের আলো ফেলে আতশ কাচ দিয়ে দেখলুম, রক্তের সূক্ষ্ম ছিটে লেগে রয়েছে।

বলে কর্নেল তাঁর ওভারকোটের ভেতর থেকে কাগজে মোড়া ফুটদেড়েক লম্বা একটা জিনিস বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর বের করলেন একটা বই। চামড়ায় বাঁধানো হলেও সেটার অবস্থা জরাজীর্ণ। অবাক হয়ে বললুম,—ওটা কী? কোথায় পেলেন ওটা?

—তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নে বোঝা যাচ্ছে, তুমি এটা কী বই বুঝতে পেরেছ। ডার্লিং, এই সেই হারানো বই—রামশংকর শর্মার আত্মচরিত।

—কোথায় পেলেন আগে বলুন?

কর্নেল নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বললেন,—গোবিন্দ অর্কিড চেনে। রাম শর্মার আনা অর্কিডের বংশধরদের ওপর তার খুব লক্ষ। ফুল ফুটলে তো কথাই নেই, সে আনন্দে নেচে ওঠে। অর্কিডের কথায় খুশি হয়ে বলল, কোণের শিরীষ গাছটার গুড়ির ওপর যে অর্কিডগুলো আছে, ওবেলা তাতে ফুল ফুটেছে। দেখবেন নাকি হুজুর? আমি কেন, সাহেবি-পোশাকপরা সবাই ওর কাছে হুজুর। তো

আমার টর্চ খুব জোরালো। ফুল দেখতে-দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল, অর্কিডের ঝালরের ভেতর কী যেন রয়েছে। পাখির বাসা? গোবিন্দকে বললুম, মই আছে কি? গোবিন্দ বলল, আনছি হুজুর।

বাধা দিয়ে বললুম,—অর্কিডের ভেতর বইটা লুকনো ছিল তাহলে?

ধুরন্ধর বৃদ্ধ কোনো জবাব দিলেন না। বইটা টেনে নিলুম হাত থেকে। চোখ বুজে চুরুটে টান দিয়ে বললেন,—আগে পরিশিষ্টটা পড়ো, শুনি।

পড়তে শুরু করলুম। জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। সবটা পড়া যায় না।

> *...ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের প্রতি উপদেশদান নিমিত্ত কহি যে, সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করিবেক। বিশেষত কহি যে যিশুখ্রিস্টও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া অস্মদেশে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার শোণিতে মনুষ্যজাতির পাপ ধৌত হইয়াছে। অপিচ যে ২ জড়বস্তুসমুদয় তাঁহার শোণিতপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহারা জড়ত্বনাশ হেতু ধন্য হইয়াছে।... উদ্যানে পক্ষীসকল বিচরণ করে। উহারা পঞ্চ প্রকার পঞ্চরূপের প্রতীক। সেই পঞ্চরূপ হইল পঞ্চবাণ। খ্রিস্টের শোণিতপ্রাপ্ত পঞ্চবাণ... উদ্যানের শোভাস্বরূপিণী অপ্সরার রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত কহি যে উহার অনিন্দ্যসুন্দর আননে আত্মবলিদানের স্পর্শগুণ বিধায় উহা ধন্য। বহু প্রযত্নে উহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।...*

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে পরিশিষ্ট পড়তে শুরু করলেন। তারপর বললেন,—জয়ন্ত, সম্ভবত এখানেই রাম শর্মা কী যেন আভাস দিয়েছেন।... অপ্সরামূর্তি —মানে নিশ্চয় ফোয়ারার মাথায় ওই মূর্তিটা। পাঁচকোণা ফোয়ারা।... রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দিচ্ছেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের।... উহার অনিন্দ্যসুন্দর আননে আত্মবলিদানের স্পর্শগুণ... জয়ন্ত! একথায় কি যিশুর ক্রুশে আত্মবলিদান বোঝাচ্ছে না?... কিন্তু কথাটা লক্ষ করো। আ—ন—নে। তার মানে মুখে। মুখে মানে মাথার ভেতর...!

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিতভাবে। আমারও মাথার ভেতর একটা সাড়া জাগল। বললাম, —কিন্তু ফোয়ারার ওই অপ্সরার মাথাই তো নেই। কবে ঝড়ের সময় গুঁড়ো হয়ে গেছে। প্রণবশংকর বলছিলেন না?

কিন্তু তাহলে পেরেকটা নিশ্চয় কেউ পেয়েছিল। দেখেও কিছু টের পায়নি। —কর্নেল অস্থির হয়ে বললেন। একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিস!

বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তারপর টর্চের আলো দেখলুম। কেউ ভারী গলায় বলল, —কোন্ ঘরে?

গঙ্গাধরের কথা শোনা গেল,—ওই যে স্যার, হ্যারিকেন জ্বলছে।

কর্নেল দরজায় উঁকি মেরে বললেন,—মিঃ সান্যাল নাকি? চলে আসুন।

হ্যাল্লো ওল্ড ডাভ! —একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। আরও চারজন পুলিশ অফিসার তাঁর পেছন-পেছন ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলুম গত দু-ঘণ্টা ধরে গোয়েন্দাপ্রবর শুধু গোবিন্দের সঙ্গে আড্ডা দেননি, এঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন।

কর্নেল বললেন,—মিঃ সান্যাল, আলাপ করিয়ে দিই। আমার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি। আর জয়ন্ত, ইনি পুলিশ সুপার মিঃ অজিতেশ সান্যাল।

অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর কাজের কথা শুরু হল। থানা অফিসার ইন্দ্রজিৎ ভদ্র বললেন,—পরিতোষকে মাঠে মিঃ ব্যানার্জির ফার্মে পাওয়া গেছে। কর্নেল, আপনার অনুমান কাঁটায়-কাঁটায় মিলে গেছে। এইমাত্র ওকে পাকড়াও করে সোজা আসছি। আসামি এতক্ষণ থানার লক-আপে।

কর্নেল বললেন,—এই নিন মার্ডার উইপন। ফরেনসিকে পাঠাতে হবে। ওতে রক্ত আর খুনির হাতের ছাপ আছে। পাকা সাক্ষী গোবিন্দ-মালিও।

কাগজের মোড়কে ভরা শাবলটা একজন অফিসার সাবধানে নিয়ে গেলেন। এতক্ষণে প্রণবশংকর নেমে এলেন। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—রাস্কেল খুনিটা ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে কালসাপটা?

মিঃ সান্যাল হাসতে-হাসতে বললেন,—কিছুক্ষণ আগে। আপনার ফার্ম হাউসে গিয়ে রাত কাটাবে ভাবছিল। আগে থেকে ওত পেতে ছিল আমাদের লোকজন। ভাববেন না, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন গিয়ে।

প্রণবশংকর বসলেন। বললেন,—চায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। আপনারা একটু বসুন দয়া করে।

কর্নেল বললেন,—এই দিকটা আমি এখানে আসার পরও ভাবিনি। বোম্বের রোডরিগেরই লোক এখানে আছে ভেবেছিলুম। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলুম না, বোম্বে থেকে ওর পক্ষে এত দ্রুত এখানে যোগাযোগ—তাছাড়া বইটা চুরির খবর পাওয়া, সবই কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছিল। বিকেলে ভৈরবগড় গিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছে যখন জানতে পারলুম, মিঃ ব্যানার্জি বইটা ছাপার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন, তখনই টের পেলুম মিঃ ব্যানার্জির পেছনে থেকে কেউ তাগিদ দিচ্ছে। বহু ভাবনা-চিন্তার পর বইটা এবার তার খুব দরকার হয়েছে। যাই হোক, পরিতোষ মরিয়া হয়ে প্রমাণ লোপের চেষ্টা করছিল লোডশেডিংয়ের সুযোগে। বইটাও শিরীষ গাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু আমি সেখানে থাকায় পারেনি। ভেবেছিল পরে একসময় এসে নিয়ে যাবে। এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করি মিঃ ব্যানার্জিকে।

প্রণবশংকর বললেন,—বলুন কর্নেল।

—ফোয়ারার অপ্সরার মাথা ১৯৪২ সালের ঝড়ে ভেঙে গিয়েছিল। তখন আপনার বয়স কত?

—তা চব্বিশ-পঁচিশ হবে।

—তাহলে তো আপনার মনে থাকা উচিত। অপ্সরার মাথা ভেঙে যাওয়ার পর কোনো পেরেক জাতীয় কিছু দেখেছিলেন ওর ভেতর?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। গলার ভেতর লোহার শূল মতো বসানো ছিল—মুণ্ডটা জোড়া দেওয়ার জন্য।

কর্নেল শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন,—না মিঃ ব্যানার্জি, ওটাই সেই পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেক।

বলেন কি!—প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন। তাই বুঝি ওটার গায়ে খুদে হরফে কীসব লেখা ছিল যেন।

—সেটা তারপর কী হল মনে আছে?

গঙ্গাধর দরজার কাছ থেকে বলল,—কেন বড়বাবু, সেটা গোবিন্দের বউ উপড়ে এনেছিল না? ছাগল বাঁধার খুঁটি করেছিল। গোঁজের মতো জিনিসটা। পায়ে নকশাকাটা ছিল।

কর্নেল বললেন,—তাহলে সেটা গোবিন্দের ঘরে থাকা উচিত।

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে বলল,—গোঁজটা ভারি অপয়া ছিল স্যার। গোবিন্দের বউ যে-ছাগল ওতে বাঁধত, হয় তাকে শেয়ালে নিয়ে যেত, নয়তো রোগে ভুগে মারা পড়ত। শেষে বউটাও মরে গেল। তখন গোবিন্দ একদিন ওটা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। তারপর আর কোনোরকম ক্ষতি হয়নি স্যার!

কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে বললেন,—গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল?

এতক্ষণে দেখলুম দরজার কাছে একটা ভীষণ বুড়োমানুষ তুলোর কম্বল জড়িয়ে বসে রয়েছে। সে খকখক করে কাশল প্রথমে। তারপর বলল,—হুজুর, ওই নকশাকাটা মন্তর লেখা গোঁজই এ বাড়ির সব্বোনাশ করছে। বড়বাবুর ছেলেপুলে নেই। একটা ভাই ছিল, সেও বেঘোরে খুন হলেন।

ইদিকে আমার দশা দেখুন। কোনোরকমে বেঁচে আছি। কোনো সুখশান্তি নেই হুজুর। সেই থেকে কোনো সুখশান্তি নেই। ওই যে কথায় বলে, যত হাসি তত কান্না/ বলে গেছে রাম শন্না! লোহার গোঁজে মন্তর খোদাই করে রেখেছিল কেউ। তাইতে ওনারও ফাঁসিতে পেরান গিয়েছিল।

ঘরে সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আলো জ্বলে উঠল। প্রণবশংকর বললেন,—গঙ্গু! চা কোথায় রে?

আনি বড়বাবু!—বলে গঙ্গাধর চলে গেল।

কর্নেলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, গালে হাত রেখে বসে আছেন চুপচাপ। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। পবিত্র ঐতিহাসিক জিনিসটা উদ্ধার করতে পারলে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে পারতেন তুমুল উত্তেজনায়।...

সকালের ট্রেন ধরব বলে আমরা তৈরি হয়েছিলুম। কর্নেল বললেন,—এসো জয়ন্ত! একবার ফোয়ারার বিদেশিনী অপ্সরাকে বিদায় জানিয়ে আসি।

ফোয়ারার কাছে গিয়ে বললেন,—আমায় সত্যি বাহাত্তুরে ধরেছে ডার্লিং। নইলে কাল দুপুরে এই পাঁচকোণা ফোয়ারা দেখেই অনুমান করা উচিত ছিল, এখানেই রহস্যের চাবি লুকিয়ে রয়েছে। ওটা দেখামাত্র খ্রিস্টীয় পবিত্র নক্ষত্রের কথা মাথায় এসেছিল। অথচ পেরেকটার সঙ্গে এর স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকা উচিত। SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS!—এক মিনিট!

বলে কর্নেল ফোয়ারার ভেতর নেমে ফাটলধরা চুন-কংক্রিটের স্তম্ভের একদিকে ঘাস ও আগাছা সরালেন। একটা ছুরি বের করলেন পকেট থেকে। ছুরি দিয়ে ঘষতে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ।

তারপরই মুখ তেতো করে সরে এলেন। দেখি, স্তম্ভের গায়ে একটা কাকের টেরাকোটা মূর্তি ফুটে বেরিয়েছে। তাহলে অন্যদিকে কোকিল, কাকাতুয়া, কাঠঠোকরা আর কাদাখোঁচাও নিশ্চয় আছে।

কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু আর ঘুরেও দাঁড়াতে রাজি নন। বললেন,—ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। চলে এসো জয়ন্ত।

বুঝলুম, ওই কাকটাই গণ্ডগোল বাধিয়েছে। কাক ওঁর দুচোখের বিষ।...

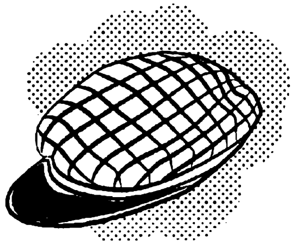

কোদণ্ড পাহাড়ের বা-রহস্য

হাথিয়াগড় বনবাংলো চৌকিদার ঘন্টারাম সাবধান করে দিয়েছিল, সম্প্রতি তল্লাটে একটা মানুষখেকো বাঘের খুব উপদ্রব। কাজেই আমরা যেন সবসময় হুঁশিয়ার থাকি।

কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের পাল্লায় পড়ে বরাবর যা হয়, এবারও তাই হল। হাথিয়াগড় জঙ্গলে কোদণ্ড নামে একটা হাজার দশেক ফুট উঁচু পাহাড় আছে এবং সেই পাহাড় থেকে একটা জলপ্রপাত নেমে প্রকাণ্ড জলাশয় সৃষ্টি করে নদী হয়ে বয়ে গেছে। জলাশয়ে নাকি প্রচুর মাছ। কর্নেল ছিপ ফেলে সেই মাছ ধরবেন এবং আমাকে অসংখ্য দিব্যি কেটে বলেছিলেন, 'না ডার্লিং! পাখি-প্রজাপতি আর নয়। এবার মাছ—স্রেফ মাছই আমার লক্ষ্য। ছিপে গাঁথতে পারি বা না পারি, সেটা কোনো কথা নয়। ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। জলটাও খুব স্বচ্ছ। কাজেই বঁড়শির টোপের কাছে মাছের আনাগোনা স্পষ্ট দেখা যাবে। আসলে আমি মাছের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ইদানীং একটু মাথা ঘামাচ্ছি। কাজেই ডার্লিং....'

বিশেষ করে মনস্তত্ত্বের কচকচি শোনার চেয়ে তক্ষুণি রাজি হওয়াই ভাল। তা ছাড়া বক্তৃতা শোনার চেয়ে মানুষখেকো বাঘ-টাঘের পেটে গিয়ে লুকানো আরও ভাল।

জলাশয়টি এবং পারিপার্শ্বিক অবশ্য সত্যিই সুন্দর। যেন ছবিতে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ। অক্টোবরের বিকেলের রোদ্দুরটিও খাসা। কর্নেল ছিপ ফেলে বসে আছেন। স্বচ্ছ জলের তলায় ছোট-বড় নানা জাতের মাছের আনাগোনাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মাছগুলো বড় সেয়ানা। টোপের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু টোপে মুখ দিচ্ছে না। এদিকে আমার বাঘের ভয়। বারবার পেছনটা এবং এদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছি। বাতাস বন্ধ। কোথাও একটুখানি শব্দ হলেই চমকে উঠছি। কর্নেলের দৃষ্টি কিন্তু ফাতনার দিকে। প্রপাতটা বেশ খানিকটা দূরে বলে জল পড়ার শব্দ অত প্রচণ্ড নয়, আবছা।

একটু পরেই গণ্ডগোল বাধাল হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলে একটা রঙবেরঙের প্রজাপতি। কোত্থেকে উড়ে এসে ফাতনার ওপর বসল। অমনি যথারীতি প্রকৃতিবিদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। ক্যামেরাটি তাক করলেন। কিন্তু ধূর্ত প্রজাপতি বেগতিক বুঝে উড়ে গেল। তখন বাইনোকুলারে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! ছিপটা...' বলে উধাও হয়ে গেলেন। আমি ডাকতে গিয়ে চুপ করলুম। রাগে, ক্ষোভে মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না। একেই বলে, স্বভাব যায় না মলে!

কিন্তু কর্নেলের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষখেকো বাঘটার আতঙ্ক এসে আমাকে কাঠ করে ফেলল।

এমনই কাঠ সেই মুহূর্তে ছিপের হুইলে ঘর-ঘর শব্দ হল এবং শেষে বঁড়শিগেলা শক্তিমান একটা মাছ হ্যাঁচকা টান দিল, ছিপটা আমার হাত ফসকে জলে গিয়ে পড়ল। শুধু বললুম, 'ওই যাঃ!'

অমনি বাঁদিকে ঝোপের আড়াল থেকে প্রকৃতিবিদের গলা শুনতে পেলুম। 'তোমাকে ছিপটার দায়িত্ব দিয়েছিলুম জয়ন্ত!'

ছিপটা তখন জলার মাঝখানে একবার খাড়া হচ্ছে, একবার কাত হচ্ছে। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললুম, 'সরি! কিন্তু আপনি দিব্যি করেছিলেন, পাখি-প্রজাপতির পেছনে দৌড়বেন না।'

কর্নেল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'অভ্যাস, ডার্লিং! যাই হোক, ঘন্টারামই এখন ভরসা। তাকে ডেকে এনে দামি ছিপটা উদ্ধার করা দরকার। আশা করি, মাছটার লোভে সে....'

হঠাৎ কোথাও পরপর দুবার গুলির শব্দ শোনা গেল। কর্নেল থেমে গিয়ে কান খাড়া করে শুনলেন। ব্যস্তভাবে বললুম, 'কোনও শিকারি, নিশ্চয় মানুষখেকো বাঘটাকে গুলি করল।'

কর্নেল বললেন, 'হুঁ', রাইফেলের গুলির শব্দ। এসো তো, ব্যাপারটা দেখা যাক।'

উনি পা বাড়ালে বললুম, 'জঙ্গলে কোথায় কোন শিকারি গুলি করল, খুঁজে বের করবেন কীভাবে?'

'কান, জয়ন্ত, কান।' কর্নেল নিজের একটা কান দেখালেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মার জঙ্গলে গেরিলাযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলুম। কোন শব্দ কোনদিকে কতদূরে হল, সেটা আঁচ করতে পারি। চলে এসো।'

ঘন জঙ্গল আর পাথরের চাঁই ছড়ানো। যেতে-যেতে প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছি, বাঘটা না মরে জখম হয়ে থাকলে দৈবাৎ তার সামনে গিয়ে পড়ি তো অবস্থা শোচনীয় হবে। তবে কর্নেল আমার আগে যাচ্ছেন, সেটাই ভরসা। জখমি বাঘ তাঁর ওপরই ঝাঁপ দেবে। ঝাঁপ দিলে আমি 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' করে পিঠটান দেবই। কোনও মানে হয়?

ক্রমশ জঙ্গল ঘন হচ্ছিল। একে তো বিকেলবেলা, তার ওপর ঘন এবং উঁচু-নিচু গাছের ছায়া আবছা আঁধার করে রেখেছে। কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটছেন। আমি বারবার হোঁচট খাচ্ছি। একখানে একটু খোলামেলা জায়গা, ঘাসে ঢাকা জমি। জমিটার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পাথর। পাথরের নিচের ঘাসগুলো বেশ উঁচু। তার ভেতর কী-একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। তখন কর্নেল দৌড়ে গেলেন। আমিও।

গিয়ে দেখলুম এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

রক্তাক্ত দেহে একজন মানুষ পড়ে রয়েছে। পরনে আঁটোসাঁটো শিকারির পোশাক। পায়ে হান্টিং জুতো। একপাশে রাইফেলটা ছিটকে পড়ে আছে। ফালাফালা পোশাক আর চাপচাপ রক্ত। কর্নেল তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে গেলে অতিকষ্টে বললেন, 'বা...' এবং তারপর শরীরটা বেঁকে স্থির হয়ে গেল।

কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখটা গম্ভীর।

উত্তেজিতভাবে বললুম, 'বা বললেন! মানে বাঘ, কর্নেল! মানুষখেকো বাঘটা ওকে আক্রমণ করেছিল।'

কর্নেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখছিলেন। তারপর রাইফেলটা কুড়িয়ে নিলেন। চেম্বার খুলে পরীক্ষা করে দেখে আস্তে বললেন, 'অটোমেটিক রাইফেল! কিন্তু....'

কর্নেল ঘাসে-ঢাকা জমিটার ওপর হুমড়ি খেয়ে কিছুক্ষণ কী-সব দেখলেন-টেখলেন। জিগ্যেস করলুম, 'কিন্তু কী, কর্নেল?'

কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি বডি পাহারা দাও। এই রাইফেলটা নাও। সাবধান, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা অটোমেটিক। এই পাথরটা যথেষ্ট উঁচু আর নিরাপদ। তুমি পাথরটায় বসে বডি পাহারা দেবে। আমি আসছি।'

বলে রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে ব্যস্তভাবে জঙ্গলে ঢুকলেন এবং নিপাত্তা হয়ে গেলেন। কোনও আপত্তি করার সুযোগই পেলুম না। হাতে রাইফেল। তাতে কী? এই ভদ্রলোকের অবস্থাটা কী হয়েছে? শিকারের বইয়ে পড়েছি, মানুষখেকো বাঘ অতিশয় ধূর্ত।

সাবধানে উঁচু পাথরটার মাথায় চড়ে বসলুম। অদূরে পাহাড়টার কাঁধ ছুঁয়েছে সূর্য। রোদ্দুর ফিকে হয়ে আসছে। এতক্ষণে পাখ-পাখালির তুমুল কলরব শুরু হল। কর্নেল কখন ফিরবেন কে

জানে! কাছাকাছি জঙ্গলের ভেতর মানুষখেকোটা কোথাও নিশ্চয় ওঁত পেতে আছে। শিকারটিকে কড়মড়িয়ে খেতে আসবে। তখন ধরা যাক, গুলি করলুম। কিন্তু যদি ফস্কে যায় গুলি? বাঘটা লাফ দিয়ে আমকে...সর্বনাশ!

দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকল। জীবনে এমন সাংঘাতিক অবস্থায় কখনও পড়িনি। পাথরটার সবচেয়ে উঁচু অংশে বসে আছি। তাই নিচের রক্তাক্ত মৃতদেহ চোখে পড়ছে না। পড়লে ওই ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে আরও ভয় পেতুম।

কিন্তু কর্নেল আমাকে মড়ার পাহারায় বসিয়ে রেখে কোথায় গেলেন? বাংলো এখান থেকে অন্তত এক কিলোমিটার দূরে। চৌকিদার ঘন্টারামকে দিয়ে হাথিয়াগড় টাউনশিপে খবর পাঠাবেন কী? কার কাছে খবর পাঠাবেন। হয়তো থানায়। তা হলে এখানে কর্নেল এবং পুলিশ এসে পৌঁছতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে! এদিকে সঙ্গে টর্চ নেই।

এইসব দুর্ভাবনায় অস্থির হচ্ছি, এমন সময়ে সামনেকার জঙ্গল ফুঁড়ে দুজন লোক বেরুল। তারা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। একজন হিন্দিতে বলল, 'হায় রাম! বাবুজির বরাতে এই ছিল?' তারপর রক্তাক্ত দেহটির দিকে ঝুঁকে কান্নাকাটি শুরু করল।

অন্যজন বলল, 'অত করে বারণ করলুম। বাবুজি শুনলেন না। হায় হায়! এ কী হল?'

জিগ্যেস করলুম, 'আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

প্রথমজন চোখ মুছে বলল, 'হাথিয়াগড় থেকে, বাবুজি! একজন বুড়োসায়েব খবর দিলেন, আমাদের বাবুজি বাঘের পাল্লায় পড়ে মারা গেছেন।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'দেরি কোরো না! হাত লাগাও। এখানে বডি পড়ে থাকলে মানুষখেকো বাঘটা বডি খেতে আসবে। ওঠাও ওঠাও!'

প্রথমজন বলল, 'বাবুজির বন্দুক?'

বললুম, 'এই যে!'

রাইফেলটা আমার হাতে দেখামাত্র সে হাত বাড়াল। 'দিন স্যার! বাবুজির খুব শখের বন্দুক ওটা!'

এই সময় কাছাকাছি কোথাও জঙ্গলের ভেতর বাঘটা ডাকল, আ-উ-ম। তারপর চাপা গরগর গজরানিও শোনা গেল। আমি পাথর থেকে নামতেই রাইফেলটা প্রায় ছিনিয়ে নিল প্রথম লোকটা। আবার বাঘের গরগর গর্জন শুনতে পেলুম। রাইফেল বগলদাবা করে প্রথম লোকটি তাড়া দিল, বাঘটা এসে পড়েছে। বডি ওঠাও।'

দুজনেই তাগড়াই চেহারার লোক। গায়ে জোর আছে বোঝা গেল। শিকারি ভদ্রলোকের রক্তাক্ত মৃতদেহ কাঁধে তুলে ওরা ব্যস্তভাবে হাঁটতে শুরু করল।

আমি ওদের অনুসরণ করলুম। জঙ্গলের ভেতর ততক্ষণে আবছা আঁধার ঘনিয়েছে। ওরা লম্বা পায়ে দৌড়চ্ছে। নাগাল পাচ্ছি না। খানিকটা এগিয়ে গেছি, ডানদিকে আবার বাঘের গরগর গজরানি শুনতে পেলুম। একখানে গাছপালার ফাঁক গলিয়ে একটু ফিকে আলো এসে পড়েছে। সেখানে একটা ঝোপের ফাঁকে বাঘের মাথা দেখতে পেলুম।

অমনি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। হ্যাঁ, মাথা খারাপই বটে। নইলে কী করে গাছে চড়ে বসলুম এর ব্যাখ্যা হয় না।

গাছটা অবশ্য তত উঁচু নয় এবং কয়েকটা ডাল নিচুতে নাগালের মধ্যেই ছিল। যতটা উঁচুতে পারা যায়, উঠে গেলুম। হাত ছড়ে গেল। জামাও একটু-আধটু ফর্দাফাঁই হল। ডালে বসে নিচের দিকে লক্ষ্য রাখলুম, বাঘটা মড়া হাতছাড়া হওয়ার রাগে এবার আমাকেই খাওয়ার জন্য ফন্দিফিকির করছে কি না। শিকারের বইয়ে বাঘের গাছে চড়ার কথাও পড়েছি। সেটাই দুর্ভাবনার ব্যাপার।

কিন্তু বাঘটা আর গজরাচ্ছে না। হয়তো মড়াবাহী লোকদুটোকেই চুপি-চুপি অনুসরণ করেছে। এখন কথা হল, কর্নেলের কাছেই ওরা ওদের বাবুজির খবর শুনেছে, অথচ, কর্নেল ওদের সঙ্গে এলেন না কেন? সম্ভবত ওরা দৌড়ে এসেছে এবং কর্নেল তাই ওদের নাগাল পাননি। এবার যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বেন। কান খাড়া করে বসে রইলুম।

কতক্ষণ কেটে গেল। জঙ্গল অন্ধকারে ছমছম করতে থাক্‌ল। চারদিকে নানারকমের ভূতুড়ে শব্দ। কাঠ হয়ে বসে আছি, হঠাৎ নিচের দিকে টর্চের আলোর ঝলক এবং কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম। 'এই যে! এদিকে।'

সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দিলুম, 'কর্নেল! কর্নেল!'

নিচে থেকে আমার ওপর আলো এসে পড়ল। কর্নেল বললেন, 'তুমি গাছের ডগায় কী করছ, জয়ন্ত?' তারপর ওঁর স্বভাবসিদ্ধ হা-হা অট্টহাসি।

রাগ চেপে অতি কষ্টে গাছ থেকে নেমে বললুম, 'কোনও মানে হয়? লোকদের খবর দিয়ে এতক্ষণে এসে জিগ্যেস করছেন, গাছের ডগায় কী করছি!'

কর্নেলের সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার আর জনা-দুই কনস্টেবল এসেছেন। কর্নেল আমার কথা শুনে বললেন, 'লোকদের খবর দিয়ে মানে? যাঁদের খবর দিতে গিয়েছিলুম, তাঁরা তো আমার সঙ্গে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'দুজন লোক বডি তুলে নিয়ে গেল! তারাই বলল....'

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বলে উঠলেন, 'মাই গুডনেস! আমারই বুদ্ধির ভুল! আমাকে নির্ঘাত বাহাত্তুরে ধরেছে, আগাগোড়া খুলে বলো তো জয়ন্ত!'

সব শোনার পর কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত এমন বোকামি করে বসবে, ভাবিনি, যাই হোক, চলুন মিঃ সিনহা। আগে ঘটনাস্থলটা দেখাই।'

পুলিশ অফিসারটির নাম মিঃ সিনহা। তিনি পা বাড়িয়ে বললেন, 'জয়ন্তবাবু বললেন, সত্যিই বাঘটাকে দেখেছেন। গজরানিও শুনেছেন। কাজেই ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি।'

কর্নেল এদিকে-ওদিকে টর্চের আলো ফেলেছিলেন। একখানে আলো পড়তেই বাঘের মাথাটা ঝোপের ফাঁকে দেখা গেল। সবাই থমকে দাঁড়ালেন। কনস্টেবলরা বন্দুক তাক করল। কর্নেল তাদের বললেন, 'সবুর! খামোকা গুলি খরচ করে লাভ নেই।'

তারপর নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন ঝোপটার দিকে। বাঘটা আর একটুও গর্জন করছিল না। কর্নেল সোজা গিয়ে বাঘের মাথাটা খামচে ধরলেন এবং হা-হা করে হেসে উঠলেন।

মিঃ সিনহা বললেন, 'এ কী কর্নেল!'

'হ্যাঁ—একটা নিছক ডামি মুন্ডু। নকল মুন্ডু।' কর্নেল বাঘের মুন্ডুটা উপড়ে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। 'আসলে জয়ন্তকে ভয় দেখাতেই এই চালাকি করেছিল।'

বললুম, 'কিন্তু বাঘের ডাক?'

'ওটাও নকল।' কর্নেল সেই খোলা ঘাসজমিটায় পৌঁছে ফের বললেন, 'অনেক শিকারি অবিকল বাঘের ডাকের নকল করে বাঘকে আকৃষ্ট করেন। জিম করবেট বা অ্যান্ডারসনের শিকার-কাহিনিতে পড়েছি। তা ছাড়া জয়ন্ত যে অবস্থায় পড়েছিল, শেয়ালের ডাককে বাঘের ডাক বলে ভুল হতো ওর!'

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, 'আমি অত বোকা নই।'

কর্নেল বললেন, 'মজাটা এই যে নিজের বোকামি নিজেই টের পাওয়া যায় না। ডার্লিং, কেউ এসে মড়াটা দাবি করলে সেটা না হয় দেওয়া চলে, হাতের সাংঘাতিক অস্ত্র—মানে, রাইফেলটা দেওয়া যায় না।'

খোলা জায়গাটায় কিছু আলো আছে তখনও। মিঃ সিনহা ঘাসের ওপর রক্তের ছাপ টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। বললেন, 'হুঁ তলার মাটিটা নরম। কিন্তু সত্যিই বাঘের পায়ের ছাপ নেই।'

'নেই।' কর্নেল বললেন। 'সেটাই আমার সন্দেহের কারণ!'

মিঃ সিনহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বডিটা কোথায় পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবে—এখনই ব্যবস্থা করা দরকার।'

এতক্ষণে লক্ষ্য করলুম, তাঁর হাতে একটা ওয়াকি-টকি রয়েছে। বেতারে চাপা গলায় থানায় মেসেজ পাঠালেন। তারপর বললেন, 'চলুন কর্নেল ফেরা যাক। আপনাদের বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে যাব।'

সামান্য দূরে জঙ্গলের একটেরে পিচের রাস্তা। সেখানে পুলিশের জিপ অপেক্ষা করছিল।...

বনবাংলোর বারান্দায় বসে কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, 'ছিপটা আর মাছটার কথা ভেবে এ রাতে আমার ঘুমের বারোটা বেজে যাবে ডার্লিং! সকালে....'

কথা কেড়ে বললুম, 'কিন্তু ওই শিকারি ভদ্রলোক পাণ্ডেজির ব্যাপারটা আমার ঘুমেরও বারোটা বাজাবে।' কর্নেল হাসলেন। 'হুঁ, ব্যাপারটা অবশ্য রহস্যময়। তবে স্রেফ তোমার বোকামির জন্যই রহস্যটা ঘনীভূত হল। তোমার হাতে একটা রাইফেল ছিল জয়ন্ত। পাঁচটা গুলির তিনটে ভরা ছিল। তুমি ওদের বডি তুলে নিয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারতে—যতক্ষণ না আমি পৌঁছচ্ছি!'

'কিন্তু আপনি কোনও আভাস দিয়ে যাননি!'

'ঘটনার আকস্মিকতায়, ডার্লিং!' কর্নেল সাদা দাড়ি চুলকে বললেন। 'দুবার গুলির শব্দ। তারপর পান্ডেজি বা বলেই শেষ-নিঃশ্বাস ফেললেন। বাঘের কথাই ভাবা সে-মুহূর্তে স্বাভাবিক। তারপর মনে হল, গুলি-খাওয়া বাঘ শিকারির ওপর ঝাঁপ দিলেও গর্জন করবে ক্রমাগত। অথচ গর্জনের শব্দ শুনিনি তো! তখনই প্রথম সন্দেহ জাগল। এটা কোনও হত্যাকাণ্ড নয় তো? সম্ভবত আমাদের হঠাৎ গিয়ে পড়ায় খুনিরা গা ঢাকা দিয়েছে। তা ছাড়া ঘাসের তলায় বাঘের পায়ের ছাপ নেই!'

'পান্ডেজি ভদ্রলোক কে?'

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন! তারপর অভ্যাসমতো চোখ বুজে বললেন, 'শিবচরণ পাণ্ডে হাথিয়াগড়ের বনেদি বংশের মানুষ। শিকারে প্রচণ্ড নেশা ছিল। আমার একজন পুরানো বন্ধুও বলতে পার ওঁকে।' তারপর চোখ খুলে চাপাস্বরে বললেন, ফের, আসলে পান্ডেজির চিঠি পেয়েই এবার আমার এখানে আসা এবং প্রপাতের জলায় মাছ ধরতে যাওয়া।'

চমকে উঠে বললুম, 'কী চিঠি?'

গোয়েন্দাপ্রবর জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করে দিলেন। চিঠিটা পড়ে আরও অবাক হয়ে গেলুম। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটার বাংলা করলে এই দাঁড়ায় :

'প্রিয় কর্নেল,

সম্প্রতি হাথিয়াগড় এলাকার একটা ধূর্ত মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। মানুষখেকো বাঘ ধূর্ত হয়। কিন্তু এ বাঘটা এমনই ধূর্ত যে, তার মানুষ মারার খবরই শুধু শুনি। কিন্তু মড়ার পাত্তা পাই না। খুব খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এটা কোনও ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপারটা হল : কোদণ্ড পাহাড়ের জলপ্রপাতের নিচে যে জলটা আছে, সেখানে বাঘটা জল খেতে আসবে ভেবে পরপর তিনটে রাত ওঁত পেতে ছিলুম। প্রতি রাতেই একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছি। প্রপাতের দিকটাতে একটা উঁচু পাথর জল থেকে মাথা তুলেছে সেটা দেখতে কাছিমের খোলের মতো। ওখানে হঠাৎ একটা আলো জ্বলে ওঠে। আলোটা কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে। তারপর নিভে যায়। এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় সব দেখতে পাই। প্রথমে আলোটা জ্বলে তারপর দেখি,

একটা ছোট্ট নৌকো এগিয়ে চলেছে আলোটার দিকে। প্রথম দুটো রাত ভেবেছিলুম জেলে-নৌকো মাছ ধরছে। কিন্তু মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব চলছে। কাদের এত সাহস হতে পারে? তৃতীয় রাতে জোরাল টর্চের আলো ফেলে নৌকোর লোকগুলোকে ডাকলুম। অমনি ওরা নৌকো অন্যদিকে ঘুরিয়ে দক্ষিণপাড়ে চলে গেল। অনেকটা ঘুরে পিচ রাস্তার ব্রিজ হয়ে সেখানে গেলুম। নৌকোটা বাঁধা আছে। লোক নেই। ব্যাপারটা রহস্যময়। সকালে আবার গেলুম সেখানে। নৌকোটা নেই। আমি এর মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে রহস্যটা ফাঁস করে যান। শুভেচ্ছা রইল।

শিবচরণ পান্ডে

চিঠিটা ফেরত দিয়ে বললুম, 'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি বটে!'

'হুঁ, রহস্য!' কর্নেল দাড়ি নেড়ে সায় দিলেন এবং চওড়া টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়, শুনি জয়ন্ত!'

একটু হেসে বললুম, 'আমি তো বোকা।'

'না না। বোকারা গাছে চড়তে পারলেই বুদ্ধি খোলে—চীনা প্রবাদ। তুমি গাছে চড়তে পেরেছ, ডার্লিং!'

কথার ভঙ্গিতে আরও হাসি পেল। বললুম, 'তা ঠিক। তারপর থেকে আমার মাথা সত্যি খুলে গেছে। এখন বুঝতে পারছি, ওই জলায় কেউ বা কারা গোপনীয় কিছু করছে এবং পান্ডেজি সেটা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে মেরে ফেলা হল।

আমরা গিয়ে না পড়লে—সরি, আপনি গিয়ে না পড়লে ওটা মানুষ-খেকো বাঘের হাতে মৃত্যু বলে চালানো সোজা ছিল।'

'বাঃ! অপূর্ব! খাসা বলেছ ডার্লিং!' বৃদ্ধ ঘুঘুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রশংসায় খুশি হয়ে বললুম, 'মানুষখেকো বাঘের ব্যাপারটাও রটনা বলে মনে হচ্ছে। যাতে জঙ্গলে লোকেরা না ঢোকে।'

কর্নেল সায় দিলেন। 'ঠিক, ঠিক!' বিশেষ করে ওই জলায় জেলেরা মাছ ধরতে যায়। তারাও বাঘের ভয়ে যাতায়াত বন্ধ করেছে। যাই হোক, সকাল ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। তবে সত্যি জয়ন্ত, আমার ছিপটাও খুব দামি। আর মাছটাও নিশ্চয় বড়। দেখা যাক, ঘন্টারাম মাছটার লোভে আমার ছিপটা উদ্ধার করে দেয় নাকি। ঘন্টারাম! ঘন্টারাম! ইধার আও তুম!'

কর্নেল ঘন্টারামকে ডাকতে থাকলেন। ঘন্টারামের সাড়া পাওয়া গেল কিচেন থেকে। সেই রাতের খাবার তৈরি করছিল। এই সময় হঠাৎ কর্নেল মুচকি হেসে চাপা গলায় বললেন, 'কিন্তু জয়ন্ত, তোমার থিওরিতে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। পান্ডেজির শেষ কথাটি ''বা...।'' এ সম্পর্কে তোমার কী বক্তব্য?'

এবার একটু ঘাবড়ে গেলুম। বললুম, 'বা-রহস্য সত্যিই গোলমেলে। ওকে যদি মানুষেই হত্যা করে থাকে, 'বা...' মানে, বাঘ বলছে চাইলেন কেন?' বলেই ফের বুদ্ধি খুলে গেল। উত্তেজিতভাবে বললুম, 'হাঁ—বুঝেছি। পান্ডেজি এই নকল বাঘের মুন্ডুটা ঝোপের ফাঁকে দেখেছিলেন। মুন্ডুটা....'

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুন্ডুটা প্লাস্টিকে তৈরি খেলনার মুখোশ। তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ ডার্লিং! এই নকল মুন্ডু সম্পর্কেই হয়তো পান্ডেজির কিছু বক্তব্য ছিল। মৃত্যু সেই কথাটি শেষ করতে দেয়নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা 'বা...রহস্যে' আটকে যাচ্ছে দেখছি। নকল বাঘের মুন্ডুর কথাই বা বলতে গেলেন কেন পান্ডেজি?'

এতক্ষণে ঘন্টারাম সেলাম দিয়ে ঘরে ঢুকল। কর্নেল বললেন, 'এসো ঘন্টারাম। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

ঘন্টারাম বিনীতভাবে বলল, 'বোলিয়ে কর্নেলসাব।' তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।....

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। ভোরের দিকেই বোধহয় ঘুমটা আমাকে বাগে পেয়েছিল। কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, 'নটা বাজে। উঠে পড়ো ডার্লিং!'

একটু অবাক লাগল। কর্নেলের প্রাতঃভ্রমণে বেরুনোর অভ্যাস আছে জানি। কিন্তু বরাবর সবখানেই সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ করে এসে আমাকে ঘুম থেকে ওঠান। অথচ আজ সকালে নটা অবধি বাইরে ছিলেন।

তারপরই মনে পড়ে গেল ছিপ উদ্ধারের পরিকল্পনাটা। তাহলে ঘন্টারামকে নিয়ে প্রপাতের জলায় ছিপ উদ্ধারে গিয়েছিলেন। তাই এত দেরি? বললাম, 'ছিপটা পেলেন?'

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'না :! ঘন্টারামের ধারণা, ছিপসুদ্ধু মাছটা জলার দক্ষিণে স্রোতের দিকটায় চলে গিয়েছিল। এতক্ষণ কয়েক মাইল দূরে চলে গেছে নদীর ধারে কোনও আদিবাসী বসতির কাছে গিয়ে পড়লে তাদের পেটে মাছটা হজম হয়ে গেছে। অবশ্য ছিপটা উদ্ধার করা যায়। দেখা যাক।' বলে ইজিচেয়ারে বসলেন। চোখ বন্ধ। দাড়িতে আঙুলের চিরুনি কাটতে থাকলেন।

বাথরুম সেরে এসে দেখি, টেবিলে ব্রেকফাস্ট রেডি। ঘন্টারামকে আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে। সে চলে গেলে বললুম, 'আপনি খুব মুষড়ে পড়ছেন দেখছি। কিন্তু ঘন্টারামের মুখটা বড় বেশি তুম্বো হওয়ার কারণ আশা করি মাছ না পাওয়ার ব্যর্থতা নয়?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ জয়ন্ত!' বৃদ্ধ ঘুঘু মিটিমিটি হাসতে থাকলেন। 'বেচারাকে সাতসকালে বঁড়শি-বেঁধা মাছের বদলে একটা মড়া ঘাঁটতে হয়েছে। তার ওপর ওর বউ ওকে মড়া ঘাঁটার জন্য আবার একদফা স্নান করিয়েছে।'

চমকে উঠে বললুম 'মড়া?'

'পান্ডেজির ডেডবডি।' কর্নেল টোস্টে কামড় দিয়ে বললেন, 'পুলিশ অফিসার মিঃ সিনহা খুব জেদি মানুষ। পুরো পুলিশবাহিনী এবং বন দফতরের সব ক'জন রক্ষী, মায় রেঞ্জার সাহেবকেও লড়িয়ে দিয়েছিলেন। তল্লাটের বনজঙ্গল শ্মশান-মশান সারারাত চষা হয়েছে। বেগতিক দেখে খুনিরা পান্ডেজির বডি ওই জলায় তলার পাথর বেঁধে ডুবিয়ে রেখেছিল। ঘন্টারাম সেটা উদ্ধার করেছে। সে মোটা বখশিস পাবে সরকার থেকে! কিন্তু....'

কর্নেল খাওয়ায় মন দিলেন। বললুম, 'কিন্তু কী?'

'ওই বা....।'

চুপ করে গেলুম। বা-রহস্য সত্যিই নির্ভেজাল রহস্য। এই সময় দরজা দিয়ে চোখে পড়ল, বাংলোর লনে ঘন্টারামের হামাগুড়ি দেওয়া বাচ্চা সেই নকল বাঘের মুন্ডুটা নিয়ে খেলছে। তার মা এসে বাচ্চাটাকে বকাবকি করে কোলে তুলে নিল এবং মুন্ডুটা ছুড়ে ফেলে দিল। বুঝলাম, ঘন্টারামের বউ ওটাকে অলুক্ষুণে ভেবেছে। কিন্তু মুন্ডুটা কর্নেল কি বাচ্চাটাকে উপহার দিয়েছিলেন?

প্রখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবর কীভাবে সেটা আঁচ করে বললেন, 'ঘন্টারামের বউ খুব ভয় পেয়ে গেছে, জয়ন্ত! ওর ধারণা জীবজন্তুর নকল মুন্ডু বানানো ঠিক নয়। এতে তাদের ঠাট্টা করা হয়। তার ওপর মানুষখেকো বাঘ। তার নকল মুন্ডু! মানুষখেকো বাঘটা রেগে আগুন হয়ে গেছে এতে।'

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। একটু পরে কফিতে মন দিলেন, ওঁর প্রিয় পানীয়। বললুম, 'জলার সেই কাছিমের খোলের মতো পাথরটা পুলিশ পরীক্ষা করল না? ওখানেই তো পান্ডেজি আলো দেখেছিলেন।'

'নিরেট পাথর।' কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন।

'নৌকো নিয়ে ওখানে গিয়েছিলুম। তা ছাড়া পাথরটা বেজায় পিছল। শ্যাওলা জমে আছে। ওঠা কঠিন। উঠলেও দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। মিঃ সিনহা পা হড়কে জলে পড়ে গেলেন। পুলিশের উর্দি, রিভলবার সব ভিজে কেলেঙ্কারি।'

একটু ভেবে বললুম, 'তা হলে আলোটা অন্য কোথাও দেখে থাকবেন পান্ডেজি। দূর থেকে দেখা ভুল হতেই পারে!'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'চলো, বেরুনো যাক।'

'ছিপ উদ্ধারে নাকি?'

'ঘন্টারামকে সে-দায়িত্ব দিয়েছি। আমরা কোদন্ড পাহাড়ে জলপ্রপাতের মাথায় উঠব, ডার্লিং! একটু কষ্টকর। তবে তোমার তো মাউন্টেনিয়ারিঙে ট্রেনিং নেওয়া আছে। এসো, বেরিয়ে পড়ি....!'

এই খেয়ালি বুড়োর পাল্লায় পড়ে অনেকবার ভুগেছি। কিন্তু সে-কথা বলতে গেলেই উনি আমার মাথার ঘিলুর দিকে আঙুল তুলবেন। সবই নাকি আমারই বোকামির ফল। কাজেই কথা না বাড়ানোই ভালো। তবে এবারকার কোদণ্ড পর্বতারোহণ মন্দ লাগছিল না। প্রপাতটা শুধু সুন্দর নয়, যেন একটা প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রাও। তাছাড়া দুধারে বৃক্ষলতা এবং রঙবেরঙের ফুলে সাজানো।

ফুল থাকলে প্রজাপতি থাকবে এবং গাছ থাকলে পাখি। প্রকৃতিবিদ প্রপাতের মাথায় চড়তে-চড়তে প্রচুর ছবি তুললেন। বাইনোকুলার চোখে রেখে কতবার থেমে পড়লেন। আমি যখন মাথায় পৌঁছে গেছি তখন উনি ফুট বিশেক নিচে একটা পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করেছেন। ওপরে আসলে একটা নদী। নদীটা এখানে এসে নিচে ঝাঁপ দিয়ে প্রপাত সৃষ্টি করেছে। গনগনে রোদ্দুর। তাতে পাহাড়ে চড়ার পরিশ্রম। হাঁপ ধরে গেছে! একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। যেখানে পাথর মাটি মিশে আছে। ঘন জঙ্গল। দূরে উত্তরে বনবাংলোটি দেখা যাচ্ছিল। ক্লান্তভাবে গাছের নিচে পাথরটাতে বসেছি, অমনি পেছন ঝোপে মচমচ শব্দ হল। ঘুরে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে দুটো লোক বাঘের মতো আমার ওপর এসে পড়ল এবং মুখে টেপ সেঁটে দিল। চ্যাঁচানোর সুযোগই পেলুম না। কাল বিকেলে দেখা সেই লোকদুটোই বটে।

একজন একটা ছুরি গলায় ঠেকিয়েছিল। কাজেই হাত-পা নাড়ানো বা ধস্তাধস্তির উপায় নেই। গলায় ছুরি ঢুকে যাবে।

তারপর আমার চোখে রুমাল পড়ল এবং টের পেলুম আমি ওদের কাঁধে। কাল বিকেলে পান্ডেজির মড়া যেভাবে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেভাবেই আমাকেই নিয়ে চলল ওরা।

কতক্ষণ পরে কাঁধ থেকে আমাকে নামিয়ে বসিয়ে দিল। তারপর চোখ থেকে রুমাল খুলে নিল। মুখের টেপটা কিন্তু খুলল না। জায়গাটা প্রথম কিছুক্ষণ অন্ধকার মনে হচ্ছিল। একটু পরে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। তখন দেখলুম, এটা একটা মন্দির। ফাটলধরা এবং পোড়ো মন্দির। দেয়াল ফুঁড়ে শেকড়বাকড় বেরিয়েছে। সামনে বেদির ওপর শিবলিঙ্গ। বেদির একপাশে একজন গাব্দাগোব্দা ষন্ডামার্কা চেহারার লোক পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পেল্লায় গোঁফ। কুতকুতে চোখে ক্রুর হাসি। সে খৈনি ডলছিল। খৈনিটা দুই সাঙাতকে বিলি করে বাকিটুকু নিজের মুখে ঢোকাল। তারপর হিন্দিতে বলল, 'টেপ খুলে দে। কথা বের করি।'

হ্যাঁচকা টানে আমার মুখের টেপ খুলল একজন। যন্ত্রণায় আঃ করে উঠলুম। বেদির লোকটা বলল, 'এই ছোট টিকটিকি! পাণ্ডে ব্যাটাচ্ছেলে মরার সময় কী বলেছে?'

ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'বা—'

'চো-ও-প্!' বলে সে পাশ থেকে একটা জিনিস তুলে দেখাল। জিনিসটা অবিকল মানুষের হাতের গড়ন। কিন্তু পাঁচটা আঙুল নখের মতো বাঁকা এবং ধারালো। 'দেখেছিস এটা কী? এর নাম বাঘনখ। পাণ্ডের মতো ফালাফালা করে ফেলবো। কলজে উপড়ে নেবো। সত্যি কথা বলো!'

মিনতি করে বললুম, 'বিশ্বাস করুন। পাণ্ডেজি শুধু 'বা' বলেই মারা যান।'

'শুধু বা! আর কিছু নয়?' বলে সে বাঘনখটা উঁচিয়ে ধরল। আঁতকে উঠে বললুম, 'বিশ্বাস করুন। শুধু বা!'

লোকটা তার সাঙাত দুজনকে বলল, 'তোমরা এবার বুড়ো টিকটিকিটাকে ধরে নিয়ে এসো। বেগড়বাই করলে ছুঁড়ে প্রপাতের তলায় ফেলে দেবে।'

ওরা তখুনি বেরিয়ে গেল। কর্নেলের জন্য আঁতকে কাঠ হয়ে রইলুম। চোখে বাইনোকুলার রাখলে ওঁর আর কোনও দিকে মন থাকে না। সেটাই ভাববার কথা।

লোকটা বলল, 'এই উল্লুক! 'বা' মানে কী বুঝেছিস?'

'আজ্ঞে, বা মানে বাঘ।'

'আর ওই দাড়িওলা বুড়ো বুঝেছে?'

'সেটা ওঁর মুখেই শুনবেন। আমাকে তো উনি খুলে কিছু বলেননি।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বড্ড দেরি করছে। হলটা কী? একটা বাহাত্তুরে বুড়োকে ধরে আনতে এতক্ষণ লাগছে!' বলে সে মন্দিরের দরজার কাছে গেল। তারপর আপনমনে গজগজ করতে থাকল।

এই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। গায়ের জোরে ওর সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। তাই নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে বেদি থেকে বাঘনখটা তুলে নিলাম।

কিন্তু লোকটা কীভাবে যেন টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমার হাতে ওটা দেখেই পকেট থেকে ছুরি বের করল। আমার হাতে বাঘনখ ওর হাতে ছুরি। পরস্পর পরস্পরকে তাক করছি এবং দুজনের মুখ থেকেই হুমহাম গর্জন বেরুচ্ছে। দুজনে বেদী চক্কর দিচ্ছি। আমি মরিয়া, সেও মরিয়া।

হঠাৎ সেই সময় শিবলিঙ্গটা নড়তে শুরু করল। তারপর একপাশে কাত হয়ে পড়ল এবং আমাদের দুজনকেই হকচকিয়ে দিয়ে একটা মুন্ডু বেরুল।

মুন্ডুটিতে টুপি এবং সাদা দাড়ি। সেটি প্রখ্যাত ঘুঘুবুড়ো কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের।

নাকি স্বপ্ন দেখছি?

উঁহু, স্বপ্ন নয়। এক লাফে কর্নেল বেদি ফুঁড়ে বেরিয়ে রিভলভার তাক করলেন লোকটার দিকে। সে ছুরি ফেলে দিয়ে দুহাত ওপরে ওঠাল এবং দেয়ালে সেঁটে গেল। কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। মন্দিরের ভেতর যেন বাজপড়ার শব্দ। বললেন, 'কী বাবুরাম! কেমন জব্দ। শাবাশ জয়ন্ত! ব্রাভো! এই তো চাই।'

বাইরে ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল। পুলিশ অফিসার মিঃ সিনহাকে আসতে দেখলুম। সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল। তারা এই বাবুরামের দুই সাঙাতের হাতে-হাতে দড়ি এবং সেই দড়ি কোমরেও পরিয়ে টেনে আনছে। যেন এই শিবমন্দিরে জোড়াপাঁঠা বলির জন্য আনা হচ্ছে।

কর্নেল ডাকলেন, 'ভেতরে আসুন মিঃ সিনহা। স্বয়ং বা-বাবাজি ধরা পড়েছে।'

মিঃ সিনহা ঢুকেই দৃশ্যটা দেখে একচোট হাসলেন। দুজন কনস্টেবল বাবুরামের হাতে হাতকড়া এঁটে দিল। মিঃ সিনহা এবার ওলটানো শিবলিঙ্গ দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী!'

কর্নেল বললেন, 'ওখান দিয়ে আমার আবির্ভাব ঘটেছে। একটু দেরি হলেই রক্তারক্তি হয়ে যেত। আসলে ওটা একটা সুড়ঙ্গ পথ।'

মিঃ সিনহা উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'কী আশ্চর্য!'

কর্নেল বললেন, 'প্রপাতের একধারে দাঁড়িয়ে পাথরের আড়ালে একটা ফোকর আবিষ্কার করেছিলুম। ঢুকে দেখি এটাই সেই সুড়ঙ্গপথ। ধাপে-ধাপে কোদণ্ডদেবের মন্দিরে উঠে এসেছে। হ্যাঁ, আসল কথাটা বলা দরকার। ঘন্টারামই বলেছিল এই মন্দিরের তলায় নাকি একটা সুড়ঙ্গপথ

আছে। সেখানে তার মাসতুতো ভাই দাগি ফেরারি আসামি এই বাবুরাম লুকিয়ে থাকে বলে তার ধারণা। ঘন্টারাম খুব নীতিবাগীশ লোক। তাকে সরকার থেকে পুরস্কার পাইয়ে দেবেন মিঃ সিনহা। তবে আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। কথামতো আপনি দলবল নিয়ে এখানে না এসে পড়লে জয়ন্ত বেচারাও....'

রেগেমেগে বললুম, 'বাঘনখ দিয়ে বাবুরামকেও 'বা' বলিয়ে ছাড়তুম।'

কর্নেল হাসলেন। 'খুনের দায়ে পড়তে ডার্লিং। যাই হোক, মিঃ সিনহা, মন্দিরের তলায় একটা কুঠুরিতে পাণ্ডেজির রাইফেল আর প্রচুর ডাকাতির মাল মজুত রয়েছে। আসামিদের থানায় পাঠিয়ে দিন। আর আপনার হাতের ওয়াকি-টকিতে মেসেজ পাঠান। জিনিসগুলো উদ্ধার করা দরকার।'

বলে আমার হাত থেকে বাঘনখটি নিয়ে কর্নেল মিঃ সিনহাকে দিলেন এবং আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো ডার্লিং! খুব ধকল গেছে তোমার বাংলোয় ফেরা যাক।'

সেই গাছটার কাছে এসে বললুম, 'বা-রহস্য ফাঁস হল। কিন্তু আলো-রহস্য?'

কর্নেল বললেন, 'তখন আমাকে নিচে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে, ওখান থেকেই টর্চের আলো দেখাত বাবুরাম। তখন ওর দলের লোকেরা ডাকাতি করা মাল নৌকোয় নিয়ে আসত। আসলে কোদণ্ডমন্দিরের পেছনে আদিবাসী জেলেদের একটা বসতি আছে। তারা প্রপাতের নিচের জলায় রাতবিরেতে জাল ফেলে মাছ ধরতে যেত। মানুষখেকো বাঘের ভয়ের চেয়ে পেটে খিদে নামক রাক্ষসের ভয় বেশি জয়ন্ত! বেচারারা এত গরিব যে নৌকো কেনার ক্ষমতা নেই। তো ওরা মাছ ধরে পাহাড়ি পথে বসতিতে ফিরে গেলে তখন বাবুরাম আলোর সংকেত করত।'

বললুম, 'তাহলে পাণ্ডেজি পরে টের পেয়েছিলেন বাবুরাম ডাকুরই কীর্তি! তাই....'

'হ্যাঁ'। বলে হঠাৎ কর্নেল বাইনোকুলার চোখে তুললেন এবং ঝোপঝাড় ভেঙে অদৃশ্য হলেন।

বুঝলুম, সেই সাংঘাতিক গাছটার তলায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওঁর অপেক্ষা করতে হবে! তবে আর হামলার ভয়টা নেই। অতএব সেই সুন্দর পাথরটাতে বসে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করায় বাধা নেই।....

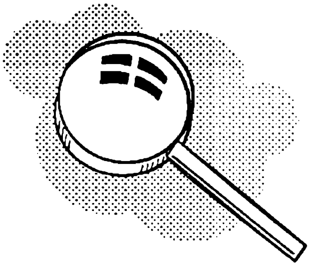

ভীমগড়ের কালো দৈত্য

সরকারি ডাকবাংলো থেকে বিকেলে বেরুনোর সময় চৌকিদার সুখলাল হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে যা বলেছিল, তার সারমর্ম ছিল এরকম :

পশ্চিমের সবচেয়ে উঁচু আর ন্যাড়া পাহাড়ের ওধারে বাস করে এক 'কালা দেও', অর্থাৎ কিনা কালো দৈত্য। তার চেহারা ঘনকালো মেঘের মতো। পেল্লায় তার গড়ন। তার হিংস্র দাঁত ঝকঝক করে উঠলেই কানে তালা ধরানো হুঙ্কার শোনা যাবে। দৈবাৎ যদি তাকে পাহাড়ের ওপর দেখতে পাই, আমরা যেন তক্ষুণি পালিয়ে এসে কোনও ফাঁকা জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ি। তা না হলে সে আমাদের তুলে নিয়ে দূরে পাথরের ওপর ছুড়ে ফেলবে।...রামজিকা কিরিয়া সাব, কালা দেও হামারা ভাতিজা রঘুয়াকো মার ডালা।....

আর কার-কার কালো দৈত্যের পাল্লায় পড়ে একেকটি আছাড়ে হাড়গোড় দলা পাকিয়ে কয়েক মাইল দূরে লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেই রোমহর্ষক বর্ণনাও দিয়েছিল সুখলাল।

ভীমগড়ের পাহাড়ি জঙ্গলে শেষ মার্চের বিকেলে কর্নেলের সঙ্গী হয়ে বেরুনোর সময় চৌকিদারের ওইসব কথা শুনে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু কর্নেলের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলুম, তিনি কেমন যেন নির্বিকার। বারকয়েক কালো দৈত্যের ব্যাপারটা কী হতে পারে, জিগ্যেস করেও কোনও উত্তর পাইনি। তিনি ভীমগড়ের শেষদিকটায় খানা-খন্দে ভরা পিচরাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থেমে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। হয়তো পাখি। বসন্তকালে গাছপালায় পাখিদের ডাকাডাকি স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের কথা অবশ্য জানি। কলকাতার একটি ইংরেজি কাগজে এক দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির অর্কিডের খবর পড়েই তাঁর রাতারাতি ভীমগড় আগমন।

এদিকে অর্কিডের প্রতি আমার আগ্রহ না থাকলেও আমাকে তিনি এখানে টেনে এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—জয়ন্ত। ভীমগড় নাম শুনেই তোমার বোঝা উচিত, সেখানে মহাভারতের ভীম না হোন, অন্য কোনও ভীম বাস করতেন। আর গড় মানে দুর্গ। কাজেই রাজাগজার ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে। কোনও সময়ে ভীম নামে কোনও রাজা সেখানে অবশ্যই ছিলেন। এমন তো হতেই পারে সেই রাজা ভীমের গুপ্তধন তাঁর দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুকোনো আছে। আর গুপ্তধনের এমন নেশা, ধরো দৈবাৎ গুপ্তধনসন্ধানী কোনও দলের হদিশ সেখানে তুমি পেয়ে গেলে এবং সেই সূত্র ধরে একখানা সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর স্টোরি লিখে তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় ছেপে দিলে। ব্যস! হিড়িক পড়ে যাবে। তাই না?

একটু চটে গিয়ে বলেছিলুম,—আমাকে কি আপনি অবোধ বালক ভেবেছেন?

কর্নেল অমনই গম্ভীরমুখে তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন,—জয়ন্ত! এই পৃথিবীকে অবোধ বালকের চোখে তাকিয়ে দেখলে কত অদ্ভুত ঘটনা আবিষ্কার করা যায়। যাই হোক, চলো তো! আশা করি, ভীমগড় তোমাকে কোনও-না-কোনও একটা চমক দেবে।...

সেই বিকেলে ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কর্নেলের সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। এবার বলে উঠলুম,—কর্নেল! আপনি ভীমগড়ে চমকের কথা বলেছিলেন। দেখছি, সত্যিই এখানে একটা চমকের আভাস পাচ্ছি। চৌকিদার সুখরামকথিত কালো দৈত্য!

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। বাইনোকুলার নামিয়ে একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ। কালো দৈত্য।

—কিন্তু তখন থেকে কতবার আপনাকে জিগ্যেস করছি, ব্যাপারটা আসলে কী? আপনি কোনও জবাবই দিচ্ছেন না।

আমরা চলেছি দক্ষিণে। আমাদের বাঁদিকে মাঝে-মাঝে এক-একটা জরাজীর্ণ বাড়ি এবং কোথাও বা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। আগাপাছতলা ঝোপঝাড়, গাছপালায় সব ঢাকা। কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে আঙুল তুলে বাঁদিকে উঁচু মাটির ওপর সেই বাড়িগুলো দেখিয়ে বললেন,—জয়ন্ত! কালো দৈত্যদর্শন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু এই এলাকায় বসতির অবস্থা দেখছ? জনহীন এই এলাকাটা নিশ্চয়ই কালো দৈত্য রাগ করে ভেঙেচুরে দেয়নি। তুমি তো সাংবাদিক। একটুখানি দেখে নিয়ে বলো তো, এগুলোর এমন দশা কেন হয়েছে?

দেখে নিয়ে হাসতে-হাসতে বললুম,—কালো দৈত্যের ভয়ে লোকেরা এখান থেকে পালিয়ে গেছে।

—ওই দ্যাখো। একটা ভাঙা ফটকের গায়ে এখনও মার্বেল ফলক আটকে আছে। ফলকে পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্য এখনও প্রচুর আলো ফেলেছে।

উঁচু মাটিতে উঠে গিয়ে ফলকটা দেখে এলুম। বললুম,—কী আশ্চর্য! বাংলায় লেখা আছে 'সন্ধ্যানীড়।' তলায় কী নাম লেখা আছে, পড়া গেল না। শ্যাওলা পড়েছে!

কর্নেল এবার হাঁটার গতি দ্রুত করে বললেন,—এটা একসময় ছিল ভীমগড়ের বাঙালিটোলা।

—কিন্তু বাঙালিরা সব ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে কেন?

—সম্ভবত তাঁদের সন্তান-সন্ততি ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। নয়তো কলকাতায় সুখে বসবাস করছে। আসলে বাঙালি এখন এসব মুলুকের প্রকৃতির চেয়ে আরও সুন্দর সেজেগুজে থাকা প্রকৃতির খোঁজ পেয়ে গেছে। লক্ষ্য করছ না? কী এলোমেলো জঙ্গল, বেখাপ্পা টিলা আর একঘেয়ে দৃশ্য!

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল রাস্তাটা ছেড়ে ডানদিকে পশ্চিমে এবড়োখেবড়ো গেরুয়ামাটির পায়ে-চলা রাস্তায় পা বাড়ালেন। রাস্তাটা অস্বাভাবিক নির্জন। ক্রমশ উঁচুতে উঠে গেছে এবং সামনে-দূরে কালো একটা পাহাড়ের মাথা সূর্য ততক্ষণে ছুঁয়ে ফেলেছে। দুধারে নানান গাছের জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। কোথাও ফাঁকা ঢালু মাঠে ছোটবড় নানা গড়নের পাথর আর ঝোপ।

কর্নেল সামনে বাঁদিকে জঙ্গলে ঢাকা একটা টিলার দিকে ঘুরে বললেন,—ইংরেজি কাগজের সেই প্রকৃতিবিদ যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে এই টিলার গায়েই অর্কিডের খোঁজ পাওয়ার কথা। তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি দেখি, তার খোঁজ পাই নাকি।

বলে তিনি টিলায় চড়তে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন,—সাবধান জয়ন্ত! ওই পশ্চিমের উঁচু পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখবে। কালো দৈত্যটা দেখতে পেলেই আমাকে ডাকবে।

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কর্নেল টিলার জঙ্গলে উধাও হয়ে গেলেন। এইসব জঙ্গলে হিংস্র জন্তু থাকা সম্ভব। কালো দৈত্যের চেয়ে তারাই আপাতত আমার কাছে সাংঘাতিক। মহুয়ার ফল পাকতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু বুনো ভালুক কী অত বোঝে? পাশের ওই মহুয়াগাছের দিকে হানা দিতে এসে আমাকে দেখতে পেলেই দাঁত-নখ বের করে ঝাঁপ দেবে।

এইসব ভেবে প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবার বের করে তৈরি হয়ে থাকলুম। অবশ্য মাঝে-মাঝে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকটা দেখে নিচ্ছিলুম। সূর্য এখন পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। চারদিকে ধূসরতা ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে।

কতক্ষণ পরে কর্নেলকে দেখতে পেলুম। তিনি অমন পড়ি-মরি করে টিলার জঙ্গল ভেঙে নেমে আসছেন কেন?

অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বললুম,—কী হয়েছে?

কর্নেল আমার কাছাকাছি এসে বললেন,—জয়ন্ত! দৌড়তে হবে। কুইক!

—ব্যাপার কী? বাঘ-ভালুক নাকি?

—কালো দৈত্য!

—তার মানে?

—তোমাকে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলুম। তুমি এত বোকা—তা ভাগ্যিস টিলার ওপর থেকে আমার চোখে পড়েছিল।

কর্নেল প্রায় দৌড়নোর ভঙ্গিতে উতরাই পথে নামতে-নামতে কথাগুলো বলছিলেন। ঘুরে একবার পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, কালো মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে আসছে। তারপরই বিদ্যুতের ঝিলিক এবং কানে তালা ধরানো গর্জন শোনা গেল।

দৌড়তে-দৌড়তে বললুম,—ওটা তো মেঘ!

কর্নেল ততক্ষণে ডানদিকে ফাঁকা মাঠে নেমে গেছেন। তারপরই কানে এল, অস্বাভাবিক একটা শনশন-গরগর গর্জন। সেই সঙ্গে পিছনে কোথাও বাজ পড়ল।

কর্নেল একটা ঝোপের গোড়া দু-হাতে আঁকড়ে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় তাঁর মতো আমিও পাশে একটা ঝোপের গোড়া দু-হাতে চেপে ধরে উপুড় হলুম। এরপর যা ঘটতে থাকল, তা যেন মহাপ্রলয়। ঝড়, বৃষ্টি আর বজ্রপাত। তার চেয়ে সাংঘাতিক ঘটনা, যে ঝোপ আঁকড়ে ধরেছি, সেটা যেন আমাকে সুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং শিকড় উপড়ে যাবে, ঝড়ের এমন প্রচণ্ড গতিবেগ।

কর্নেলের দিকে তাকাব কী, চোখ খোলা যাচ্ছিল না। বৃষ্টির ধারালো ফোঁটার সঙ্গে ঝড়ে ওড়া বেলেপাথরের টুকরো আর ঝাঁকে-ঝাঁকে কাঁকর আমার ওপর মুঠো-মুঠো ছুঁড়ে মারছিল সেই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক শক্তি। ততক্ষণে হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছি, চৌকিদার সুখরামের কাছে শোনা সেই 'কালা দেও' প্রকৃতপক্ষে কী।

কতক্ষণ কালো দৈত্যের এই তাণ্ডব চলেছিল জানি না, একসময় কর্নেলের ডাকে অতিকষ্টে চোখ খুলে তাকালুম। কর্নেল ভিজে একেবারে জবুথবু। আর ঝড়টা নেই। কিন্তু বৃষ্টি ঝরছে। কর্নেল বললেন,—উঠে পড়ো জয়ন্ত! দৈত্যটা কেটে পড়েছে। কিন্তু বৃষ্টিতে বেশিক্ষণ ভেজা ঠিক নয়।

উঠে দাঁড়িয়ে টের পেলুম সারা শরীর ব্যথায় আড়ষ্ট। কর্নেলকে অতিকষ্টে অনুসরণ করলুম। গেরুয়া মাটির রাস্তা কাদা হয়ে গেছে। কর্নেল এবার পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বেলে বললেন,—কাদায় হাঁটতে অসুবিধে হবে। এসো, পাশের শালবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাই। তোমার টর্চ আনোনি?

আমার বৃষ্টি-ভেজা শরীর ঠান্ডায় কাঁপছিল। বললুম,—ভুলে গেছি। তখন কি জানতুম...

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—ঠিক আছে। আমার পিছনে এসো। ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য রাখবে। এ সময় খুদে জন্তু-জানোয়ারের লোভে পাইথন সাপ বেরিয়ে পড়ে।

সাহস দেখিয়ে বললুম,—ফায়ার আর্মসের গুলিতে পাইথনের মাথা গুঁড়িয়ে দেব কর্নেল! আমি এখন মরিয়া হয়ে উঠেছি।

কর্নেল বললেন,—বাঃ! এই তো চাই। ভীমগড়ের প্রথম চমক এটা।

এরই মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়েছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি সমানে ঝরছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। তবে কালো দৈত্যের হাঁকডাকে আর তত জোর নেই।

কিছুক্ষণ পরে সেই ভাঙাচোরা পিচরাস্তায় পৌঁছলুম। আবার বৃষ্টিতে বাগে পেল। বললুম,—কর্নেল! বরং সেই বাঙালিটোলার কোনও ঘরে আশ্রয় নিয়ে মাথা বাঁচানো যাক। বৃষ্টি ছাড়লে বেরিয়ে পড়ব।

কর্নেল সায় দিলেন,—কথাটা আমিও ভেবেছিলুম। শেষ দিকটায় একটা বাড়ি চোখে পড়ল।

জরাজীর্ণ বাড়িটা দোতলা। কাছাকাছি যেতেই দোতলার ডানদিকের জানলার ফাঁকে আলো দেখতে পেলুম। বললুম,— বাড়িটাতে লোক আছে। দোতলায় আলো জ্বলছে।

দেখেছি।—বলে কর্নেল বারান্দায় উঠলেন।

আমিও উঠলুম। কিন্তু বারান্দার ছাদ ফাটাফুটো। ফোঁটা-ফোঁটা নোংরা জলের উপদ্রবে অতিষ্ট হয়ে বললুম,—কর্নেল! বাড়ির লোকেদের ডাকা উচিত। অন্তত ভিতরে কিছুক্ষণ আশ্রয়ের সুযোগ পাব।

কর্নেল এই অবস্থাতেও হাসলেন,—ঠিক বলেছ। এক কাপ গরম চা-ও মিলতে পারে। নাঃ, কফির আশা না করাই ভালো।

তিনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে ভিতরে আলোর ছটা চোখে পড়ল। তারপর দরজা খুলে গেল। একজন বেঁটে মোটাসোটা লোক হাতের হেরিকেন একটু তুলে বাংলায় বলল,—বলুন আজ্ঞে।

কর্নেল বললেন,—আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। পথে ঝড়বৃষ্টিতে কী অবস্থা হয়েছে, তা দেখতেই পাচ্ছ! বারান্দায় দাঁড়াতে পারছি না। এ বাড়ির মালিক কে?

—মালিক আজ্ঞে কলকাতায় থাকেন। আমি এই বাড়ি পাহারা দিই।

—তুমি তো বাঙালি মনে হচ্ছে! এই বিপদে আমাদের একটু সাহায্য করো। আমাদের ভিতরে বসতে দাও। বৃষ্টি ছাড়লেই আমরা চলে যাব।

লোকটার গোঁফে যেন পোকা আটকেছে, এমন ভঙ্গিতে গোঁফ ঝেড়ে একটু দ্বিধা দেখিয়ে বলল, —তা-তা বসতে পারেন আজ্ঞে। কিন্তু আর লণ্ঠন তো নেই। এটা নিয়ে আমাকে দোতলায় যেতে হবে।

—লণ্ঠনের দরকার নেই। তুমি তোমার কাজে যাও। আমাদের এই টর্চই যথেষ্ট।

বলে কর্নেল তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখলুম, ঘরে কয়েকটা নড়বড়ে চেয়ার আর টেবিল ছাড়া কোনও আসবাব নেই। দুজনে মুখোমুখি বসলুম। কর্নেলের তাগড়াই শরীরের ওজন চেয়ারটা সামলে নিল। তিনি বললেন,—তোমার নাম কী?

লোকটা তখনও কেমন অবাক-চোখে তাকিয়ে ছিল। বলল,—আজ্ঞে আমি কালীপদ।

—আচ্ছা কালীপদ, দুকাপ চায়ের ব্যবস্থা করা যায় না? ভালো বকশিস পাবে।

কালীপদ তার গোঁফ থেকে আবার পোকা বের করার ভঙ্গি করল। তারপর বিরসমুখে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে! চা-ফা আমার চলে না। ওই যাঃ! তরকারিটা পুড়ে গেল হয়তো! —বলে সে হন্তদন্ত ভিতরে চলে গেল। তারপর ভিতরের কপাট ওদিক থেকে বন্ধ করার শব্দ হল।

একটু পরে কানে এল টেবিলে টুপটুপ করে যেন জল ঝরছে। বললুম,—কর্নেল! ছাদ ভেঙে পড়বে না তো? একতলার ছাদের ওপর দোতলার ছাদ আছে। মনে হচ্ছে দুটো তলাই মেরামতের অভাবে ফেটে গেছে।

কর্নেল সবে চুরুট ধরিয়েছিলেন। আমার কথা শুনে টর্চ জ্বেলে টেবিলটা দেখলেন। বললেন, —ঠিক বলেছ!

কর্নেল টর্চের আলো নেভাননি। আমি টেবিলের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে বললুম, —জলের ফোঁটা লালরঙের কেন?

—আগের দিনে চুনসুরকির মশলা দিয়ে বাড়ি তৈরি হতো। সুরকিগুঁড়ো হতে পারে।

কর্নেলের হাত থেকে টর্চ নিয়ে সিলিঙে আলো ফেলে দেখলুম, কড়ি-বরগার ওপর সাজানো টালির একটা ফাটল দিয়ে লালরঙের তরল পদার্থটা পড়ছে।

কর্নেল বললেন,—ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে। টর্চ নেভাও।

টর্চের আলো টেবিলে ফেলে আঙুল দিয়ে লাল রঙটা পরীক্ষা করে বললুম,—কর্নেল! সুরকির গুঁড়ো কি এমন আঠালো হয়?

মাই গুডনেস!—বলে কর্নেল আমার হাত থেকে টর্চ নিয়ে সিলিং এবং টেবিলের ওপরটা পরীক্ষা করলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন,—তুমি হয়তো ঠিক বলেছ জয়ন্ত! বৃষ্টিটা একটু কমেছে মনে হচ্ছে। কালীপদকে ডাকা যাক!

তিনি উঠে গিয়ে ভিতরের দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। খুলল না। তখন হাঁক দিলেন, —কালীপদ! কালীপদ!

কোনও সাড়া এল না! আরও কয়েকবার ডাকাডাকির পর কর্নেল কপাটে সজোরে তাঁর মিলিটারি লাথি মারলেন। তিনটে লাথির পর কপাট ভেঙে পড়ল। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, —জয়ন্ত! তোমার ফায়ার আর্মস রেডি রাখো। আমার পিছনে এসো। সাবধান! চারদিকে লক্ষ্য রাখবে।

টর্চের আলোয় নিচু পাঁচিলে ঘেরা একটুকরো উঠোনে ঘন ঝোপজঙ্গল আর একটা পোড়ো ইঁদারা দেখতে পেলুম। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে ডাইনে একটা ঘর। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। কর্নেল এক হাতে তাঁর রিভলভার অন্যহাতে টর্চের আলোয় ভিতরটা দেখে নিলেন। ঘরে একটা খাটিয়া পড়ে আছে। সেটা কেউ বহুদিন যাবৎ ব্যবহার করেছে বলে মনে হল না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যে ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখেছিলুম, সেই ঘরটাও ফাঁকা। কোনও আসবাব নেই। তাহলে কালীপদ লণ্ঠন নিয়ে এ ঘরে কী করছিল?

কথাটা জিগ্যেস করার সুযোগ পেলুম না। কর্নেল পরের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে বললেন, —এই ঘরের নিচেই আমরা ছিলুম। এ ঘরে দেখছি তালা আঁটা আছে। এক মিনিট! তুমি টর্চটা ধরো। জ্বেলে রাখো।

কর্নেল তাঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগ থেকে একটা অদ্ভুত গড়নের প্লাস বের করলেন। তারপর সেটা দিয়ে কী কৌশলে তালা খুললেন কে জানে? কপাটদুটো ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। আমার হাতে টর্চ। আলো ফেলে যা দেখলুম, তা কর্নেলের পাল্লায় পড়ে অনেকবার আমাকে দেখতে হয়েছে।

মেঝেয় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পরনে প্যান্ট আর স্পোর্টিং গেঞ্জি।

কর্নেল আমার হাত থেকে টর্চ নিয়ে মৃতদেহটা দেখে বললেন,—আমার এই এক দুর্ভাগ্য জয়ন্ত! যেখানে যাই, এক অদৃশ্য আততায়ী আমার সামনে একটা মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। যাই হোক। মৃতদেহটার কয়েকটা ফোটো তুলে নিয়ে কেটে পড়া যাক।

তাঁর ক্যামেরায় ফ্ল্যাশবাল্‌ব্‌ কয়েকবার ঝিলিক দিল।....

চৌকিদার সুখলাল সঙ্গে একজন লোক নিয়ে আমাদের খোঁজে আসছিল। বাংলোর কাছাকাছি তাদের সঙ্গে দেখা হল। সুখলালকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। 'কালা দেও'-এর পাল্লায় পড়ে আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি জেনে সে আশ্বস্ত হল।

বাংলোয় ফেরার পর আমরা ভেজা পোশাক বদলে নিলাম। সুখলাল কফি নিয়ে এল। কর্নেল তাকে জিগ্যেস করলেন,—বাঙালিটোলার শেষের দোতলা বাড়িটাতে কি কেউ থাকে?

সুখলাল অবাক হয়ে বলল,—না কর্নিলসাব!

—তুমি কালীপদ নামে বেঁটে মোটাসোটা কোনও বাঙালিকে চেনো?

সুখলাল একটু ভেবে নিয়ে বলল,—পাঁচবরস আগে কালীপদ ওই বাড়ির জিম্মাদার ছিল। লেকিন সে কলকাত্তা চলিয়ে গেছে। কালীপদ দুবলা আদমি ছিল। বুঢ়া ভি ছিল। লেকিন...

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—বাংলোর কেয়ারটেকার মোহনবাবু কী বাড়ি চলে গেছেন?

—হাঁ কর্নিলসাব।

—ওঁর অফিসের চাবি তাহলে উনি নিয়ে গেছেন?

—'ডুপলিকাট্' হামার কাছে আছে। কুছু দরকার হলে বলিয়ে সাব!

—টেলিফোন করতে চাই।

—কুছ অসুবিধা নাই।....

কর্নেল দ্রুত কফি শেষ করে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তিনি কাকে ফোন করতে যাচ্ছেন, তা জানতুম। একটা বেঁটে হোঁতকা-মোটা-গুঁফো লোক কাউকে কোনও ছলে ওই পোড়োবাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে, এটা আমার কাছে স্পষ্ট। হঠাৎ আমরা গিয়ে পড়ায় যে লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে।

একটু পরে কর্নেল ফিরে এসে বললেন,—আশ্চর্য ব্যাপার জয়ন্ত। ভীমগড়ের পুলিশ ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে কল্পনাও করিনি। ও. সি. ভদ্রলোক আমার কথায় হেসে অস্থির। বললেন, এর আগে বারদুয়েক কারা ওই পোড়োবাড়িতে আমাদের মতোই রক্তাক্ত লাশ দেখে থানায় খবর দিয়েছিল। পুলিশ গিয়ে তন্নতন্ন খুঁজে লাশ তো দূরের কথা, ছিটেফোঁটা রক্তও খুঁজে পায়নি।

অবাক হয়ে বললুম,—ভারি অদ্ভুত তো!

—হ্যাঁ। এদিকে সুখলাল ব্যাপারটা জেনে নিয়ে একই কথা বলল।

—কিন্তু আমরা তো রক্তাক্ত লাশ দেখেছি। আপনি ক্যামেরায় লাশটার ছবিও তুলেছেন।

কর্নেল গুম হয়ে একটু বসে থাকার পর বললেন,—আমি ও. সি. জয়রাম সিংহকে আমার ক্যামেরায় লাশের ছবি তোলার কথাও বলেছি। আমি খাপ্পা হয়ে মিঃ সিংহকে পুলিশসুপার মিঃ প্রশান্ত ত্রিবেদীর নাম করে বলেছি, মিঃ ত্রিবেদী আমার পরিচিত। তাঁকে খবরটা জানাতে বাধ্য হব। তা শুনে ও. সি. একটু ভড়কে গিয়ে অবশ্য নিছক দুজন আর্মড কনস্টেবল পাঠাতে রাজি হলেন।

—কর্নেল! আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—কনস্টেবলরা পৌঁছনোর আগেই খুনি পোড়োবাড়ি থেকে লাশটা সরিয়ে গুম করে ফেলবে। এই তো?

—ঠিক ধরেছেন।

—কথাটা আমিও ভেবেছি। কাজেই আমাদের চুপচাপ বসে থাকা ঠিক হবে না। উঠে পড়ো। বেরুনো যাক। সঙ্গে এবার টর্চ নিতে ভুলো না!

—সেই পোড়োবাড়িতে যাবেন?

কর্নেল রহস্যময় ভঙ্গিতে হেসে বললেন, —চলো তো! সুখলালকে সঙ্গে নেব। কারণ সুখলাল এবার আমাদের গাইড হবে।

দেখলুম, সুখলাল তখনই বল্লম আর টর্চ নিয়ে এল। তার সেই সঙ্গীকে বাংলোয় থাকতে বলে আমাদের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল!

ততক্ষণে আকাশ থেকে মেঘ সরে নক্ষত্র দেখা দিয়েছে। আমাকে অবাক করে সুখলাল আর কর্নেল উত্তরে ভীমগড় বসতির দিকে হাঁটছিলেন। লাশ আছে দক্ষিণে পরিত্যক্ত বাঙালিটোলার একটা জরাজীর্ণ বাড়িতে। আর আমরা তার উলটোদিকে কোথায় যাচ্ছি কে জানে! প্রশ্ন করতে গিয়ে থামতে হল। অদূরে স্ট্রিটল্যাম্পের ম্লান আলোয় দুজন সশস্ত্র কনস্টেবল আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছিল।

আমাদের দেখে তারা থমকে দাঁড়াল। সুখলাল বলল,—রাম-রাম পাঁড়েজি!

পাঁড়েজি হিন্দিতে বলল,—রাম-রাম সুখলাল ভাইয়া! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এঁরা কে?

—ইনিই কর্নিলসাব। থানায় বড়বাবুকে লাশের খবর দিয়েছেন।

দুজন কনস্টেবলই খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল। কর্নেল বললেন,—পাঁড়েজি! লাশ দেখবেন তো আমাদের সঙ্গে চলুন! দেরি করবেন না। সুখলাল। তুমি রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

সম্ভবত বাঙালিটোলার পোড়োবাড়িতে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হবে না ভেবেই সশস্ত্র কনস্টেবলদ্বয় খুশি হয়েছিল। এর পর কিছুটা এগিয়ে বসতি এলাকার সংলগ্ন ডান দিকের রাস্তায় সুখলাল আমাদের নিয়ে চলল। আমবাগান এবং ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে। কিছুদুর চলার পর যেখানে পৌঁছলুম, সেখানে একটা ঝিল দেখা দিল। তারপরই পিছনের দিকে কোথাও 'রামনাম সৎ হ্যায়' চিৎকার শোনা গেল।

তখনই কর্নেল বললেন,—আমাদের লুকিয়ে পড়তে হবে। শিগগির।

ঝোপের আড়ালে আমরা লুকিয়ে পড়লুম। ক্রমশ 'রামনাম সৎ হ্যায়' চিৎকার কাছেই শোনা গেল। কর্নেল পাণ্ডেজিদের চাপাস্বরে হিন্দিতে কিছু বললেন। তারপর খাটিয়ায় একটা মড়া চাপিয়ে লণ্ঠন হাতে কয়েকজন লোক এসে পড়তেই কর্নেল এবং কনস্টেবলদ্বয় ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেন। কর্নেল টর্চের আলো জ্বেলে উদ্যত রিভলভার হাতে গর্জন করে উঠলেন,—থামো! নইলে গুলি করব।

টর্চের আলোয় সেই জাল 'কালীপদকে' দেখতে পেয়েছিলুম। সবার আগে লণ্ঠন ফেলে দিয়ে সে পালাতে যাচ্ছিল। পাঁড়েজি তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু বাকি লোকেরা খাটিয়া ফেলে ঝোপের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল খাটিয়ার কাছে গিয়ে বললেন,—এই সেই ভূতুড়ে লাশ। সুখলাল! দেখো তো চিনতে পারো কি না!

সুখলাল লাশের মুখ দেখে আঁতকে উঠে বলল,—আরে! এ তো পরসাদজি আছেন।

পাঁড়েজি গুঁফো লোকটার পিঠে রাইফেলের বাঁটের এক খোঁচা মেরে বললেন,—কর্নিলসাব! এই লোকটার নাম মগনলাল। দাগি খুনি। এলাকার ডাকুদের সর্দার!

অপর কনস্টেবল বলল,—হায় রাম! পরসাদজি তো খুব ভালো লোক ছিলেন। এই শয়তানটা ওঁকে খুন করল কেন?

কর্নেল বললেন,—আমার ধারণা, এই প্রসাদজিকে ফাঁদে ফেলে মগনলাল খুন করেছে। ফাঁদটা কীসের তা যথাসময়ে জানা যাবে। পাঁড়েজি, আপনি আসামিকে নিয়ে থানায় চলে যান। ও. সি. মিঃ সিংহকে খবর দিন।

পাঁড়েজি আঁতকে উঠে বলল,—না কর্নিলসাব! এই ডাকু বহত্ খতরনাক আছে। তার চেয়ে চৌবেজি থানায় গিয়ে খবর দিক। আমরা এখানে অপেক্ষা করি।

অপর কনস্টেবল চৌবেজি টর্চের আলো জ্বালতে-জ্বালতে কাঁধে বন্দুক রেখে যেভাবে হেঁটে গেল, মনে হল মগনলালের অনুচরদের আচমকা হামলার ভয়ে সে বেজায় আড়ষ্ট।....

কর্নেল বলেছিলেন, ফাঁদ পেতে প্রসাদজি নামে ওই ভদ্রলোককে মগনলাল খুন করেছে। আর বাংলোর চৌকিদার সুখলাল বলেছিল, পরসাদজি খুব ভালো লোক ছিলেন। কিন্তু পরদিন সকালেই আসল ঘটনা জানা গিয়েছিল। কীভাবে জানা গিয়েছিল, সেটাই শেষ চমক বলা যায়।

ভোর পাঁচটায় আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে কর্নেল বলেছিলেন,—চলো জয়ন্ত! আমার রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হয়ে যাবে। সেই পোড়োবাড়িতে সারা রাত পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করতে বলেছিলুম। সেখানে গিয়ে দেখি কী অবস্থা। তারপর অর্কিডের খোঁজে একচক্কর ঘুরব। চিন্তা কোরো না। ফ্লাস্কভর্তি কফি আর প্রচুর বিস্কুট সঙ্গে আছে।

কী আর করা যাবে, কর্নেলের পাল্লায় পড়ে অনেকবার জেরবার হয়েছি। এবারও হতে হবে। হাঁটতে অবশ্য ভালো লাগছিল। বসন্তকালের ভোরবেলায় পাখিদের ডাকে কী এক মায়া আছে!

সেই পোড়োবাড়িতে গিয়ে দেখছিলুম, ভিতরের বারান্দায় সেই জীর্ণ খাটিয়ায় একজন কনস্টেবল শুয়ে তখনও নাক ডাকাচ্ছে। বাকি তিনজন বারান্দায় মেঝের থামে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমাদের সাড়া পেয়ে তারা উঠে দাঁড়াল। কর্নেলের প্রশ্নের জবাবে তারা একবাক্যে বলল, রাত্রে একটা চুহা অর্থাৎ ইঁদুরের শব্দও তারা শোনেনি।

কর্নেল এবার উঠোনের ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করব কি না ভাবছিলুম। কিন্তু তিনি উঠোনের কোণে সেই ইঁদারায় উঁকি মেরে কিছু দেখার পর সহাস্যে ডাকলেন,—জয়ন্ত! দেখে যাও!

গিয়ে দেখি ইঁদারার ওপাশে একটা ঝোপের গোড়ায় মোটা দড়ি বাঁধা আছে এবং দড়িটা ইঁদারার পাড়ে একটা ফাটলের মধ্যে দিয়ে তলায় নেমে গেছে। কর্নেলের টর্চের আলোয় দেখলুম, দড়ির শেষপ্রান্তে বাঁধা একটা কালো ব্যাগ ঝুলছে।

কর্নেল ব্যাগটা দড়ি ধরে টেনে তুললেন। ততক্ষণে দুজন কৌতূহলী কনস্টেবল এসে গেছে। তারা দুজনে হতবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল।

ব্যাগে তালা আঁটা ছিল। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ও. সি. মিঃ সিংহ এখনই এসে পড়বেন।

বললুম—ব্যাগে কী থাকতে পারে?

কর্নেল হাসলেন।—সম্ভবত মগনলাল ডাকুর ডাকাতি করা দামি কিছু জিনিস। ব্যবসায়ী রমেশ প্রসাদ এই চোরাই মাল কিনতে এসে খুন হয়েছে।

—খুনের কারণ কী?

—হ্যাঁ। তোমাকে ইচ্ছে করেই বলিনি। কারণ ভীমগড়ে কিছু-কিছু চমকের কথা দিয়েছিলুম তোমাকে। কাল রাতে মগনলালের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার নোটের বান্ডিল পাওয়া গেছে। বান্ডিলগুলো তার জামার তলায় একটা কাপড়ে সারবন্দি অবস্থায় লুকানো ছিল। বুক থেকে পিঠ অবধি বেড় দিয়ে বাঁধা ছিল। টাকাটা সে প্রসাদজিকে খুন করে হাতিয়েছিল।

সেই সময় বাইরে জিপের শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরে ও. সি. মিঃ সিংহ দুজন পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবলসহ বাড়িতে ঢুকে ব্যস্তভাবে বললেন,—মর্নিং কর্নেলসায়েব! ওখানে কী করছেন?

কর্নেল থামলেন।—মর্নিং মিঃ সিংহ! যা অনুমান করেছিলুম, তা সত্য হয়েছে। এখানে এসে ব্যাপারটা দেখে যান।

হ্যাঁ, কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন। ব্যাগের তালা ভাঙতেই বেরিয়ে পড়ল কাপড়ের থলে ভর্তি একরাশ সোনার গয়না। হিরে বসানো একটা জড়োয়া নেকলেসও।

ও. সি. উত্তেজিতভাবে বললেন,—গত মাসে আহিরগঞ্জের একটা বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। এগুলো সেই ডাকাতি করা মাল মনে হচ্ছে। আহিরগঞ্জের ধনী ব্যবসায়ী পাটোয়ারিজি ডাকাতি হওয়া জিনিসের যে লিস্ট দিয়েছিলেন, তা আমার মনে আছে। এই জড়োয়া নেকলেসটা দেখেই সব মনে পড়ে গেল!

এর পর আর কী! ভীমগড়ের চূড়ান্ত চমক আমাকে সত্যিই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য রোমহর্ষক একটা স্টোরির মশলা উপহার দিয়েছিল। তখন কর্নেলের সঙ্গে পাহাড়ি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে আর আমার এতটুকু দ্বিধা ছিল না। তাছাড়া ভীমগড়ের কালো দৈত্যের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।...

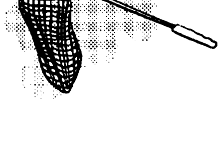

পদ্মার চরে ভয়ঙ্কর

ডানপিটে বেপরোয়া মানুষদেরও অদ্ভুত অদ্ভুত কুসংস্কার থাকে। দুর্দান্ত শিকারি জিম করবেট মানুষখেকো বাঘ মারতে গিয়ে আগে একটা সাপ মারতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আগে একটা সাপ না পারলে তিনি কিছুতেই বাঘটা মারতে পারবেন না। ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ধুরন্ধর গোয়েন্দা কিলবার্ন কোনো হত্যা রহস্যের কিনারা করার আগে একটা ঘুঘু পাখি কিনে আকাশে উড়িয়ে দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আগে একটা ঘুঘু পাখিকে মুক্তি না দিলে তাঁর গোয়েন্দাগিরি ব্যর্থ হবে।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ডানপিটে তো বটেই, তিনি শিকারেও যেমন দক্ষ, গোয়েন্দাগিরিতেও তেমনি ধুরন্ধর! কাজেই তাঁর ওই রকম একটা কুসংস্কার থাকা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, স্বাভাবিক। কিন্তু এতকাল তাঁর সঙ্গে ঘোরাফেরা করেও সেটা টের পাইনি, এটাই আশ্চর্য! আসলে আমি এখনও ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট বোকা, মুখে যতই চালাকির ভান করি না কেন।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টে তেমন কিছু চমকপ্রদ নয়। কোঠারিগঞ্জ সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা পদ্মার চরগুলোর খবর নিচ্ছিলুম। ক্যাপ্টেন নটবর সিং বলছিলেন, এই ম্যাপটা বরং সঙ্গে রাখুন আপনারা। চিহ্ন দেওয়া এই চরগুলো আমাদের ভারতের। দিনের বেলা নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারেন। তবে কখনও রাতবিরেতে যাবেন না। ডাকাত আর স্মাগলারদের তখন গতিবিধি শুরু হয়। আমাদের জওয়ানদের সঙ্গে অনেক সময় সংঘর্ষও বাধে।

কর্নেল মন দিয়ে ম্যাপটা দেখছিলেন। দেখার পর বললেন, আচ্ছা হাবিলদার সায়েব, এই একটা প্রকাণ্ড চর আঁকা আছে দেখছি। এর গায়ে লাল চিহ্ন দেওয়া কেন?

নটবর সিং একটু হেসে বললেন, ওটা ডিসপুটেড, অর্থাৎ বিতর্কিত চর। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ওই চরটা নিয়ে ঝগড়া আছে। অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মীমাংসা হয়নি এখনও। শুনছি আগামী মে মাসে দিল্লীতে আবার দু'দেশের মধ্যে বৈঠক বসবে। তখন 'পীরের চর' নিয়ে কথা উঠবে।

কী চর বললেন? 'পীরের চর' না কী যেন? কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন!

নটবর সিং বললেন, হ্যাঁ। পীরের চর। চরটা বেশ বড়। প্রায় সবটাই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলের ভেতর এক পীর বাবার কবর আছে। কবরের ওপর ভাঙাচোরা একটা দালান বাড়ি রয়েছে। আগে ওখানে পদ্মার ওপার-এপার দুই পারের হিন্দু-মুসলিম ভক্তরা মানত করতে যেত। তারপর নাকি কী সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। ভয়ে লোকেরা পীরের থানে যাওয়া ছেড়ে দিল। জঙ্গল গজিয়ে গেল।

কর্নেল ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, অদ্ভুত ঘটনাটা কী?

নটবর সিং হাসতে লাগলেন—একজোড়া বাঘ।

বাঘ! কর্নেল অবাক হয়ে বললেন। বাঘ তো জঙ্গলেই থাকে। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা বলছেন কেন?

অদ্ভুত এ কারণে যে, ওই একজোড়া বাঘ মাঝে মাঝে মানুষের গলায় শাসাতো। নটবর সিং তামাশার ভঙ্গিতে বললেন। আমি স্যার পীরের চরে গোপনে বার দুই গেছি, কিন্তু বাঘ তো দূরের কথা, একটা শেয়ালও দেখিনি। এ তল্লাটের লোকের কাছেই ব্যাপারটা শুনেছিলাম। অথচ এ কিন্তু সত্যি, পীরের চরে আরও ভুলে কেউ পা বাড়ায় না।

আমি এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিলুম। এবার বললুম, কেউ বাঘের চামড়া পরে বাঘ সেজে হয়তো লোককে ভয় দেখাত।

নটবর সিং বললেন, সে কথা আমিও ভেবেছি। স্মাগলারদের ঘাঁটির কথাও ভেবেছি। তারাই হয়তো ওভাবে ভয় দেখাত। কিন্তু লোকের মনে একবার আতঙ্ক ঢুকলে আর তো বেরোয় না! পীরের চরে যাওয়া সেই থেকে বন্ধ। আর এখন তো দু'দেশের সরকারই মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পীরের চরে কাউকে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

কর্নেল ম্যাপ থেকে মুখ তুলে কী দেখছিলেন। গঞ্জের বাইরে এই ক্যাম্প। আমবাগানের ভেতর কয়েকটা তাঁবু। নীচে পদ্মা বয়ে যাচ্ছে। বসন্তকালের সকালের রোদে নদীর জল আর মাঝে মাঝে ধূ-ধূ চর, কোথাও চরে ধূসর ঘাসবন, একটা বিরাট বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র আর মরুভূমি পাশাপাশি শুয়ে আছে।

কর্নেল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ওহে! শোনো—শোনো!

ক্রাচে ভর করে একটা ভিখারি গোছের নোংরা ছেঁড়াখোড়া পোশাকের লোক যাচ্ছিল গঞ্জের বাইরের দিকে। কর্নেলের ডাকে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দিকে আসতে থাকল।

খোঁড়া লোকটি তো হতবাক। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কর্নেল পকেট থেকে পার্স বের করে আস্ত একটা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। লোকটার চোখ আরও বড় হয়ে গেল। কর্নেল তার হাতে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, গুড বাই, মাই ফ্রেন্ড! আবার দেখা হবে।

লোকটি ক্যাপ্টেন সিং আর সেপাইদের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে যেভাবে টাট্টু ঘোড়ার মতো ক্রাচ খটমটিয়ে দ্রুত চলে গেল, বুঝলুম—এত বেশি টাকা সে জীবনে ভিক্ষে পায়নি এবং ভেবেছে, হাবিলদার আর সেপাইদের এ ব্যাপারে মনঃপুত নয়—এক্ষুনি তাই ভাগ চেয়ে বসতেও পারে। অতএব কেটে পড়াই ভাল।

নটবর সিং আমার মতো, অবাক হয়েছিলেন। বললেন, ওই বজ্জাতটাকে দশ টাকা ভিক্ষে দিলেন স্যার, ও তো এবার নেশা-ভাঙ করবে আর জুয়ো খেলতে যাবে। ওকে আপনি চেনেন না!

কর্নেল মৃদু হেসে বললেন, ও কিছু না। আচ্ছা হাবিলদার সায়েব, বেলা বাড়ছে। আমরা তাহলে আসি। এস জয়ন্ত!

ক্যাম্পের সবাই কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমরা চলতে থাকলুম পদ্মার পাড়ে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কর্নেল বললেন, সচরাচর কেউ ভিখিরিকে দশ টাকা দেয় না। তাই ওরা অবাক হয়েছে। বুঝলে জয়ন্ত?

বললুম, অবাক আমিও কম হইনি।

ডার্লিং! কর্নেল সস্নেহে আমার একটা হাত হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তুমি ভালই জানো, ইচ্ছে থাকলেও খুব একটা দান-ধ্যানের ক্ষমতা আমার নেই। তবে কোনো শুভ কাজে বেরুনোর আগে হঠাৎ কোনো প্রতিবন্ধীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেটাকে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি। বহুবার বহু ব্যাপারে ঠিক বেরুনোর মুখে অন্ধ, খোঁড়া কিংবা বিকলাঙ্গ মানুষ দেখতে পেলেই সে কাজটা সফল হয়েছে। তাই আমি এসব সময়ে তেমন কোনো মানুষ দেখতে পেলে দশ টাকা কেন, আরও বেশি দান করতে রাজি।

এ কিন্তু আপনার নিছক কুসংস্কার।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'কু' কিংবা 'সু' জানি না—তবে এটা আমার সংস্কার। তাছাড়া এটা আমার বহুবার পরীক্ষিত।

হাসতে হাসতে বললুম, বাংলা প্রবাদ কিন্তু উল্টোটাই বলে। বলে কী জানেন? প্রতিবন্ধী দর্শনে যাত্রা নাস্তি। যাত্রারম্ভে হাঁচি টিকটিকির বাধার মতো।

কর্নেল চুপচাপ হাঁটছিলেন। তাঁর মাথায় এখন ধূসর রঙের টুপি। কড়া রোদে টাক জ্বলে যাবে। সাদা দাড়ি পদ্মার জোরালো হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছে। পিঠে হ্যাভারস্যাক, গলায় ঝুলছে সেই অদ্ভুত ক্যামেরা—যা অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ এবং একটি বাইনোকুলার।

আমার পিঠে বন্দুক, পকেটে কয়েকটা গুলিও আছে। জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক কাঁধে ঝুলিয়েছি। পিঠে একটা কিটব্যাগে কিছু জামাকাপড়, ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম ইত্যাদি।

বরাবর এভাবেই কর্নেলের সঙ্গে আমি বেরোই। এবার মার্চের শেষাশেষি মুর্শিদাবাদ সীমান্তে পদ্মার পাড় ধরে এই অভিযানের উদ্দেশ্য, বুনো হাঁস শিকার। নীতিগতভাবে পশুপাখিকে গুলি করে মারার আমি বিরোধী। কিন্তু হিমালয় পারের লক্ষ লক্ষ যাযাবর হাঁসের দু-চারটিকে মেরে সুস্বাদু মাংস ভোজনে এমন কিছু পাপ হবে বলে মনে করি না।

কর্নেলের উদ্দেশ্য চিরাচরিত। বিরল প্রজাতির পক্ষী দর্শন এবং ফটো তোলা। পদ্মার চরে কী এক প্রজাতির জলচর পাখি আসে নাকি—যা হাঁস এবং বকের মাঝামাঝি গড়নের। ঠোঁট এবং মাথা হাঁসের মতো, পা এবং শরীর বকের মতো। এই কিম্ভূত বিদঘুটে পাখির নাম দিয়েছি বখাঁস্। বক্ ও হাঁসের সন্ধি। কিন্তু কর্নেল তামাশায় কান দেননি।

আমবাগান, ঝোপঝাড়ে ভরা জমি, কোথাও চষা ক্ষেত আর বাঁ দিকে পদ্মা রেখে আমরা হাঁটছিলুম। পাড় বরাবর একটা সরু পায়ে চলা পথ এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চাষাভুষো লোকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তারা সবাই যাচ্ছে কোঠারিগঞ্জ বাজারে আনাজপাতি বেচতে।

একটা পুরনো মন্দির পড়ল পথের পাশে। একটু তফাতে একটা বসতি। মন্দিরের চত্বরে কয়েকজন লোক জাল বুনছে—কেউ জাল শুকোতে দিয়েছে। আমাদের দেখে তারা কাজ ফেলে তাকিয়ে রইল। কর্নেল ওদের উদ্দেশে ভদ্রতাসূচক হেসে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। ওরা হাত জোড় করে নমস্কার করল। বুঝলুম, আস্ত সায়েব দেখে ওরা ভড়কে গেছে। কর্নেলকে দেখে এমন ভুল তো সবাই করে! কিন্তু কর্নেল যখন বললেন, পদ্মায় কেমন মাছ হচ্ছে-টচ্ছে? ওরা সায়েবের মুখে বাংলা শুনে তখন খুশি হয়ে একসঙ্গে কলকল করে জবাব দিতে থাকল।

তা স্যার, মাছ হচ্ছে বই কিছু কিছু। কিন্তু আজকাল বর্ডারের সেপাইরা বেশি দূরে যেতে দেয় না। তার ওপর চোর-ডাকাতও ওপার থেকে এসে হামলা করে। মাছ ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কর্নেল বললেন, শুনেছি পীরের চরের ওদিকে পদ্মার একটা পুরনো খাদ আছে। সেখানে তো খুব মাছ পাওয়া যেতে পারে। তাই না?

ওদের সর্দার চোখ বড় করে মাথাটা জোরে দোলাল। তারপর ভয় পাওয়া গলায় বলল, না স্যার। সে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা! পীরের চরের থেকেও ভয়ঙ্কর।

কেন বলো তো?

জেলে সর্দার বলল, ওই খাদের নাম রাক্ষুসির বাঁওড়। লোভে পড়ে ওখানে মাছ ধরতে গিয়ে আমাদের গাঁয়ের অনেক লোক নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমার বড় ছেলে—নাম ছিল গণেশ। ইয়া বড় বুকের ছাতি—পেল্লায় চেহারা। তিন বছর বাদে বারণ না মেনে রাক্ষুসির বাঁওড়ে গেল—আর ফিরে এল না।

জেলে সর্দার ফোস করে শ্বাস ছেড়ে কান্না সামলে নিল। কর্নেল ম্যাপটা খুলে জায়গাটা দেখতে দেখতে বললেন, হুম! ভারি ভয়ঙ্কর জায়গা তাহলে।

ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

আমরা আপাতত যাব 'মহিমবাবুর চরে', কর্নেল বললেন। সেখানে নাকি প্রচুর বুনো হাঁস দেখা যায়।

তা যায় বটে! জেলে সর্দার বলল। কিন্তু হাঁসের দেখা বেশি মেলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে। শীত পর্যন্ত এত হাঁস দেখা যায়, পদ্মার জল কালো হয়ে ওঠে যতদূর চোখ যায়। এখন তো স্যার শীত

ফুরিয়েছে, এখন তত বেশি নেই। তবে আছে—সারা বছর যারা থাকে, তারা আছে। তাদের সংখ্যাও কম নয়। দেখবেন গিয়ে?

কর্নেল বসলেন, হুম! সে কথা আমিও শুনেছি। পদ্মার চর এলাকায় বারো মাস শুধু হাঁস কেন, কত রকমের পাখির আড্ডা। তাই না?

আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন।

লোকগুলোকে সিগারেট বিলি করলুম কর্নেলের আদেশে। কর্নেলের তো চুরুট ছাড়া চলে না, চুরুট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ খবরাখবর নিলেন। কথা আছে, মহিমবাবুর চরে গিয়ে ডেরা পাতব। ওখানে আগে থেকে একটা নৌকো নিয়ে লোক থাকবে।

নির্জন রাস্তা। বড় বড় গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। একটা বটগাছের তলায় পৌঁচেছি, পেছনে ক্রিং ক্রিং সাইকেলের ঘন্টি শুনতে পেলুম।

ঘুরে দেখি, কোঠারিগঞ্জে রাতে যার বাড়িতে ছিলুম, সেই সদাশিববাবুর নাতি মোহনবাবু আসছেন সাইকেলে চেপে। পিঠে বন্দুক। ব্যাপার কী! উনি না আজ ভোরবেলায় কলকাতা যাচ্ছেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন!

কর্নেল খুশি হয়ে বললেন, হ্যাল্লো মোহন! আমি জানতুম, তোমার কলকাতা যাওয়া হবে না।

মোহনবাবু বললেন, আপনি কি অন্তর্যামী কর্নেল!

কতকটা। কর্নেল সহাস্যে বললেন। রাতে তোমার দাদুর সঙ্গে তোমার কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পারছিলুম, আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে তোমার যতটা টান, দাদুর কাজে কলকাতা যাওয়ায় ততটা নেই। কাজেই ধরেই নিয়েছিলুম, তুমি ট্রেন ফেল করবে।

মোহনবাবু আমার সমবয়সী যুবক। খুব হাসিখুশি স্বভাবের। সাহসী বলেও মনে হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এখন এই এলাকায় পাটকাঠি থেকে কাগজ তৈরির কারখানা গড়ার চেষ্টা করছেন। এ এলাকায় প্রচুর পাট চাষ হয়।

মোহনবাবু বললেন, দেখুন কর্নেল, দাদুর কাজ দু'দিন পরে হলেও চলবে। কিন্তু আপনাদের সঙ্গ তো আর পাব না! আপনাদের দু'জনের কীর্তিকথা এতকাল কাগজে পড়েছি। হঠাৎ কপালগুণে আপনারা যে এই জঙ্গলে পাণ্ডব বর্জিত এলাকায় এসে পড়বেন, কল্পনাও করিনি। তা আবার আমাদের বাড়িতেই!

কর্নেল সস্নেহে ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোমার বাবা এ জেলার প্রখ্যাত শিকারি ছিলেন। ওড়িশার জঙ্গলে যখন মানুষখেকো বাঘ শিকারে গিয়ে প্রমথনাথ মারা যান, আমি তাঁর সঙ্গী ছিলুম। তোমার বয়স তখন খুব কম। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে মাঝে মাঝে গেছি অবশ্য।

মোহনবাবু বললেন, মায়ের কাছে সব শুনেছি। দাদুও বলছিলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা আরও মাইলটাক এগিয়ে মহিমবাবুর চরের এলাকায় পৌঁছলুম। বাঁ দিকে পদ্মার জল অনেকগুলো বালির ঢিবির আনাচ-কানাচ ঘুরে বয়ে যাচ্ছে। কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বুঝি মহিমবাবুর চর খুঁজছিলেন। সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে মোহনবাবু একটা খাড়ির ধারে গিয়ে কাদের ডাকতে থাকলেন।

একটু পরে ফিরে এসে বললেন, চলুন, নৌকো রেডি।

বালি-কাদা ভরা পিছল খাড়িতে একটা পানসি নৌকো নিয়ে মাঝিরা অপেক্ষা করছিল। নৌকো চেপে আমরা চললুম সেই চরের দিকে। চরটা দেখা যাচ্ছিল না। শুনেছি, মহিম হালদার নামে কেউ বহুকাল আগে ওই চরে গিয়ে বসতি করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবার বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে যেত। তারপর থেকে চরটা জনহীন হয়ে পড়ে আছে। শুধু মহিমবাবুর পুরনো একতলা ইঁটের বাড়িটা রয়ে গেছে। সেখানে মাঝে মাঝে সীমান্ত বাহিনী গিয়ে ক্যাম্প করে থাকে। এখন সীমান্ত এলাকা শান্ত বলে তারা ওখানে নেই।

ঘণ্টা তিনেক লাগল পৌঁছুতে।

মাঝিরা নৌকোয় থাকল। তারা রান্নাবান্না করবে এখন। আমরা যতক্ষণ থাকব, ওদেরও থাকতে হবে।

ঘন কাশবন আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা চর। উঁচু গাছের সংখ্যা খুব কম। সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা একটা জীর্ণ দালান বাড়ি। সীমান্তবাহিনীর ফেলে যাওয়া কয়েকটা খাটিয়া রয়েছে ঘরে। জানালা-দরজা ফেটে রয়েছে। বারান্দায় একটা উনুন দেখতে পেলুম। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন, ওটাই বুঝি সেই পীরের চর?

খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল, মাইলটাক দূরে পদ্মার বুকে একটা ঘন সবুজ দ্বীপ। চারদিকে জল। মোহনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, কর্নেল, ওখানেই নাকি দুটো বাঘ মানুষের গলায় কথা বলত।

আর রাক্ষুসির বাঁওড় কোন্‌টা?

মোহনবাবু আঁতকে ওঠার ভান করে বললেন, তাও কানে গেছে? ওই দেখুন—পীরের চরের ডান দিকে পদ্মা খানিকটা ঢুকে গেছে বিলের মতো-দেখতে পাচ্ছেন? ওটাই সেই ভূতুড়ে বাঁওড়।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে হঠাৎ বললেন, আশ্চর্য তো!

আমরা দু'জনে এক গলায় বললুম, কী?

একটা স্পিড-বোট।

মোহনবাবু কর্নেলের কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন বাইনোকুলার। দেখতে দেখতে বললেন, তাই তো! আমাদের সীমান্ত বাহিনীর গোটা দুই স্পিড-বোট আছে বটে, সে তো সেই লালগোলা ক্যাম্পে। তাছাড়া এ স্পিড-বোটের গড়নও অন্যরকম।

আমি বললুম, বাংলাদেশের নয় তো?

কর্নেল বললেন, না। কারণ স্পিড-বোটে একটা স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা আছে। আর একটা মড়ার খুলি এবং তার তলায় আড়াআড়ি দুটো হাড়ও আঁকা। তার মানে, সাবধান! আমি সাক্ষাৎ মৃত্যু!

বলেন কী! অজানা ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল আমার।

মোহনবাবু বললেন, স্পিড-বোটে জনা চার লোক বসে আছে। ওরে বাবা! একটা সাব-মেশিনগান ফিট করা আছে দেখছি। কর্নেল! কর্নেল! ওরা পীরের দিকে এগোচ্ছে।

কর্নেল বললেন, যাক্ যার যেখানে খুশি। আমরা তো পাখির ব্যাপারে এসেছি! ইয়ে—ডার্লিং জয়ন্ত! তাহলে এবার সঙ্গের খাদ্যগুলোর সৎকার করে নিয়ে বেরুনো যাক। রোদ্দুরটা খাসা। আবহাওয়াও মোলায়েম। ওই দেখ, কত পাখি! জয়ন্ত! বিশ্বাস করো, একসঙ্গে এত জলচর পাখি কখনও দেখিনি! অভূতপূর্ব। বিস্ময়কর!

দুই

অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়করই বটে। এমন লক্ষ লক্ষ, নাকি কোটি কোটি জলচর পাখির সমাবেশ কোথাও দেখিনি। যতদূর চোখ যায়, খালি পাখি আর পাখি। তাদের চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। জল থেকে এখানে ওখানে বালির চর জেগে রয়েছে। সেইসব চরে অসংখ্য পাখি বিশ্রাম করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ছে। আবার ছল-ছলাৎ শব্দে জলে নামছে। মনে হচ্ছে একটা দীর্ঘ চাবুক আকাশ থেকে কেউ সপাং করে জলে মারল।

বন্দুকের আওয়াজ করলে কর্নেলের সেই 'বখাঁস' দর্শন হবে না। তাই উনি আমাকে আর মোহনবাবুকে দক্ষিণে যেতে বলে একা গেলেন চরের উত্তর দিকে। কাশবনের আড়ালে ওঁর টুপিটি দেখা যাচ্ছিল। আমরা চরের দক্ষিণ দিকে ঢালুতে নেমে আর ওঁকে দেখতে পেলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে মোহনবাবুর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেল যে, আমরা পরস্পরকে তুমি বলতে শুরু করলুম এবং নাম ধরে ডাকাডাকি চলল।

মোহন বলল, আজকাল এত বেশি জলচর পাখি নির্ভয়ে এ তল্লাটে এসে জুটছে কেন জানো? এদিকে কেউ পা বাড়ায় না বলে। এসব পাখি মারা বেআইনি। কিন্তু সেজন্য নয়। প্রথম কথা, বর্ডার বাহিনীর নিষেধাজ্ঞা আছে। দ্বিতীয় কথা হল, পীরের চর আর রাক্ষুসির বাঁওড় সম্পর্কে লোকের ভীষণ আতঙ্ক। যারা এদিকে একা-দোকা এসেছে, তারা কেউ ফিরে যায়নি।

চরের একদিকটা ঢালু হয়ে জলে নেমেছে। সমুদ্রের বেলাভূমির মতো। একেবারে ফাঁকা এদিকটা শুধু ধু-ধু বালি। আমাদের দেখামাত্র বুনো হাঁসের ঝাঁক উড়ে দূরে গিয়ে বসল। বন্দুকের পাল্লার বাইরে। অনেক ঘোরাঘুরি করেও গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেলুম না।

দেখতে দেখতে রোদ কমে এল। তারপর টের পেলুম, হাওয়াটা বেজায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মোহন বলল, আমাদের বরাত মন্দ জয়ন্ত! পাখিগুলো দেখছি মহা ধড়িবাজ! কী আর করা! কাল ভোরবেলা অন্যদিকে বেরনো যাবে। এখন ফেরা যাক্।

মহিমবাবুর চর বেশ লম্বা-চওড়া। লম্বায় মাইলটাক না হয়ে যায় না। চওড়াতেও মনে হল প্রায় পৌনে এক মাইল। কাশবন, বালিয়াড়ি, কাঁটাঝোপের ভেতর ঘোরাঘুরি করে ধূর্ত পাখিগুলোকে যখন কিছুতেই বন্দুকের নাগালে পেলুম না, তখন ডেরায় ফিরে গেলুম।

কর্নেল ফিরলেন সন্ধ্যা নাগাদ। তখন পুবে মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা তাহলে। জ্যোৎস্না ফুটতে ফুটতে আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেল। নৌকোর মাঝিরাও এসে জুটল। ওরা নৌকোয় রাত কাটাতে নারাজ। আগের ব্যবস্থা মতো লণ্ঠন আর রান্নার সরঞ্জাম নৌকোয় ছিল। সব বয়ে নিয়ে এল। ভেবেছিলুম, বুনো হাঁসের মাংসের ঝোল খেয়ে পদ্মার এই বেমক্কা ঠাণ্ডাটা ঠেকাব। হল না। তবে মাঝিরা বুদ্ধি করে জাল ফেলে কিছু মাছ ধরেছিল।

কর্নেলেরও আমাদের মতো মন ভাল নেই। অনেক হাঁটাহাঁটি আর জল-কাদা-বালিতে উপুড় হয়ে 'বর্খাস' দেখার চেষ্টা করেছেন। থাকলে তো!

কর্নেলের মতে, নিশ্চয় আছে। এক পক্ষীবিদ্ সায়েবের বইতে পড়েছেন। বোম্বাইয়ের নামকরা পক্ষীবিদ্ সেলিম আলিও লিখেছেন পদ্মার চরের এই আশ্চর্য জলচর পাখির কথা।

রাত আটটার মধ্যে শালপাতায় মোটা চালের ভাত আর মাছের ঝোল খাওয়া হয়ে গেল। সায়েব মানুষ কর্নেলও খুব তারিয়ে তারিয়ে চেটেপুটে খেলেন এবং মাঝিদের রান্নার সুখ্যাতি করলেন।

তারপর এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। এখনই পীরের চরে যেতে চান। ইচ্ছে করলে আমরাও ওঁর সঙ্গে যেতে পারি।

কিন্তু যেতে হলে নৌকো চাই। মাঝিরা আতঙ্কে কাঠ হয়ে বলল, তারা প্রাণ গেলেও পীরের চরে যাবে না। দিনেই যাবে না, তো এই রাতের বেলায়! সায়েবের কি মাথা খারাপ! ওদিকে যে যায়, সে আর ফেরে না।

মোহন বলল, ঠিক আছে। আমি নৌকো বাইতে জানি। এ দেশের ছেলে। এ কাজটা ভালই পারি। জয়ন্ত, তুমি নৌকো বাইতে পারো তো?

জোরে মাথা নেড়ে বললুম, মোটেও না। কর্নেলও পারেন না।

কর্নেল বললেন, তুমি কি ভুলে গেলে জয়ন্ত? ভারত মহাসাগরের টোরা দ্বীপ থেকে একবার একা ভেলায় পাড়ি জমিয়েছিলুম প্রাণের দায়ে! আর এ তো পদ্মা!

তাও বটে। এ বুড়োর অসাধ্য কাজ কিছু থাকতে নেই। কিন্তু দ্বিধাজড়ানো গলায় বললুম, এই রাত-বিরেতে ওই জঙ্গুলে চরে কি না গেলেই চলে না! বরং সকালে যাওয়া যাবে।

একজন মাঝি ভয় দেখিয়ে বলল, স্যার, পীরের চরের জোড়া বাঘ এখনও শুনেছি আছে। তাছাড়া প্রচণ্ড সাপের উৎপাত আছে। কেউটে-গোখরো তো আছেই, আর আছে অজগর সাপ। স্যার, আমি দূর থেকে একবার দেখেছি, অজগর সাপটা মাথায় মণি নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর চারদিকে আলো ঠিকরে পড়ছে। জঙ্গল আলো হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস করুন।

কর্নেল কানে নিলেন না। মোহনের মুখেও দ্বিধার চিহ্ন নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে টর্চ আছে। প্রত্যেকের পায়ে গামবুট আছে। দুটো বন্দুক আছে। কর্নেলও নিশ্চয় তাঁর রিভলভারটা সঙ্গে এনেছেন।

জ্যোৎস্নার রাতে পদ্মায় নৌকো করে যাওয়ার আনন্দ আছে। বারবার মনে পড়ছে সেই ভয়ঙ্কর স্পিড-বোটটার কথা। কারা ওরা! ওদের কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওরা যে ভাল মানুষ নয়, তা তো বোঝাই গেছে। বোটের গায়ে মড়ার খুলি আঁকার মানে একটাই—তা হল, 'আমরা সাক্ষাৎ মৃত্যু!' কর্নেল-দাঁড়ে বসেছেন। মোহন একা আলতো হাতে বৈঠা বাইছে। আমরা যাচ্ছি স্রোতের ভাটিতে। তাই নৌকো তরতর করে এগোচ্ছে। আমি পানসির ছাদে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে উঁচু পাড়, অন্যদিকটায় জল। কিছু দূর যাবার পর নৌকো কোনাকুনি চলতে থাকল। পাড় থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলাম।

জ্যোৎস্নায় চারদিক কেমন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছিল, ভুল করে বাংলাদেশের সীমানায় গিয়ে পড়ব না তো!

কর্নেলকে না বলে পারলুম না—পীরের চর তো দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে অন্য কোথাও নৌকো নিয়ে গেলেই মুশকিল!

কর্নেল পানসির পেছন থেকে জবাব দিলেন, এবার নাক বরাবর। তাছাড়া ওই দেখ আলো!

আলো মানে! চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলুম।

মোহনও মুখ ফেরাল। বলল সর্বনাশ! ওটা তাহলে সেই স্পিড-বোটের আলো।

কর্নেল বললেন, না। আলোটা উঁচুতে। তার মানে পীরের চরের জঙ্গলে।

আলোটা দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। বললুম, কর্নেল, জনমানুষহীন পীরের চরে কেউ নিশ্চয় আলো হাতে আমাদের বরণ করার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু বরণ কীভাবে করবে, সেটাই একটু ভাবনার কথা।

কর্নেল কোনো জবাব দিলেন না। ওদিকে আলোটা নড়তে নড়তে হঠাৎ যেন নিবে গেল। বন্দুকটা শক্ত করে চেপে ধরলুম।

তারপর টের পেলুম, আমাদের নৌকো বিশাল এক ঝাঁক পাখির দিকে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার পাখি ভয় পেয়ে উড়তে শুরু করল। অনেক বেপরোয়া পাখি তরতর করে জল কেটে দূরে সরে যেতে থাকল। চারদিকে প্রচণ্ড একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। জলের শব্দ, ডানার শব্দ, আঁক-আঁক ট্যাঁ-ট্যাঁ চিৎকার। একটু পরে সামনে কালো পাহাড়ের মতো আবছা ভেসে উঠল পীরের চর।

জলে ঝোপঝাড় ঝুঁকে আছে। ঘন কালো তাদের রঙ। অন্ধকার ওত পেতে আছে যেন আমাদের জন্য। নৌকো ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করে এক জায়গায় ফাঁকা বালির তট পাওয়া গেল। সেখানে নৌকো বেঁধে রাখা হল একটা ঝোপের সঙ্গে। পাহাড়ের মতো আবছা ভেসে উঠল পীরের চর।

জলে ঝোপঝাড় ঝুঁকে আছে। ঘন কালো তাদের রঙ। অন্ধকার ওত পেতে আছে যেন আমাদের জন্য। নৌকো ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করে এক জায়গায় ফাঁকা বালির তট পাওয়া গেল। সেখানে নৌকো বেঁধে রাখা হল একটা ঝোপের সঙ্গে। তারপর আমরা ঢালু পাড় বেয়ে উঠে গেলুম পীরের চরে।

কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, কোনো কথা নয়। চুপচাপ আমার পেছন পেছন এস। দরকার হলে আমিই টর্চ জ্বালব—তোমরা জ্বেলো না যেন!

ওপরে মাটিটা শক্ত। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বড় বড় গাছ আছে। চাঁদের আলো পড়েছে চকরা-বকরা হয়ে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি সাপের ফোঁস শুনতে পাব! কিন্তু কিছুটা এগিয়ে ভয়টা কেটে গেল। বিষধর সাপ পায়ে ছোবল মেরে সুবিধে করতে পারবে না, পায়ে গামবুট রয়েছে আমাদের।

সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সেখানে যেতেই আমরা থমকে দাঁড়ালুম। ডাইনে সম্ভবত একটা বটগাছ। জ্যোৎস্নায় অজস্র ঝুরি দেখা যাচ্ছে মনে হল। ঝুরিগুলোর ভেতর একখানে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো বাঘ আপন মনে খেলা করছে। তাদের লেজ দুটো খুব নড়াচড়া করছে। পরস্পর কামড়াকামড়ি আর জড়াজড়ি করে ওরা খেলছে।

কর্নেলের ইশারায় আমরা বসে পড়লুম। বন্দুক এগিয়ে বাগিয়ে রইলুম, যদিও জানি, পাখি-মারা কার্তুজে বাঘের একটুও ক্ষতি করা যাবে না। অবশ্য আওয়াজে ভড়কে যেতেও পারে।

বাঘ দুটোর খেলা আর শেষ হয় না। কতক্ষণ পরে এবার যা দেখলুম, চোখে বিশ্বাস করা কঠিন। সম্ভবত যে আলোটা দেখেছিলুম, সেইটেই হবে। দুলতে দুলতে কোত্থেকে এল। তারপর আলোর ছ'টায় আবছা দেখা গেল একটা অদ্ভুত চেহারার মানুষকে। কালো আলখাল্লায় ঢাকা আপদমস্তক। নাকটা বাঁকা বাজপাখির ঠোঁটের মতো। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সে বাঘ দুটোর কাছে এসে লণ্ঠন নামিয়ে রাখল। তখন বাঘ দুটো তার পায়ে মাথা ঘষতে থাকল।

লোকটা বাঘ দুটোর পিঠে থাপ্পড় মেরে বলল, খুব হয়েছে! এবার নিজের কাজে যাও বাবারা! চারিদিকে চক্কর মেরে নজর রাখবে। হুঁশিয়ার!

বাঘ দুটো পেছনের দু'পা গুটিয়ে সামনের দু'পা সোজা রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। আলখাল্লাধারী ফের বলল, হাঁ করে দেখছ কী বাবারা? আজ শয়তান কাশিম খাঁকে দেখেছি মোটর-বোটে রাক্ষুসির বাঁওড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খবরদার! শয়তানটা যেন এ পবিত্র মাটিতে পা রেখে নোংরা করে না!

বাঘ দু'টো দু'দিকে চলে গেল। ভাগ্যিস, আমাদের দিকে এল না। এলে কী হত, ভাবতেও গা শিউরে উঠল!

আলখাল্লাধারী আলো নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢোকা মাত্র কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, চলে এস। সাবধানে কিন্তু।

জঙ্গলের ভেতর জায়গায় জায়গায় জ্যোৎস্না পড়েছে। গাছগুলো সবই উঁচু। তাই এবার হাঁটতে অসুবিধে নেই। আলখাল্লাধারী আলো নিয়ে যেখানে ঢুকল, সেটাই তাহলে পীরের মাজার। একতলা জীর্ণ একটা বাড়ি। দরজা বন্ধ করে দিল সে।

আমরা বাড়িটা ঘুরে পেছনের দিকে গেলুম। ভাঙা জানলা দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছিল। প্রথমে কর্নেল সেখানে উঁকি দিলেন। তারপর আমাকে ইশারা করলেন। ফাটলে চোখ রেখে দেখি, ঘরের মেঝেয় সেই আলখাল্লাধারী লোকটা বসে আছে। তার সামনে একটা কবর। কবরে পুরনো আমলের ছেঁড়াখোঁড়া একটা লাল ভেলভেট কাপড় ঢাকা। কবরের অন্যদিকে বসে রয়েছে তিনজন হিংস্র চেহারার লোক। তাদের পরনে প্যান্ট-শার্ট এবং প্রত্যেকের হাতে একটা করে রাইফেল, বুকে কার্তুজের মালা।

আলখাল্লাধারী বলল, হ্যাঁ, শয়তানটা আজ আবার এসেছে। কিন্তু ওর সঙ্গে লড়াই করে এঁটে ওঠা যাবে না। কারণ এবার হারামজাদা কাশিম খাঁ সঙ্গে একটা সাব-মেশিনগান এনেছে। কাজেই ওর সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি। বরং বাদশা-বেগমকে লেলিয়ে দিয়েছি। ওরা ওদের ভিড়তে দেবে না চরে।

ইতিমধ্যে কর্নেল আর মোহনও আমার পাশে মাথা গুঁজে ফাটলে চোখ রেখেছেন। আমরা থ' বনে গিয়ে শুনছি ওদের কথাবার্তা। বুঝতে পারছি বাদশা-বেগম সেই বাঘ দু'টোর নাম। কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না!

একজন অনুচর বলল, কিন্তু বাদশা-বেগমকে ওরা যদি গুলি করে মারে?

আমার এ জানোয়ার দু'টোর বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর একটু আস্থা রেখো জনার্দন! আলখাল্লাধারী লোকটা বলল। তার মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। তুমি কি জানো না, এ পর্যন্ত কত জন ওদের পেটে হজম হয়ে গেছে?

দ্বিতীয় অনুচর বলল, তারা নেহাত মাছমারা জেলে—নিরীহ মানুষ! কিন্তু কাশিম খাঁ—

কথা কেড়ে আলখাল্লাধারী বলল, হুঁশিয়ার রহিম বখ্‌শ! তোমার দেখছি ওদের ওপর বড্ড দরদ! তুমি জানো! ওরা সবাই কাশেমের টাকা খেয়ে পীরের চরে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিল মাছধরার ছলে? জেলেপাড়ার গণেশ নামে এক ছোকরাকে বাদশা কামড় বসিয়েছিল। আমার খেয়াল হল বাঘের পেটে যাবার আগে ওকে জেরা করে দেখি, সত্যি সত্যি মাছ ধরতে এসে পীরের চরে পা দিয়েছে নাকি! জেরা করে জানলুম, ওপার থেকে কাশেমের লোক গিয়ে ওকে টাকা খাইয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছে।

তৃতীয় অনুচর বলল ওস্তাদজী! মহিমবাবুর চরে কারা এসেছে দেখেছি। তাদের মধ্যে একটা বুড়ো সায়েব আছে। সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে পাখি দেখে বেড়াচ্ছিল।

ওস্তাদজী হাসল—সায়েবদের পাখি দেখার নেশা আছে, গদাই। বুঝলে তো? পদ্মার চরে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে শিকারিরাও আসে। কাজেই ও নিয়ে ভেবো না।

তৃতীয় অনুচর গদাই চেহারাতেও তদ্রূপ। নাদুসনুদুস গড়ন। প্রকাণ্ড মাথা। অন্য সময়ে তাকে দেখলে হাসি পেতে পারে। কিন্তু এখন ওর হাতে অটোমেটিক রাইফেল।

গদাই বলল, ওদের সঙ্গে কোঠারিগঞ্জের সদাশিববাবুর নাতি মোহনবাবুকেও দেখেছি।

ওস্তাদজী খিকখিক করে হেসে বলল, মোহন! মোহন বড় ভাল ছেলে। ছোটবেলায় কোঠারিগঞ্জে থাকার সময় ওকে দেখেছি। এখন খুব বড় হয়ে গেছে নিশ্চয়!

জনার্দন বলল, এখন একটু চা পেলে মন্দ হত না ওস্তাদজী! বাইরে ঠাণ্ডাটি বাড়ছে। তাছাড়া সারা রাত জেগে কাজ করতে হলে মাঝে মাঝে চা দরকার।

ওস্তাদ ডাকল, ভুতো! অ্যাই ভুতো!

ওদিক থেকে সাড়া এল।—চা হয়ে গেছে ওস্তাদজী!

নিয়ে আয় ঝটপট!

চায়ের কেটলি আর গোটাকতক গ্লাস হাতে যে লোকটা ঘরে ঢুকল, তাকে দেখেই চমকে উঠলুম। আরে! এ তো সেই সকালে বর্ডার বাহিনীর ক্যাম্পে দেখা খোঁড়া লোকটা! বগলে ক্রাচ এখনও রয়েছে। কর্নেলকে চিমটি কাটলুম। সাড়া পেলুম না।

ওরা চা খেতে থাকল। তারপর দূরে কোথাও বাঘের ডাক শুনতে পেলুম। কয়েকবার ডেকেই চুপ করে গেল। ভেতরের লোকগুলো নিশ্চয় শুনতে পায়নি। ওরা নিশ্চিন্ত মনে কথা বলছে পরস্পর। কান পেতে শুনতে থাকলুম। মাঝে মাঝে পেছনে ঘুরে দেখেও নিলুম, বাদশা বা বেগমের জন্য মনে আতঙ্ক রয়েছে। পেছনের দিকটা ফাঁকা না হলেও উঁচু গাছের সংখ্যা কম। তাই পরিষ্কার নজর হচ্ছে অনেকটা দূর পর্যন্ত।

ওস্তাদ বলল, শয়তান কাশেম আসলে ভেবেছে, বুলবন পেশোয়ারীর সোনাদানায় তার ভাগ আছে। কেন? না, সে পেশোয়ারীর কর্মচারী ছিল। ভেবে দেখ তোমরা! ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে যখন ওপারে হাঙ্গামা লাগল, অবাঙালি মুসলিম বড়লোকেরা অনেকেই এই বর্ডার পেরিয়ে পালিয়ে

আসছে—বুলবন পেশোয়ারী আর থাকবে কোন্ সাহসে? পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের লকার ভেঙে প্রায় পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাট নিয়ে ভাগলো। হ্যাঁ, কাশেম খাঁ বলতে পারে বটে, সে বর্ডার পেরুতে তার ওই স্পিড-বোটটা দিয়ে পেশোয়ারীকে সাহায্য করেছিল। তাতে কি পেশোয়ারীর সোনার হিস্যে তার পাওনা হয়!

করিম বখশ বলল, পেশোয়ারী এই পীরের চরেই যে সোনা পুঁতে রেখেছিল, তার প্রমাণ?

ওস্তাদ চোখ পাকিয়ে বলল, করিম বখশ! তুমি বরাবর বড্ড সন্দেহপ্রবণ লোক!

করিম আমতা আমতা হেসে বলল, না ওস্তাদজী! ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার! নইলে খামোকা যেখানে-সেখানে মাটি খুঁড়ে লাভ কি?

জনার্দনও সায় দিয়ে বলল, ঠিক, ঠিক।

খোঁড়া লোকটা—ভুতো, চায়ের এঁটো গ্লাসগুলো নিয়ে চলে গেল। গদাই বলল, হ্যাঁ ওস্তাদজী। সবটা আপনার মুখে শুনতে চাই। আর কতদিন ভুল পথে ছোটাছুটি করে মরব!

ওস্তাদ বলল, পেশোয়ারীকে তার মালপত্তর সমেত কাশেম এই চরে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। আমাকে বলে যায়, ওকে যেন নিরাপদে লালগোলা পৌঁছে দিই। রাতে আমার এই আস্তানায় যত্ন করে পেশোয়ারীকে রাখলুম। আমি ভাবতেই পারিনি, ওর কাছে অত সোনা আছে! তবে হ্যাঁ, দেখে মনে হয়েছিল বটে বেজায় বড়লোক। টাকাকড়িও আছে সঙ্গে। ভাবলুম, ঘুমোলে স্যাঙাতকে শেষ করে সবটা হাতাব। লাশটা বাদশা-বেগমকে খাইয়ে দেব। কিন্তু ব্যাটা কীভাবে সব টের পেয়েছিল জানি না। না কি কাশেমই আমার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিল! রাতে আমি মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকালে উঠে দেখি পেশোয়ারী নেই। তখন সন্দেহ হল, ব্যাটা আমাকে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। গ্লাস পরীক্ষা করে দেখলুম, সাদা গুঁড়ো কী সব জিনিস রয়েছে গ্লাসের তলায়।

গদাই বলল, বলেন কী! তারপর?

ওস্তাদ বলল খুব রাগ হল। বুলবনকে খুঁজতে বেরুলুম। এ চর থেকে সাঁতার কেটে পালাতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গের বাক্সপেঁটরা? খুঁজতে খুঁজতে একখানে দেখি, আমার বাদশা আর বেগম বুলবন হতভাগাকে থাবার ঘায়ে আধমরা করে ফেলেছে। ঘাড়ে কামড় বসাতে যাচ্ছে, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। বাঘ দুটো আমাকে দেখে সরে দাঁড়াল। বুলবনের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। কাছে গিয়ে বসতেই অতি কষ্টে বলল, "আমার পাপের ফল। পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাট। পীরের তলায় সোনাটা—" শুনেই চেঁচিয়ে উঠলুম, কোথায়? বুলবনের দম আটকে গেল। তখন কী আর করি! বাঘ দুটোকে ডেকে বললুম, শীগগির এ ব্যাটাকে গিলে খা। পীরের চরে মড়া পড়ে থাকার বিপদ আছে। কখন বর্ডার পুলিস এসে দেখে ফেলবে!

জনার্দন বলল, ওস্তাদজী! আমার মাথায় একটা কথা এসেছে।

কী তা বলেই ফেলো বাপু। ওস্তাদ বিরক্ত হয়ে বলল।

পেশোয়ারী নিশ্চয় কোথাও বালির মধ্যে সোনাটা পুঁতে রেখেছিল, জনার্দন বলল। এ জঙ্গলের ভেতর মাটিতে পুঁতলে তো আপনি খুঁজে পেতেন। সদ্য মাটি খোঁড়ার চিহ্ন থাকত। কাজেই বালিতে পুঁতেছিল ব্যাটা।

ওস্তাদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, এ কথাটা তো এত দিন মাথায় আসেনি! তুমি ঠিকই বলেছ জনার্দন! বালিতে পুঁতলে জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। কী বোকা আমরা! এতকাল জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে হন্যে হলুম, অথচ—

কথা থামিয়ে আলখাল্লাধারী উঠে দাঁড়ায়। ব্যস্তভাবে বলল, চলো তাহলে! আগে পুবের বালির চড়ায় যাই। একদিক থেকে খোঁড়া শুরু করি। যতদিন লাগে লাগুক—মাস, বছর লাগুক।

এবার দেখলুম, কয়েকটা কোদাল আর ঝুড়ি রয়েছে ঘরের কোনায়। সেগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে তিন রাইফেলধারী আর ওস্তাদ বেরুল। ঘরে লণ্ঠনটা রইল। ওস্তাদের গলা শোনা গেল ওদিক থেকে—অ্যাই ভুতো! কোথাও যাবিনে। চুপচাপ ঘরে শুয়ে থাক্!

ক্রাচে ভর করে ভুতো ঘরে ঢুকল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল। লোকটার একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে কাটা। সে সেই কাটা পা নাচাতে থাকল শুয়ে শুয়ে। চোখ দুটো বোজা। নিশ্চয় গাঁজা টানছিল এতক্ষণ। এখন নেশায় চুর হয়ে গেছে।

তিন

আমরা নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করছিলুম। শুধু আতঙ্ক ওই বাঘ দুটোর জন্য। আমাদের দৈবাৎ দেখে ফেললে প্রচণ্ড বিপদে পড়তে হবে।

ওস্তাদ দলবল নিয়ে পুবের বালিয়াড়িতে চলেছে। এদিকে ফাঁকা বলে জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়ামূর্তি নজর হচ্ছে। কিন্তু এতক্ষণে ঠান্ডাটা বেজায় বেড়ে গেছে। কাঁপুনি হচ্ছে। একখানে একটু থেমে কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, রাক্ষুসির বাঁওড় পশ্চিমে। আমরা যাচ্ছি পুবে। কাজেই মনে হচ্ছে, বাঘ দু'টোর আচমকা হামলার ভয় আর নেই। কারণ ওদের রাক্ষুসির বাঁওড়ের দিকটায় পাহারা দিতে বলা হয়েছে। কাশেম খাঁ স্পিড-বোট নিয়ে ওদিক থেকেই আসবে কিনা!

একটা বালির ঢিবির ওপর ওস্তাদ আর তিন অনুচরের ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছিল। তারা ওধারে নেমে অদৃশ্য হলে আমরা সেই ঢিবিতে গিয়ে বসে পড়লুম। বালির ঠান্ডা পোশাকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। তার ওপর পদ্মার হু-হু হাওয়া। নিচে ওস্তাদদের দেখা যাচ্ছে। এবার খোঁড়ার আয়োজন চলেছে।

আমরা ঘাপটি মেরে বসে রইলুম। মোহন বলল, ওদের বোকামি দেখে হাসি পাচ্ছে। ওরা কি গোটা বালিয়াড়ি খুঁজে সোনা আবিষ্কারের মতলব করেছে! তাহলে তো এক বছর লেগে যাবে।

বললুম এ তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল!

কর্নেল বললেন, ওরা আসলে মরিয়া হয়ে উঠেছে সোনার লোভে। আচ্ছা মোহন, লোকগুলোকে কি চিনতে পেরেছ? তোমাদের এলাকার লোক বলেই মনে হচ্ছে।

মোহন বলল, চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। চিনতে পারলুম না।

হুম! আমার ধারণা, এরা আসলে একদল ডাকাত। আর আলখাল্লাধারী ওদের সর্দার, সেটা তো 'ওস্তাদজী' বলা শুনে বোঝাই যাচ্ছে, কর্নেল বললেন, কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না, বাঘ দুটো কীভাবে ওর পোষ মানল? বাঘ সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানা আছে। কম বয়সে বাঘ মানুষের পোষ মানে বটে, কিন্তু বয়স হলে তারা তাদের বন্য হিংস্র স্বভাব ফিরে পায়। তখন তাদের আর পোষ মানিয়ে রাখা যায় না। তার ওপর বাঘ দুটো মানুষখেকো।

বললুম, কর্নেল! পীরের জঙ্গলে বাঘ দুটো খায় কী? কী খেতে দেয় ওস্তাদ?

কর্নেল বললেন, মানুষ।

মোহন ও আমি শিউরে উঠলুম। বললুম, মানুষ খেতে দেয়!

তাই বোঝা যাচ্ছে। কর্নেল বললেন। শুনেছি এই এলাকায় এ যাবৎ অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। তাই না মোহন?

মোহন উত্তেজিতভাবে বলল, হ্যাঁ কর্নেল! এতদিনে তাহলে সে রহস্যের কিনারা হল।

কর্নেল বললেন প্রাণীবিদদের লেখা বইয়ে পড়েছি, সারা জীবন ধরে কোনো বাঘ যদি শুধু মানুষের মাংস খায় বা তাকে খাওয়ানো হয়, তাহলে এক সময় তার অবস্থা হয়ে ওঠে আফিংখোর মানুষের মতো। অর্থাৎ সারাক্ষণ নেশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ওই অবস্থায় তার স্বাভাবিক হিংসা লোপ

পায়। আক্রমণবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। গৃহপালিত নেড়ি কুকুর হয়ে ওঠে বেচারা। অবশ্য জানি না, বাদশা-বেগমের সেই অবস্থাটা এসেছে কি না! এখনও না এসে থাকলে ভবিষ্যতে আসবে। তখন ওদের তাড়া করলে বা ঘুঁষি মারলেও দাঁত বের করে থাবা তুলে আক্রমণ করবে না।

সকৌতুকে বললুম, গজরাতে পারবে না?

কর্নেল বললেন, ওটা তো তার মাতৃভাষা। কাজেই জয়ন্ত, গর্জনটা তাকে করতেই হবে।

বলে কর্নেল ঢিবির আড়ালে উঠে দাঁড়ালেন। ফের বললেন, ওরা সম্ভবত শেষ রাত পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করবে। কাজেই অকারণ এখানে বসে থেকে লাভ নেই। এস, আমরা পীরের মাজারে যাই। ভুতো এতক্ষণ গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

কেনই বা তাহলে ওদের অনুসরণ করে আসা, কেনই বা ফের পীরের মাজারে যাওয়া—কিছুই বুঝলুম না। কর্নেলের গতিবিধির অর্থ খোঁজা বৃথা। কোনো কথা না বলে ওঁকে অনুসরণ করলুম। জঙ্গলে ঢুকে আবার বাঘ দুটোর জন্য আতঙ্ক জাগল।

কিন্তু কিছুটা এগোতেই পড়বি তো পড় একেবারে সেই বাঘ দুটোরই মুখোমুখি। সেই ঝুরিওয়ালা বটগাছটার তলায় ফাঁকা জায়গায় যেখানে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখানেই। তেমনি করে খেলা জুড়েছে হতচ্ছাড়ারা।

এবার কিন্তু আমাদের দেখতে পেল। পেয়েই পিলে চমকানো ঘড়ঘড় গর্জন করে তেড়ে এল। কর্নেল চাপা গলায় বলে উঠলেন, গাছে ওঠো! গাছে উঠে পড়ো।

সামনে যে ঝুরিটা ছিল, সেটা বেয়ে প্রাণপণে উঠতে শুরু করলুম। একটা বাঘ নিচে দাঁড়িয়ে সমানে ঘড়ঘড় করতে থাকল। মাটিতে লেজ বারবার আছড়ে আমাকে শাসাতে থাকল।

মোহনকে এক পলক দেখেছিলুম, দিশেহারা হয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। আরেকটা বাঘ একটু তফাতে আমার ডাইনে গজরাচ্ছে শুনে বুঝলুম, মোহন ওখানেই একটা গাছে উঠতে পেরেছে।

কিন্তু কর্নেল কোথায় গেলেন?

গামবুট পরে গাছে ওঠা সহজ কথা না। লাখ টাকা বাজি ধরলেও পারতুম না। কিন্তু এ হল গিয়ে প্রাণের দায়! কে যেন ঠেলে বটগাছের উঁচু ডালে তুলে দিয়েছে। বেচারা কর্নেলের জন্য ভয় হচ্ছিল। বুড়ো বয়সে গামবুট পরে গাছে চড়া কি সহজ কথা! আমরা যুবক বলেই পেরেছি!

বাঘটা নিচে ঝুরির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে আর ওপর দিকে মুখ তুলে যেন বেজায় গালমন্দ করছে। পস্তানি হচ্ছিল, যদি বুদ্ধি করে রাইফেলটা আনতুম! বন্দুকের ছররা গুলিতে ওর গায়ে আঁচড় পড়বে না। তবু বন্দুকের নল তাক করে আমিও বাঘটাকে ভয় দেখাতে শুরু করলুম।

মোহন বোকামি করে ছররা গুলি ছুড়ে বসবে না তো! তাহলে ওস্তাদরা টের পেয়ে দৌড়ে আসতে পারে।

মোহনের বন্দুকের আওয়াজ ভাগ্যক্রমে শোনা গেল না। ও বুদ্ধিমান ছেলে।

কতক্ষণ পরে বাঘটা একবার চাপা হালুম শব্দ করল। তখন দেখি, তার জোড়াটাও হালুম করে এসে গেল। দুটিতে আবার খেলা শুরু করল। গাছের ডালে বসে ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এবার কর্নেলের মুণ্ডুপাত করছিলুম! কেন যে ওঁর সঙ্গে এমন করে চলে আসি যেখানে সেখানে, এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, বুড়ো গোয়েন্দাপ্রবর মোটেও বখাঁস দেখতে পদ্মার চরে আসেননি। ভেতরে অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

এক এক সময় পশ্চিমে দূরে সম্ভবত রাক্ষুসির বাঁওড়ে কাশেম খাঁর স্পিড-বোটের গরগর শব্দ শোনা গেল। অমনি বাঘ দুটো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কান খাড়া করে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে সেদিকে চলে গেল।

সুযোগ বুঝে সাবধানে নেমে এলুম। জামা আর হাতের তালু ছিঁড়ে গেল। নেমেই চাপা গলায় ডাকলুম, মোহন! মোহন!

মোহনের সাড়া পাওয়া গেল একটু তফাতে গাছের ডগায়—এই যে আমি!

কাছে গিয়ে দেখি, একটা লম্বা গুঁড়িওয়ালা গাছের মগডালে প্রকাণ্ড হুতুমপ্যাঁচার মতো বসে আছে.সে। বললুম, নেমে এস শিগগির! অল ক্লিয়ার!

মোহন করুণ স্বরে বলল, নামতে পারছি না। পা পিছলে যাচ্ছে। লাফ দাও বরং!

ওরে বাবা! হাড়গোড় ভেঙে যাবে যে!

ভাঙবে না। ঝটপট লাফ দাও। মাটিটা নরম।

মোহন বলল, একটা মই খুঁজে আনো জয়ন্ত!

মই! অবাক হয়ে বললুম। এই বনবাদাড়ে কোথায় পাব! চড়তে পেরেছ যখন, নামতেও পারবে।

পারছি কই? চেষ্টা তো করছি!

খাপ্পা হয়ে বললুম, তাহলে থাকো! আমি কর্নেলের খোঁজে চললুম।

মোহন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, যেও না জয়ন্ত, যেও না! ওরে বাবা! আমার বড় ভয় হচ্ছে।

ওকে না ডানপিটে ভেবেছিলুম! এত ভীতু, তা তো বুঝতে পারিনি। তাছাড়া গ্রামের ছেলে। গাছে চড়ার অভ্যাস থাকা উচিত। তার চেয়ে বড় কথা, গাছে চড়াটাই কঠিন, নামা, তো খুব সোজা।

রাগ করে কয়েক পা এগিয়েছি, পেছনে সড়্ সড়্ সড়্ ধপাস্ করে একটা শব্দ শুনে বুঝলুম মরিয়া হয়ে বেচারা নেমে পড়েছে।

মোহন এসে সঙ্গ নিল। বলল, বাপ্স্! খুব শিক্ষা হল বটে! জীবনে এমন করে কখনও গাছে চড়িনি।

দু'জনে চারপাশে নজর রেখে হাঁটছিলুম। আর মাঝে মাঝে চাপা গলায় কর্নেলকে ডাকছিলুম। সাড়া নেই। তাহলে গাছে না চড়ে বুড়ো ঘুঘুমশাই পীরের বাড়িটায় গিয়ে ঢুকেছেন!

পীরের বাড়ির দরজা খোলা। ভাঙাচোরা অবস্থা। ভেতরে একটা উঠোন। খাপচা খাপচা জ্যোৎস্না পড়েছে। বারান্দায় উঠে দেখি, সেই ভুতো ঘরের ভেতর তেমনি চিত হয়ে পড়ে আছে। তবে কাটা ঠ্যাংটা নড়ছে না। তার নাক সমানে ডাকছে। লণ্ঠনটা তেমনি জ্বলছে।

লাল ভেলভেটে জরির কাজ করা একটা প্রকাণ্ড চাদরে পীরের কবর ঢাকা। হঠাৎ দেখি, কাপড়টা নড়ছে একপাশে। ভীষণ নড়তে শুরু করলে আঁতকে উঠে এতক্ষণে টর্চ জ্বাললুম। মোহন অস্ফুট স্বরে 'ও কী' বলেই চুপ করেছে। ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। আমারও। টর্চের আলোয় এই তাজ্জব কাণ্ড দেখলে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। কবরটা কি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে? ভয়ে দম আটকে গেল।

তারপর ঢাকনাসুদ্ধ কবরের মাথার দিকটা মৃদু ঢঙ শব্দ করে বাক্সের ডালার মতো উঠে গেল। তারপর একটা টুপি পরা মাথা বেরুলো। তারপর যিনি বেরুলেন, তিনি আমার বহু বছরের গুরু ও বন্ধু মহাপ্রাজ্ঞ কর্নেলসায়েব! তবে তাঁর সাদা দাড়ি কবরের গুপ্ত সুড়ঙ্গের ময়লায় কালো হয়ে গেছে। তাঁকে যুবক দেখাচ্ছে। প্রথমে বললেন, আলো নেভাও ডার্লিং! চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তারপর কবরের ঢাকনা আগের মতো ঠিকঠাক করে দিয়ে বললেন, বুলবন পেশোয়ারীর পঞ্চাশ কিলো সোনার বাঁট ঠিক জায়গাতেই আছে। আপাতত ওখানেই থাক। কাল নটবর সিং তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে বরং এর কিনারা করবেন।

আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

কর্নেল বললেন, এখন সমস্যা হল ভুতোকে নিয়ে। ভুতো ঘুমের ভান করে পড়ে আছে কি না জানা দরকার। ওকে কাতুকুতু দাও তোমরা। দেরি কোরো না।

আমি আর মোহন কাছে যেতেই ভুতো তড়াক করে উঠে বসে হাঁউমাউ করে বলল, ওরে বাবা! কাতুকুতু দিলে আমি মরে যাব! দোহাই হুজুররা! ওই কাজটি করবেন না।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, দেখেছ! ওকে লক্ষ করে এ রকমই সন্দেহ হয়েছিল। আমরা চলে গেলে ও কবরের গুপ্ত সুড়ঙ্গে ঢুকত আর সোনাটা হাতিয়ে কেটে পড়ত।

ভুতো নাক-কান মলে বলল, ছি ছি! সে কী কথা। সায়েব আমাকে সকালে দশ টাকা ভিক্ষে দিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন, বাবা ভূতো! আরও বখসিস পাবে, আমাদের সঙ্গে চলো!

ভুতো ভয় পাওয়া মুখে বলল, কোথায় যাব হুজুর? আমাকে তাহলে বাদশা-বেগমের পেটে পাঠিয়ে দেবে কাল্লু খাঁ!

কাল্লু খাঁ! মোহন চমকে উঠল। কাল্লু ডাকাত? এই পীরের থানের সেবককে বছর দশেক আগে সে খুন করে ফেরারি হয়েছিল না?

কর্নেল, কাল্লু খাঁয়ের কথা দাদুর কাছে শুনেছি। আগে নাকি সে সার্কাসের দলে খেলোয়াড় ছিল। বাঘের খেলা দেখাত। আশ্চর্য, ব্যাপারটা অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল।

কর্নেল বললেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কাল্লু খাঁর পক্ষেই দুটো বাঘ পোষা সম্ভব। পীরের থানের সেবককে খুন করে সে এখানেই আস্তানা গেড়েছে এতকাল। বাঘ দু'টোর ভয় দেখিয়ে ভক্তদের থানে আসা বন্ধ করেছে সে। দারুণ এলেমদার লোক! একটা বিতর্কিত চরে নিরাপদে ঘাঁটি গেড়ে বাস করছে।

বললুম, কিন্তু এই কবরের ভেতর গুপ্ত ঘর বা সুড়ঙ্গের কথা সে টের পেল না কেন?

কর্নেল বললেন, টের পায়নি, তা তো বুঝতেই পারছি। আসলে সে এমনটা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু বুলবন পেশোয়ারী যেভাবেই হোক টের পেয়েছিল, কবরের তলায় গুপ্ত ঘর আছে। সোনাটা সেখানে রেখে সে পালাচ্ছিল। বাদশা-বেগমের পাল্লায় পড়ে বেচারার প্রাণ যায়। মরার সময় সে শেষবার বলতে পেরেছিল—'পীরের তলায় সোনাটা.....।' তাই শুনে কাল্লু খাঁ ভেবেছে, পীরের চরের কোথাও পোঁতা আছে। পীরের কবর কথাটা মুখে আসেনি পেশোয়ারীর। যাক গে, এবার কেটে পড়া যাক্। ভুতো আমাদের সঙ্গে এস।

ভুতোর আপত্তি টিকল না। আমি আর মোহন তাকে টেনে নিয়ে চললুম। শাসালুম, চেঁচালে বন্দুকের গুলিতে মুণ্ডু উড়ে যাবে। ভয়ে সে চুপ করে থাকল।

পানসি নৌকোয় উঠে বসলুম আমরা। এখন রাত বারোটা পনেরো। নৌকো ছাড়ার সময় পশ্চিমের জঙ্গলে বাঘ দুটোর প্রচণ্ড গর্জন শোনা যাচ্ছিল।

এক সময় আমরা পীরের চর ছাড়িয়ে পদ্মার স্রোতের উজানে পড়লুম। ভুতো আমার কষ্ট দেখে বলল, মেজ হুজুর! আমাকে দিন বরং। ঠ্যাং-ট্যাং কাটা গেলেও হাত দুটো তো আছে! আর বৈঠা আমি দু বেলা বাই।

ভুতো আর মোহন বৈঠা বাইতে থাকল। মনে হল, ভুতো লোকটা আসলে ভাল। পেটের দায়ে কাল্লু খাঁর দলে ইনফরমার হয়ে ঢুকেছিল। রান্নাবান্না কাজকর্মও করে দিত। ভুতো সারা পথ সে কথা বলতে থাকল। শেষে বলল, একখানা ছিপ নৌকো লুকোনো আছে হুজুর। পশ্চিমের জঙ্গলের নীচে খাড়ির মধ্যে আছে। পুলিসকে বলবেন, খুঁজে বের করবে। আর হুজুর, দেখবেন, আমার যেন জেল না হয়। তাহলে আমার বউ ছেলেমেয়েরা বড্ড কষ্টে পড়বে। বরং, আমাকে বড় হুজুর একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন। তাহলেই হল।

মহিমবাবুর চরের কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা কর্নেল, আপনি কীভাবে জানলেন কবরের তলায় গুপ্ত ঘর আছে?

কর্নেল বললেন, কাল্লু খাঁ বুলবনের মরার সময়কার কথাটা যখন বলল, তখনই সন্দেহ হয়েছিল। 'পীরের তলায় সোনাটা'—এর মানে কী হতে পারে? পীর যেখানে শুয়ে আছেন অর্থাৎ পীরের কবর, তার তলায়।

ধন্য আপনার বুদ্ধি! মোহন তারিফ করে বলল।

মহিমবাবুর চরে পৌঁছুতে রাত তিনটে বেজে গেল। যাবার সময় স্রোতের ভাটিতে গিয়েছিলুম। ফেরার সময় উজানে বলে এত বেশি সময় লাগল।

উদ্বেগে মাঝিরা ঘুমোতে পারেনি। আমাদের দেখে উঠে বসল। বলল, পীরের জঙ্গলে বাঘের ডাক শুনে আমরা খুব ভয় পেয়েছিলুম হুজুর। এখন ওই শুনুন! বন্দুকের আওয়াজও হচ্ছে। সবই ভূতপেরেতের কাণ্ড।

কর্নেল কান খাড়া করে কী শুনছিলেন। বললেন, খুব গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে পীরের চরে। তাহলে কি কাশেম খাঁর সঙ্গে কাল্লু খাঁর লড়াই বেধে গেল?

আবছা গুলির শব্দ আর মাঝে বাঘের গর্জন ভেসে আসছিল পীরের চর থেকে। জ্যোৎস্নায় ওদিকটা ধূসর। পদ্মার বুকে ঘন কুয়াশা জমেছে। এক সময় কর্নেল বললেন, শুয়ে পড়া যাক। মোহন, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে যাবে। সাইকেল করে ঝটপট নটবর সিংয়ের ক্যাম্পে যাবে। আমার চিঠি নিয়ে যেও।

সকালে আবার আমরা পীরের চরে গেলুম। এবার বর্ডার বাহিনীর মোটর লঞ্চে চেপে। গিয়ে যা দেখলুম, গা শিউরে উঠল। এমন বীভৎস দৃশ্য কখনও দেখিনি।

কাল্লু খাঁ, জনার্দন, গদাই, রহিম বকশ মড়া হয়ে পড়ে আছে পুবের বালিয়াড়িতে। সারা গা গুলিতে ক্ষতবিক্ষত। পশ্চিমের জঙ্গলে বাঘ দুটো—বাদশা আর বেগমও তেমনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে। কাশেম খাঁ কাকেও রেহাই দেয়নি। বেচারা ভুতো জোর বেঁচে গেছে!

কবরের ঢাকনা তুলে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাঁট উদ্ধার করা হল। সোনাটা প্রাক্তন পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার। কাজেই ওটা ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে ফিরিয়ে দেবেন।

মহিমবাবুর চরে আমরা আরও দিন দুই ছিলুম। কর্নেল 'বখাঁস', না আবিষ্কার করে কলকাতা ফিরবেন না। তাঁর বক্তব্য, এবার পদ্মার চরে সত্যি সত্যি বিরল প্রজাতির ওই পক্ষী দর্শনেই এসেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি, পীরের চরে এত সব রহস্য আছে! দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলুম এবং সোনার কথা জানতে পারলুম কাল্লু খাঁর মুখে। তবে হ্যাঁ, নটবর সিংয়ের কাছে তো বটেই, সদাশিববাবুর কাছেও কাল্লু খাঁর গল্প শুনেছিলুম। সে সার্কাসে ছিল এক সময়, তাও শুনেছিলুম। তাই যখন পীরের জঙ্গলে জোড়া বাঘের গুজব শুনলুম, তখন মনে হল একটা যোগসূত্র থাকতেও পারে। সে-জন্যে পীরের জঙ্গলে উঁকি মারতে গিয়েছিলুম। আমি কিন্তু আজও এ-কথা বিশ্বাস করিনি। এই ধুরন্ধর বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবরের সব ব্যাপারই রহস্যময়। এমন তো হতে পারে, বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে হারানো সোনার জন্য ভারত সরকার গোপনে তদন্ত করছিলেন এবং সুযোগ্য ঘুঘুমশাইটিকেই এ ব্যাপারে পদ্মার চরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন!

আরও একটা কথা। খঞ্জ মানুষ ভূতোকে বেমক্কা দশ টাকা দান করাও কি কর্নেলের কুসংস্কার না কোনো গোপন অভিসন্ধি ছিল, বলা কঠিন।

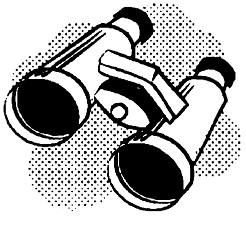

ভূতুড়ে এক কাকতাড়ুয়া

এমন যদি হয়, বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়াটি নিঝুম জ্যোৎস্নায় রাতে ক্ষীণ সুরে গান গাইতে গাইতে চলাফেরা করে বেড়ায়, তা হলে সত্যিই ব্যাপারটা বড্ড ভয়-ভূতুড়ে হয়ে ওঠে। কিন্তু তার গায়ের জামায় আর বেগুনপাতায় রক্তের ফোঁটা থাকলে সে-একটা সাঙ্ঘাতিক রহস্যই!

কাকতাড়ুয়াটি বানিয়েছিল ফান্টু, তুলারাম দণ্ডীমশাইয়ের ভাগনে। স্কুল ফাইনালে তিন-তিনবার ফেল করায় যাকে গঙ্গার পাড়ে মামার সাধের ফার্মে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ফান্টুর মেধা খেত-খামারেই ভাল খুলেছে। খামোকা কাগজে ছাপানো কথাবার্তা মুখস্থ করে জীবন বরবাদ করে ফেলছিল। কাটরার মাঠে দণ্ডীমশাইয়ের পনেরো একর খেতে মরসুমি ফসল আর ফুল-ফলের ফলন দেখার মতো! এক টুকরো নার্সারির লাবণ্য তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। গত শীতে কালীগঞ্জে কৃষি-প্রদর্শনী মেলায় তিন কিলো ওজনের বেগুন সরকারি মেডেল পাইয়ে দিল, এও একটা বড় ঘটনা।

তবে সবই নাকি ঈশান কোণে পোঁতা কাকতাড়ুয়াটির জোরে, এটা ফান্টুর নিজের মত। গঙ্গার ধারে ওই যে পুরনো শিবমন্দির আর বটের গাছ, সেখানে কখনও-না-কখনও সাধু-সন্নেসি এসে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকেন। তাঁদেরই একজনকে তুষ্ট করে পরামর্শটি পায় সে। পৃথিবীতে সবকিছু নাকি জোড়ায়-জোড়ায় সিধে আর উল্টো থাকার নিয়ম। যেমন, দিন আর রাত, মাটি আর জল, গরম আর ঠান্ডা, মামা আর মামি—ফান্টুর দেওয়া নমুনা। মামা যেমন কুচুটে বদরাগী, মামি তেমনি শান্ত, মিঠে, নরম। তো লক্ষ্মীর উলটো অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মীর দৃষ্টি সবসময় কু। বিশেষ করে বেগুনখেতের দিকে তার নজর বেশি। পোকায় পোকায় বেগুন জেরবার। শেষে যেই কাকতাড়ুয়াটি তৈরি করে ঈশাণ কোনায় পোঁতা হল, একজিবিশনে মেডেল! আর কী প্রমাণ চাই?

কাকতাড়ুয়া বানানো খুব সোজা। পলকা দু'টুকরো বাঁশ আড়াআড়ি বেঁধে ক্রুশ তৈরি করো। তাতে খড় জড়িয়ে কষে বাঁধো। দু'ধারে দু'হাত বাড়ানো একঠেঙে মানুষটির আকার হল। এবার একটা ছেঁড়াখোঁড়া পাঞ্জাবি পরিয়ে দাও। মাথায় বসিয়ে দাও, একটা কেলে মাটির হাঁড়ি। চুন দিয়ে ওতে চোখ-মুখ এঁকে দাও, দাঁতশুদ্ধু। দেখবে কী বিকট চেহারা হল! অলক্ষ্মী অবশ্য শুধু এতেই ভয় পাবার নয়, সেই সন্নেসি কাকতাড়ুয়াটির মাথায় মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছিলেন, যেটা ফান্টুর মুখস্থ হয়ে গেছে: 'ওঁং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!'

হুঁ, পাঞ্জাবিটি মামার। মামির কাছে গোপনে চেয়ে আনা। মামা হাড়কেপ্পন, হিসেবি মানুষ। তবে একটাই সুবিধে, বড্ড ভুলো মন। পাঞ্জাবিটি চিনতে দেরি হয়েছিল এবং তখন একজিবিশনে মেডেল জুটেছে। ফান্টু একগাল হাসি আর আশীর্বাদই পেল। তারপর থেকে মামার মন ফার্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সন্ধেটি হলেই গঙ্গা পেরিয়ে কাটরার মাঠে ছোট্ট একতলা ফার্মহাউসে রাত কাটান। খুব 'নেচার, নেচার' করেন। বলেন, "নেচারেই শান্তি আছে রে বাবা! সাধুসন্নেসিরা সেটা জানেন বলেই তো নেচারের ভেতর ঘুরে বেড়ান।" ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাতে ঘুম ভেঙে মামাকে খোলা বারান্দায় হেঁড়ে গলায় গান গাইতেও শুনেছিল ফান্টু।

কিন্তু এ-গান সে-গান নয়। নিশুতি রাতে চলন্ত কাকতাড়ুয়ার খোলা সুরের ভয়-জাগানো গান। মামা-ভাগনে দু'জনেই আতঙ্কে কাঠ। ফার্মহাউসে বিদ্যুৎ আছে। ঘটনার সময় রহস্যময় লোডশেডিং। টর্চের আলো ফেলতেই কাকতাড়ুয়াটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গানও গেল থেমে।

ফার্মে আরও দুজন লোক আছে। মুকুন্দ আর রমজান। মুকুন্দ পাওয়ার টিলার চালায়। রমজান কীটনাশক ওষুধ ছড়ায়। দণ্ডীমশাইয়ের সন্দেহ, দু'জনেই গাঁজাখোর। ওঠানো গেল না। সকালে দেখা গেল, কাকতাড়ুয়াটি নিজের জায়গা ছেড়ে অন্তত হাত-তিরিশেক এগিয়ে বেগুনখেতের মাঝামাঝি পোঁতা আছে। বেগুনের গাছে যথেচ্ছ কাঁটা। ফান্টু সাবধানে কাকতাড়ুয়াটিকে আগের জায়গায় পুঁতে রেখে এল।

পরের রাতে আবার একই ঘটনা।

বদরাগী দণ্ডীমশাই এ-রাতে বন্দুকে গুলি ভরে তৈরিই ছিলেন। ধুধু জ্যোৎস্নায় কাকতাড়ুয়াটি জ্যান্ত হয়ে ঠ্যাঙ বাড়িয়ে ধোঁনা সুর ভাঁজছে কি, বন্দুক চিক্কুর ছাড়ল। ফট্টাস শব্দ এবং কাকতাড়ুয়া বেগুনখেতের ভেতর কুপোকাত!

কিন্তু না, তখনও রক্তের ফোঁটা দেখা যায়নি। ভোরে ফান্টু গেল অবস্থা দেখতে। মামা তখনও জয়ের আনন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ফট্টাস শব্দটি ছিল কাকতাড়ুয়া বেচারার মুণ্ডুর, মানে—সেই কেলে হাঁড়িটি গুলি লেগে চৌচির হওয়ার। মন্ত্রপড়া মুণ্ডুর দশা দেখে ফান্টুর মন খারাপ হয়ে গেল। কবন্ধ কাকতাড়ুয়াকে পুঁতে রাখল অগত্যা।

সেদিনই দ্বিতীয় রহস্যের সূত্রপাত।

তুলারাম দণ্ডীর সঙ্গে তুলাদণ্ডের সম্পর্ক আছে। কালীগঞ্জের বাজারে পশুখাদ্য খোল-ভুসির বড় আড়ত তাঁর। দুপুরে ঔরঙ্গবাদ থেকে এক ট্রাক টাটকা গমের ভুসি এসেছিল। বাঁধা খদ্দেররা ধরলে টাটকা ভুসি বেচতে হয়। একটা বস্তার ভেতর থেকে বেড়িয়ে পড়ল একটা মড়ার খুলি। হইচই পড়ে গেল চারদিকে। এ কী বিদঘুটে ব্যাপার!

সাপ্লায়ার দণ্ডীমশাইয়ের মাসতুতো ভাই চণ্ডীচরণ। খবর গেল তাঁর কাছে। খুলিটি ওজনদার, প্রায় ন'শো গ্রাম। সেই নশো গ্রাম ভুসি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি এল চণ্ডীচরণের কাছ থেকে। চিঠির বক্তব্য হল, সম্ভবত যে-গমখেতের গম থেকে এই ভুসির উৎপত্তি, তার শিয়রে একটি কাকতাড়ুয়া ছিল এবং খুলিটি সেটির মাথায় বসানো ছিল। কোনও আমুদে চাষির রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। দাদা যেন ক্ষমাঘেন্না করে দেন এবারকার মতো। এবার থেকে সব মাল বিশদ খতিয়ে না দেখে পাঠানো হবে না।

দণ্ডীমশাই বিশেষ তুষ্ট হলেন। বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়াটির মাথা তিনি গত রাতে ফাটিয়েছেন। ফান্টু কেলে হাঁড়ির খোঁজে সারাদিন হন্যে হচ্ছে, খবর পেয়েছেন। আজকাল আর মাটির হাঁড়িতে রান্নার চল নেই। দৈবাৎ একটা পেয়ে গিয়েছিল সেই সন্নেসির দয়ায়, যিনি মৃৎপাত্রে রান্না করা ছাড়া অন্ন অশুচি গণ্য করতেন।

সন্ধে হতে-না-হতে গঙ্গা পেরিয়ে দণ্ডীমশাই কাটরার মাঠে তাঁর ফার্মে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন মড়ার খুলিটি। একগাল হেসে বললেন, "ফান্টু, এই দ্যাখ, কী এনেছি তোর জন্যে।"

ফান্টু আঁতকে উঠে বলল, "ওরে বাবা! এ আমি কী করব মামা?"

"ধুর বোকা!" দণ্ডীমশাই বললেন। "দেখিসনি কাকতাড়ুয়ার মাথায় মড়ার খুলিও থাকে। নে, ব্যাটাচ্ছেলেকে পরিয়ে দে। ন্যাড়া লাগছে বড্ড। আর শোন, সাধুবাবার কাছে কী মন্ত্র শিখেছিলি, ফুঁকে দিতে ভুলিসনে যেন।"

ফান্টু খুলিটা কাকতাড়ুয়ার ঘাড়ে আটকে দিয়ে মন্ত্রটা পড়ল, "ঔং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!"

তারপর মামার কাছে ফিরে বলল, "ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না মামা। যদি—"

দণ্ডীমশাই চোখ কটমট করে বললেন, "কী যদি? যদি-টদি কিছু নয়। ত্যাঁদড়ামি করলেই গুলি খাবে।"

রমজান বলল, "বাবুমশাই, মনে হচ্ছে, এ-ব্যাটা একটু বেশি ত্যাঁদড়ামিই করবে।"

"কেন, কেন?"

"যার খুলি, সে শুদ্ধু এসে যোগ দেবে। ছিল এক, হবে দুই।"

দণ্ডীমশাই বাঁকা হেসে বললেন, "আমার বন্দুকও দোনলা। একসঙ্গে দুটো ঘোড়াই টিপে দেব।"

মুকুন্দ কিছু না বুঝেই বলল, "খুব জমে যাবে মনে হচ্ছে। খুলিতে গুলিতে জমজমাট।"

দণ্ডীমশাই ভেংচি কেটে বললেন, "যাই হোক, তোমাকে তো আর ডেকেও পাওয়া যাবে না।"

মুকুন্দ জিভ কেটে বলল, "কী যে বলেন স্যার! কিছু বাধলে ডেকেই দেখবেন, কী করি!"

কী করে, যথারীতি দেখা গেল সে-রাতে। গাঁজা খাক নাই খাক, দুই বন্ধুর ঘুমটাও বড্ড বেশি। ফান্টু চুপি চুপি ডাকতে গিয়ে ফিরে এল। পূর্ণিমা তিথি। জ্যোৎস্না ফেটে পড়ছে কাটরার মাঠে। কাকতাড়ুয়াটি, রমজানের হিসেব অনুসারে, দুনো জ্যান্ত হয়েছে। খোঁনাসুরে কী গাইছে, কথাগুলো বোঝা যায় না, হাওয়ার তোলপাড় খুব। বন্দুকের নল জানালার বাইরে, ট্রিগারে আঙুল, হ্যামার দুটোই ওঠানো, দণ্ডীমশাই তৈরি। শুধু একটু কৌতূহল জেগেছে, শেষ পর্যন্ত কী করে কাকতাড়ুয়া হতচ্ছাড়া, তাই দেখবেন।

তেমন কিচ্ছুটি করছিল না। শুধু গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজা আর দু'ধারে চিতানো লম্বা হাতদুটো সমেত একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঘোরা, ট্যাঙস ট্যাঙস করে এ কোনা থেকে ও কোনো পায়চারি। গত রাতে গুলি খেয়েই যেন রেগে আছে, এমন বেপরোয়া ভঙ্গি। শেষে ঘরটার দিকে মুখ করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। অমনি খাপ্পা দণ্ডীমশাই একসঙ্গে দুটো ট্রিগারই টেনে দিলেন।

ফলে উলটো ধাক্কাটা যথেষ্ট দিল বন্দুকের কুঁদোটা এবং পড়ে গেলেন দণ্ডীমশাই। পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আলো! আলো!"

হুঁ, এ রাতেও বিদ্যুৎ অদ্ভুতভাবে বন্ধ! সাড়ে-বারোটা বাজে। টর্চের আলো ফেলে কাকতাড়ুয়াটিকে বেগুনখেতের ভেতর কাত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মামা-ভাগনে সাহস করে বেরোতে পারলেন না। আগের দুটো রাতের মতোই। তারপর বিদ্যুৎ এল আধঘন্টা পরে—এও আগের দু'রাতের মতোই।

ভোরে কাকতাড়ুয়া পাঞ্জাবিতে একটু রক্তের ছোপ, তারপর বেগুনগাছের পাতায় খুঁজতে খুঁজতে আরও পাওয়া গেল। শেষ দিকটায় ঝোপঝাড় ও কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত রক্তের দাগ রেখে গেছে কেউ। বেড়ার সঙ্গে বুনো লতার ঝালর থাকায় আগে ধরা পড়েনি। এদিন ঝালর সরাতেই বেরিয়ে পড়ল কাঁটাতারের খানিকটা অংশ কাটা। একটা বড় ফোকর। গুলিখোরটি যেই হোক, ভূত কি মানুষ, ওই পথেই পালিয়েছে।

ফান্টু চ্যাঁচাতে থাকল "মামা, মামা, মামা!"

দুই

"এই আপনার তেরো নম্বর কেস?"

"হঃ আনলাকি থারটিন।" গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার ওরফে কে কে হালদার ওরফে আমাদের হালদারমশাই নাকে নস্যি গুঁজে নাকি-স্বরে বললেন। মুখে তেতো ভাব, অনিশ্চয়তার।

কিছুদিন থেকে আমার ফ্রেন্ড-ফিলজফার গাইড কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তাঁর ছাদের বাগানে নিপাত্তা হয়ে আছেন। এদিকে পৃথিবীতে কত রহস্যময় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে! কাগজে ছাপা হচ্ছে তার খবর। কালীগঞ্জের তুলারাম দণ্ডীর বেগুনখেতে ভূতুড়ে কাকতাড়ুয়ার খবর আমাদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো। তবে বিশদ কিছু ছিল না। কাটরার মাঠে জনৈক

তুলারাম দণ্ডীর বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়াটি নাকি রাতবিরেতে জ্যান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এটুকুই ছাপা হয়েছিল। কর্নেলের আশা ছেড়ে অগত্যা গিয়েছিলুম হালদারমশাইয়ের আপিসে। গণেশ অ্যাভিনিউতে একটা চারতলা বাড়ির চিলেকোঠায় তাঁর 'হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি'। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড রাস্তা থেকে দেখা যায়।

ঘরে ঢুকে দেখি, সামনে নোটবই আর নস্যির খোলা কৌটো, আঙুলের টিপে নস্যি, গোঁফ বেয়ে সেই নস্যি ঝরছে, অর্থাৎ সিরিয়াস কেস হাতে পেয়েছেন! মুখও গুরুগম্ভীর। নোটবইয়ের পাতায় কোনও কোনও শব্দ লাল রঙের খোপে ঢোকাচ্ছেন। উলটো দিক থেকে তিনটে শব্দ বন্দী দেখতে পেলুম, 'তুলা', 'দণ্ড', 'মুণ্ড'।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, "তুলারাম দণ্ডীর ব্যাপারটা নয় তো?"

এবার মুখ তুলে ফিক করে হাসলেন হালদারমশাই। "হঃ!" বলে বিচিত্তির রুমালে, ন্যাতা বলাই উচিত, নাক ও গোঁফ মুছলেন। রীতিমত আপিস যখন, তখন একজন বেয়ারাও বহাল আছে। তার নাম রামধারী। হালদারমশাই পুলিশে চাকরি করতেন। রামধারীও করত। পেল্লায় চেহারা। কেটলি নিয়ে চা আনতে বেরোল কর্তার ইশারায়।

তারপর হালদারমশাই সবিস্তারে রহস্যের জালটি আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন, নিজের ভাষায় যেটি আগেই মোটামুটি বর্ণনা করেছি। দিয়ে বললেন, "মিনিট দশেক আগে দণ্ডীমশাই গেলেন। রাত জেগে ট্রেনে এসেছিলেন। সাড়ে ন'টার বাস ধরে ফিরে যাবেন। কারবারি মানুষ। কিন্তু—"

"কিন্তুটা কী?"

"ওই যে কইছিলাম, আনলাকি থারটিন।" একটু গুম হয়ে থাকার পর ফের বললেন, "আপনে কী কন?" হালদারমশাই সমস্যাগ্রস্ত, সেটা বোঝাতে মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গীয় মাতৃভাষায় কথা বলে ফেলেন।

"কেস তো নিয়েছেন!"

"নিয়েছি। কথাও দিয়েছি।"

"তা হলে আর কথা কী? চলুন, আমিও সঙ্গ দেব।"

হালদারমশাইকে একটু উত্তেজিত দেখাল। চাপা স্বরে এবং ভুরু নাচিয়ে বললেন "কর্নেল স্যার কী বলেন শুনে আসি চলুন! কেসটা শুনে যদি কোনও ক্লু দেন, মন্দ হবে না। ওল্ড ম্যানরা এমনিতেই ওয়াইজ, তার ওপর কর্নেল স্যারের মতো ওয়াইজ ম্যান কে কোথায় দেখেছে?"

"কর্নেল তাঁর শূন্যোদ্যানে ঢুকে গেছেন। গাছ হয়ে গেছেন। নড়াচড়া চোখে পড়বে। তবে বোবা।"

হালদারমশাই খিখি করে হাসতে লাগলেন। "না, না, এই কেসে রক্ত টক্ত আছে, বুঝলেন না? স্রেফ ভূতুড়ে ব্যাপার হলে কথা ছিল! কর্নেল স্যার হলেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। রক্তের গন্ধ পেলেই ঝাঁপিয়ে আসবেন।"

চা খাওয়ার পর হালদারমশাইয়ের টানাটানিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদের ডেরায় আবার গেলাম। শূন্যোদ্যান থেকে নেমে ব্রেকফাস্ট করে সবে চুরুট ধরিয়েছেন। আমাদের দেখে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, "বসার আগে দুজনেই একবার ছাদে গিয়ে দেখে আসুন ষষ্ঠী কী করছে। না, না ডার্লিং, হালদারমশাইয়ের সঙ্গে তুমিও যাও। দেখে এসো। এতদিন যে কেন আইডিয়াটা আমার মাথায় আসেনি, আশ্চর্য!"

হালদারমশাই ততক্ষণে ছাদে পৌঁছে গেছেন। আমি সোফায় বসে পড়লাম। ষষ্ঠী কী করছে দেখার মুড নেই। কর্নেল তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে আপনমনে বললেন, "এতদিন ধরে অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছি। অথচ মাথায় এই সামান্য ব্যাপারটা আসেনি। এবার ব্যাটাচ্ছেলেরা দেখবে কি, তল্লাট ছেড়ে পালাবে!" বলে স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাস্য করতে থাকলেন।

অট্টহাসি থামলে বললুম, "কাক?"

"ঠিক ধরেছ, ডার্লিং!"

"ষষ্ঠী কাকতাড়ুয়া তৈরি করছে বুঝি?"

"হুঁউ। তুমি বুদ্ধিমান।"

"কাগজে কালীগঞ্জের কাকতাড়ুয়ার খবর পড়েছেন বুঝি?"

কর্নেল নড়ে বসলেন। "আমাকে সত্যিই বাহাত্তুরে ধরেছে, জয়ন্ত। কাকতাড়ুয়া জিনিসটা যে এত কাজের, কতবার কত জায়গায় দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসেনি। আসলে কলকাতা বহু জরুরি জিনিস ভুলিয়ে দেয়। হরিয়ানায় আমার এক বন্ধু কর্নেল কেশরী সিংয়ের ফার্মে একটিমাত্র কাকতাড়ুয়া বহু একর জমির গম রক্ষা করেছিল—না, কাকের মুখ থেকে নয়, হরিণের মুখ থেকে। জিনিসটাকে আমরা বাংলায় কাকতাড়ুয়া বলি বটে, কিন্তু ওটা সমস্ত প্রাণীকে ভয় পাইয়ে দেয়। মানুষকে, ডার্লিং, মানুষকেও। বিশেষ করে রাতবিরেতে তো বটেই!"

হাসি চেপে বললুম, "ভয় পেয়ে গুলিও চালায় অনেক মানুষ!"

"স্বাভাবিক। খুবই স্বাভাবিক।" বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ সায় দিলেন। "জ্যোৎস্নারাতে বাতাস দিলে কাকতাড়ুয়াকে জ্যান্ত মনে হয়। কাজেই চমকে উঠে গুলি চালানো অসম্ভব কিছু নয়, হাতে ফায়ার আর্মস্ যদি থাকে।"

"তারপর যদি সকালে কাকতাড়ুয়ার গায়ে..."

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, "রক্তের দাগ থাকলে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না জয়ন্ত।"

জোর গলায় বললুম, "প্রমাণ হয় না? কী বলছেন আপনি!"

"রক্তের দাগ বলে যেটা ভাবা হচ্ছে, সেটা রক্তেরই দাগ কি না যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছ, ততক্ষণ কিছু প্রমাণ হয় না।"

"কালীগঞ্জের তুলারাম দণ্ডীর বেগুনখেতে কাকতাড়ুয়ার জামায় আর বেগুনগাছের পাতায় রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।"

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তারপর মিটিমিটি হাসলেন। "হালদারমশাই সম্প্রতি যে হারে কাগজে তাঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, এই কেস তাঁর হাতে আসা স্বাভাবিক। যাই হোক, তুমি আবার এসেছ এবং হালদারমশাই তোমার সঙ্গে। বোঝা যাচ্ছে, তুমি এতে খুব আগ্রহী।"

"নিশ্চয়। কাগজের রিপোর্টাররা আজকাল অন্তর্তদন্ত লেখে। আমিই বা সুযোগ ছাড়ি কেন?"

কর্নেল হঠাৎ কেন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। জ্বলন্ত চুরুট কামড়ে ধরে চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, "হালদারমশাই সম্ভবত কাকতাড়ুয়াটির গঠনকৌশল লক্ষ করছেন মন দিয়ে। উনি গ্রামাঞ্চলে পুলিশের দারোগা ছিলেন। ষষ্ঠী বর্ধমানের গ্রামের লোক। সে কাকতাড়ুয়া বোঝে। আসলে হালদারমশাইয়ের বরাবর দেখে আসছি বুদ্ধিসুদ্ধি উৎসাহ, সাহস, অভিজ্ঞতা সবকিছুই প্রচুর আছে। শুধু একটু অনুসন্ধিৎসা আর একটু পর্যবেক্ষণ এই দুটো জিনিসের ঘাটতি আছে।" চোখ খুলে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন হঠাৎ, "আমি বলি কি, তুমি কালীগঞ্জে যেও না।"

"কেন বলুন তো?"

"তুমি যে ছদ্মবেশ ধরতে একেবারে আনাড়ি।" গম্ভীর মুখেই কর্নেল বললেন। "আশা করি, লোহাগড়ার ঘটনাটা ভুলে যাওনি। তোমার গোঁফ খুলে পড়ে গিয়ে কী কেলেঙ্কারি ঘটেছিল!"

ঝটপট বললুম, "কালীগঞ্জে ছদ্মবেশ ধরার দরকারটা কী!"

"দরকার হবে, যদি হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ঘুরতে চাও।" বলে কর্নেল হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিলের ওপর একটা সুইচ গোছের কিছু টিপে দিলেন।

অমনি খড়খড়-খসখস বিবিধপ্রকার শব্দ শোনা গেল। তারপর কাকের চ্যাঁচামেচি। সেইসঙ্গে এইসব কথাবার্তা: "হ্যাঁ হ্যাঁ....ব্যস... হয়েছে....খাসা! এবার মন্তরটা পড়ে দিই মাথায়। ওং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়ায় তাড়য় স্বাহা!"

হালদারমশাইয়ের গলা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, "ছাদের বাগানে কী ঘটছে, ঘরে বসে খোঁজখবর নেবার জন্য এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা করেছি, জয়ন্ত! মন্ত্রতন্ত্র পাঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে, হালদারমশাই ছদ্মবেশ ধরেই কালীগঞ্জে যাবেন—অবশ্যই সাধুবাবা সেজে। যাবার সময় চিৎপুর হয়েই যাবেন, ওখানে যাত্রা থিয়েটারের ড্রেস-সাপ্লায়ার প্রচুর। কাজেই ভেবে দ্যাখো, কী করবে!"

ষষ্ঠীচরণ ভক্তিমাখা মুখে ছাদ থেকে নেমে এসে ঘোষণা করল, "বাবামশাই কাজ পাক্কা।"

কর্নেল শুধু বললেন, "কফি।" ষষ্ঠী গুম হয়ে চলে গেল ভেতরে। একটা প্রশংসা আশা করেছিল বেচারা!

হালদারমশাই যথারীতি ষষ্ঠীকে মনে করিয়ে দিলেন "দুধটা একটু বেশি করে, ভাইটি!" তারপর এসে সোফায় বসলেন। হ্যান্ডব্যাগ থেকে নোটটা বের করে একটু হেসে বললেন, "কর্নেল স্যারকে, বুঝলেন জয়ন্তবাবু এই জন্যেই অন্তর্যামী বলি। ওপরে গিয়ে তো চক্ষু ছানাবড়া। বড়ই আশ্চর্য। ভাবা যায় না!"

কর্নেল বললেন, "হালদারমশাই কি সন্নেসি সেজে কালীগঞ্জে যাচ্ছেন?" "অ্যাঁ!" হালদারমশাই অবাক হয়ে আমার দিকে ঘুরে ফিক করে হেসে বললেন, "হঃ বুঝছি। জয়ন্তবাবু সব কইয়া দিছেন স্যাররে।"

বললুম, "পুরোটা বলিনি। আপনি বলুন। দেখুন কী ক্লু পান!"

হালদারমশাই সোফার কোনায় পিছলে গেলেন, কর্নেলের ইজিচেয়ারের পাশে। তারপর চাপা স্বরে মন্ত্রপাঠের মতো নোট-বই থেকে রহস্যজনক ঘটনাটির বিবরণ দিতে থাকলেন। ইতিমধ্যে ষষ্ঠী কফির ট্রে রেখে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে হালদারমশাই দ্বিগুণ উদ্যমে বাকি বৃত্তান্ত শেষ করে বললেন, "আমি যে প্ল্যান ছকেছি, আগে বলে দিই কর্নেল স্যার।"

কর্নেল বললেন, "সাধুবাবা সেজে গঙ্গার ধারে মন্দিরতলায় ধুনি জ্বেলে বসবেন তো?"

জবাবে হালদারমশাই 'খিখি-খিখি' করলেন। অর্থাৎ সেটাই ইচ্ছে।

"জয়ন্তবাবুকে তা হলে চেলা সাজতে হবে।"

আপত্তি করে বললুম, "মোটেও না। আমি ফার্মে কৃষি-সংবাদদাতা হয়ে থাকব। দৈনিক 'সত্যসেবকে' কৃষির একটি পাতা বেরোয় ফি সপ্তায়।"

"সাধু সাজার সুবিধে এ-ক্ষেত্রে আছে।" কর্নেল বললেন। "সাধুসন্নেসিরা গাঁজা খেয়ে ধ্যানে বসেন। তাই এলাকার গাঁজাখোরদের চেলা হিসেবে পাওয়ার আশা আছে। বিশেষ করে রমজান আর মুকুন্দকে সবার আগে পাওয়ার কথা। হালদারমশাই তাদের মুখ থেকে কিছু তথ্য পেতেও পারেন।"

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে নোট করে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ এটা একটা বড় পয়েন্ট।"

"আবার নাও পেতে পারেন!"

"সে কী!" বলে হালদারমশাই নোটবইতে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেগে দিলেন।

"যদি তারাও চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকে—"

"কীসের চক্রান্ত, কর্নেলস্যার?" হালদারমশাই করুণ মুখে প্রশ্নটা করলেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "ভূত হোক বা মানুষ হোক, কেউ বা কারা চায় না তুলারাম দণ্ডী ফার্মে রাত্রিবাস করেন—শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে আপাতত। জয়ন্ত, যাচ্ছ, যাও। কিন্তু সাবধান!"

জেদ ধরে বললুম, “যাচ্ছি।”

“কাকতাড়ুয়াটি বিপজ্জনক, ডার্লিং! তবে আরও বিপজ্জনক জিনিস তুলাদণ্ড।”

হালদারমশাই নোটবইতে ‘তুলাদণ্ড’ লালকালিতে বন্দী করে আমার পক্ষ হয়ে বললেন, “বুঝাইয়া কন!”

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, “তুলারাম দণ্ডীর সঙ্গে তুলাদণ্ডের যোগ আছে। কারণ খোলভুসি ওজন করে বেচতে হয়। দণ্ডী পদবির কী ব্যাখ্যা উনি দেন জানি না। তবে দণ্ডী বলতে প্রাচীন যুগে রাজবাড়ির দারোয়ান বোঝাত। কালীগঞ্জে গুপ্তযুগের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে শুনেছি।”

হালদারমশাই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, “গুপ্তধন! গুপ্তধন!”

“সমস্যা হল,” কর্নেল বলতে থাকলেন, “বরাবর দেখে আসছি, ‘ণ্ড’ এই যুক্তবর্ণটি সর্বত্র গণ্ডগোলের প্রতীক। হুঁ, গণ্ডগোলেও ‘ণ্ড’ লক্ষ করুন। তারপর দেখুন, দণ্ড, মুণ্ড, ভাণ্ড, পিণ্ড, চণ্ড, ষণ্ড, লণ্ডভণ্ড.....। যাই হোক, এবার কাকতাড়ুয়া কথা ভাবুন। দণ্ডের ওপর মুণ্ডু দেখতে পাচ্ছেন। দণ্ডমুণ্ড সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! তা ছাড়া দণ্ডমশাইয়ের বেগুন খেতে মুণ্ডটি আস্ত মড়ার খুলি!”

গোয়েন্দামশাই খসখস করে নোট করছিলেন। বললেন, “একটা কথা জিগানো বাকি, কর্নেল স্যার। কাটরার মাঠ। কাটরাটা কী কন তো?”

বিরক্ত হয়ে বললুম, “সেখানে গিয়েই জানা যাবে!”

হালদারমশাই আমাকে পাত্তা দিলেন না। বললেন, “দণ্ডীবাবু বলছিলেন, সেখানে নাকি মোগল-পাঠানে খুব কাটাকাটি হয়েছিও। তাই কাটরা। আপনি কী কন?”

কর্নেল ফের একটা অট্টহাসি হাসলেন। “হয়েছিল। তবে কাটরা কথাটা আসলে কাঠরা। মানে, রবিশস্য। কোথাও-কোথাও কাঠখন্দও বলা হয় রবিশস্যকে।” বলে আমার দিকে তাকালেন। “কাঠরা বলতে কাঠগড়াও বোঝায়, জয়ন্ত। না, না, কাঠগড়ার ভয় তোমার কীসের? শুধু একটা ব্যাপার সাবধান করে দিই। কাটরার শ্মশানে নাকি পিশাচ আছে।”

শুনে একটু ভড়কে গেলুম নিশ্চয়। ‘পিশাচ’ শব্দটা লিখে হালদারমশাই নোটবই বুজিয়ে তাড়া দিলেন। “উঠে পড়া যাক, জয়ন্তবাবু। বারোটা পাঁচে ট্রেন।” বলে সহাস্যে কর্নেলকে ধন্যবাদ দিলেন। “অনেক ক্লু দিয়েছেন। থ্যাংকস, থাউজ্যান্ড থ্যাংকস কর্নেল স্যার!”

তিন

গুরুজনের চোখে ছেলেপুলের বয়স বাড়ে না। ফলে দণ্ডীবাবুর বর্ণনা অনুসারে তৈরি হালদারমশাইয়ের নোটবুকের বৃত্তান্ত থেকে ফান্টুর যে মূর্তি বানিয়েছিলুম, মিলল না। বরং ওকে দেখলেই কেন যে হাসি পায়! বেঢপ গড়ন বলেই হয়তো কার্টুনচিত্র মনে হয়। গোলগাল, বেঁটে, মুখটি প্রকাণ্ড—তবে এক্ষেত্রে ‘ণ্ড’ বর্ণ বিপজ্জনক কদাচ নয়। বড় বড় দাঁত, খোলা হাসি সবসময় মুখে টাঙানো। নিরীহ গোবেচারা বলাই উচিত। পরনে কালো রঙের শর্টস আর নীলচে স্পোর্টস্ গেঞ্জি। পায়ে গামবুট। ধুলো কাদায় নোংরা। মাথায় আঁটো-সাঁটো টুপি দিনশেষেও আঁটা দেখে দণ্ডীবাবু ধমক দিলেন, “রোদ্দুর আছে? আবার আমাকে বলা হয় ভুলো মন! যা, ওই নোংরা মেঠো পেন্টুল-ফেন্টুল খুলে আয়।”

ফান্টু আমাকে বোঝাচ্ছিল, কী কৃৎকৌশলে উদ্ভিদের কাছে অনেক বেশি আদায় করা যায় এবং সে সত্যিই কৃষিবিজ্ঞানীর কান কাটতে পারে। মামার কথায় জিভ কেটে বিব্রতভাবে পাম্প ঘরের সামনে চৌবাচ্চাটির দিকে গেল। পনেরো একর ফার্মের চারদিকে ঝোপঝাড়, কিছু গাছের জটলা। পুবে পোড়ো শিবমন্দির আর বট, দ্রুত আবছা হয়ে আসছে। হু হু করে বাতাস দিচ্ছে। বেগুনখেতের এক কোণে, খানিকটা দূরে কাকতাড়ুয়াটি কালো হয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে আর দুলছে। গা ছমছম

করছিল। ফার্ম-ঘরের খোলামেলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে দণ্ডীবাবু তেরাত্তিরের রহস্যময় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। নতুন কোনও কথা শুনলুম না। হালদারমশাই গঙ্গার ওপারে কালীগঞ্জে দণ্ডীবাবুর বাড়িতে আছেন। নিশুতি রাত্তিরে তাঁর অভিযান শুরু হবে। প্ল্যানমাফিক আমি কলকাতার কাগজের কৃষি বিষয়ক রিপোর্টার। রমজান আর মুকুন্দ কলকাতার কাগজে তাদের ছবি ছাপা হবে শুনে আমাকে খাতিরের চূড়ান্ত করছিল। শেষে মুকুন্দ গঙ্গা পেরিয়ে আমার সরেস রকম সৎকারের জন্য মাছ-মাংস-রসগোল্লা-দই আনতে গেল বাজার থেকে। রমজান চায়ের সঙ্গে দাগড়া-দাগড়া বেগুনী আর 'পটাটো-চিপস' আনাল। গর্বে হেসে বলল, "সবই আমাদের এই মাটির উৎপন্ন স্যার। এই বেগুন বলুন, বেগুন। আলু বলুন, আলু!"

দণ্ডীবাবু কৌতুকে বললেন, "বল্ না চায়ের পাতাও ফলিয়েছিস! কাগজে তাও ছাপা হবে!"

কর্তাবাবুর কথায় রমজান দমল না। বলল, "সেও আমাদের ভাগনেবাবুর পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়, বাবুমশাই। দেখবেন, কবে চায়ের বাগান করে বসে আছে। লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি—সবই ফলাতে পেরেছে, চা এমন কী জিনিস?"

দণ্ডীবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "আলো জ্বেলে দে! খালি বড় বড় কথা আর রাতটি এলেই ঘুমিয়ে পড়া!"

রমজান সুইচ টিপে দরজার ওপরে কার্নিশের নিচের বালব্‌টি জ্বেলে দিল। আমার উদ্দেশে বলল, "কিছু দরকার হলেই ডাকবেন, স্যার! আমি ধাঁ করে একচক্কর মাঠে ঘুরে আসি। গম পেকেছে। সন্ধ্যার দিকেই গম-চোরদের উৎপাত হয়।" সে চলে গেলে দণ্ডীবাবু বললেন, "আমার এই লোক দুটো রমজান আর মুকুন্দ, খুব বিশ্বাসী। অনেস্ট। শুধু একটাই দোষ। রাত দশটার পর গাঁজার নেশায় মড়া হয়ে পড়ে থাকে।"

ফান্টু চায়ের গেলাস হাতে এল। টুপিটা নেই এই যা! পরনে সেইরকম পোশাক—শর্টস আর গেঞ্জি। মুখে কার্টুন-হাসি টাঙানো। একটা চেয়ার টেনে একটু তফাতে বসে বলল, "চান করার সময় একটা কথা মাথায় এল মামা। বলি কাগজের দাদাকে?"

দণ্ডীবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ভাগনের দিকে।

ফান্টু বলল, "গতরাত্তিরে কাকতাড়ুয়া দুষ্টুমি করেনি। মামা ছিলেন না, তাই। আজ রাত্তিরে মামা আছেন। দেখবেন, ঠিক গণ্ডগোল বাধাবে। যত রাগ যেন মামার ওপর!"

দণ্ডীবাবু উরুতে ঠেস দিয়ে রাখা দোনলা বন্দুকটি তুলে নিয়ে বললেন, "খুলি উড়িয়ে দেব। আমার ওপর রাগ! আমি কোন্ ব্যাটাচ্ছেলের পাকা ধানে মই দিয়েছি? বুঝলেন জয়ন্তবাবু! এ স্রেফ কারুর জেলাসি। কেউ বা কারা চায় না আমার ফার্মে তিন কিলো বেগুন ফলুক। একজিবিশানে মেডেল পাক্।"

ফান্টু বলল, "না মামা, তোমাকে বারবার বলেছি, তুমি কানেই নিচ্ছ না—"

তাকে থামিয়ে দিয়ে দণ্ডীবাবু বললেন, "থাম তো! খালি এক কথা।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু কথাটা কী?"

দণ্ডীবাবু ফ্যাঁচ করে বড়ই বেমানান হাসিটি হাসলেন। আসলে তাঁর রুক্ষ কেঠো চেহারার জন্য সবসময় মুখে তিতকুটে জিনিস গেলার ভাব। হাসলে মনে হয়, খ্যাঁক করে কামড়ে দিলেন। বললেন, "ভূত! যে সে ভূত নয়, গঙ্গার মড়াখেকো পিশাচ! ছেলেটা কাটরার মাঠে থাকতে থাকতে কী একটা হয়ে গেছে যেন। সব সময় উদ্ভুট্টে কথাবার্তা! বলে কী জানেন! গাছপালা, পাখপাখালি, পোকামাকড় সবকিছুর কথা বুঝতে পারে।"

"পারি তো!" ফান্টু বলল, "সাধুবাবা আমাকে বলে গেছেন, যার প্রাণ আছে সেই কথা বলে। চেষ্টা করলেই বোঝা যায়, কী বলছে।"

বললুম, "কিন্তু তুমি ভূত-প্রেত-পিশাচ এসব বিশ্বাস করো কি?"

ফান্টু বলল, "করি। দেখেছি যে!"

"কী দেখেছ, বলো।"

দণ্ডীবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "খুব হয়েছে আর নয়। সাধুবাবা না, এই রমজান আর মুকুন্দ ওর মাথাটি খেয়েছে। জয়ন্তবাবু, দোহাই আপনাকে। ফিরে গিয়ে যেন এইসব উদ্ভুট্টে কথাবার্তা কাগজে ছাপবেন না! একে তো আপনাদের কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা গঞ্জুবাবু জ্যান্ত কাকতাড়ুয়ার ভৌতিক খবর ছাপিয়ে হুলস্থুল বাধিয়েছেন। আড়তে অসংখ্য জায়গার লোক এসে আমাকে জেরায়-জেরায় জেরবার করে দিচ্ছে। এবার আপনিও যদি ভূত-প্রেত-পিশাচের খবর ছাপেন, তিষ্টোনো যাবে না। আমাকে আড়তের কারবার ছেড়ে, এই ফার্ম ছেড়ে হিমালয়ে পালাতে হবে।"

ফান্টু বড় আকারে নিঃশব্দে হেসে বলল, "হিমালয়ে গেলে সাধুবাবার দেখা পেয়ে যাবে, মামা।"

"যাচ্ছি!" দণ্ডীবাবু ভেংচিকাটা মুখ করে বললেন, "বলিস তোর পিশাচব্যাটাচ্ছেলেকে, দণ্ডীবাবু লড়ে যাচ্ছে, লড়বে। কাকতাড়ুয়া নই, দু'ঠেঙে মানুষ। হাতে বন্দুক। খুলি উড়িয়ে দেব।"

এ-সব কথার নিশ্চয় একটা মানে আছে, আমার বুঝে নেওয়ার দরকার। তাই বললুম, "দণ্ডীমশাই, পিশাচটি আপনার মতে মানুষ?"

আমার কথা শেষ করার আগেই দণ্ডীবাবু বললেন, "আলবাত মানুষ। নইলে রক্তের ছাপ কেন? বেগুনখেতের পেছনকার কাঁটাতারের বেড়ায় খোঁদল ছিল কেন? বুঝলেন না! প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বেগুনগাছ। ঝাঁকড়া ইয়াব্বড় পাতা। ব্যাটাচ্ছেলে করে কি, বেড়ার খোঁদল দিয়ে গুড়ি মেরে বেগুনখেতে ঢোকে। ঢুকে কাকতাড়ুয়ার নিচেটা ওপড়ায়। গুড়ি মেরে সেটাকে নাচাতে নাচাতে খেতময় ঘোরে আর ভূতুড়ে সুর ভাঁজে, ওই দেখেই ভয় পেয়ে আমি ফার্মহাউসে রাত্রিবাস ছেড়ে দেব। দিচ্ছি! যাও-বা কোনও-কোনও রাতে বাড়িতে থাকতুম, আর থাকছি না। দেখি তোমার দৌড়!"

বললুম, "ব্যাপারটা পরিষ্কার হল এতক্ষণে। কিন্তু কে সে?"

দণ্ডীবাবু ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "সেটাই তো বোঝা গেল না!" তারপর চাপা স্বরে ফের বললেন, "সেজন্যই ডিটেকটিভ এজেন্সিতে যাওয়া। বুঝলেন না?"

"হুঁ, এ তো স্পষ্ট, কেউ বা কারা আপনার ফার্মহাউসে রাত্তিরে থাকা পছন্দ করছে না।"

"করছে না?"

"কিন্তু কেন?"

দণ্ডীবাবু এবার আম ওপর চটলেন। "আহা, সেজন্যই তো ডিটেকটিভ ভাড়া করা! আপনাদের কাগজের লোকেরা খালি প্রশ্ন করতেই জানেন। তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন না।" বলে ফের আগের মতোই বেমানান একটি ফ্যাঁচ করলেন, অর্থাৎ হাসলেন। "সরি, আপনি আমার গেস্ট। কিছু মনে করবেন না। ব্যাপারটা যত ভাবছি, তত প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। আমি মশাই টি. আর দণ্ডী, এ তল্লাটের বাঘ বলে আমাকে। আর আমাকে ওই বিটকেল কাকতাড়ুয়ার নাচ দেখিয়ে ভড়কানোর চেষ্টা! বড্ড অপমানজনক ব্যাপার নয়? বলুন আপনি!"

সায় দিয়ে বললুম, "সত্যি অপমানজনক। তবে আপনি বলছিলেন, জেলাসি!"

দুঃখিত মুখে অর্থাৎ আরও তেতো গেলার ভঙ্গিতে দণ্ডীবাবু বললেন, "আপাতদৃষ্টে জেলাসিই মনে হচ্ছে। এর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখি, ডিটেকটিভ ভদ্রলোক কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করতে পারেন কি না!"

ফান্টু আমাদের দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কথা শুনছিল। এতক্ষণে বলল, "রিপোর্টারদা ক'টা বাজছে দেখুন তো?"

ঘড়ি দেখে বললুম, "ছ'টা তেতাল্লিশ!"

"আর সতেরো মিনিট পরে প্রিন্স অ্যালবার্ট ফুটতে শুরু করবে। যাই, কাছে গিয়ে বসে থাকি।"

ফান্টু উঠে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করলুম, "কী ফুল ফান্টু!"

ফান্টু বলল, "গোলাপ। দেখবেন তো আসুন না।"

দণ্ডীমশাই বললে, "দিনে দেখবেন জয়ন্তবাবু। ফান্টু বসে থাকতে হয় তো তুই থাকবি। খালি বাতিক।"

ফান্টু বলল, "রিপোর্টারদা, সকালে কিন্তু ফোটো তুলতে হবে। পুরো ফুটতে ভোর হয়ে যাবে। দেখবেন কত্ত বড় গোলাপ।"

সে চলে গেলে কর্নেলের কথা মনে পড়ল। হায় বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ! না এসে কী হারালেন, জানেন না। এই ফান্টুচন্দ্রের মধ্যে যেন কর্নেলের আদল। ছাদের বাগানে কোনও অর্কিডের ফুল ফোটার পথ চেয়ে উনি এমনি করে পাশে বসে রাত কাটান!

একটু পরে পূর্ব দিকে গঙ্গার ওপারে বিশাল লালরঙের জিনিসটি যে চাঁদ, বুঝতে সময় লাগল। রঙ বদলে চাঁদটা ছোট হলে মুকুন্দ গান গাইতে গাইতে দু'হাতে ব্যাগ নিয়ে ফিরল। রমজান তার সঙ্গে। দণ্ডীবাবু বললেন, "নন্দী-ভৃঙ্গী! বুঝলেন জয়ন্তবাবু? একজন গেল বাজারে একজন জমি দেখতে। ফিরবে জোড় বেঁধে। যত্ত সব!"

ওঁর চটে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারলুম না। মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, "স্যার, শিবমন্দিরে আবার এক সাধু এসে ধুনি জ্বেলেছেন দেখে এলুম। মাথায় পেল্লায় জটা।"

দণ্ডীবাবু বললেন, "তাহলে তো এ-রাতে শিবমন্দিরে তোদের মড়া গড়াবে।"

দু'জনেই জিভ কাটল। মুকুন্দ বলল, "বাবা ধ্যানে বসছেন। দেখে মনে হল ধ্যান ভাঙতে ভোর হয়ে যাবে। তাছাড়া স্যার, ঘরে গেস্ট। রাঁধাবাড়া ফেলে সাধুসঙ্গ করা কি উচিত?" সে হন্তদন্ত হয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল।

রমজান পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে চণ্ডীবাবুর হাতে দিল। বলল, "গেটের কাছে পড়ে ছিল। মুকুন্দ বলল, ফেলে দে। ফেলে দিলে চলে? যদি বেনামী চিঠি হয়! যা ভুতুড়ে কাণ্ড চলেছে রাতবিরেতে।"

দণ্ডীমশাই ব্যস্তভাবে পড়ে বললেন, "ধুস, পদ্য লিখেছে কেউ। ফান্টুও হতে পারে, কিচ্ছু বলা যায় না। নেচারের মধ্যে থাকলে মনে কত ভাব জাগে মানুষের!"

ওঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দেখি, লাল আঁকাবাঁকা হরফে লেখা আছে :

নিঝুম রাতে গাছগাছালির মাথার ওপর
উঠলে চাঁদ,
বেগুনখেতে পাততে যাব শেয়াল ধরার
ফিচেল ফাঁদ।

বললুম, "দণ্ডীবাবু পদ্যটা হয়তো নিছক পদ্য নয়। কেউ যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে! শেয়াল-ধরা ফাঁদ পাততে আসবে বেগুনখেতে এবং 'ফিচেল' কথাটাও কেমন সন্দেহজনক!"

ঠিক এই সময় কোথায় বিকট শব্দে সত্যিই শেয়াল ডেকে উঠল। আমার বুক ধড়াস করে উঠেছিল। দণ্ডীমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, "কাটারার মাঠে এখনও শেয়াল আছে তা হলে?"

রমজান বলল, "কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে দু'একটা আছে। কখনও-সখনও ডাকে শুনেছি।"

বারকতক হোয়া-হোয়া করে ডেকে শেয়ালটা চুপ করে গেল। কেমন একটা ভয়-জাগানো অনুভূতি আর গা ছমছম করা ভাব পেয়ে বসল আমাকে। আবছা জ্যোৎস্নায় নিঝুম পরিবেশের

ভেতর ফান্টুর দেখা পিশাচটার সবে ঘুম ভাঙল বুঝি! একটা প্যাঁচা ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও করে ডাকতে ডাকতে শিবমন্দিরের দিকে চলে গেল।

মুকুন্দের ডাকে রমজান চলে গেল। দণ্ডীমশাই আস্তে বললেন, "চ্যালেঞ্জ না কী বলছিলেন যেন?"

"হ্যাঁ। পদ্যটা কেমন যেন রহস্যজনক!"

দণ্ডীমশাই কাগজটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে পড়লেন। তারপর বাঁকা মুখে বললেন, "খুলি উড়িয়ে দেব। ফিচলেমি করে দেখুক না! ঢের ফাঁদ আমার দেখা আছে।"

বলে উঠে দাঁড়ালেন। কাঁধে বন্দুক, এক হাতে লম্বা টর্চ। বেগুনখেতের দিকে আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেলেন। সাহসী মানুষ, সন্দেহ নেই। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই গেলেন নিশ্চয়!

একটু পরে কাকতাড়ুয়াটির ওপর তাঁর টর্চের আলো পড়লে আঁতকে উঠলুম। পাঞ্জাবি পরে কাকতাড়ুয়ার খুলি-মুণ্ডুটি দাঁত বের করে আঁধার চোখে তাকিয়ে যেন হিহি করে হাসছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিলুম সঙ্গে সঙ্গে।

ফান্টু এসে গেল। "রিপোর্টারদা, প্রিন্স অ্যালবার্ট মুখ খুলেছে। মামা কোথায়?

বললুম, "তোমার মামা বেগুনখেতে ঢুকেছেন।"

ফান্টু জোরালো হেসে বলল, "এই রে, কাঁটায় আটকে ফাঁদে পড়ার অবস্থা হবে সেদিনকার মতো। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেগুনখেতে ঢুকলে কী হয়, এখনও শিক্ষা হয়নি মামার!"

"আচ্ছা" ফান্টু, তুমি পদ্য লেখো কি?"

ফান্টু কান পর্যন্ত হাসি টেনে একটু পরে বলল, "লিখতে ইচ্ছে করে রিপোর্টারদা। পারি না। বেগুনের সঙ্গে মিল দিতে গেলে সেগুন আনতে হয়। কিন্তু বেগুন আর সেগুনে কত তফাত, বলুন!"

"আহা, তুমি পদ্য লিখেছ কি না জানতে চাইছি।"

"নাঃ, পোষায় না। ততক্ষণ সয়েল টেস্ট করতে মাথা ঘামানো ভাল।" ফান্টু ঠিক কর্নেলের মতোই চুল থেকে একটা পোকা বের করে উড়িয়ে দিল। দিয়ে বলল, "তবে এই এরিয়ায় পদ্য লিখতে পারে একজনই। কাগজে ছাপাও হয়।"

"কে তিনি?"

"ভাণ্ডারী মাস্টারমশাই!" ফান্টু প্রশংসা করে বলল। "আমাদের স্কুলে বাংলা পড়াতেন। রিটায়ার করেছেন গতবছর। বিকেলে গঙ্গার ধারে একলা ঘুরে বেড়ান। মাথায় লম্বা চুল, চিবুকে তেমনি লম্বা একগোছা ছুঁচলো দাড়ি। ওঁকে দেখে আপনি হেসে সারা হবেন। কিন্তু গুণী মানুষ।"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে ফান্টু চাপা স্বরে ফের বলল, "মামা জানতে পারলে বকবেন। কিন্তু লুকিয়ে ফার্মের এটা-সেটা দিয়ে আসি। খুব গরিব হয়ে গেছেন ভাণ্ডারীমশাই! সেদিন একটা বেগুন পেয়ে দেখুন না, একখানা পদ্য দিয়েছেন। দারুণ পদ্য।"

ফান্টু ঘরে ঢুকে পদ্যটা নিয়ে এল। ভাণ্ডারী-তে 'ণ্ড' আছে। শুনেই অস্বস্তি লেগেছিল। এবার হাতের লেখা দেখে অস্বস্তিটা বেড়ে গেল এবং রহস্যটা জটিল হয়ে পড়ল।

একই ছাঁদের হরফ। তবে নীলচে কালিতে লেখা।

কেল্লাবাড়ির দারোয়ানের বংশ
তাই পদবী দণ্ডী
তারই এক মাসতুতো ভাই চণ্ডী
চোর-জোচ্চোর দেশটা করছে ধ্বংস

হস্তে তৌল দণ্ড
পাষণ্ড আর ভণ্ড
বেচছে ভেজাল ভুসি ও খোল সর্ষের
ষণ্ডদুটি আছে বড়ই হর্ষে
অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা বাপ
বস্তার ভেতর রাস্তা ঢুঁড়ছে সাপ!

পদ্যটা পড়ে বললুম, "এর মানে কী বলো তো? 'বস্তার ভেতর রাস্তা ঢুঁড়ছে সাপ।' একথা কেন লিখেছেন ভাণ্ডারীমশাই?"

ফান্টু বলল, "পদ্যের আবার মানে থাকে নাকি? পদ্য পদ্য। কই, দিন। লুকিয়ে রেখে আসি। মামা দেখলেই হয়েছে!"

"এটা আমার কাছে থাক, ফান্টু।"

"রাখবেন, রাখুন। কিন্তু সাবধান রিপোর্টারদা, মামার চোখে যেন পা পড়ে!"

"না, না। তুমি ভেবো না।" বলে পদ্যটা ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করে দিলুম। শিগগির হালদারমশাইকে দেখানো দরকার। মুকুন্দের কথায় টের পেয়েছি, শিবমন্দিরের সাধুটি কে!

এইসময় বেগুনখেতের দিক থেকে দণ্ডীবাবুর ডাক শোনা গেল, "ফান্টু, ফান্টু।"

ফান্টু বলল, "এই রে! যা ভেবেছিলুম। মামা আটকে গেছেন কাঁটায়!" সে ঘরে ঢুকে একটা কাটারি বের করে নিয়ে দৌড়ে গেল।

অবস্থাটা দেখার জন্য এগিয়ে গেলুম। বেগুনখেতের অনেকটা ভেতরে আবছা জ্যোৎস্নায় একটা কালো মূর্তির বুক থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খুব নড়াচড়া করছেন দণ্ডীমশাই। ফান্টু বুক সমান উঁচু বেগুনগাছের জঙ্গলে দিব্যি ঢুকে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, টর্চ কী হল মামা?"

দণ্ডীবাবু চিঁ চিঁ করুণ স্বরে বললেন, "কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে কোথায় পড়ে গেছে। খুঁজে পাচ্ছিনে!"

"বন্দুক পড়ে যায়নি তো?"

"না, না! খালি কথা বাড়ায়। অ্যাই যাঃ! গেল, নতুন জামাকাপড় পর্দাফাঁই হয়ে গেল। কী... কী সাঙ্ঘাতিক বেগুনগাছ রে বাবা! যেন জ্যান্ত! নড়লেই খিমচি—উঃ! ইঃ!"

আমার কাছে টর্চ আছে। কিন্তু দণ্ডীবাবুর দুর্দশা উপভোগ করার চেয়ে এই সুযোগে ঝটপট ভাণ্ডারীমশাইয়ের পদ্যটা শিবমন্দিরে সাধুবেশী গোয়েন্দার কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি মনে হল। ফার্মের মাঝ-বরাবর একচিলতে রাস্তা। দু'ধারে সুন্দর কেয়ারি-করা বেড়া-গাছ। গেট খুলে গঙ্গার ধারে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাবধানে পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে দক্ষিণ পূর্ব কোণে শিব মন্দিরের দিকে চললুম। কানে ভেসে এল, 'ওঁং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!' তারপর ধুনির আলোও চোখে পড়ল।

তারপরেই আচমকা উলটে পড়ে গেলুম।

হোঁচট খেয়ে পড়িনি। কে বা কারা পেছনে ঝোপের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর। টুঁ শব্দটি করার সুযোগ পেলুম না। আমার মুখে টেপ সেঁটে দিল। তারপর আমার হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধতে বাঁধতে কেউ ফিসফিসিয়ে বলল, "চুপচাপ না থাকলে শ্বাসনলি কেটে যাবে।" কাজেই চুপচাপ থাকতেই হল। শ্বাসনলি কাটা মড়া হয়ে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না।

চার

কিন্তু তারপর সত্যিই আমাকে মড়া হতে হল, শ্বাসনলি কাটা না হলেও। অর্থাৎ জ্যান্ত মড়া। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখলুম, একটা খাটিয়া এল। চারটে ছায়ামূর্তি এসে খাটিয়ায় আমাকে তুলে চিতপাত শুইয়ে দিল। তারপর খাটিয়া কাঁধে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "বলো হরি! হরি বো-ও-ল!"

মন্দির চত্বরে ধুনির আলোয় জটাজুটধারী হালদারমশাইকে স্পষ্ট দেখলুম, উঁচুতে থাকার দরুন। চোখ বুজে ধ্যানস্থ। মাত্র হাত-দশেক পাশ দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে শ্মশানযাত্রার পথে মনে-মনে ওঁর মুণ্ডুপাত করছিলুম তাকিয়ে তো দেখবেন কী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! বিকট স্বরে হরিধ্বনি কানে যাচ্ছে, একবার অন্তত মুখ তুলে চোখ খোলা উচিত ছিল না কি?

বটতলার পর ফাঁকা মাঠ। এখানে-ওখানে ঝোপঝাড়, কিছু গাছ। এতক্ষণে প্রচণ্ড ভয়ে সিঁটিয়ে গেলুম। রসিকতা বলে মনে হচ্ছে না। আর, মড়ার খাটিয়ায় তোলার সময় যদিও তাই ভেবেছিলুম। এরা নির্ঘাত আমাকে চিতায় শুইয়ে আগুন জ্বেলে দেবে, তাই যত হরিধ্বনি দিচ্ছে, তত চমকে-চমকে উঠছি। হৃৎপিণ্ড তুমুল লাফালাফি করছে।

অন্তত আধ-কিলোমিটার পরে খাটিয়া মাটিতে নামল। চাঁদটা গঙ্গার ওপর থেকে ফান্টুর মতো কার্টুনহাসি হাসছে আমার দশা দেখে। এবার ছায়া মূর্তি চতুষ্টয় আমাকে খাটিয়ার সঙ্গে সেঁটে আগাগোড়া বাধল। একজন শি-শি শব্দে হেসে ভূতুড়ে গলায় বলল, "জলে ফেলে দে রে, তলিয়ে যাক।"

অন্যজন বলল, "পাঁজাটাক কাঠ থাকলে চিতেয় দিতুম।"

আরেকজন বলল, "অ্যাই, আর এখানে নয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ভূতুড়ে গলাটি সেইরকম শি-শি করে হেসে বলল, "পিশেচবাবা এসে কড়মড়িয়ে খাবে বরং। চল্, এবার সাধুবাবার একটা ব্যবস্থা করি।"

একজন হঠাৎ নড়ে উঠল। "অ্যাই! পিশেচবাবা আসছে!"

চারজন বিকট স্বরে "বলো হরি! হরি বো-ও-ল" বলতে বলতে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। জায়গাটা যে শ্মশান, পোড়া কাঠের গন্ধে অনুমান করতে পারছিলুম। খাটিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধায় এখন আমার নড়াচড়ার সাধ্যি নেই। অতি কষ্টে চোখের তারা কোণস্থ করে জ্যোৎস্না ঝিলমিল জল এবং একটা উঁচু ন্যাড়া গাছ দেখতে পাচ্ছিলুম। শিমুলগাছই হবে। সেখান থেকে অলক্ষণে প্যাঁচার ডাক শোন গেল। তারপর দূরে ডেকে উঠল একটা শেয়াল—সেই শেয়ালটাও হতে পারে। শেয়ালের ডাক থামলে শুকনো পাতায় খড়খড় মসমস শব্দ শোনা গেল। পিশেচবাবা বলতে নিশ্চয় পিশাচ, যাকে ফান্টু দেখেছে এবং সেই পিশাচ নরমাংসভোজী হওয়াই সম্ভব! এখন কথা হল, আসছে, দুষ্টু-চতুষ্টয় তাকে আসতে দেখে পালিয়ে গেল। খড়মড়, খসখস শব্দ ক্রমাগত শুনছি। সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, তাও বুঝতে পারছি। পিশাচ বলে যদি কিছু সত্যিই থাকে, তার জ্যান্ত মাংসে অরুচি হলে তবেই আমার বাঁচার চান্স অন্তত নব্বই শতাংশ। নইলে তো গেছিই!

ভেবে ঠিক করলুম, গোঁ-গোঁ আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দেব, আমি মড়া নই, জ্যান্ত। খড়খড় খসখস শব্দটা আমার বাঁদিকে ঝোপের ওধারে এসে থেমে গেল। চোখ কোণস্থ করে ঝোপের ওধারে লম্বাচওড়া পিশাচবাবার ছায়ামূর্তিও দেখতে পেলুম।

অমনি নাকে যথাসাধ্য দম টেনে নিয়ে সেই দম টেপআঁটা মুখ দিয়ে জোর ওঁ কিংবা গোঁ ধ্বনিসহযোগে ঠেলে দিলুম। ফুটুত করে একটা শব্দ হল এবং টেপটির একদিক উপড়ে গেল।

টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, "পিশাচবাবা, আমি মড়া নই, জ্যান্ত মানুষ!"

অমনি বিদঘুটে গলায় পিশাচবাবা বলল, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ! মানুষের গন্ধ পাঁউ!" তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে খাটিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল এবং হা-হা-হা-হা করে অট্টহাসি হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, অট্টহাসিটা চেনা ঠেকছে। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, পিশাচবাবার মুখে সাদা দাড়ি। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পরনে জ্যাকেট ও পাতলুন। গলা থেকে ঝুলন্ত ক্যামেরা ও বাইনোকুলার। মাথায় টুপি। পিঠে কিটব্যাগ আঁটা। হাতে একটি ছড়িও দেখতে পাচ্ছি। হুঁ, 'হ্যালুসিনেশন' বলে এরকম অসুখ আছে! সেই অসুখে ধরলে মানুষ ভুলভাল দেখে শুনেছি।

অথবা মৃত্যুকালীন সুখস্বপ্ন! অবশ্য, যক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত-পিশাচ নানারকম রূপ ধরতেও পটু। এই শ্মশানের মানুষখেকো পিশাচবাবা আমাকে কামড়ে খাওয়ার সময় যাতে বেশি চ্যাঁচামেচি, কান্নাকাটি না করি, সেজন্যই আমার সুপরিচিত রূপটি ধরেই দেখা দিয়েছে এবং কোন্ জায়গা থেকে খেতে শুরু করবে, তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। মরিয়া হয়ে চোখ বুজে ফেললুম।

তারপর টের পেলুম, দড়িগুলো ঢিলে হয়ে যাচ্ছে! পায়ের দড়ি খুলে গেল এবং ছদ্মরূপধারী পিশাচবাবা আমাকে ঠেলে অন্যপাশে কাত করে হাতের দড়িও খুলে দিল। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। তড়াক করে উঠেই পালানোর চেষ্টা করলুম।

কিন্তু পারলুম না। আমার কাঁধে থাবা পড়ল এবং আবার সেই হা-হা-হা-হা অট্টহাসি। "জল ডার্লিং! এ-মুহূর্তে খানিক জল দরকার। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলে ঘিলু চাঙ্গা হবে। ওঠো, উঠে পড়ো।"

কয়েক হাত নিচেই গঙ্গা। বেগড়বাঁই না করে হুকুম তামিল করলুম। তারপর সত্যিই ঘিলু চাঙ্গা হল এবং রুমাল বের করে মুখ মুছতে-মুছতে বললুম, "তা হলে স্বপ্ন নয়!"

"নয়, সেটা এখনও বুঝতে না পারলে আরও খানিকটা জলের ঝাপটা দাও।"

"দরকার হবে না। কিন্তু আমাকে উদ্ধারের জন্য আপনি কি মন্ত্রবলে উড়ে এলেন কলকাতা থেকে?"

"মন্ত্রবলে নয়, ডার্লিং! চার চাকার মোটরগাড়িতে—এক্সপ্রেস বাসে।"

"কিন্তু রাতবিরেতে এই শ্মশানে ছুটে আসার কারণ কী?

"পিশাচবাবার হুকুমে। তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে।"

প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, দূরে বিকট চ্যাঁচানি শোনা গেল, "বলো হরি! হরি বো-ওল! বলো হরি! হরি বো-ও-ল!" কর্নেল আমাকে টানতে-টানতে ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলেন। কাঁধ ধরে ঠেলে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফিসফিসিয়ে বলে উঠলুম, "ওরা নির্ঘাত হালদারমশাইকে আমার মতো বেঁধে আনছে। উনি শিবমন্দিরে সাধু সেজে—"

"চুপ! স্পিকটি নট।"

চুপ করে থাকলুম। হরিধ্বনি ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সাবধানে উঁকি মেরে দেখলুম, একটু দূরে চার ছায়ামূর্তি কী একটা বয়ে আনছে! তবে খাটিয়া নয়। কাছাকাছি আসামাত্র কর্নেল বিদ্‌ঘুটে গলায় একখানা হুঙ্কার ছাড়লেন, কতকটা বাঘের গজরানির মতো।

শোনামাত্র ওরা থমকে দাঁড়াল। তারপর কাঁধের লম্বাটে জিনিসটা ফেলে দিয়ে পিটটান দিল। কর্নেল দৌড়ে গেলেন। আমিও।

হ্যাঁ, জটাজুটধারী হালদারমশাই-ই বটে। মুখে টেপ সাঁটা আমারই মতো। আগাগোড়া দড়ি জড়ানো গায়ে। আশ্চর্য ব্যাপার, জটা ও দাড়ি খুলে যায়নি এবং কাঁধ থেকে ফেলে দেওয়ায় চোটও খাননি। কর্নেল বাঁধন খুলে দিতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দুই ঠ্যাঙে সিধে দাঁড়ালেন এবং জটা-দাড়ি নিজেই খুললেন। দেখলুম, টেপটি নকল গোঁফদাড়ির সঙ্গে সেঁটে থাকায় ওঁর সুবিধে হয়েছে বেশি। সহজেই খুলে গেল।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, আলখাল্লাধারী হালদারমশাই অবাক হলেন না কর্নেলকে দেখে। মুখ দিয়ে যে ধ্বনি বেরোল, তা হল, "খি-খি-খি-খি....!"

কর্নেল বললেন, "আছাড় খেয়ে ব্যথা লাগেনি তো হালদারমশাই?"

"হঃ কি যে কন! সয়েল না, স্যান্ড। বালু, বালু!" বলে খালি পায়ে বুড়ো আঙুলে নরম মাটির অবস্থাটা বুঝিয়েও দিলেন।

কর্নেল বললেন, "মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিন বরং—"

"ক্যান?"

"আপনার ওপর এমন একটা সাঙ্ঘাতিক ধকল গেল। মনে হচ্ছে, এখন আপনি ধাতস্থ হতে পারেননি।"

"অ্যাঁ! হালদারমশাই এতক্ষণে চমকালেন। কর্নেল এবং আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে লম্বা পায়ে জলের ধারে গেলেন।

একটু পরে আলখাল্লায় মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে বললেন, "ক্কী.....ক্কী আশ্চর্য ঘটনা। কর্নেল স্যার, আপনি? এতক্ষণ তাই চেনাচেনা ঠেকছিল। আপনি কখন এলেন? আর এই শ্মশান-মশান জায়গায় ক্কী...ক্কী অবাক!"

কর্নেল বললেন, "সব কথা পরে হবে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় হালদারমশাই! যে-কোনও সময়ে পিশাচবাবার আবির্ভাব ঘটতে পারে। চলুন, কেটে পড়া যাক।"

হালদারমশাই বললেন, "পিশাচবাবা! সে আবার কে?"

"ভুলে গেছেন দেখছি। নোটবইতে টুকেছিলেন না?"

হালদারমশাই চুপ করে গেলেন।

জ্যোৎস্না খানিকটা ঝলমলে হয়েছে। কোথাও গমখেত, কোথাও ধবধবে সাদা ন্যাড়া চষা-মাটি, কোথাও ঝোপঝাড় আর গাছের জটলা। মাঠের মধ্যে দূরে বা কাছে বিদ্যুতের আলো দুলদুল করছিল। বাঁ দিকে পশ্চিমে সোজা এগিয়ে সামনে কালো চাপ-চাপ উঁচু-নিচু পাঁচিলের মতো জিনিসটা দেখিয়ে কর্নেল বললেন, "কেল্লাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ।"

জিজ্ঞেস করলুম, "ওখানে গিয়ে কী হবে? বরং দণ্ডীবাবুর ফার্মে যাই চলুন।"

কর্নেল আস্তে আস্তে বললেন, "এসো তো।" তারপর পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বেলে নাড়তে থাকলেন।

কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের দিকে একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা এদিকে-ওদিকে নড়াচড়া করে নিবে গেল। কর্নেলও টর্চ নেবালেন। আলখাল্লাধারী হালদারমশাই বললেন, "এক মিনিট! এক মিনিট! জটা-দাড়ি না পরলে এ পোশাকে বড্ড বিচ্ছিরি দেখাবে। জয়ন্তবাবু, একটু হেল্প করুন। বিটকেল টেপটা ছাড়ানো যাচ্ছে না।"

টেপটা ছাড়িয়ে দিলুম। কিন্তু কিছু গোঁফ আটকে থাকল তাতে। হালদারমশাই সেটা ফেলে দিয়ে কষে জটা-দাড়ি আঁটলেন। তারপর বললেন, "চলুন, আই অ্যাম রেডি অ্যান্ড স্টেডি।"

পায়ের কাছে আলো ফেলে কর্নেল আগে হাঁটছিলেন। একটু পরে শুকনো খাল অর্থাৎ গড়খাইয়ের সামনে পৌঁছলুম। সাবধানে নেমে গেলুম। নরম দূর্বাঘাসে গড়খাইটা ভরে আছে। ওপারের ঢালে একফালি পায়ে-চলা রাস্তা। উঠতে অসুবিধে হল না। রাস্তার ওপর ঝোপঝাড় ঝুঁকে রয়েছে। সামনে আবার সেই রহস্যময় টর্চের আলো জ্বলে উঠল। কর্নেল সাড়া দিয়ে বললেন, "সঙ্গে গেস্ট আছে নন্দবাবু! আগে চা দরকার! হবে তো?"

অবাক কাণ্ড! জবাব পদ্যে এল :

খাবেন নেহাত চা
সে আর এমন কী।
কুকারে কেটলিটাও
চাপিয়ে রেখেছি

গেস্ট পেলে তো ধন্যই
প্রস্তুত সেজন্য।।

কর্নেল থামিয়ে না-দিলে পদ্যটা চলত। তবে মজাটা হল, কর্নেলও পদ্যেই থামলেন :

যথেষ্ট যথেষ্ট
খামোকা কেন কষ্ট।।

একটা লণ্ঠন জ্বালানো হচ্ছিল। জবাব এল ফের পদ্যেই এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপা খিকখিক হাসি :

পদ্য বলা কষ্ট নয় বদভ্যাস
ব্রেনে যদি বসত করেন বেদব্যাস।।

হ্যাঁ আমার অনুমান সঠিক। ফান্টুর কাছে শোনা সেই ভাণ্ডারী মাস্টারমশাই। কিন্তু দেখলে হাসি পাবে বলেছিল, পেল না। একটু রোগা, টিঙটিঙে, একটু কুঁজো, প্রচণ্ড লম্বা নাক। চিবুক থেকে অন্তত আট ইঞ্চি লম্বা গোঁফের মতো দাড়ি ঝুলছে, আর মাথায় লম্বা সন্নেসি-চুল। মুখে অমায়িক হাসি। পরনের পাঞ্জাবি এত লম্বা যে, ধুতি ঢেকে ফেলেছে প্রায়।

গাছ ও ঝোপের ভেতর কোনওরকমে টিকে থাকা, দরজা জানালার কপাট লোপাট হওয়া, হাঁ-হাঁ করা একটা ঘর। ছোট্ট গেরস্থালি পাতা। ফান্টু বলেনি এখানেই কবি ভাণ্ডারীমশাইয়ের ডেরা। হয়তো সে জানে না এই ডেরার খবর। ভাণ্ডারীমশাই সাধুবেশী হালদারমশাইকে দেখে চোখ নাচিয়ে বললেন,

হচ্ছে সন্দেহ
সাধু নন অন্য কেহ।

হালদারমশাই নিশ্চয় পদ্য বানাতে পারেন না। কারণ তিনি জবাবে তার প্রসিদ্ধ "খি-খি-খি-খি" উপহার দিলেন। কর্নেল বললেন, "ঠিক ধরেছেন নন্দবাবু, ইনিই সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে কে হালদার।"

"তা হলে নমস্কার।" বলে কবিবর মিষ্টি হাসলেন।

ডিটেকটিভ এনেছে দণ্ডী।
খবর পেয়েই চণ্ডী।
কালীগঞ্জে প্রেজেন্ট।
একটা ইনসিডেন্ট
বাধতে পারে শেষটা—"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "কী এই কেসটা?"

কবি নন্দ ভাণ্ডারী কেটলিতে ফুটন্ত জলে চা-পাতা ফেলে, সেটা নামিয়ে রেখে দুধ গরম করতে দিলেন। তারপর তক্তাপোশের তলা থেকে কাপ-প্লেট বের করে বাইরে ধুতে গেলেন। হালদারমশাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কর্নেল মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, "শেষটার সঙ্গে কেসটা বেশ মিলেছে হালদারমশাই।"

হালদারমশাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, "কেসটা বুঝতে দরকার একটু চেষ্টা।"

হারদারমশাই একটু চটে গেলেন। "ধুর মশাই! খালি পদ্য। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। পদ্য-টদ্য আমার আসে না। ওদিকে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে! বেগুনখেতে—"

বাইরে থেকে কবিবর বললেন—

বেগুনখেতে রাতবিরেতে নাচত কাকতাড়ুয়া।
চুপিসাড়ে ঝোপেঝাড়ে বলত শেয়াল ক্যা হুয়া।

দণ্ডীবাবু ফন্দি করে যেই আনল ডিটেকটিভ।
চণ্ডীচরণ বুঝল তখন এবার সে ইনএফেকটিভ।

তারপর ঘরে ঢুকে দুধের পাত্র নামিয়ে কুকার নেবালেন। চা তৈরি করতে করতে ফের ভাণ্ডারীমশাই আপনমনে আস্তে বললেন,

"হচ্ছে ভয়।
কী হয়, কী হয়।
ছেলেটা যে বোকা।
জিনিয়াস একরোখা।
ওরে পোড়ামুখো।
তোর হাতেই হুঁকো।
খেয়ে যাচ্ছে ভূত—

হালদারমশাই চটেই ছিলেন। বলে উঠলেন, "কী অদ্ভুত!"

কর্নেল তারিফ করার ভঙ্গিতে বললেন, "আসছে হালদারমশাই, আসছে!"

হালদারমশাই চমকে উঠে বললেন, "ক্কী!"

"পদ্য।"

আমি ফোড়ন না কেটে পারলুম না। "এবং ছন্দও।"

হালদারমশাই গুম হয়ে বসে রইলেন। মনে হল, যা ঘটছে সেটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছেন। কবি নন্দ ভাণ্ডারীর মুখেও সেই আমুদে ভাবটা নেই। হাতে-হাতে চা এগিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড একটা ধকলের পর গরম চা আমাকে চাঙ্গা করতে থাকল। হালদারমশাইকেও বটে। কারণ তাঁর সন্নেসি-মুখে প্রশান্তি ফুটতে শুরু করল।

ভাণ্ডারীমশাই চা শেষ করে বললেন,

অনারেবল গেস্ট।
নাউ টেক রেস্ট।
ওয়ান থিং টু ক্লিয়ার।
ইফ ইউ হিয়ার
দা জ্যাকল হাউলস।
সামথিং ইজ ফাউল।

তক্তপোশের তলা থেকে তিনি একটা পুঁটুলি বের করলেন। তারপর সেটা বগলদাবা করে কর্নেলের দিকে চোখ নাচিয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

দেখলুম, হালদারমশাই কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কর্নেল লণ্ঠনের দম কমিয়ে দিলেন। বললেন, "কী বুঝলেন বলুন হালদারমশাই!"

"প্রচুর—প্রচুর রহস্য।"

"হ্যাঁ, রহস্য প্রচুরই। আপনাকে বলেছিলুম, 'ণ্ড' বর্ণটি যেখানে, সেখানেই গণ্ডগোল। কবি নন্দলাল ভাণ্ডারীকেও দেখলেন। ণ্ড বর্ণটি তাঁর নামেও আছে। কাজেই কিছু গণ্ডগোল তাঁরও আছে, তবে সেটা মাথায়।"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার সঙ্গে এর পরিচয় হল কীভাবে?"

কর্নেল একটু হাসলেন। "গত একমাস যাবৎ নন্দবাবু আমাকে পদ্যে চিঠি লিখে আসছেন। পাগলের পাগলামি ভেবে গ্রাহ্য করিনি। তারপর কাগজে সত্যিই ভূতুড়ে কাকতাড়ুয়ার খবর

বেরোল। আজ সকালে হালদারমশাই আর তুমি গেলে। হালদারমশাইয়ের কাছে দণ্ডীবাবুর আসার খবর পেলুম। তখন নন্দলালবাবুর পদ্যগুলোকে গুরুত্ব দিতেই হল। উনি লিখেছিলেন :'

ভাঙা কেল্লাবাড়ি আমার ইদানীংকার আস্তানা।
মুখে দাড়ি দুজনকারই সেটাই চেনার রাস্তা না?

"অতএব পরস্পর চেনাচিনির অসুবিধে হয়নি।"

"শ্মশানে গিয়েছিলেন কেন?"

"হরিধ্বনি শুনেই নন্দবাবু আমাকে শ্মশানে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন দণ্ডীবাবুকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে। তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলুম। আমাকে দেখে পিশাচবাবা ভেবে লোকগুলো খাটিয়া ফেলে পালিয়ে গেল। তখনও ভাবিনি, তোমাকে ওরা ধরে এনেছে! তোমার কান্নাকাটি শুনে তবে বুঝলুম—"

"মোটেও কান্নাকাটি নয়" প্রতিবাদ করলুম। "আমি যে জ্যান্ত মানুষ, সেটাই জানাতে চাইছিলুম।"

হালদারমশাই প্রচণ্ডভাবে খি-খি-খি-খি করলেন এতক্ষণে। তারপর বললেন, "খাইছে আর কি!"

বললুম, "কিন্তু পিশাচবাবার ব্যাপার কী? ফান্টুও বলছিল, তাকে দেখেছে।"

কর্নেল বললেন, "কাটরার মাঠের নরমাংসভোজী পিশাচবাবার থান তোমাকে বলেছিলুম, মনে নেই? শুনলুম দণ্ডীবাবু আর চণ্ডীবাবু দুজনেরই দিকে নাকি তাঁর নজর।"

হালদারমশাই বললেন, "জিনিয়াস ছেলেটার হাতে ভূতের হুঁকো খাওয়ার কথা বললেন পোয়েটমশাই। বড়ই রহস্যজনক! কর্নেল স্যার কি কিছু ক্লু পেলেন?"

"কীসের?" কর্নেল আনমনে জবাব দিলেন। কারণ তিনি যেন কিছু শোনার চেষ্টা করছিলেন।

হালদারমশাই বললেন, "হুঁকোর।"

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন। সেই সময় শেয়ালের ডাক শোনা গেল। অমনি উঠে দাঁড়ালেন। "ইফ দ্য জ্যাক্‌ল হাউলস্/ সামথিং ইজ ফাউল" বলে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় দৌড়েই গেলেন বলা উচিত।

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "খাইছে! পোইদ্য। বুঝলেন না? পোইদ্য—পইট্রি! কর্নেলসাররে খাইছে!" ওই-কারের মতো একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরলেন গোয়েন্দাবর। তারপর গেরুয়া আলখাল্লার ভেতর থেকে নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন। শেয়ালটা থেমে গেল হঠাৎ। তার একটু পরে বন্দুকের গুলির শব্দ ভেসে এল দূর থেকে। পরপর দু'বার। হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। এখানে বসে থাকার মানে হয় না আর। চলুন জয়ন্তবাবু, কী ঘটছে দেখে আসি!" বলে আমাকে টেনে ওঠালেন।

সেই গড়খাই পেরিয়ে মাঠে পৌঁছানোর পর শ্মশানের দিক থেকে হরিধ্বনির শব্দ ভেসে এল। অমনি হালদারমশাই দম-আটকানো গলায় বললেন, "আবার কারে বাঁধল?"

বলে আচমকা টাট্টু ঘোড়ার মতো গমখেত ভেঙে উধাও হয়ে গেলেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর গা ছমছম করতে থাকল। জ্যোৎস্নার রাতে কাটরার মাঠে একা পড়ে গিয়ে এখন প্রতি মুহূর্তে ভয়, হুঁ—সেই নরমাংসভোজী পিশাচবাবারই! কে জানে, সামনে বা পেছনে কোনও গর্ত থেকে বা ঝোপঝাড় ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেই গেছি।

দণ্ডীবাবুর ফার্মটা কোন্‌দিকে ঠাহর করার চেষ্টা করলুম। বাঁ দিকে একটু দূরে বিদ্যুতের আলো জ্বলজ্বল করছে। ওইটেই হবে। মরিয়া হয়ে সেইদিকে নাক-বরাবর হাঁটতে থাকলুম।

পাঁচ

ফার্মহাউস এলাকা একেবারে সুনসান নিশুতি। বেগুনখেতে কালো হয়ে কাকতাড়ুয়াটি দাঁড়িয়ে আছে। মড়ার খুলি এমনিতেই দেখতে বিটকেল, তার ওপর সময়টা এরকম। শেয়ালের ডাক শুনে কর্নেলের দৌড় এবং শ্মশানের হরিধ্বনি শুনে ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের নিমেষে অন্তর্ধান, ওদিকে নরমাংসভোজী পিশাচবাবার ব্যাপারটাও কম সাঙ্ঘাতিক নয়। কাজেই কাকতাড়ুয়াটির দিকে এখন না তাকানো উচিত।

খোলা বারান্দায় ফান্টু দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিল, তাঁর হাতে দোনলা বন্দুক। সেই বন্দুকটাই হবে। কিন্তু ইনি তো দণ্ডীবাবু নন, তাঁর বিপরীত। নাদুস, নুদুস, বেঁটে। মুখের ভাব অমায়িক। প্রথমে ফান্টুই আমাকে দেখতে পেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, "রিপোর্টারদা, কোথায় গিয়েছিলেন হঠাৎ? আমি তো আপনার জন্য ভেবে-ভেবে সারা। শেষে বড়মামা খুঁজতে গেলেন আপনাকে।"

বেঁটে ভদ্রলোক একটু যেন চমকে গিয়েছিলেন। তারপর মিঠে হাসলেন। আসুন-আসুন! এতক্ষণ ফান্টু আপনার কথাই বলছিল। কাগজে ওর ছবি বেরোবে শুনে খুব ভাল লাগল।"

ফান্টু বলল, "আপনি পিশাচবাবার পাল্লায় পড়েননি তো রিপোর্টারদা!'

"নাঃ।" বলে বেতের চেয়ারে বসে পড়লুম। বেজায় ক্লান্ত। শুতে পেলে বাঁচি, এমন অবস্থা। শরীরের গিঁটে গিঁটে ব্যথা, যা বাঁধা বেঁধেছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা! মাথাও ঝিমঝিম করছে রহস্যের চোটে।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। "আমার নাম চণ্ডীচরণ খাঁড়া। তুলোদা আমার মাসতুতো দাদা। আর বলবেন না স্যার! ভুসির বস্তায় মড়ার খুলি ঢুকিয়ে দিয়েছিল কেউ। নেহাতই রসিকতা। কিন্তু তুলোদার আবার সবতাতে বড্ড বাড়াবাড়ি। বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়ার মাথায় সেটি বসিয়ে দিয়ে কেলেঙ্কারি বাধিয়েছেন। খবর পেয়ে ছুটে এলুম। হচ্ছেটা কী, হাতে নাতে দেখে তারপর ব্যবস্থা।"

ফান্টু বলল, 'তোমাকে দেখে কিন্তু আর নড়ছে না, দেখছ ছোটমামা!'

"নড়ুক না। তুলোদা'র চেয়ে আমার হাতের টিপ কেমন দেখিয়ে ছাড়ব!"

"কিন্তু বন্দুকে তো আর কার্টিজ নেই, ছোটমামা। বড়মামা দুটোই ফায়ার করে ফেলেছেন!"

চণ্ডীবাবু বন্দুক মোচড় দিয়ে খালি কার্তুজ দুটো বের করে দেখে ফেলে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "তুলোদার একটুতেই বাড়াবাড়ি।"

ফান্টুও খুব হাসতে লাগল। "উড়ো পদ্য পেয়ে শেয়াল-ধরা ফাঁদ খুঁজতে জামাকাপড় ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে বড়মামার। বের করে আনতে সে এক ঝামেলা! মেজাজ খাপ্পা হয়েই ছিল, আরও খাপ্পা করে দিল।"

"কে?"

"আবার কে? কাকতাড়ুয়া।"

"নড়াচড়া করছিল নাকি?"

"তুমি শুনলে কী এতক্ষণ? পর পর দুটো ফায়ার করেও বড়মামার রাগ পড়তে চায় না। মুকুন্দদা আর রমজানদা এসে অনেক করে বোঝাল। তারপর মাথা ঠাণ্ডা হল। তারপর এই রিপোর্টারদার কথা বললুম। তখন বড়মামা রিপোর্টারদাকে খুঁজতে বেরোলেন টর্চ নিয়ে।'

"হ্যাঁ রে ফান্টু, তুলোদা পিশাচবাবার পাল্লায় পড়েনি তো?"

ফান্টু একটু ভেবে বলল, "একটা কথা মাথায় আসছে ছোটমামা!"

"কী কথা বল্ তো?"

"বড়মামাকে পিশাচবাবা কিছু বলবে না। কেন জানো? আজ সন্ধে থেকে শ্মশানে তিনটে মড়া গেল।"

"গেল বটে। হরিধ্বনি দিচ্ছিল।"

"পিশাচবাবা এখন ওই তিনটে মড়া খেতেই ব্যস্ত। পেট ফুলে ঢোল হবে।"

'ঠিক বলেছিস।' বলে চণ্ডীবাবু আমার দিকে ঘুরলেন। "সওয়া দশটা বাজে প্রায়। স্যারকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। ফান্টু, ওঁর খাওয়ার ব্যবস্থা কর। তোদের নন্দী-ভৃঙ্গীর সাড়া নেই—দ্যাখ, গাঁজা টেনে পড়ে আছে নাকি?'

ফান্টু চলে গেল কিচেনের দিকে। চণ্ডীবাবু গুলিশূন্য বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে বললেন, "খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন স্যার। আমি তুলোদাকে খুঁজে নিয়ে আসি। মাঠে তুলকালাম করে বেড়াচ্ছে হয়তো!"

চণ্ডীবাবু চলে গেলেন গেটের দিকে। একটু পরে ফান্টু ফিরে এসে বলল, "রিপোর্টারদা, ওরা নেই। না মুকুন্দদা, না রমজানদা!" সে একটু রাগ করেছে বোঝা যাচ্ছিল। ফের বলল, "বড়মামা আসুন, এবার সব বলে দেব।"

"কী বলে দেবে ফান্টু!"

ফান্টু প্যাঁচার মতো মুখ করে বলল, "ওরা রোজ রাত্তিরে চুপিচুপি কোথায় যায়! আমাকে বলতে বারণ করছিল, তাই বলিনি মামাকে। এবার দেখছি বলতেই হবে।"

একটু অবাক হয়ে বললুম, "তা হলে ওরা সত্যি গাঁজা খেয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকে না বলছ?"

"হ্যাঁ!" বলে ফান্টু হাই তুলল। "চলুন রিপোর্টারদা, আমরা খেয়ে নিই।"

"তোমার মামারা ফিরে আসুন। একসঙ্গে খাব বরং।"

ফান্টু হঠাৎ হাসল। "তা হলে চলুন রিপোর্টারদা, প্রিন্স অ্যালবার্টকে দেখে আসি। একা যেতে ভয় করছে। আজ রাতে বড্ড বেশি শেয়াল ডাকছে। শেয়াল ডাকলেই বুঝতে পারি পিশাচবাবা বেরিয়েছে।"

ফার্মহাউসের পাশ দিয়ে একফালি পায়ে চলা রাস্তা। কয়েক পা এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। বললুম, "কী হল?"

ফান্টু বলল, "টর্চ? আমার টর্চটা বড়মামা নিয়ে গেছেন। আপনার কাছে টর্চ নেই?"

"ছিল," বলতে গিয়ে সামলে নিলুম। কারণ, তা হলে ওকে সব কথা খুলে বলতে হয়। বলার মুড নেই। তাই বললুম, "নেই।"

"নার্সারির ওখানে একটা চালাঘর আছে। আলোটা জ্বেলে দেব, চলুন। একটু দূরে অবশ্যি—তা হলেও দেখা যাবে।" বলে ফান্টু হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকল। ওর সঙ্গ ধরতে বারকতক পা হড়কে আছাড় খাওয়ার উপক্রম। তারপর সামনের দিকে গমখেত পড়ল। আঁকাবাঁকা আলপথে অনেকটা যাওয়ার পর ফান্টু বলল, "নার্সারির এরিয়ায় এসে গেছি রিপোর্টারদা! এই দেখুন, কতরকম ক্যাকটাস, পাতাবাহার আর ঝাউ লাগিয়েছি। ওইখানে গোলাপবাগান। পাঁচ রকমের গোলাপ আছে। প্রিন্স অ্যালবার্ট—"

ফান্টু থেমে গেল। খানিকটা দূরে হঠাৎ আলো জ্বলল। বিদ্যুতের আলো। সেই আলোয় দেখলুম, চণ্ডীবাবু একটা চালাঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে মুকুন্দ ও রমজানের সঙ্গে কথা বলছেন। ফান্টু খুব অবাক হয়ে বলল, "ছোটমামা ওখানে কী করছেন?"

সে দৌড়তে যাচ্ছিল, টেনে ধরে আটকে দিলুম। বললুম, "চুপ! বরং দু'জনে আড়ালে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিই, চলো!"

ফান্টুর মনে ধরল কথাটা। ঝাউ, ক্যাকটাস, পাতাবাহারের ঝোপঝাড়ের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে কাছাকাছি এক জায়গায় বসে পড়লুম। হাত-বিশেক দূরে চালাঘরটা, সবকিছুই দেখা ও শোনা যাচ্ছে। চণ্ডীবাবু দুটো ছোট্ট প্লাস্টিকের থলে পাঞ্জাবির দুই পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, "বন্দুকটা তুলোদার ঘরে রেখে দিয়ে যাও! আর এই নাও, পাঁচ টাকা করে বাড়িয়েই দিলুম।"

রমজান ও মুকুন্দ টাকাগুলো পকেটে ঢোকাল। তারপর মুকুন্দ ফিক করে হেসে বলল, "পিশাচবাবা এতক্ষণ দণ্ডী-স্যারের হাড় চুষছে। খুব রাগী লোকের হাড়ে টক-ঝালটা বড্ড বেশি থাকে।"

চণ্ডীবাবুও ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসলেন। রমজান বলল, "কাগজের বাবুটিকে আমার কেমন সন্দেহ হয়। বাবুমশাই।"

চণ্ডীবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ হে! শ্মশান থেকে দিব্যি ফেরত এল দেখে আমি তো তাজ্জব! পিশাচবাবা ওকে খেল না কেন? তা ছাড়া বাঁধন খুলে পালিয়ে এল কী করে?"

মুকুন্দ বলল, "আপনার লোকগুলো কোনও কম্মের নয়। বরাবর দেখে আসছি, সবতাতেই বড্ড তাড়াহুড়ো করে। কাকতাড়ুয়া নাচাতে গিয়ে গুলি খেয়ে রক্তারক্তি হল।"

"ধুস, রক্ত নয়, কুমকুমের ছোপ।" চণ্ডীবাবু মুখ বাঁকা করে বললেন। "ওদিন দোলপূর্ণিমা ছিল না! হোলির কুমকুম-পটকা। বেন্দাটা অতি চালাক। কে ওকে বলেছিল, কাকতাড়ুয়ার গলায় কুমকুম-পটকা বাঁধতে? জানা কথা, তুলোদা আগের রাত্তিরের মতো মুণ্ডু তাক করেই গুলি ছুঁড়বে। হাঁদারাম!"

মুকুন্দ ও রমজান বেজায় হাসতে লাগল। মুকুন্দ বলল, "তাই বলুন! পটকা ফেটে রঙবেরঙ!"

চণ্ডীবাবু বললেন, "রঙবেরঙ করতে গিয়ে আমাকেও বিপদে ফেলেছিল আর কি! তুলোদার তো হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি। কলকাতা থেকে গোয়েন্দা এনে—যাকগে, আলো নেবাও। আর শোনো, গোয়েন্দাবাবু তো পিশাচবাবার পেটে গেছে। কাগজের বাবুটিকেও ফের শ্মশানে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। বেন্দার দল তোমাদের হেল্প করবে।"

রমজান বলল, "এক কাজ করা যাক। কাগজবাবুর খাবারে আফিমের রস মিশিয়ে দিলেই, ব্যস, মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়বে। তখন ওকে চ্যাংদোলা করে শ্মশানে রেখে আসা যাবে।"

মুকুন্দ সায় দিয়ে বলল, "পিশাচবাবার শেষরাত্তিরে নিশ্চয় খিদে পাবে! তখন ওকে খাবে।"

কথাগুলো শুনে শিউরে উঠেছিলুম। ফান্টু আমাকে চিমটি কাটলে ফিসফিসিয়ে বললুম, "চুপ।"

আলো নিবে গেল। তারপর কাছেই কোথাও শেয়ালের ডাক শোনা গেল। চণ্ডীবাবু চালাঘর থেকে নেমে জ্যোৎস্নায় দাঁড়ালেন। বললেন, "ফার্মের জমি তুলোদা ফান্টুর নামে উইল করে রেখেছে। ফান্টু তো আমারও ভাগনে। আশা করি, বেগড়বাঁই করবে না।"

"মুকুন্দ বলল, না, না। ফান্টু তো জানেই না কীসের চাষ করছে! চণ্ডী-স্যার বীজ এনে দিতেই সয়েল টেস্ট করে কতরকমের সার দিয়ে ফুলে ফুলে ছয়লাপ করে দিয়েছে। মাথা আছে বটে!"

চণ্ডীবাবুর বন্দুক রমজানের কাঁধে। সে আর মুকুন্দ আমাদের দিকে, চণ্ডীবাবু উল্টোদিকে সবে কয়েক-পা হেঁটেছেন, অমনি কোথাও একটা অমানুষিক গর্জন শোনা গেল। কতকটা এইরকম, "খ্র্যাঁ-ও-ও! খ্র্যাঁ-ও-ও! খ্র্যাঁ-ও!"

তারপর চণ্ডীবাবুর সামনাসামনি ঝোপ ফুঁড়ে কালো একটা মূর্তি বেরোল। চণ্ডীবাবু টর্চ জ্বেলেই "বাবা রে" বলে আর্তনাদ করে উঠলেন। টর্চটা বোধ করি আতঙ্কের চোটে হাত থেকে পড়ে নিবে

গেল। কিন্তু ওই এক পলকের আলোয় দেখতে পেলুম দু'ঠেঙে কালো গরিলার মতো একটি প্রাণীকে। ভয়ঙ্কর মুখ থেকে সাদা দুটো কষদাঁত বেরিয়ে আছে। দু'হাতে বড়-বড় নখ।

ফান্টু আমাকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করল, "পিশাচবাবা। পিশাচবাবা!"

রমজান ও মুকুন্দের এক-গলায় আর্তনাদ শুনলুম। তারপর তারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়েই পালিয়ে গেল। চণ্ডীবাবু পালাতে যাচ্ছেন, সেই সময় চালাঘরের পেছন থেকে কেউ এসে তাঁকে জাপটে ধরল। জ্যোৎস্নায় আবছা যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ধস্তাধস্তি বেধেছে মনে হচ্ছে। তারপরেই, কী আশ্চর্য, কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম, "হালদারমশাই, চালাঘরের আলোটা জ্বেলে দিন! শিগ্‌গির।"

আলো জ্বলল।

কর্নেলকে দেখলুম, সবে ধরাশায়ী দশা থেকে উঠে দাড়াচ্ছেন। টুপিটা পড়ে গেছে। টাক ঝকমক করছে। চণ্ডীবাবু অদৃশ্য। হাত ফসকে পালিয়ে গেছেন বোঝা গেল।

পিশাচবাবা দাঁড়িয়ে আছে। আলখাল্লা ও জটাজুটধারী হালদারমশাই চালাঘর থেকে নেমে খি-খি-খি-খি করলে। পিশাচবাবার ভয়ঙ্কর মুখ থেকে মানুষের ভাষায় পদ্য বেরোল, সঙ্গে ফোঁস করে একটি দীর্ঘশ্বাস।

গঙ্গায় দিল দণ্ডী ঝম্প
চণ্ডীও দিল লম্বা লম্ফ।।

পদ্য শুনেই ফান্টু লাফিয়ে উঠল এবং 'মাস্টারমশাই' বলে চিক্কুর ছেড়ে দৌড়ে গেল।

আমিও গেলুম। ভয়ঙ্কর মুখোশ এবং কালো কাপড়ে তৈরি মনুষ্যাকৃতি খোলসের টিপ-বোতাম পুট পুট করে খুলে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন কবি নন্দলাল ভাণ্ডারী। সহাস্যে ফান্টুকে বললেন,

ওরে বাবা ফান্টুস
একটুকু চাই হুঁশ
বললেও ইঙ্গিতে
পারিসনি বুঝে নিতে
মামা এনে দিল বীজ
যত্ন করে চষেছিস
জানিস এইগুলো কী
ওপিয়াম পপি রে!

বলে পায়ের কাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে ফেললেন। ফান্টু বলল, এগুলো তো ফুল মাস্টারমশাই, পপিফুল!"

কবি ভাণ্ডারীমশাই চটে গেলেন।

এই দ্যাখো ছেলেটা
কী যে ভেলভেলেটা
বোঝালেও বোঝে ভুল
বলে কিনা পপিফুল!

ফান্টু অবাক হয়ে বলল, "তা হলে কী এগুলো?"

ভাণ্ডারীমশাই বললেন,—

শোন্ তবে আগাগোড়া
সব সাপ নয়, ঢোঁড়া

কোনওটার থাকে বিষ
এইবার বুঝেছিস
এই পপি ডেঞ্জারাস
আফিং এরই নির্যাস।”

ফান্টু একটু গুম হয়ে থাকার পর বলল, হুঁ, বুঝেছি। তাই মুকুন্দদা রমজানদা গাছগুলোর ডগা চিরে রাখত। রস বেরিয়ে আঠার মতো জমে থাকত আর ওরা চুপিচুপি রাত্তিরে এসে সেগুলো খুলে নিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরত। আমাকে বলত, মামাকে যেন না বলি। আমি অত কি জানি, বলুন তো!”

ভাণ্ডারীমশাই তাঁর পৈশাচিক ছদ্মবেশ গুটিয়ে পুঁটলি বানালেন এবং সেটি বগলদাবা করে বললেন,

ওরে সোনা গুড বয়
করে ফ্যাল ডেস্ট্রয়
বিলম্ব নয় বাপ
হাতে দেবে হ্যান্ডকাপ
আবগারি দারোগা
তব তেরা ক্যা হোগা
ব্রিং সাম গুড বিষ
আভি করে দে ফিনিশ।।

ফান্টু বলল, “এখনই বিষ স্প্রে করে দিচ্ছি। কর্নেল বললেন, আসুন নন্দবাবু, ফান্টু ওপিয়াম পপি জ্বালিয়ে দিক। আমরা ফার্মহাউসে গিয়ে দেখি, দণ্ডীবাবু সাঁতার কেটে ফিরতে পারলেন নাকি!”

ভাণ্ডারীমশাই হাই তুলে বললেন,

রাত নিঝুম
পাচ্ছে ঘুম
উঠছে হাই
ডেরায় যাই।।

তারপর সটান ঘুরে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। জ্যোৎস্নায় তাঁর ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে শেয়ালের ডাক শোনা গেল! সেদিকে। অদ্ভুত মানুষ!

হালদারমশাই ততক্ষণে চালাঘরে গিয়ে ছদ্মবেশ ছেড়েছেন এবং সেটি তিনিও পুঁটুলি বানিয়ে বগলদাবা করে বেরোলেন। প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো ছিল। বোঝা গেল, আলখাল্লার ভেতর প্যান্ট-শার্ট পরেই ছিলেন। অবশ্য পা-দুটো খালি। বললেন “কী কাণ্ড! পোইদ্যের লগে পিশাচ আর শৃগালের সম্পর্ক আছে শুনি নাই। এক্কেরে শৃগালের ডাক!”

বললুম, “উনি শেয়াল ডাকতে পারেন নাকি?”

“ওই তো ডাকছেন! শুনছেন না?”

কর্নেল বললেন, “আমার টর্চটা খুঁজে বের করতে হবে। দণ্ডীবাবুর বন্দুকটাও।”

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ফান্টু এসে পড়ল। হাতে স্প্রে। হাসতে-হাসতে বলল, “ওদিকে এক কাণ্ড। বড়মামা এসে গেছেন। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। বললেন, গঙ্গাস্নান করে এলুম। আমি তো জানি, পিশাচবাবার ভয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন! বলতে গেলে রেগে যাবেন। তাই সে-কথা

বললুম না। তবে পপিফুলের ব্যাপারটা আর যা-যা হয়েছে এখানে, সব বলেছি। শুনে মামা হতভম্ব।”

বললুম, “তোমার মামা জানেন না এগুলো আফিংগাছ!”

ফান্টু বলল, “না। বড়মামাকে তো চণ্ডীমামা—মানে, ছোটমামা ফুলের বীজ বলে কোত্থেকে এনে দিয়েছিলেন! বড়মামা আপনাদের জন্য ওয়েট করছেন। শিগ্‌গির যান। মামার অবস্থা শোচনীয়। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকলে কী হবে? রাত্তিরে গঙ্গার জল যা ঠাণ্ডা!”

কর্নেল টর্চ খুঁজে পেলেন। তারপর বন্দুকটাও পাওয়া গেল। হালদারমশাই বন্দুক কাঁধে এবং পুঁটুলি বগলদাবা করে মার্চের ভঙ্গিতে পা বাড়ালেন। কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,

কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা
বেগুনভাজা আর পরোটা
কিংবা লুচি অর্ধডজন
ইচ্ছে হয় করি ভোজন
দিচ্ছে কেডা
রাত বারোটায়

হালদারমশাই খি-খি সহযোগে বললেন, “খাইছে! পোইদ্যে পাইছে!”

বললুম, “আপনাকেও, হালদারমশাই! পদ্যে পেয়েছে। সাবধান!”

হালদারমশাই সম্ভবত সাবধানতাবশেই চুপ করে গেলেন। পদ্যের সঙ্গে পিশাচ ও শেয়ালের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন উনি। পিশাচ যদি বা সাজতে পারেন, শেয়ালের ডাক ডাকতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে!

ছয়

দণ্ডীবাবু ঘরের ভেতর তক্তপোশের বিছানায় সত্যিই কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। আমাদের দেখে করুণ মুখে বললেন, “আসুন, আসুন! ফান্টুর মুখে সব শুনলুম। শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। ওই চণ্ডী—পাষণ্ড ষণ্ড, ভণ্ড আমার মাসতুতো ভাই! আমাকে ফাঁসাবার কী ষড়যন্ত্র করেছিল, দেখুন! তারপর লোকে বলত, চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই! উঃ কী সাঙ্ঘাতিক ঘটনা!”

দেখলুম, বারান্দার বেতের চেয়ারগুলো ঘরে ঢোকানো হয়েছে এবং তা আমাদেরই খাতির করে বসতে দেওয়ার জন্যে তো বটেই! আমরা বসলুম। হালদারমশাই বললেন, “দণ্ডীবাবু, কর্নেল স্যারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই! ইনি—”

কথা কেড়ে দণ্ডীবাবু বললেন, “কী আশ্চর্য, শ্মশানে ইনিই আমার বাঁধন খুলে দিলেন মনে পড়ছে—হুঁ, দাড়ি দেখেই চিনতে পারছি। নমস্কার স্যার, নমস্কার! বুঝতেই পারছেন, ওই অবস্থায় শত্রু-মিত্র চেনা কঠিন। আমি ভাবলুম, পিশাচবাবার চেলা-টেলা হবে। পিশাচ বাবার খাওয়াদাওয়ার সুবিধে করে দিচ্ছে।” বলে সেই অদ্ভুত ‘ফ্যাঁচ’ শব্দটি বের করলেন মুখ থেকে। অর্থাৎ দুর্লভ হাসিটি হাসলেন।

হালদারমশাই বললেন, “ইনি স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আমার গুরুদেব কইতে পারেন এনারে। ইনি না আইয়া পড়লে কী যে হইত, কওন যায় না।”

আবেগে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “অমন করে জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত হয়নি দণ্ডীবাবু! আপনি বিচক্ষণ মানুষ। ভাল করে তাকিয়ে দেখবেন তো?”

দণ্ডীবাবু বললেন, "ওই যে বললুম, শত্রু-মিত্র চেনার অবস্থা ছিল না। গেলুম জয়ন্তবাবুকে খুঁজতে, আর আচমকা কারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিছমোড়া করে বাঁধল। তারপর চ্যাংদোলা করে তুলে হরি বোল বলতে-বলতে শ্মশানে ফেলে পালিয়ে গেল। এদিকে ইদানীং পিশাচবাবার গল্পটা প্রচণ্ড রটেছিল। আপনি আমার বাঁধন খুলছেন, তখন সাক্ষাৎ পিশাচবাবা এসে আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আচে। হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে হুঙ্কারও দিচ্ছে। ওই অবস্থায় জলে ঝাঁপ না দিয়ে উপায় কী, বলুন স্যার?"

কর্নেল বললেন, "যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। আমার কিছু প্রশ্ন আছে, দণ্ডীবাবু।'

"বলুন, বলুন!"

"আপনার ফার্মে পপিফুলের খেতটা যে আসলে ওপিয়াম পপির খেত সেটা কি আপনি জানতেন না?"

"বিশ্বাস করুন। ওপিয়াম কী থেকে হয়, আমি জানতুম না। একটু আগে ফান্টু সব বলে গেল। আমি জানতুম ফুল, তো ফুল! পপিফুল! ফান্টুর ফুলের বড্ড শখ। চণ্ডী যে সেই সুযোগ নেবে, কে জানত! গত অক্টোবরে চণ্ডী নিজের হাতে একটা বীজের প্যাকেট দিয়ে গেল। বলল, "ফান্টুকে দিও। এগুলো পপিফুলের বীজ। দারুণ ফুল ফুটবে। গন্ধে মউমউ করবে। বদমাস! জোচ্চোর! পরের হাতে হুঁকো খাওয়ার ফন্দিটা কেমন দেখুন?"

"ইদানীং আপনি ফার্মে এসে রাত্রিবাস করছিলেন কেন, দণ্ডীবাবু?"

দণ্ডীবাবু একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে শ্বাস ফেলে বললেন, "সারাটা দিন আড়তে কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকি। বড্ড একঘেয়ে লাগে। ছেলেমেয়েও নেই বাড়িতে, শুধু গিন্নি আর আমি। তাই অনাথ ভাগনেটাকে এনে রেখেছিলুম। সে থাকে ফার্মে। ছেলেমানুষ তো! রাতবিরেতে কী হয়, যা অবস্থা আজকাল! এও একটা কথা। তবে আরেকটা কথা হল, খটকা।"

"কীসের খটকা?"

ফান্টু বলেছিল, চণ্ডী আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে ফার্মে আসে। বুঝুন ব্যাপারটা। কোথায় ঔরঙ্গাবাদ, আর কোথায় কাটরার মাঠ! চণ্ডী আসে, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করে যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, সন্ধ্যাবেলায় কেন? ফান্টুটার এগ্রিকালচারে মাথা আছে। আর সব ব্যাপারে আস্ত বোকা। এদিকে চণ্ডী লোক ভাল নয়। কাজেই খটকা লেগেছিল। সন্ধ্যার আগেই ফার্মে এতে রাত কাটাতে শুরু করলুম। ব্যস! কাকতাড়ুয়া নাচিয়ে আমাকে ভয় দেখানোর খেলা আরম্ভ হল।"

ফান্টু এসে গেল। বড় করে হেসে বলল, "জ্বালিয়ে দিয়েছি মামা। ফিনিশ!"

চণ্ডীবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "গেস্টদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ফান্টু! অনেক রাত হয়ে গেছে।"

ফান্টু বলল, "মুকুন্দদা রান্না করে রেখেছে মামা!"

চণ্ডীবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "চোর! চোর! চোরদের রান্না গেস্টদের খাওয়াব কী রে হাঁদারাম! তা ছাড়া তুই তো বললি, খাবারে আফিমের রস মিশিয়ে দেবার চক্রান্ত করছিল। কাল সকালে সব খাবার শ্মশানে ফেলে দিয়ে আসব। মড়াখেকো শেয়াল-কুকুরের পেটে যাক। তুই এক কাজ কর বরং। বেগুনখেতে যা। বেগুন নিয়ে আয়। আমি ময়দা ছেনে পরোটা বানাচ্ছি। লুচি করতে হলে রাত পুইয়ে যাবে। তার চেয়ে পরোটা ইজ ইজি। কী বলেন স্যার? কর্নেল সায় দিলেন। হালদারমশাই উৎসাহে দাঁড়ালেন। তারপর "চলুন, আমিও হাত লাগাই" বলে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় বাইরে কাছেই শেয়াল ডেকে উঠল, "হেয়ো হোয়া হোয়া!"

একটু থমকে দাঁড়ালেন চণ্ডীবাবু ও হালদারমশাই। তারপর বেপরোয়া ভঙ্গিতে কিচেনে গিয়ে

ঢুকলেন। বললুম, "কর্নেল, আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ হল তাহলে! রাত বারোটায় পরোটা আর বেগুনভাজা। খাসা। কিন্তু শেয়ালের ডাক শুনে মনে হচ্ছে আরেকজন গেস্ট আসছেন হয়তো!"

তারপরই হঠাৎ বাইরে ফান্টুর চিৎকার শোনা গেল। "মামা মামা!"

সব্বাই বেরিয়ে গেলাম। দণ্ডীবাবু হাঁক দিলেন,—কী হয়েছে রে?

বেগুনখেতের দিকে হাত তুলে আবার বলল, "কাকতাড়ুয়াটা আবার নাচছে—ওই দ্যাখো।"

চমকে উঠতেই হল। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কাকতাড়ুয়া দু'হাত ছড়িয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। দণ্ডীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বন্দুক! বন্দুক! বন্দুক নিয়ে আয় ফান্টু!"

অমনি কাকতাড়ুয়া পদ্যে বলে উঠল :

বেগুনখেতে কাকতাড়ুয়া
নিশুত রেতে নাচ করে
ডাকে শেয়াল কেয়া হুয়া
ভূরিভোজন আঁচ করে
দণ্ডীভায়া এ কী বিচার
করবে গুলি বন্দুকে
উপকারী বন্ধুকে?

দণ্ডীবাবু সহাস্যে বললেন, "ভাণ্ডারীভায়া নাকি? আরে, এসো, এসো! সুস্বাগতম! তবে এ কেমন আসা হে? বেগুনখেতে বড্ড কাঁটা। জামাকাপড় আটকে ফর্দাফাই হয়ে যাবে যে!"

কবি নন্দলাল ভাণ্ডারী কাকতাড়ুয়াটির আড়াল থেকে বেরোলেন।

না, বেরোলেন বলা ভুল হচ্ছে। দেখা দিলেন। তারপরই আর্তনাদ করলেন,

"ওরে ওরে ফান্টা
সত্যিই কাঁটা রে
আগে কে জানত
শেয়ালের ফাঁদ তো
হয় এইরকমই
কণ্টকে জখমই
আঃ উঃ বাবা রে
বাঁচা রে বাঁচা রে

ফান্টু কাটারি এনে উদ্ধার করতে গেল তাঁকে। হালদারমশাই ক্রমাগত খি-খি-খি-খি করছিলেন। শেষে বললেন, "কী কাণ্ড! বাইগনখ্যাতখান এক্কেরে লণ্ডভণ্ড!"

বললুম, "সাবধান হালদারমশাই! আবার আপনাকে পদ্যে পেয়েছে।"

অমনি হালদারমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, "না, না। কথার কথা!"...

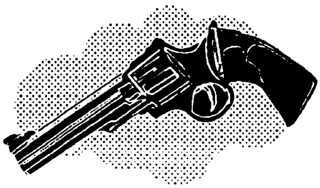

রাজবাড়ির চিত্ররহস্য

প্রাইভেট ডিকেটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন,—খাইসে!

জিগ্যেস করলুন,—কী হল হালদারমশাই?

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে নোংরা রুমালে নাক মুছলেন। তারপর বললেন,—জয়ন্তবাবুরে একখান কথা জিগাই।

—বলুন হালদারমশাই।

গোয়েন্দাপ্রবর বাঁকা হেসে বললেন,—আপনাগো কাগজে আইজ দুইখান মার্ডারের খবর লিখসে।

—তাতে কী হয়েছে? কোথাও মার্ডার হয়েছে, তাই খবর লেখা হয়েছে।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—একখান মার্ডার তেমন কিসু না। ভিক্‌টিম চায়ের দোকানে বইসা চা খাইত্যাছিল, কারা তারে বোম মারসে। কিন্তু আর একখান মার্ডার হইসে এক্কেরে ঘরের মধ্যে। ভিক্‌টিমের মাথায় গুলি করসে খুনি। ভিক্‌টিম তখন দরজার কাছাকাছি মেঝের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়সে। কিন্তু তার ডাইন হাতের মুঠায় একগোছা কাঁচাপাকা চুল।

এবার একটু কৌতূহলি হয়ে বললুম—তা হলে বোঝা যাচ্ছে ভিক্‌টিম খুনির মাথার চুল উপড়ে নিয়েছে।

হালদারমশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন,—প্রথম কথা, দরজা বন্ধ ছিল। পুলিশ দরজা ভাইঙা ওই অবস্থায় ভিক্‌টিমরে দেখসে। কিন্তু এমন একখান হেভি মিস্ট্রির খবর আপনাগো কাগজে এইটুকখান কইরা ছাপসে। ওদিক প্রথমে যে মার্ডারের কথা কইলাম, সেইখবর ছাপসে বড় কইরা প্রথম পাতায়। ক্যান?

আমি আমাদের কাগজ মন দিয়ে পড়ি না। তা ছাড়া কাল শনিবার আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসেও যাইনি। হালদারমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললাম,—এমন হতে পারে প্রথম পাতার ভিক্‌টিম একজন ভি.আই.পি। আর দ্বিতীয় খবরটা হয়তো দেরিতে পাওয়া গিয়েছিল। তখন কাগজে যেটুকু জায়গা ছিল, খবরটা কাটছাঁট করে কোনওরকমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন নাইট এডিটর।

হালদারমশাই তেমনই উত্তেজিতভাবে বললেন,—নাইট এডিটর ঠিক করেন নাই। অমন হেভি মিস্ট্রি! ভিক্‌টিমের হাতের মুঠোয় খুনির চুল! তারপর আরও হেভি মিস্ট্রি, দরজা যখন বন্ধ ছিল তখন খুনি পলাইল কোন পথে?

কর্নেল তাঁর টাইপরাইটারে সম্ভবত প্রজাপতি, অর্কিড বা দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির পাখি নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলেন। এতক্ষণে তাঁর কাজ শেষ হল। তারপর টাইপ করা কাগজগুলো গুছিয়ে ভাঁজ করে টেবিলের ড্রয়ারে রাখলেন। এবং বললেন,—হালদারমশাই, খবরটা ছোট করে লেখা হলেও আপনি কয়েকটা পয়েন্ট মিস করেছেন।

—মিস করসি? কী মিস করসি কন তো কর্নেল স্যার।

কর্নেল টাইপরাইটারের কাছ থেকে উঠে এসে আমাদের কাছাকাছি তাঁর ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর চুরুট ধরিয়ে বললেন,—একটা লাইন আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। দরজার ল্যাচ-কি ছিল। তার মানে কেউ ঘরের ভেতর থেকে ল্যাচ-কি তে চাপ দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে

পারে, কিন্তু সে বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে বাইরে থেকে আর খোলা যায় না। আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার দরজা কী আপনি লক্ষ করেননি?

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—হঃ! আপনি ঠিক কইসেন।

বলে তিনি আবার সেই অংশটা পড়ার জন্য কাগজটা তুলে নিলেন। তারপর যথারীতি বিড়বিড় করে পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ হলে তিনি বললেন,—আর কী মিস করসি বুঝলাম না।

কর্নেল বললেন,—ভিক্‌টিমের মুঠোয় ধরা কাঁচাপাকা চুলের গোছা উল্লেখ করে খবরে লেখা হয়েছে, চুলগুলো পুলিশ সহজেই টেনে বের করে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছে।

হালদারমশাই বললেন,—ওই লাইনটা আমি মিস করি নাই কর্নেল স্যার! ওই চুল তো ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানোই লাগবো।

কর্নেল হাসলেন,—হালদারমশাই কোনও মৃত মানুষের হাতের মুঠিতে আটকে থাকা কোনও জিনিস সহজে খুলে নেওয়া যায় না। আপনি তো একসময় পুলিশের চাকরি করেছেন, ওই সহজ কথাটা আপনার চোখ এড়িয়ে গেল কী করে?

অমনি হালদারমশাই নড়ে সিধে হয়ে বসলেন। তারপর কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—হঃ, আমারই ভুল।

এবার আমি জিগ্যেস করলুম,—কর্নেল, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন খুনিই ওই চুলগুলো ইচ্ছে করে পুলিশকে মিস গাইড করার জন্য হাতে গুঁজে দিয়েছিল। তাই কি?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—এজন্যই তোমাকে বলি জয়ন্ত, তুমি বোঝো সবই, তবে দেরিতে।

এবার আমি খবরটা পড়ার জন্য হালদারমশাইয়ের কাছ থেকে কাগজটা নিলুম। হেডিংটা ছোট্ট 'কেষ্ট মিস্ত্রি লেনে রহস্যময় খুন'। খবরটা এক লাইন পড়েই বুঝতে পারলুম, ওটা আমাদের নতুন ক্রাইম রিপোর্টার দীপকেরই লেখা।

সবে দুটো লাইন পড়েছি, এমনসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল অভ্যাসমতো হাঁক দিলেন, —ষষ্ঠী!

হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—এবার দ্যাখেন কে আসে!

কথাটা শুনে বুঝতে পারলুম বরাবর যেমন হয়, কর্নেলের এই জাদুঘরসদৃশ ড্রইংরুমে যখনই আমরা কোনও রহস্যময় ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি, তখনই সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেউ-না-কেউ এসে পড়েন।

কিন্তু আমাদের নিরাশ করে ঘরে ঢুকলেন বেঁটে বলিষ্ঠ গড়নের এক ভদ্রলোক। তাঁর পরনে সাদা-সিধে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে একটা বাদামি রঙের ব্রিফকেস। তিনি ঘরে ঢুকে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—কর্নেলসাহেব কি আমাকে চিনতে পারছেন?

কর্নেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছিলেন। বললেন,—আমি যদি ভুল না করি তাহলে আপনি যদুগড়ের মধুরবাবু।

ভদ্রলোক সোফায় বসে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—আপনার স্মৃতিশক্তির ওপর আমার বিশ্বাস এখনও আছে। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমি যদুগড়ের রাজবাড়ির কেয়ারটেকার হতভাগ্য মধুরকৃষ্ণ মুখুজ্যেই বটে।

লক্ষ করলুম কর্নেলের চোখে যেন বিস্ময় ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন,—আমি আপনাকে চিনেছি বটে, কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যে আপনার চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। যদুগড়ের কুমারবাহাদুর রুদ্রনারায়ণ রায় আপনাকে 'বাবুর বাবু' বলে পরিহাস করতেন, কারণ আমিও দেখেছি আপনার পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ বিলাসিতা ছিল। আপনার চেহারাতেও প্রাণবন্ত ভাব ছিল। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন দীর্ঘকাল রোগে ভুগেছেন।

মধুরবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—আমার জীবনে এই তিনবছরে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। আমি যদুগড় ছেড়ে এসেছি তিন বছর আগে। কলকাতায় এক বিধবা দিদির কাছে বাস করছি। দিদির একটি মাত্র ছেলে। সে থাকে বোম্বেতে। যাই হোক, যেজন্যে আজ হঠাৎ আপনার কাছে এসে হাজির হয়েছি, তা বলি।

বলে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই, জয়ন্ত চৌধুরি, দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার বিখ্যাত সাংবাদিক, আর উনি প্রাইভেট ডেটেকটিভ মিস্টার কে. কে. হালদার। তবে আমরা ওঁকে হালদারমশাই বলি।

মধুরবাবু এবং আমাদের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হল। তারপর তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন,—আমার কথাগুলো গোপনীয়।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—যত গোপনীয়ই হোক, আপনি এদের সামনে স্বচ্ছন্দে খুলে বলতে পারেন। কারণ এরা দুজনেই আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তবে আগে কফি খান। কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে। বলে কর্নেল হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী, কফি কোথায়?

ঠিক সেই মুহূর্তেই কফির-ট্রে হাতে নিয়ে ষষ্ঠী ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ট্রে সেন্টার-টেবিলে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল। আমি জানি কর্নেলের ঘরে নতুন কেউ এলেই ষষ্ঠী দ্রুত কফি তৈরি করে ফেলে।

মধুরবাবুকে কর্নেল এক পেয়ালা কফি তুলে দিলেন। তারপর নিজে এক পেয়ালা কফি তুলে নিয়ে বললেন,—মধুরবাবু, কুমারবাহাদুরের কোনও খবর রাখেন?

মধুরবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—না। তবে কুমারবাহাদুরের মেয়ে বল্লরীকে আমি আমার দুঃখ জানিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলুম। বল্লরীকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলুম। সে আমাকে আগের মতোই আপনজন ভেবে চিঠির উত্তর দিয়েছিল। তার বাবা নাকি এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই প্রায়ই আমার কথা বলেন। বল্লরী রাগ করে বাবাকে আমার ঠিকানা দেয়নি। লিখেছিল,—কাকাবাবু আপনি এখানে ফিরে আসুন।

কফি শেষ করে মধুরবাবু বললেন,—এবার তা হলে ব্যাপারটা বলি।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজিয়ে বললেন,—হাঁ বলুন।

মধুরবাবু আবার একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন,—ঘটনাটা ভারি অদ্ভুত। গত পরশু, শুক্রবার বিকেলে অভ্যাস মতো আমি গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম। গঙ্গাদর্শনে আমার মন শান্ত হয়। তো আউটরাম ঘাটের দিকে একটা খালি বেঞ্চে বসে গঙ্গাদর্শন করছিলুম। রবিবার ছাড়া অন্যদিন গঙ্গার ধারে লোকজন কমই থাকে। কিছুক্ষণ পরে প্যান্টশার্ট পরা এক ভদ্রলোক বেঞ্চের অন্য কোণে এসে বসলেন। তাঁকে একবার দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিলুম। এর কোনও কারণ ছিল তা নয়। বেড়াতে গিয়ে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। যদি দৈবাৎ ভদ্রলোক যেচে পড়ে কথা শুরু করেন সেই ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। ভদ্রলোকের মুখে একরাশ কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ, মাথায় তেমনই এলোমেলো একরাশ কাঁচাপাক চুল। প্যান্ট-শার্ট-জুতো অবশ্য বেশ পরিচ্ছন্ন। একটু পরে চোখের কোনা দিয়ে দেখলুম তিনি ব্রিফকেসের ওপর একটা কাগজ রেখে কিছু লিখছেন। লেখা শেষ হলে কাগজটা তিনি ভাঁজ করলেন। তারপর গঙ্গার দিকে আপন মনে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে সূর্য লাল হয়ে যখন অস্ত যাচ্ছে তখন লক্ষ করলুম তিনি ডানদিকে ঘুরে কী যেন দেখলেন। তারপর আমাকে ভীষণ অবাক করে বললেন,—কিছু যদি মনে না করেন একটা অনুরোধ করব। আমি বললুম,—অনুরোধের কী আছে, বলুন। তিনি বললেন,—প্লিজ, আমার এই ব্রিফকেসটা আপনার কাছে রাখুন। আর এই চিঠিটা পড়ে দেখুন। কথাটা বলেই তিনি ব্রিফকেসটা একরকম জোর করেই আমার দুই উরুর ওপর রেখে সেই ভাঁজকরা কাগজটা আমার বুক পকেটে

গুঁজে দিলেন। তারপর সবেগে পিছনের রেললাইন ডিঙিয়ে তিনি গাছপালার আড়ালে উধাও হয়ে গেলেন। আমি তো ভীষণ হতবাক হয়ে গেছি! তারপর পকেট থেকে সেই ভাঁজ করা কাগজটা খুলে পড়তে-পড়তে আমার বোধবুদ্ধি গুলিয়ে গেল। কাগজটা আপনাকে দেখাচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—আপনার হাতে যে ব্রিফকেসটা দেখছি, ওটা নিশ্চয়ই সেই ভদ্রলোকের ব্রিফকেস।

—ঠিক ধরেছেন। এটা আমার হাতে মানায় না। বেশ দামি ব্রিফকেস। বলে তিনি বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল ভাঁজ খুলতে-খুলতে জিগ্যেস করলেন,—একটা কথা। ওই ব্রিফকেসটা কি আপনি খুলেছিলেন, বা খোলার চেষ্টা করেছিলেন?

মধুরবাবু বললেন,—আজ্ঞে না কর্নেলসাহেব। আপনি তো আমাকে ভালোই জানেন। আমি কী প্রকৃতির মানুষ। হ্যাঁ, বলতে পারেন, মানুষের স্বভাব বদলায়, কিন্তু আমি বদলাইনি। তা ছাড়া আমার একটা ভয়ই পিছু ছাড়ছে না। যদি ব্রিফকেসটা খুলতে গেলেই কোনও সাংঘাতিক বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আপনি তো জানেন আজকাল সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গিরা এভাবে বিস্ফোরণ ঘটায়।

হালদারমশাই কান খাড়া করে কথা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন,—হঃ, ঠিক কইসেন। ওটার মধ্যে সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ কিছু থাকতেও পারে। আর একটা কথা কই আমি। চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করসি। তাই আমার সন্দেহ হইত্যাসে সেই ভদ্রলোক আপনার কোনও শত্রুর চর হইতেও পারে। কী কন কর্নেল স্যার!

কর্নেল কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ে মধুরবাবুর দিকে তাকালেন,—এটা একটা চিঠি। দেখা যাচ্ছে সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ 'বারিন' বলে যিনি স্বাক্ষর করেছেন, তাঁকে কি আপনি একটুও চিনতে পারেননি?

—নাঃ এটাই আমার দুর্ভাগ্য। বারিনের সঙ্গে আমার শেষ দেখা বছর দশেক আগে। সে যদুগড়ে তার ব্যবসার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দৈবাৎ রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হয়। তখন তার মুখে দাড়ি ছিল না। তাছাড়া গায়ের রং ছিল খুব ফরসা। দশ বছর পরে সে মুখে একরাশ গোঁফদাঁড়ি নিয়ে আমার পাশে বসলে আমার পক্ষে তাকে চেনা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

কর্নেল বললেন,—দ্যাখা যাচ্ছে সে আপনাকে চিনতে পেরেই আপনার কাছে এসে বসেছিল। বরং আমার অনুমান, তার কোনও শত্রু ওই সময়েই গঙ্গার ধারে তাকে ফলো করে আসছিল। তা ছাড়া চিঠি পড়ে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, সেই শত্রুর লক্ষ ছিল তাকে খুন করে ব্রিফকেসটা হাতানো। যাই হোক, চিঠির কথা পরে। এবার আপনি বলুন, তার অনুরোধমতো আপনি কী কাল সকালে তাঁর ঠিকানায় ব্রিফকেসটা পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলুম আর শুনলুম—

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন,—বারিনবাবু তাঁর ঘরে খুন হয়েছেন, তাই না?

মধুরবাবু দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। আত্মসম্বরণ করার পর তিনি ধরা গলায় বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি কেষ্ট মিস্ত্রি লেনে গিয়ে দেখি, একটা দোতলা বাড়ির সামনে পুলিশের কয়েকটা গাড়ি আর বাড়ির ভেতরে-বাইরে পুলিশ গিজ-গিজ করছে। আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন আগেই, কিন্তু কী ঘটেছে তা জানার জন্য একজন পান-সিগারেট বিক্রেতার কাছে একটা সিগারেট কিনলুম। তারপর তাকে জিগ্যেস করলুম, এখানে এত পুলিশ কেন দাদা? লোকটা বলল, ওই বাড়ির দোতলায় এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁকে কে বা কারা গতরাত্তিরে কখন খুন করে গেছে। সকালে একটা হোটেল থেকে ওর জন্যে ব্রেকফাস্ট নিয়ে গিয়েছিল একটা লোক। সে দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি করে। কিন্তু সাড়া পায়নি। তারপর হঠাৎ তার চোখে পড়ে দরজার বাইরে চাপ-চাপ খানিকটা রক্তের ছোপ। অমনি সে হোটেলে খবর দেয়। তারপর পাড়ার লোকেরা জড়ো হয়, পুলিশ ডাকে।

মধুরবাবু দম নিয়ে বললেন,—কথাগুলি শোনামাত্র আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলুম। তারপর আমার দিদি নিরুপমাকে সব কথা খুলে বলেছিলুম। সে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমাকে পুলিশের কাছে যেতে বারণ করেছিল। তার মতে পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করবে না, উলটে আমাকেই হয়তো খুনি সাব্যস্ত করবে। তার চেয়েও বড় কথা, ব্রিফকেসে যদি চোরাই মাল থাকে? দিদির কথা শুনে আমি আর থানায় যাইনি। তারপর গত রাতে নানাকথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায় আপনার কথা। আপনার নেমকার্ডটা আমি খুঁজে পাইনি। তাছাড়া দিদির বাড়িতে টেলিফোনও নেই। তাই সকাল হলে সোজা আপনার বাড়ি চলে এলুম। আপনার এ-বাড়িতে আমি একবার কুমারবাহাদুরের চিঠি নিয়ে এসেছিলুম, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তবে আপাতত একটা কাজ জরুরি বলে মনে হচ্ছে। কাজটা হল এই ব্রিফকেসটা খুলে ফেলা। চিন্তার কারণ নেই আমার কাছে মেটাল বা এক্সপ্লোসিভ ডিটেকটর যন্ত্র আছে।

বলে কর্নেল উঠে গেলেন। আমরা হতবাক হয়ে বসে রইলুম।

দুই

লক্ষ করছিলুম হালদারমশাইয়ের চোখদুটি যথারীতি গুলি-গুলি হয়ে উঠেছে এবং গোঁফের দুই সুচাল ডগা তিরতির করে কাঁপছে। তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—আমার বিশ্বাস ব্রিফকেসটার ভেতরে টাকাকড়ি কিংবা সোনাদানা আছে।

আমি কিছু বলার আগেই কর্নেল এসে ব্রিফকেসটার ওপর একটা ছোট্ট ডিটেকটর ছোঁয়ালেন। কোনও শব্দ শোনা গেল না। মধুরবাবুকেও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন,—মেসিনটা দিয়ে কী বুঝলেন কর্নেলসাহেব?

কর্নেল দ্বিতীয় ডিটেকটরটা ব্রিফকেসের ওপর ছোঁয়াতে-ছোঁয়াতে হাসিমুখে বললেন, —আমাদের নিরাশ করল ব্রিফকেসটা। এতে বিস্ফোরকও নেই, আবার কোনো অস্ত্রশস্ত্রও নেই।

গোয়েন্দপ্রবর বলে উঠলেন,—তা হলে আমি যা কইসিলাম জয়ন্তবাবুরে, তাই-ই সইত্য।

বললুম,—হ্যাঁ, টাকাকড়ি সোনাদানা থাকতেও পারে। তবে সে সব থাকলে বারিনবাবু কি তাঁর পুরোনো বন্ধুর হাতে বিশ্বাস করে রেখে যেতে পারতেন কি না, সেটা মধুরবাবুই বলতে পারবেন।

মধুরবাবু বললেন,—বারিন চিঠিতে লিখেছে ইচ্ছে হলে আমি তালা ভেঙে ব্রিফকেস খুলে দেখতে পারি কী আছে। কারণ সে জানে আমি তার কোনও জিনিস হাত দেব না, বা তালাও ভাঙব না।

কর্নেল বললেন,—তা হলে কী করা যায় আপনিই বলুন মধুরবাবু?

—আজ্ঞে? আমি কী বলব? আপনি যদি ওটার তালা ভেঙে ভেতরে কী আছে দেখতে চান, আমার তাতে আপত্তি নেই। বরং জয়ন্তবাবু আর হালদারমশাই দুজন সাক্ষী থাকবেন।

কর্নেল হালদারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হেসে বললেন,—হালদারমশাই, আপনি কী বলেন?

হালদারমশাই এবার গম্ভীরমুখে বললেন,—আমি কী আর কমু, ব্রিফকেসের মালিক তো খুন হইয়া গেসেন। কাজেই এটা একটা মার্ডার কেস। তাই আমার মতে ওটা না ভাইঙা ও.সি. হোমিসাইডেরে খবর দিলে ভালো হয়।

মধুরবাবু হাত তুলে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বললেন,—না-না, ওকাজ করলে আমি মারা পড়ে যাব। পুলিশ আমাকে ছাড়বে না।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তা ঠিক। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করি। আপনি তো আমার কাছে এসেছেন। পুলিশের কাছে গেলে ঝামেলা হবে বলেই এসেছেন—তাই না?

মধুরবাবু ব্যস্তভাবে বললেন,—হ্যাঁ, কর্নেলসাহেব।

—তা হলে এটার ভেতর কী আছে তা জানতে আমাদের যেমন আগ্রহ, আপনারও তাই।

মধুরবাবু বললেন,—হ্যাঁ। বারিনের কাজকর্মের খবর বহুকাল আমি জানি না। আমার ধারণা ব্রিফকেসটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা সে শত্রুপক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েই আমাকে দিয়ে কেটে পড়েছিল। কাজেই আপনি যদি তালা ভেঙে ভেতরের জিনিস দেখে নেন, তাহলে বারিনকে খুনের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে।

এবার কথাটা হালদারমশাইয়ের মনঃপুত হল। তিনি বললেন,—হঃ, এটা একটা পয়েন্ট বটে। পুলিশ খুনের মোটিভ বুঝে পাওয়ার আগেই আপনি তা পাইয়া যাবেন।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ছোট বড় স্ক্রু-ড্রাইভার এবং একটা ছোট্ট হাতুড়ি বের করলেন। তারপর ব্রিফকেসটা কোলে রেখে একটা স্ক্রু-ড্রাইভারের মাথায় আস্তে হাতুড়ির ঘা দিতে থাকলেন। দুমিনিটের মধ্যেই একটা লক্ খুলে গেল। দ্বিতীয় লকটা খুলতে তার চেয়ে কম সময় লাগল। তারপর ব্রিফকেসটা তিনি টেবিলে রেখে ডালা খুললেন।

আমরা খুব উত্তেজিত হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। দেখলুম ব্রিফকেসের ভেতর একটা টার্কিস তোয়ালে ভরা আছে। কর্নেল সেটা তুলে নিতেই দেখা গেল খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। প্যাকেটটা প্রায় ব্রিফকেসের তলার সাইজের। কাগজের মোড়ক খোলার পর দেখলুম তিনটে একই সাইজের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

কর্নেল একটা-একটা করে ছবি আমাদের দেখালেন। তিনটে ছবিই পোর্ট্রেট। ফটোগ্রাফ নয়, অয়েল পেন্টিং। একটা ছবি নানা অলঙ্কারে সেজে থাকা এক মহিলার। বাকি দুটো দুজন পুরুষের। একজন যুবক, অন্যজন বয়স্ক। তিনটি ছবি দেখেই বোঝা যায় এই মানুগুলি অভিজাত পরিবারের। কর্নেল আতস কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—তিনটি ছবির চিত্রকর একজন সাহেব বলে মনে হচ্ছে। জড়ানো ইংরেজি হরফে লেখা আছে 'আর মার্লিন' বা মার্টিন। আমি বিখ্যাত চিত্রকরদের অনেকের নামই জানি না। তবে আমার কাছে বিদেশি চিত্রকরদের একটা এনসাইক্লোপিডিয়া আছে। সঠিক নামটা পেতেও পারি, কারণ দেখে তো মনে হচ্ছে এরা রাজা মহারাজা পরিবারের লোক। আর ছবিগুলোও আঁকা বহুবছর আগে।

মধুরবাবু বললেন,—এবার ছবির তলায় কিছু আছে নাকি দেখুন তো।

কর্নেল ছবি তিনটে টেবিলে রাখলেন তারপর ব্রিফকেসটা উপুড় করে ঝাড়বার ভঙ্গি করলেন। বললেন,—নাঃ, আর কিচ্ছু নেই।

আমি বললুম,—ওপরের ডালার ভেতরে একটা চেন দেখতে পাচ্ছি।

আমি আর কিছু বলার আগেই কর্নেল চেন টেনে ভেতর থেকে কতকগুলো নেমকার্ড বের করলেন। তারপর বললেন,—নানা জায়গার নানা লোকের নেমকার্ড। এদের কেউ-কেউ কোনও কোম্পানির লোক।

মধুরবাবুকে হতাশ দেখাচ্ছিল। তিনি বিস্ময়ের সুরে আস্তে বললেন,—এই তিনটে ছবির জন্য বারিন অমন করে ভয় পেয়ে পালালই বা কেন? সে কি এই ছবিগুলোর জন্যই খুন হয়ে গেল? কর্নেলসাহেব আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে— আপনিই এই অদ্ভুত ঘটনার পিছনে কী আছে তা জানতে পারবেন, কারণ আপনার পরিচয় আমি ভালোই জানি।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন,—ঘটনাটা রহস্যজনক তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রহস্য ফাঁস করতে হলে আপনার সাহায্য দরকার। একটা কথা আপনাকে খুলেই বলি, আপনি যদি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন তবেই আমার পক্ষে ঠিকভাবে হাঁটা সম্ভব হবে।

মধুরবাবু বললেন,—আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। অবশ্য যদি এমন কোনও প্রশ্ন করেন যে বিষয়ে আমার জানা নেই তাহলে আমি ঠিক উত্তর দিতে পারব না।

এবার কে জানে কেন গোয়েন্দাপ্রবরের মুখে খি-খি হাসি শোনা গেল। তিনি বললেন,—এটা যে আদালতের ব্যাপার হইয়া গেল। যাহা বলিব সইত্য বলিব, মিথ্যা বলিব না।

কর্নেল হেসে উঠলেন। বললেন,—ঠিক ধরেছেন। যাইহোক, মধুরবাবু প্রথমে আপনি আমার এই প্রশ্নটার উত্তর দিন। বারিনবাবুর পুরো নাম কী? আর তার সঙ্গে কবে কোথায় কোন সূত্রে আপনার পরিচয় হয়েছিল?

মধুরবাবু বললেন,—বারিনের পুরো নাম, বারীন্দ্রনাথ সিনহা। ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ যদুগড় রাজ হাইস্কুলে। ওর বাবা ছিলেন রেলের অফিসার। যদুগড়ে বদলি হয়ে আসার পর বারিনকে তিনি ক্লাস সিক্সে ভরতি করে দেন। বারিন ছিল খুব আলাপি ছেলে। আমার সঙ্গে ওর হৃদ্যতা ছিল সবচেয়ে বেশি। তখন আমার বাবা ছিলেন যদুগড় রাজপরিবারের ম্যানেজার। যাইহোক, আমরা দুজনে ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে পাটনার কলেজে পড়েছিলুম। বি.এ. পাশ করে বারিন কোথায় চলে গিয়েছিল জানি না। ওর বাবা রিটায়ার করে যদুগড়েই বাড়ি করেছিলেন। তাঁর কাছে বারিনের কথা জানতে চাইলে তিনি রাগ করে বলতেন, ওই হতভাগার কথা তুমি জিগ্যেস কোরো না আমাকে। আমি জানি না সে কোথায় কী করছে।

কর্নেল বললেন, তারপর বারিনের সঙ্গে আপনার আবার কবে দেখা হয়েছিল?

—আগেই বলেছি বছর দশেক আগে। সে যদুগড়ে কোনও কোম্পানির ব্যবসার কাজে এসেছিল।

—বারিনবাবুর বাবা কি তখন বেঁচে ছিলেন?

—না, তিনি মারা যাওয়ার পর বারিনের মা তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ভাগলপুরে। তারপর তিনি যদুগড়ের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে জামাইয়ের কাছে গিয়ে থাকতেন।

—বারিন আপনার কাছে এসব কিছু জানতে চায়নি? নাকি সে তার মায়ের এবং বোনের খবর জানত?

মধুরবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—বারিন এ কথা জানত। সে বলেছিল, সে তখন বম্বেতে বড় একটা কোম্পানিতে কাজ করে। সেই কাজের সূত্রেই তাকে যদুগড়ে আসতে হয়েছে। আমি তাকে রাজবাড়িতে আমাদের কোয়ার্টারে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলুম। কিন্তু সে বলেছিল তার হাতে আর সময় নেই। এখুনি তাকে পাটনায় চলে যেতে হবে।

—আচ্ছা মধুরবাবু একটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন তো, যদুগড়ে কোন ব্যবসায়ীর কাছে বারিনবাবু এসেছিলেন? তা কি তিনি আপনাকে বলেছিলেন?

মধুরবাবু চোখ বুজে কিছুক্ষণ আঙুল খুঁটলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন,—হ্যাঁ, বারিন আমাকে বলেনি, কিন্তু আমি তাকে হরদয়াল ট্রেডিং এজেন্সির অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলুম।

কর্নেল বললেন,—ওই অফিসটা যে ব্যবসা সংক্রান্ত তা বোঝা যাচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন বা জানতেন ওরা কীসের ব্যবসা করত।

মধুরবাবু এবার বিকৃত মুখে বললেন,—হরদয়াল ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের ব্যবসা করত। কিন্তু যদুগড়ে ওর বদনাম ছিল স্মাগলার বলে। একবার ওকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছিল। হংকং থেকে

নেপাল থেকে যেসব ইলেকট্রনিক জিনিস চোরাচালান হয়, সেই চক্রের সঙ্গে হরদয়ালের যোগাযোগ ছিল।

—এখন কি ওই ট্রেডিং এজেন্সিটা আছে?

—তিন বছর আগে আমি যদুগড় থেকে চলে এসেছি। তখন ওটা ছিল, তা দেখেছি। হরদয়াল মারা গেলে তার ছেলে রামদয়াল ব্যবসা চালাত। এই তিন বছরে সেটা উঠে গেছে কি না জানি না।

কর্নেল বললেন,—আপাতত আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই। এবার আপনি আপনার কলকাতার ঠিকানা দিন।

বলে কর্নেল একটা কাগজের প্যাড আর কলম এগিয়ে দিলেন। মধুরবাবু তাতে নিজের নাম, বাড়ির ঠিকানা লিখে দিলেন।

কর্নেল সেটা হাতে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে ব্রিফকেসের ছবিগুলো আগের মতো কাগজের মোড়কে ভরে রেখে দিলেন। তারপর তোয়ালেটা হঠাৎ কী খেয়ালে খুলে পায়ের কাছে ঝাড়লেন। তখনই দেখলুম তোয়ালের ভেতর থেকে একটা লম্বা-চওড়া খাম মেঝেয় ছিটকে পড়ল। মধুরবাবু বলে উঠলেন,—আরে ওটা আবার কী?

কর্নেল খাম খুলে একটা ভাঁজ করা খুব পুরোনো কাগজ বের করলেন। কাগজের ভাঁজগুলো কোথাও-কোথাও একটু আধটু ছিঁড়ে গেছে। সাবধানে ভাঁজখুলে অভ্যাসমতো তিনি আতস কাচের সাহায্যে দেখতে-দেখতে বললেন,—মধুরবাবু, রহস্য আরও ঘনীভূত হল মনে হচ্ছে।

মধুরবাবু সোফা থেকে একটু উঁচু হয়ে কাগজটা দেখতে-দেখতে বললেন,—এটা একটা ম্যাপ মনে হচ্ছে! ম্যাপটাতে শুধু আঁকিবুঁকি ছাড়া স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই।

কর্নেল বললেন,—আছে, তবে সেগুলোতে ইংরেজি এ বি সি ডি ইত্যাদি অক্ষর লেখা আছে। ম্যাপের দাগগুলো মোটা কিন্তু অক্ষরগুলো ছোট তাই সহজে চোখে পড়ে না।

মধুরবাবু জিগ্যেস করলেন,—এটা কীসের ম্যাপ বলে মনে হচ্ছে আপনার?

কর্নেল একটু থেমে বললেন,—এটা কোনও জায়গার ম্যাপ হতে পারে, তবে ও ম্যাপ আঁকার উদ্দেশ্য কী তা এখন অনুমান করাও আমার পক্ষে অসম্ভব।

হালদারমশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন,—কর্নেলস্যার, কোথাও কোনও দামি জিনিস লুকোনো আছে—এটা তারই ম্যাপ হইতে পারে না? জয়ন্তবাবু কী কন?

সায় দিয়ে বললুম,—ঠিক বলেছেন হালদারমশাই। এটা যাকে বলে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের ম্যাপ।

মধুরবাবু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন,—গুপ্তধন? বারিন কি কোনও গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছিল? তা না হলে এ ম্যাপ সে এঁকে লুকিয়ে রাখল কেন? কর্নেলসাহেব এখন আমার মনে হচ্ছে ছবিগুলোর জন্য নয়, এই লুকিয়ে রাখা ম্যাপটার জন্যই বারিনকে কেউ অনুসরণ করেছিল। আর এটা না পেয়েই রাগের চোটে সে বারিনকে খুন করে চলে গেছে।

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—মধুরবাবু আপনি কি ব্রিফকেসটা আপনার কাছে রাখতে চান?

মধুরবাবু হাত এবং মাথা জোরে নেড়ে বললেন,—না-না কর্নেলসাহেব, ওই সর্বনেশে জিনিস আমার কাছে রেখে আমি কি স্বেচ্ছায় কারও হাড়িকাঠে গলা গলিয়ে দেব? ওসব সাংঘাতিক জিনিস আপনিই রাখুন। আর আমার একটা অনুরোধ, বারিন আমার এক সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য আমার মনে খুব আঘাত লেগেছে। আপনি দয়া করে বারিনের খুনিকে পুলিশের হাতে তুলে দিন। আর সেইসঙ্গে সেই ম্যাপের রহস্যও ফাঁস করুন। আমাকে আপনি সবসময়েই পাবেন।

কর্নেল ম্যাপটা খামে ভরে তোয়ালের ভাঁজে রেখে ব্রিফকেসে ঢোকালেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর একটা নেমকার্ড বের করে মধুরবাবুকে দিলেন। বললেন,—দরকার হলে আপনি

আমাকে ফোন করবেন। আর যদি প্রয়োজন মনে করেন, আপনার দিদিকেও আমার কথা খুলে বলবেন। কারণ তাঁর সাহায্যও যে আমার লাগবে না এমন কথা বলা যায় না।

মধুরবাবু চলে যাওয়ার সময় আমাকে ও হালদারমশাইকেও নমস্কার করে গেলেন।

কর্নেল ব্রিফকেসটা নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। বুঝতে পারলুম তিনি এই কেসটাতে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। গুরুত্ব দেওয়ারই কথা, কারণ এই ব্রিফকেস কেন্দ্র করে যা ঘটেছে তা প্রচণ্ড রহস্যময়।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন,—আচ্ছা জয়ন্তবাবু, মধুরবাবুরে দেইখ্যা আপনার কী ধারণা হইল কন শুনি।

বললুম,—আপাত দৃষ্টিতে সাধাসিধে লোক বলেই মনে হল। একসময় খুব বিলাসিতায় জীবন কাটাতেন তা তো শুনলুম, কিন্তু এখন হয়তো তাঁর তেমন কিছু রোজগার নেই। বিধবা দিদির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ইচ্ছে করলে তিনি তো ব্রিফকেসটার তালা ভেঙে টাকাকড়ি সোনাদানা আছে কি না দেখতে পারতেন। অন্য লোকে অন্ততত আগ্রহের জনও তেমনটি করে। কিন্তু উনি তা করেননি।

গোয়েন্দাপ্রবর একটিপ নস্যি নিয়ে নোংরা রুমালে নাক মুছে বললেন,—কিছু কওন যায় না। মাইনসের চেহারা দেইখ্যা বা কথা শুইন্যা কিছু বোঝা যায় না। জয়ন্তবাবু, চৌত্রিশ বৎসর চাকরি করসি—

এই সময়েই কর্নেল ফিরে এসে বললেন,—হালদারমশাই আপনার চৌত্রিশ বছরের পুলিশি অভিজ্ঞতা দিয়ে আপাতত একটা কাজ করে ফেলুন।

হালদারমশাই ব্যগ্রভাবে বললেন,—কন কর্নেলস্যার।

কর্নেল বললেন,—আপনাকে আমি নিহত বারিনবাবুর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। আপনি আজ সন্ধ্যার মধ্যেই একটা খবর এনে দিন। ও বাড়িতে বারিনবাবু কি একা থাকতেন, নাকি তাঁর সঙ্গে আরও কেউ থাকত?

কথাটা শোনামাত্র গোয়েন্দাপ্রবর কোনও কথা বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

এমনিতেই রবিবারের দিনটা আমি কর্নেলের বাড়িতে কাটাই। কিন্তু কোনও রহস্যজনক ঘটনার পিছনে দৌড়োতে হলে কর্নেলের হাত থেকে আমার রেহাই মেলে না। তাছাড়া আমার স্বার্থও থাকে। কারণ সেই ঘটনার ভিত্তিতে পাতার পর পাতা রিপোর্টিং লিখে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় প্রকাশের সুযোগ পাই এবং তাতে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে সুনাম কুড়োই।

দুপুরে খাওয়ার পর অভ্যাসমতো ডিভানে চিত হয়ে ছিলুম। সেই সময় লক্ষ করলুম কর্নেল ঘরের ভেতর থেকে সেই ব্রিফকেসটা নিয়ে এলেন। তারপর সেটার ভেতর থেকে সেই ম্যাপটা বের করলেন। আমার চোখে ঘুমের টান এসেছিল, সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল কর্নেল ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখে তা থেকে কোনও সূত্র বের করবেন।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না। ঘুম ভাঙল ষষ্ঠীচরণের ডাকে। তার হাতে যথারীতি চায়ের কাপ-প্লেট। এটা বহুদিনের রীতি। ষষ্ঠী জানে ঘুমের পর আমি চা খেতেই ভালোবাসি। ডিভানে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে জিগ্যেস করলুম,—ষষ্ঠী তোমার বাবামশাই কি সাধের বাগান পরিচর্যা করতে গেছেন?

ষষ্ঠী ফিক করে হেসে বললে,—আজ্ঞে দাদাবাবু, উনি আমাকে বলে গেছেন, তোর দাদাবাবুকে বলবি তার গাড়িটা আমি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

এমন ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু বরাবরই এতে আমার রীতিমতো অভিমান হয়। কেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ওঁর কোনও অসুবিধা হয়? বললুম,—তোমার বাবামশাই কখন ফিরবেন তা কি বলে গেছেন?

ষষ্ঠী বলল,—আজ্ঞে না। বলেই সে চমকে ওঠার ভঙ্গি করল—এই রে! সাড়ে-চারটে বাজতে চলল। ছাদের বাগানের কথা ভুলেই বসে আছি।

সে দ্রুত চিলেকোঠার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। চা খাওয়ার পর কাপ প্লেটটা নিয়ে সোফার কাছে গেলুম এবং সেটা সেন্টার টেবিলে রেখে দিলুম। ঠিক এই সময়ই টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই হালদারমশাইয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—কর্নেল স্যার, আমি হালদার কইত্যাসি।

কর্নেলের কণ্ঠস্বর নকল করার চেষ্টা করে বললুম—বলুন হালদারমশাই।

কিন্তু গোয়েন্দপ্রবরকে যতই অবহেলা করি, তাঁর কান প্রাক্তন পুলিশের কান। তিনি বললেন, —জয়ন্তবাবু, এখন জোক করার মুডে আমি নাই।

অগত্যা হাসতে-হাসতে বললুম,—আপনি কি ছদ্মবেশে আছেন, নাকি কেউ আপনাকে অ্যাটাক করেছিল?

হালদারমশাই বললেন,—বুসছি, কর্নেল স্যার ছাদের বাগানে আছেন। থাকলে প্লিজ শিগগির ডেকে দ্যান।

বললুম,—হালদারমশাই আপনার কর্নেল স্যার আমার গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালিয়েছেন।

—কী কাণ্ড! ষষ্ঠীরে কইয়া জাননি কিছু?

—ওই তো বললুম, ষষ্ঠীকে ঠিক ওই কথাটাই তিনি বলে গেছেন—জয়ন্তর গাড়ি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি!

—আপনি তখন কী করত্যাসিলেন?

—ঘুমোচ্ছিলুম। আপনি তো ভালোই জানেন দুপুরে আমার ভাত-ঘুমের অভ্যাস আছে।

—তা হইলে তো একটু গণ্ডগোল হইয়া গেল।

—কীসের গণ্ডগোল?

—কর্নেল স্যার থাকলে তেনার লগে কনসাল্ট করতাম।

—আপনি আমার সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারেন।

হঠাৎ ফোনের লাইন কেটে গেল। আমি কয়েকবার হ্যালো-হ্যালো করার পর রিসিভার নামিয়ে রাখলুম। তারপর কেন যেন মনে হল কেউ কি হালদারমশাইয়ের হাত থেকে ফোন কেড়ে নিল? একটু উদ্বেগ বোধ করলুম। এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ভুলে যান তিনি এখন পুলিশ ইন্সপেক্টর নন, তাছাড়া জেদের বসে অনেক সময়েই এমন হঠকারি কাজ করে বসেন যে কর্নেলকে সেজন্য অনেক ছোটাছুটি করতে হয়।

এইসব ভাবতে-ভাবতে দৃষ্টি গেল সোফার নিচে। যেখানে মধুরবাবু বসে ছিলেন সেখানে সোফার তলায়ে কী একটা ছোট্ট চাকতির মতো জিনিস পড়ে আছে। তখনই হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিলুম। ততক্ষণে ঘরের আলো কমে এসেছে। আগে কর্নেলের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে জিনিসটার দিকে তাকালুম। একটা তামার চাকতি বলেই মনে হল। চাকতিটার সাইজ এক টাকার কয়েনের মতো। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় দেখতে-দেখতে আবিষ্কার করলুম চাকতির গায়ে অজানা ভাষার হরফে কীসব লেখা আছে। উলটো পিঠে একটা মূর্তি আঁকা। মূর্তিটা দেখতে ভয়ঙ্কর।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কর্নেলের ড্রইং রুমে দেশ বিদেশের বিস্ময়কর বহু জিনিস আছে বটে, কিন্তু সেগুলো সবই কাচের আলমারির ভেতর সাজানো আছে। এটা নিশ্চয়ই কর্নেলের নয়।

তাহলে কি এটা মধুরবাবুর পকেট থেকে দৈবাৎ তাঁর অজান্তে পড়ে গিয়েছিল? মনে পড়ল মাঝে-মাঝে তিনি রুমাল বের করে মুখ মুছছিলেন।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় শীতের আর পাত্তা নেই বরং বাইরে বেরুলে গরম লাগে। কিন্তু কর্নেলের ড্রইং রুমের ফ্যানের হাওয়া সত্ত্বেও উত্তেজনা মানুষকে ঘামিয়ে তুলতে পারে।

আরও একটু চিন্তার পর আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল, এটা কোনও দেশের প্রাচীন মুদ্রাও হতে পারে। কিন্তু মধুরবাবু এটা পাঞ্জাবির ডান পকেটে না রেখে বাঁ-পকেটে রেখেছিলেন কেন, যে পকেটে কি না রুমাল ভরা আছে।

ইতিমধ্যে ষষ্ঠী ছাদ থেকে নেমে এসে ঘরের সব আলো জ্বেলে দিল। তারপর মুচকি হেসে বলল,—দাদাবাবু টিকটিকিবাবু আসছেন।

ষষ্ঠী হালদারমশাইকে টিকটিকিবাবু বলে। মিনিট দুই-তিন পরে ডোরবেল বাজল। ষষ্ঠী পিছনের করিডোর দিয়ে গিয়ে বাইরের লোকেদের জন্য দরজা খোলে। কিন্তু তাকে দরজা খুলতে নিষেধ করে আমি নিজেই ড্রইংরুমের সংলগ্ন ছোট ওয়েটিং রুমটা দিয়ে এগিয়ে গেলুম। তারপর দরজা খুললুম।

হালদারমশাইকে দেখে অবাক হয়ে বললুম,—কার সঙ্গে মারামারি করে এলেন? আপনার কপালে ছোট একটা ব্যান্ডেজ দেখছি। ডান হাতের বুড়ো আঙুলেও পট্টি বাঁধা।

হালদারমশাই বাঁকা হেসে বললেন,—ও কিছু না। কর্নেল স্যার ফেরেন নাই?

বললুম,—না।

ড্রইংরুমে এসে হালদারমশাই ধপাস করে সোফায় বসে বললেন,—এক গ্লাস জল খামু। ষষ্ঠীরে ডাকেন।

আমি হাঁক দিলুম,—ষষ্ঠী, শিগগির এক গ্লাস জল নিয়ে এসো।

ষষ্ঠী তখনই জল এনে দিল। তারপর তার টিকটিকিবাবুর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকিয়ে কিছু জিগ্যেস করতে ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু আমি তাকে চোখ টিপে নিষেধ করে ইশারায় চলে যেতে বলুলম। কারণ, হালদারমশাই এখন অন্য মেজাজে আছেন। ষষ্ঠীকে ধমক দিতেও পারেন।

ষষ্ঠী চলে যাওয়ার পর জিগ্যেস করলুম,—মনে হচ্ছে আপনার ওপর কেউ হামলা করেছিল।

হালদারমশাই জলের গ্লাস রেখে এক টিপ নস্যি নিলেন, তারপর প্যান্টের পকেট থেকে সেই নোংরা রুমাল বের করে নাক মুছে বললেন,—আইজ একটু ভুল করসিলাম। সঙ্গে আমার লাইসেন্সড রিভলভারটা ছিল না। আর্মস ছাড়া আমি কখনও কোনও স্পটে যাই না। আসলে কর্নেল স্যারের কথা শুইন্যাই সোজা স্পটে চলে গিসলাম।

—তা আপনার ওপর হামলা করল কে?

গোয়েন্দাপ্রবর ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,—আমি তখন আপনার লগে ফোনে কথা কইতেসিলাম। সেই ফোনটা পাইসিলাম একটা ফার্মের্সিতে। আইজ রবিবার, কিন্তু ফার্মেসিটা খোলা ছিল। আপনার লগে কথা কইত্যাসি, এমনসময়ই এক হালায় হঠাৎ আমার পিছন থিক্যা ফোনটা কাড়বার চেষ্টা করল। ফার্মেসির মালিক কর্মচারী সবাই মনে হল লোকটারে ভয় পায়। তারা চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকল। এদিকে আমি এমন কাণ্ড দেইখ্যা একটুখন অবাক হইসিলাম। ফোনটা কাড়িয়া লইয়া লোকটা কইল,—এক্ষুনি এখান থেইক্যা কাইট্যা পড়ো। নইলে এই দেখসো আমার কী আসে!

জিগ্যেস করলুম,—ছোরা ছুরি নাকি ফায়ার আর্মস?

হালদারমশাই জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—ছয়-সাত ইঞ্চি লম্বা একখান ছোরা।

জিগ্যেস করলুম,—আপনাকে কি সে ওটা দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করেছিল?

গোয়েন্দাপ্রবর বাঁকা হেসে বললেন,—নাঃ, আমিই হালার হাত থেইক্যা ড্যাগারখান কাইড়া লইছি। কাড়াকাড়ির সময় আমার কপালে আর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ড্যাগারের ডগা একটুখানি লাগসে।

—তারপর কী হল?

—হালার প্যাটে হাঁটুর গোঁত্তা এমন জোরে মারসি, সে তখনই টেলিফোন শুদ্ধু নিচে গড়াইয়া পড়সিল। তারপর আর সাড়াশব্দ নাই।

—তার মানে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?

—হঃ! তো আমি ফার্মাসিতে কইলাম আমারে দুইখান ব্যান্ডেজ লাগাইয়া দিন।

দোকানের একজন কর্মচারী আমার হুকুম পালন করল। আমি তারে কইলাম,—আমি কে আপনারা জানেন? লালবাজারের ডিকেটটিভ ডিপার্টমেন্টের লোক। অমনি দ্যাখলাম যেটুকু ভিড় জমসিল, তখনই সাফ হইয়া গেল। আমি বুক ফুলাইয়া রাস্তায় নাইম্যা একটা ট্যাক্সি ডাকলাম।

—আর লোকটা ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল?

এবার গোয়েন্দ্রপ্রবর খোলা মনে হেসে বললেন,—আমি আর পিছু ফিরি নাই।

—লোকটা কে তা চিনতে পেরেছিলেন?

—না। তবে এইটুকু বুঝঝি হালা আমারে জগদীশবাবুর বাড়ি থিক্যা ফলো কইরা আইছিল।

—জগদীশবাবু কে?

—কমু। কর্নেল স্যারেরে আইতে দিন, তারপর ডিটেলস সব জানতে পারবেন।

কর্নেল এলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। তখন প্রায় ছ'টা বাজে। তিনি এসেই হালদারমশাইকে দেখে বলে উঠলেন,—যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটেছে দেখছি। তখন আপনি আমার কথা শুনেই বেরিয়ে গেলেন, আমি সুযোগ পেলুম না যে আপনাকে একটু সাবধান করে দেব।

হালদারমশাই বললেন,—ও কিসু না। তারপর পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা ড্যাগার বের করে বললেন,—কর্নেলস্যার, আপনি তো জানেন আমার মাথা আফটার অল—।

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—পুলিশের মাথা—এই তো? যাই হোক, বসুন আমি পোশাক বদলে আসি। আর জয়ন্ত, তোমার গাড়ি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য এই বৃদ্ধের প্রতি মনে-মনে খুব রেগে আছ। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, তোমার কেমন চমৎকার একটা ভাত-ঘুম হয়ে গেল। বলবে, তুমি সঙ্গে গেলে কি আমার কোনও অসুবিধে হতো? হ্যাঁ, হতো।

বলে তিনি ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি হালদারমশাইয়ের হাত থেকে ভাঁজ করা ড্যাগারটা খুলে ফেললুম। ছ'ইঞ্চির বেশি লম্বা শান দিয়ে ধারাল করা অস্ত্র। হালদারমশাই ছোরাটা আমার হাত থেকে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন,—মনে হইত্যাসে ষষ্ঠীচরণ এখনই কফি লইয়া আইবে। সে ফায়ার আর্মস দেইখ্যা ভয় পায় না, কিন্তু ড্যাগার দেইখ্যা খুব ভয় পায়।

একটু পরে কর্নেল ফিরে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। তাঁর পেছনে ষষ্ঠীচরণও কফি আর দু-প্লেট স্ন্যাকস নিয়ে এসে গেল। এবং সেন্টার টেবিলে ট্রে-টা রেখে চুপচাপ চলে গেল।

এরপর কিছুক্ষণ আমরা কফি পানে মন দিলুম। কফি শেষ করে কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, —এবার হালদারমশাইয়ের রিপোর্ট শোনা যাক।

হালদারমশাই ইনিয়ে-বিনিয়ে যে ঘটনা শোনালেন, তা সংক্ষেপে এই :

কর্নেলের কথা অনুসারে হালদারমশাই বারিনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িটার মালিক একজন অবাঙালি ভদ্রলোক। তাঁর নাম, জগদীশ প্রসাদ রাও। বাড়িটা দোতলা, এবং নতুন। ওই গলির মধ্যে বাড়িটা চোখে পড়ার মতো। সামনের একটা গেট আছে, ভেতরে ছোট্ট একটা লন। সামনের অংশটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এবং পাঁচিলে কাঁটাতারের বেড়া আছে। হালদারমশাই গেটের

কাছে গিয়ে দারোয়ানকে ডাকেন। তারপর দারোয়ানের হাতে তাঁর নেমকার্ড দিয়ে বলেন, বাড়ির মালিকের সঙ্গে তাঁর দেখা করা জরুরি। দারোয়ান বলে তার সাহেব এখন বিশ্রাম করেছেন। দেখা করতে হলে চারটের পর আসতে হবে।

হালদারমশাই একটু গলা চড়িয়ে ইংরেজিতে বলেন, তিনি একজন ডিটেকটিভ। এবং এই বাড়িতে আজ যে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন তাঁর আত্মীয় তাঁকে এই খুনের তদন্তের ভার দিয়েছেন। এতে কাজ হয়। ডান দিকে দোতলার একটা ঘরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এক ফরসা রঙের ভদ্রলোক বেরিয়ে আসেন। তিনি কথাটা শুনতে পেরেছিলেন। তাই দারোয়ানকে বলেন, হালদারমশাইকে যেন নিচের বসার ঘরে নিয়ে আসে।

এরপর জগদীশবাবুর সঙ্গে হালদারমশাইয়ের কথাবার্তার আর বাধা ছিল না। জগদীশবাবু বলেন, নিহত বারিনবাবু ছিলেন তাঁর একজন বন্ধুমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। গত মাসে বারিনবাবুকে তাঁর বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ জানান। জগদীশবাবুর ফ্যামিলি মাসখানেকের জন্য দেশে গেছে। তাঁর দেশের বাড়ি হরিয়ানায়। কাজেই দোতলার যে ঘরটা আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠ কারো জন্য খালি রাখা হয়, অর্থাৎ তাঁর গেস্টরুম, সেখান তিনি বারিনবাবুকে অস্থায়ী ভাবে থাকতে দিয়েছিলেন। বারিনবাবুর কাছে এযাবৎ কোনও লোক দেখা করতে আসেননি। ওঘরে একটা বাড়তি টেলিফোন আছে, সেটা তিনি বারিনবাবুকে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

এসব কথা হালদারমশাই তাঁকে প্রশ্ন করেই জানতে পেরেছেন। এরপর হালদারমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে জগদীশবাবু বলেন, গতরাত্রে কখন এমন একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে তিনি টের পাননি। দারোয়ানও এতটুকু জানতে পারেনি। বারিনবাবু পাড়ার একটা হোটেলের সঙ্গে নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। কারণ, উনি কখন খাবেন তার কোনও সময়ের ঠিক ছিল না।

এরপর হালদারমশাইকে নিয়ে তিনি দোতলায় বারিনবাবুর ঘরে যান। পুলিশ যা তদন্ত করার করে নিয়ে চলে গেছে। তাই ঘরের চাবি জগদীশবাবুর কাছে আছে। ঘরে ঢুকে হালদারমশাই যথাসাধ্য খুঁটিয়ে দেখে কোনও সূত্র পাওয়ার চেষ্টা করেন। ঘরের রক্ত ততক্ষণে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। জগদীশবাবু তাকে বলেন, তাঁর ধারণা কোনও চেনা লোক বারিনবাবুর কাছে এসেছিল। কিন্তু সে তা হলে নিশ্চয়ই পাঁচিলের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে ছিল। এমনকী জগদীশবাবুর ধারণা, তাকে বারিনবাবুই গভীর রাতে কোনও এক সময় পাঁচিল ডিঙিয়ে আসতে বলেছিল। পুলিশ দেখেছে দারোয়ানের ঘরের পাশে একটা বকুলগাছ আছে। সেই বকুলগাছে খুনির আসার চিহ্ন পুলিশ খুঁজে পেয়েছে। এখন জগদীশবাবুর আক্ষেপ, তিনি বারিনবাবুর ওপর কেন যে এত আস্থা রেখেছিলেন বুঝতে পারছেন না।

এসব কথা বলার পর হালদারমশাই একটু দম নিয়ে বললেন,—ঘরে বারিনবাবুর যেসব জিনিস ছিল, তা পুলিশ সিজ কইরা লইয়া গ্যাসে, কিন্তু আমার মনে একখান ধন্ধ ঢুকসে।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—কী ধন্ধ?

গোয়েন্দপ্রবর খুব চাপা স্বরে বললেন,—কর্নেলস্যার, আমার সন্দেহ, বারিনবাবুরে ওই জগদীশবাবুই খুন করসেন।

কর্নেল বললেন,—সেটা অসম্ভব কিছু নয়।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, —বলুন মধুরবাবু....বলেন কী? আপনার লেটার বক্সে হুমকি দেওয়া চিঠি? ঠিক আছে, কাল দিনের বেলায়—ধরুন, সকাল নটার মধ্যে আপনি চলে আসুন।

চার

সেই সন্ধ্যায় কর্নেল হালদারমশাইকে জগদীশবাবুর কাজ কারবারের খোঁজ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছিলেন। হালদারমশাই চলে যাওয়ার পর আমি সোফার নিচে কুড়িয়ে পাওয়া সেই চাকতিটা কর্নেলকে দেখিয়েছিলুম। চাকতিটা যে মধুরবাবুর পকেট থেকেই পড়েছে, আমার এই ধারণার কথাও বলেছিলুম। কিন্তু কর্নেলের মতে ওই চাকতিটা তোয়ালের ভাঁজের ভেতরেই সম্ভবত রাখা ছিল। সোফার নিচে কার্পেটের ওপর তোয়ালেটা লম্বা করে ঝেড়ে ফেলার সময় অবশ্য কোনও শব্দই শোনা যায়নি। তারপর কর্নেল আমাকে অবাক করে বলেছিলেন,—তুমি এটাকে তামার চাকতি ভাবছ, কিন্তু এটা আসলে একটা ব্রোঞ্জের সিল।

আতস কাচের সাহায্যে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সিলটা পরীক্ষা করে দেখার পর কর্নেল বলেছিলেন,—প্রাচীন লিপি বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান, তাতে মনে হচ্ছে, এই লিপিগুলি ব্রাহ্মি। আর উলটো পিঠে যে মূর্তিটা দেখছ, সেটা বৌদ্ধ ধর্মের এক অপদেবতার। তার নাম 'মার'।

রহস্যটা ক্রমেই এত জটিল হয়ে উঠল দেখে সে রাতে আমার ভালো ঘুমই হয়নি। সকালে বেড-টি খাওয়ার পর বাথরুমে গিয়েছিলুম, তারপর প্যান্টশার্ট পরে সাধের বাগানে যাব ভাবছিলুম। কারণ কর্নেলের এখন ছাদেই থাকার কথা। কিন্তু চিলেকোঠার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ড্রইং রুমের ভেতর থেকে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুন। ড্রইংরুমে গিয়ে দেখি মধুরকৃষ্ণ মুখুজ্যে বিরক্ত মুখে সোফায় বসে আছেন। মনে হল ভদ্রলোক আমার মতোই বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। সবে আটটা বাজে, তাই বোঝা যায় উনি ঘুম থেকে উঠেই এখানে চলে এসেছেন।

আমাকে দেখে তিনি নমস্কার করলেন। আমি একটু তফাতে বসে জিগ্যেস করলুম,—হাতের লেখা দেখে মধুরবাবু কি কাউকে চিনতে পেরেছেন?

কর্নেল হেসে উঠলেন,—জয়ন্ত, মাঝে-মাঝে এমন ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করো আমার অবাক লাগে।

বললুম,—বাঃ, অবাক লাগার কী আছে? মধুরবাবু এতবছর দিদির বাড়িতে বাস করেছেন, কতরকম লোকের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা থাকা তো স্বাভাবিক। তাদের হাতের লেখা দেখতে পাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

মধুরবাবু বিষণ্নমুখে বললেন,—হাতের লেখা দেখে আমার মনে হয়েছে কেউ কোনও কমবয়সি ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে চিঠিটা লিখিয়েছে। কর্নেল সাহেবও আমার কথা স্বীকার করেছেন।

কর্নেল বললেন,—হাঁ, এটা যে-কোনও কমবয়েসি এবং বানান ভালো না জানা ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে লেখানো হয়েছে, এতে আমি নিঃসন্দেহ। তুমি নিজেই পুরো চিঠিটা পড়ে দ্যাখো।

চিঠিটা নিয়ে দেখলুম, একটা একসারসাইজ খাতার পাতা ছিঁড়ে আঁকাবাঁকা হরফে এবং ভুল বানানে লেখা আছে, 'মধুরকেষ্ট মালটা তুমি যে হাতিয়েছ তা জানি। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে ওটা তুমি আউটরাম ঘাটে গঙ্গার ধারে সেই বেঞ্চিতে যদি রেখে না আসো, তা তোমার মুণ্ডুতেও একটা গুলি ঢুকে যাবে। ইতি—'

চিঠিটা পড়ার পর বললুম,—একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বারিনবাবুকে যে শুক্রবার গঙ্গার ধারে ফলো করে গিয়েছিল, সে সম্ভবত দূর থেকে মধুরবাবুর হাতে ব্রিফকেসটা দেখেছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হল মধুরবাবুর মতো নিরীহ মানুষের কাছ থেকে সে তো শুক্রবার রাত্রেই সোজা ওঁর দিদির বাড়িতে ঢুকে ওটা কেড়ে নিয়ে আসতে পারত। বিশেষ করে তার কাছে যখন পিস্তল বা রিভলভার আছে।

মধুরবাবু বললেন,—আমার দিদিকে আপনি দেখেননি। সে পাড়ায় খুব জনপ্রিয়। তার ডাকে পাড়াশুদ্ধ এসে হাজির হবে। এই চিঠি যে লিখেছে সে নিশ্চয়ই একথাটা জানে।

কর্নেল বললেন,—লোকটা যে আপনার অলক্ষ্যে আপনাকে কাল সকালে বা আজ সকালে ফলো করে আসেনি, কে বলতে পারে? আমার ধারণা ব্রিফকেসটা ফেরত নেওয়ার জন্য সে তিন দিনের সময় দিয়েছে, তার কারণ সে জানে ওটা আপনার কাছে নেই।

আমি বললুম,—তা হলে খালি ব্রিফকেসটা মধুরবাবুর হাতে দিয়ে পুলিশের সাহায্যে একটা ফাঁদ পাতলেই তো হয়। যেই লোকটা মধুরবাবুর হাত থেকে ব্রিফকেস নেবে অমনি তাকে পুলিশ এবং আমরা পাকড়াও করে ফেলব।

কর্নেল হাসলেন,—জয়ন্ত, লোকটা যেই হোক, সে অত বোকা নয়।

মধুরবাবু কাতর মুখে বললেন,—আমার কলকাতায় থাকতে এখন খুবই আতঙ্ক হচ্ছে। তিনদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও যদি সে কথামতো, ব্রিফকেসটা না পায়, তাহলে প্রচণ্ড ক্রোধে আমাকে হয়তো মেরে ফেলবে। দিদিও বলছিল কর্নেলসাহেবরা যা করার করবেন, আমি যেন চুপি-চুপি যদুগড়েই ফিরে যাই। কুমারবাহাদুরের রাগ এতদিনে পড়ে গেছে, তাছাড়া ওঁর মেয়ে আমাকে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছে, কাজেই যদুগড়ে ওঁদের আশ্রয়ে থাকলে আমি নিরাপদে থাকতে পারব।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে কিছু ভাবছিলেন। তিনি চোখ না খুলেই বললেন, —এই প্ল্যানটা মন্দ নয়। আপনি বরং আজই যদুগড়ে চলে যান। যাতে সেই লোকটা আপনাকে ফলো করার সুযোগ না পায় সেইজন্য আপনি একটা ট্যাক্সি করে অলিগলি ঘুরতে-ঘুরতে হাওড়া স্টেশনে চলে যাবেন। ট্যাক্সিওলা জিগ্যেস করলে বলবেন, আমার ইচ্ছে মতো আমি যাব। তোমার তো মিটারের অঙ্ক বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

মধুরবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—এই অবস্থায় তাই করতে হবে।

টাকাকড়ি আমার হাতে তত নেই। দিদির কাছে ধার চাইলে অবশ্য পেয়ে যাব। দিদি জামাইবাবুর প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা ছাড়াও মাসে-মাসে পেনসেন পাচ্ছে। তাছাড়া নিজের বাড়ি। একতলায় ভাড়াতে আছে।

কর্নেল বললেন,—বাঃ, তাহলে তো কোনও অসুবিধেই নেই। আপনি আজই সুযোগমতো কলকাতা থেকে কেটে পড়ুন। প্রয়োজনে আমি কুমারবাহাদুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার খবর নেব।

মধুরবাবু করজোড়ে বললেন,—কিন্তু কর্নেলসাহেবকে একটু অনুরোধ, এইসব ঘটনার কথা যেন কুমারবাহাদুরের কানে না যায়।

—না, না, সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় যদুগড়ের রাজবাড়িতে—তাই না! তাই আপনার খবর নিতে আমার কোনও অসুবিধে নেই।

মধুরবাবু আমাদের দু-জনকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দেখলুম কর্নেলের একদফা কফি খাওয়া হয়ে গেছে। তাই বললুম,—এমন জমজমাট রহস্যের গোলকধাঁধায় পড়ে আমার নার্ভ অসাড় হয়ে গেছে। রাত্রে ভালো ঘুমও হয়নি।

কর্নেল এবার তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন এবং যথারীতি ষষ্ঠীকে দেখলুম পরদার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে। কর্নেল হাঁক দিয়ে বললেন,—ষষ্ঠী, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কফি না আনলে তোর গর্দান যাবে।

ষষ্ঠীর মুখ পরদার আড়ালে হারিয়ে গেল। বললুম,—কর্নেল, গত রাতে আমি লক্ষ করেছি আপনি আপনার বেডরুমে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কী যেন করছিলেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি বৌদ্ধযুগের ওই ব্রোঞ্জের সিলটা একটা সিল সংক্রান্ত পুরোনো বইয়ের পাতায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলুম।

—খুঁজে পেয়েছেন তো?

—হ্যাঁ, রাত একটা নাগাদ ওই সিলটার ছবি খুঁজে পেয়েছি। ওটা থেরবাদী, অর্থাৎ বৌদ্ধ স্থবির সম্প্রদায়ের একটা সিল। ঐতিহাসিক ডক্টর ফার্গুসন লিখেছেন এই সিল-এ পালি ভাষায় এবং ব্রাহ্মি লিপিতে যা লেখা আছে, তাতে প্রাচীন মগধ অর্থাৎ আধুনিক বিহারের একটা মঠে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের আভাস পাওয়া যায়।

চমকে উঠে বললুম,—তা হলে ঘুরে-ফিরে গুপ্তধনের কথাই ফিরে আসছে।

—হ্যাঁ। আসছে বটে। এবার শুনলে তুমি আরও অবাক হবে সিল-এর যে পিঠে অপদেবতা মার-এর মূর্তি খোদাই করা আছে, তার নিচের দিকে কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা আতস কাচে লক্ষ করে আমি একটা কাগজে তা নকল করেছি। তারপর তোয়ালের ভেতর লুকিয়ে রাখা পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া কাগজটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অবাক হয়েছি। সিল-এর আঁকাবাঁকা রেখাগুলো আসলে একটা ম্যাপ। যে ম্যাপ বড় আকারে পুরোনো কাগজে আমরা দেখেছি।

এই সময়েই ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি এবং স্ন্যাকস রেখে গেল। কফি খেতে-খেতে বললুম, —আমার নার্ভ চাঙ্গা হতে শুরু করেছে। আমার চোখে এখন কী ভাসছে জানেন?

কর্নেল বললেন,—প্রাচীন মগধ। অর্থাৎ আধুনিক বিহার।

আমি উত্তেজিত ভাবে বললুন,—কর্নেল, এমনকী হতে পারে না, বিহারের কোথাও সেই মঠের ধ্বংসাবশেষ বারিনবাবু আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু গুপ্তধন নিশ্চয়ই খুঁজে পাননি। আপনি কী বলেন?

—ঠিক বলেছ ডার্লিং।

হাসতে-হাসতে বললুম,—যাক, অনেকদিন পরে আবার আপনার মুখ থেকে ডার্লিং শব্দটা বেরোল। তার মানে আপনার অঙ্ক ঠিক পথেই এগোচ্ছে।

—নিছক অঙ্ক নয়, মনে হচ্ছে সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক। অর্থাৎ ভগ্নাংশের অঙ্ক। তাই বড় জটিল।

একটু পরে বললুম,—আপনি যদুগড়ে হয়তো অনেকবার গেছেন। কারণ, সেখানকার রাজবংশের কুমারবাহাদুর আপনার বন্ধু। যদুগড় অঞ্চলে নিশ্চয়ই অনেক ঘোরাঘুরি করেছেন। ওখানে কি কোথাও বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করেননি?

কর্নেল হাসলেন,—ভগ্নাংশটা তুমি নিমেষে সমাধান করে ফেললে?

—এমনকী হতে পারে না? বিহারে তো বহু জায়গায় বৌদ্ধদের কীর্তিকলাপের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় ডোরবেল বাজল। তিনি অভ্যাসমতো হাঁকলেন, —ষষ্ঠী—

একটু পরে সবেগে প্রবেশ করলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। তিনি সোফায় বসে বললেন,—মর্নিং কর্নেলস্যার। মর্নিং জয়ন্তবাবু।

কর্নেল বললেন,—কোনও সুখবর এনেছেন মনে হচ্ছে হালদারমশাই!

হালদারমশাই মুচকি হেসে বললেন,—খবর একখান আনসি, তা সু কিংবা কু এখনও জানি না। তবে আগে ষষ্ঠীর হাতের কফি খামু, নার্ভ চাঙ্গা করুম, তারপর সব কমু।

ষষ্ঠী হালদারমশাইকে দরজা খুলে দিয়েই তাঁর জন্য স্পেশাল কফি তৈরি করতে গিয়েছিল। শিগগির সে সেই কফি নিয়ে এল।

হালদারমশাই কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—আঃ!

ষষ্ঠী দাঁড়িয়ে আছে দেখে কর্নেল বললেন,—ওঃ, বুঝেছি। তুই বাজার যাবি।

ষষ্ঠী বলল,—আধঘণ্টা লেট হয়ে গেল। টাটকা মাছ আর পাব কিনা কে জানে?

কর্নেল উঠে গেলেন। বুঝলুম ষষ্ঠীকে বাজারের টাকা দিতে যাচ্ছেন। সেই সুযোগে আমি চুপি-চুপি জিগ্যেস করলুম,—কী খবর এনেছেন, তার একটু আভাস দিন না হালদারমশাই।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন,—জগদীশবাবুর কাজ কামের হদিশ পাইসি।

কী হদিশ শোনার সুযোগ পেলাম না। কর্নেল এসে গেলেন। ইজিচেয়ারে বসে তিনি চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন,—এবার আপনার খবরটা বলে ফেলুন হালদারমশাই।

হালদারমশাই তেমনই চাপাস্বরে বললেন,—জগদীশবাবুর ব্র্যাবোর্ন রোডে ব্যবসার অফিস আছে।

—কীসের ব্যবসা?

কর্নেলের প্রশ্নের উত্তরে হালদারমশাই আরও চাপা গলায় বললেন,—নীলামের ব্যবসা। আইজ সকাল সাতটায় ওনার বাড়িতে আবার গিসলাম। একটুখান মেক-আপ করসিলাম। মাথায় পরচুলা আর গোঁফ-দাড়ি ছিল। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। জগদীশবাবুর গাড়ি বার হইয়া গেল, তারপর দেখলাম জয়ন্তবাবুর বয়েসি একজন ইয়াং ম্যান ওনার বাড়ি ঢুকত্যাসে। অমনি তারে গিয়া কইলাম, জগদীশবাবুর লগে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। লোকটি কইল, তিনি তো কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। আপনি কে? কইলাম আমি ভবানীপুরের এক জমিদার বাড়ির থিক্যা আসত্যাসি। আমার নাম রাখালচন্দ্র বিশ্বাস। আমার কর্তামশাইয়ের টাকার অভাব। তাই উনি আমারে এখানে আইতে কইলেন। জগদীশবাবু নাকি পুরোনো মাল বেচাকেনার কারবার করেন। যুবকটি কইল, তাহলে আপনি দুপুর একটা নাগাদ স্যারের অফিসে দেখা করবেন। আমি কইলাম, ঠিকানা? সে তার পকেট থেইক্যা এই কার্ডখান বার কইরা আমাদের দিল।

বলে গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেলকে একটা কার্ড দিলেন।

কর্নেল সেটা পড়তে-পড়তে বললেন,—হ্যাঁ, ভদ্রলোক দেখছি পুরোনো আসবাব পত্রের বেচাকেনা করেন। মহাবলী অকসন হাউস। অবশ্য এই নিলামের কারবারিরা সুযোগ পেলে গোপনে প্রত্নদ্রব্যেরও ব্যবসা করেন। যাইহোক, আপনি একটা কাজের মতো কাজ করেছেন। যুবকটিকে তার নাম জিগ্যেস করেননি?

—করসিলাম। কইল, স্যারেরে কইবেন চঞ্চল সাহা আপনারে এই কার্ড দিছেন। সে আরও কইল, আমি ওনার একজন এজেন্ট।

আমি বললুম,—কর্নেল, ভগ্নাংশটা আর তো তবে জটিল মনে হচ্ছে না।

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। হালদারমশাই বললেন,—আমার সন্দেহ বারিনবাবু এই ব্যবসার লগে যুক্ত ছিল। আমি এখনও কইত্যাসি জগদীশবাবুই বারিনবাবুরে খুন করসেন।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—হালদারমশাই, আপনি এক কাজ করুন। এখনই মধুরবাবুর বাড়ি চলে যান। গিয়ে তাকে বলুন তার সঙ্গে আপনিও যদুগড়ে যাবেন। আপনার পরিচয় তো মধুরবাবু পেয়েছেন। আপনি এবার ওঁর দিদি নিরুপমার সঙ্গে দেখা করে আপনার আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে বলবেন, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আপনাকে মধুরবাবুর বিপদে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। নিরুপমাদেবী যেন আমাকে ফোন করে কথাটা যাচাই করে নেন। আর একটা কথা। সামান্য কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে আপনার এজেন্সির কনট্র্যাক্ট পেপারে ওঁদের সই করিয়ে নিন। বলবেন আইনের স্বার্থে এটা করা দরকার।

—হ বুসসি। কনট্র্যাক্ট পেপারে সই করলে মধুরবাবু আমার ক্লায়েন্ট হইয়া যাবেন। কোনও ঝামেলা বাধলে ওই কনট্র্যাক্ট পেপার আমার কাজে লাগবো।

কথাটা বলেই তিনি যথারীতি বেরিয়ে গেলেন। আমি বললুম,—তা হলে হালদারমশাই আর মধুরবাবু যদুগড়ে চলে যাচ্ছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—অপেক্ষা করো, আমরাও যদুগড়ে যাব। তার আগে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্পষ্টভাবে গড়ে নিতে হবে।

আমি জিগ্যেস করলুম,—আচ্ছা কর্নেল, ওই তিনটে ছবি সম্পর্কে কি কোনও চিন্তা-ভাবনা করেছেন?

—ও নিয়ে এখন চিন্তা-ভাবনা করে লাভ নেই। ছবি তিনটে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনও রাজপরিবারের ছবি।

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন,—প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। আমরা ব্রেকফাস্ট করে নিয়েই বেরিয়ে পড়ব।

—কোথায় যাবেন?

—এখন কোনও প্রশ্ন নয়। যথাসময়ে তুমি নিজেই তা জানতে পারবে।

পাঁচ

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললুম,—কাল বিকেলে আপনি একা এই গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন জিগ্যেস করতে ভুলে গিয়েছি।

কর্নেল বললেন,—পুরাতত্ত্ববিদ ডক্টর সুবিমল চক্রবর্তীর কাছে। তোমাকে সঙ্গে না নেওয়ার কারণ ছিল। ডক্টর চক্রবর্তীকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো। সেবার একটা দুষ্পাঠ্য প্রাচীন লিপির অর্থোদ্ধারে—

কথাটা মনে পড়ায় বললুম,—ও সেই রাগি ভদ্রলোক? যিনি চেঁচিয়ে কথা বললে ভাবেন তাঁকে ঠাট্টা করা হচ্ছে, আবার আস্তে কথা বললেও ভাবেন তাঁকে ব্যঙ্গ করে করা হচ্ছে?

কর্নেল হেসে উঠলেন,—কাজেই বুঝতেই পারছ, তোমাকে আবার দেখলে উনি খাপ্পা হয়ে আমাকেও ভাগিয়ে দিতেন। তোমাকে বলেছিলুম মনে পড়ছে, যাঁরা কানে কম শোনেন, তাঁরা খুব সহজেই রেগে যান।

—ওঃ সে এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। আপনি না থাকলে ভদ্রলোক আমাকে বিনা দোষে লাঠিপেটা করে ঘর থেকে বের করে দিতেন। তো কালকে আপনি ওই বৌদ্ধ সিলটা ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—ঠিক ধরেছ, ডক্টর চক্রবর্তীর মতে ওই সিলটা তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দির মাঝামাঝি সময় তৈরি হয়েছিল। তা ছাড়া ওঁকে ম্যাপটাও দেখিয়েছিলুম। ওঁর মতে ম্যাপে যে ইংরেজি অক্ষরগুলো লেখা হয়েছে, তা কোনও শব্দের প্রথম অক্ষর। যাই হোক, গাড়ি চালাতে-চালাতে কথা বললে অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলবে। দেখছ না এখন পিক আওয়ার শেষ হয়নি। —

কর্নেলের নির্দেশে আমি পার্ক স্ট্রিট দিয়ে ধর্মতলার মোড়ে যখন পৌঁছুলাম, তখন প্রচণ্ড জ্যাম। একটু বিরক্ত হয়ে বললুম,—আমরা যাচ্ছিটা কোথায় বললে কি আপনার মহাভারত অশুদ্ধ হবে!

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সহাস্যে বললেন,—না। তবে তোমাকে একটা চমক দেওয়ার ইচ্ছে আছে। কাজেই তুমি চুপ করে থাকো।

এরপর সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে সোজা বিডন স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছুলাম। কর্নেল ডাইনে বিডন স্ট্রিটে গাড়ি ঢোকাতে ইঙ্গিত দিলেন। কয়েকটা বাড়ির পর বাঁদিকের একটা গলির মুখে উনি গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে বললেন,—এখানে পার্ক করে রাখো, কোনও অসুবিধে হবে না।

গাড়ি লক করে কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। গলির ভেতর কিছুটা এগিয়েই দেখি ডানদিকে প্রাচীন আমলের একটা বিরাট দেউড়ি। তার ভেতরে তেমনি প্রাচীন একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির গড়নে ইতালীয় ভাস্কর্যের ছাপ স্পষ্ট। একতলা এবং দোতলায় মোটা-মোটা থাম। লনের দুপাশে ফুলের সমারোহ। গেটে কর্নেলকে দেখামাত্র একজন পেল্লাই চেহারার গুঁফো লোক সেলাম দিয়ে বলল,—আসেন, আসেন, কর্নেলসাহাব। হামার মালিক থোড়া আগে আমাকে খবর ভেজেছেন, কী কর্নেলসাহাব আসবেন। তা আপনার গাড়ি কুথায়?

কর্নেল বললেন,—বেশিক্ষণ থাকব না বলে গাড়ি গলির মোড়ে রেখে এসেছি। তা তুমি কেমন আছ রামলাল?

রামলাল গেট খুলে দিয়ে বলল,—আপকা কৃপা, হামি খুব ভালো আছি।

এইসময়েই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক গাড়িবারান্দার তলা থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে হন্ত-দন্ত এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বললেন,—রাজবাহাদুর আপনার আসার কথা আমাকে বলেছেন।

এতক্ষণে সত্যি চমকে উঠলুম। কারণ এই ভদ্রলোকের নাম অচিন্ত্যবাবু। ইনি কর্নেলের বাড়ি কয়েকবার গিয়েছিলেন। তারপরই মনে পড়ল ভানুগড় রাজবাড়ি থেকে চুরি যাওয়া অমূল্য কিছু জুয়েলস কর্নেল উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। সেই রহস্যময় কেসের সময় আমাকে আমার কাগজের কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়েছিলেন।

অচিন্ত্যবাবুও আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন,—নমস্কার, নমস্কার, জয়ন্তবাবু। তা আপনারা কি ট্যাক্সিতে এসেছেন?

কর্নেল বললেন,—না, আপনি তো জানেন আমার ছ্যাকড়া লালরঙের ল্যান্ডরোভার গাড়িটা বেচে দেওয়ার পর জয়ন্তর উৎকৃষ্ট ফিয়াটেই আমি চাপতে অভ্যস্ত। জয়ন্তর ঘাড়ে চেপেই ঘুরি।

অচিন্ত্যবাবু বললেন,—কী আশ্চর্য! গাড়ি কি বাইরে কোথাও রেখে আসছেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, কারণ রাজাসাহেবের সঙ্গে মাত্র কয়েকটা কথা বলেই আমরা অন্য জায়গায় যাব। গাড়ি ওখানেই থাক।

অচিন্ত্যবাবু আমাদের গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে একটা প্রশস্ত হলঘরে নিয়ে গেলেন। বনেদী রাজা-জমিদারের বাড়ির এইসব হলঘর কর্নেলের সাহচর্যে অনেক দেখেছি। এটা তার ব্যতিক্রম নয়। দেয়ালে বড়-বড় তৈলচিত্র। গোলাকার বিশাল শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে সারবদ্ধ গদিআঁটা চেয়ার, ইতস্তত প্রকাণ্ড চীনা ফ্লাওয়ার ভাস এবং বিবিধ ভাস্কর্য সাজানো। একপাশে আরামদায়ক সোফায় আমাদের বসতে বলে অচিন্ত্যবাবু কারপেট বিছানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলেন, সেই সময়ই কুকুরের হাঁকডাক কানে এল। আতঙ্কে দেখলুম দুটো প্রকান্ড বিদেশি কুকুরের গলায় চেন হাতে নিয়ে সিঁড়ির মাথায় ধপধপে সাদা ফতুয়া আর ধুতি পরে এক ভদ্রলোক আবির্ভূত হলেন। তাঁর চেহারায় আভিজাত্য স্পষ্ট। গলার কাছে পৈতে দেখা যাচ্ছিল। বুঝলুম তিনি ব্রাহ্মণ এবং এও বুঝলুম তিনিই রাজাসাহেব। তাঁর কণ্ঠস্বরও বেশ গম্ভীর। তিনি বললেন,—অচিন্ত্য এই বেয়াদপ দুটোকে বেঁধে রেখে এসো। নইলে ওরা আমাদের কথাবার্তায় প্রবলেন বাধাবে।

অচিন্ত্যবাবু কুকুর দুটোকে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর রাজাসাহেব রেলিং ধরে নামতে-নামতে সহাস্যে বললেন,—ডনি আর জনিকে সঙ্গে নিয়ে আসছিলুম কেন জানেন, কর্নেলসাহেব? আপনাকে যেন ওরা একটু বকে দেয়। কথাটা বলেই তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কর্নেল বললেন,—গতরাত্রে আপনি তো আমাকে নিজেই বকে দিয়েছেন। কারণ, আমি নাকি আপনাকে মন থেকে মুছে ফেলেছি।

রাজাসাহেব সোফায় আমাদের মুখোমুখি বসে বললেন,—তা বকেছি, কারণ আমার প্রিয় বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে যে দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির ক্যাকটাসটা পাঠিয়েছিলুম, তার প্রাপ্তিস্বীকার করেননি।

কর্নেল কপালে একটা মৃদু থাপ্পড় মেরে বললেন,—মাই গুডনেস! তাইতো! কিন্তু দোষটা আপনারই। সঙ্গে কোনও চিরকুট ছিল না। তাছাড়া আমিও তখন বাড়িতে ছিলুম না তাই পরে ওটার কথা ভুলে গিয়েছিলুম। কিন্তু রাজাসাহেব, আপনার তো উচিত ছিল একটা ফোন করে আমাকে জানানো।

রাজাসাহেব বললেন,—আলবত ফোন করেছিলুম।

—আমি নিশ্চয়ই ফোন ধরিনি, কারণ আমি তখন বাড়িতে ছিলুম না। নিশ্চয়ই আমার পরিচারক ষষ্ঠীচরণ ফোন ধরেছিল। যাগ্যে, আপনার পাঠানো ক্যাকটাস বাড়ছে। চমৎকার ফুল ফুটিয়েছে। এবার কাজের কথায় আসা যাক। কারণ হাতে সময় কম।

রাজাসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—আপনি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি। এই ভদ্রলোক আপনার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি।

সায় দিয়ে আমি নমস্কার করতেই তিনি আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন,—আপনার আমি ভক্ত। সত্যি বলতে কী, কর্নেলসাহেবকে আমি আপনার চোখেই দেখি।

কর্নেল বললেন,—রাজাসাহেব, আর নয়, এখনই উঠব। কাজের কথাটা—

বাধা দিয়ে রাজাসাহেব বললেন,—কফি আসছে, আপনিই তো বলেন, কফি নার্ভ চাঙ্গা করে। তা ছাড়া কতদিন পর আপনার সঙ্গে বসে আমি কফি খাব—এও আমার জীবনের একটা আনন্দ।

একটু পরেই অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে একজন পরিচারিকা কফির ট্রে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। তারপর সে কর্নেল ও আমাকে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে আবার দোতলায় উঠে গেল। রাজাবাহাদুর বললেন, অচিন্ত্য তুমি নিজের কাজে যাও।

অচিন্ত্যবাবু দোতলায় উঠে গেলেন। তারপর কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—কাল রাত্রে আপনাকে ফোনে যদুগড়ের রাজবাড়ির কেয়ারটেকার মধুরকৃষ্ণ মুখার্জির কথা বলেছি। যদুগড়ের কুমারবাহাদুর তো আপনার বেয়াই। মধুরবাবুকে আপনি অনেক বছর ধরেই চিনতেন। বিশেষ করে আপনি যখন ভানুগড়ে থাকতেন তখন শুনেছি আপনি প্রায়ই বেয়াই বাড়ি যেতেন। আমার প্রশ্ন, মধুরবাবু সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়ই একটা ধারণা হয়েছিল। অর্থাৎ সে কী প্রকৃতির লোক, আপনি নিশ্চয়ই টের পেয়েছিলেন।

রাজাসাহেব বললেন,—আরে সে তো এক বাবুর বাবু। সবসময়ই খুব সেজে-গুজে থাকত, সেন্ট মাখত। কিন্তু তাকে তো আমার খারাপ বলে মনে হয়নি।

—আপনার বেয়াইমশাই কেন ওকে বছর তিনেক আগে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আপনি কি তা জানেন?

রাজাসাহেব এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—রুদ্রনারায়ণ, অর্থাৎ আমার বেয়াইমশাই গতবার কলকাতায় এসে আমার বাড়িতেই উঠেছিলেন। তার কাছে তত বেশি কিছু শুনিনি। তবে উনি বলেছিলেন, মধুর রাজবাড়ি থেকে একটা অমূল্য প্রাচীন জিনিস হাতিয়েছে বলে তাঁর সন্দেহ।

—জিনিসটা কী তা আপনাকে উনি বলেননি?

রাজাসাহেব চাপাস্বরে বললেন,—আমার বেয়াইমশাই বাবার বাতিক ছিল পুরাদ্রব্য সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত জাদুঘর বানানোর।

—জানি। পাতালের সেই গোপন জাদুঘর আমি দেখে এসেছি। কিন্তু জিনিসটা কী?

আমাকে অবাক করে রাজাসাহেব বললেন,—একটা খুব প্রাচীন বৌদ্ধ সিল। তবে মধুরবাবুকে উনি হাতেনাতে ধরেননি, শুধু সন্দেহ হয়েছিল। তা ছাড়া মধুরবাবু নাকি স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীর কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন বলে খবর পেয়েছিলেন।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—অসংখ্য ধন্যবাদ রাজাসাহেব। আমি শুধু এই গোপন খবরটুকুই আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলুম।

রাজাসাহেব ব্যগ্রভাবে বললেন,—বাই এনি চান্স আমার বেয়াইমশাই কি আপনাকে সেই হারানো সিল-এর সন্ধানে অনুরোধ করেছেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—না। আমি অন্য কেস-এর সূত্রে সেই হারানো সিল-এর কথা জানতে পেরেছি। যাইহোক, আপনাকে একটা অনুরোধ, আপনি যেন এ বিষয়ে আপনার বেয়াইমশাইকে কোনও কথা জানাবেন না। যথা সময়ে আপনি এবং আপনার বেয়াইমশাই সবই জানতে পারবেন। কিন্তু এখন যদি আপনি তাঁকে কিছু জানান, তা হলে, আমার সব চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি এবার আসি।

রাজাবাহাদুর গম্ভীরমুখে দরজা অবধি আমাদের এগিয়ে দিলেন। তারপর আমরা গেটের দিকে চললুম।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে গাড়িতে চেপে গাড়ি স্টার্ট দিলুম। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, আমার সঙ্গে আজ বেরিয়ে যা জানতে পেরেছ, তা যেন ঘুণাক্ষরে অন্য কারও কানে না ওঠে।

বললুম—কখনও কি আমি তেমন কিছু করেছি?

—করোনি, কিন্তু তোমাকে সতর্ক করা দরকার আছে।

—এবার কোথায় যাবেন?

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ব্র্যাবোর্ন রোডে। চলো, আমি শর্টকাটে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

বললুম,—আমার ধারণা আপনি জগদীশপ্রসাদ রাওয়ের মহাবলী অকসন হাউসে যাচ্ছেন।

—তুমি বুদ্ধিমান।

তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। অলিগলি রাস্তা ঘুরে আমরা ব্র্যাবোর্ন রোডে পৌঁছুলাম। তারপর কর্নেলের নির্দেশে একটা পার্কিং-এর জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানেই গাড়ি দাঁড় করালুম।

কর্নেল বললেন,—গাড়ি লক করে চলে এসো।

রাস্তার ওপারে গিয়ে একটা গলির ভেতর কর্নেল ঢুকলেন। তারপর বললেন,—এই বাড়িটাই মনে হচ্ছে।

বাড়িটা ছ'তলা। দোতলায় সাইনবোর্ড—'মহাবলী অকসন হাউস'।

দোতলায় গিয়ে বারান্দায় কয়েক'পা হেঁটে হলঘরের মতো একটা বিরাট ঘর চোখে পড়ল। ভেতরে অবশ্য মোটা-মোটা থাম দেখা যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল নানা ধরনের সেকেলে আসবাবপত্র। হলঘরটার প্রথম দরজায় কোলাবসিবল গেট এবং সেটা তালাবন্ধ। কয়েক-পা এগিয়ে আর একটা কোলাবসিবল গেট। কিন্তু সেটা খোলা। গেটের পাশে টুলে একজন বন্দুকধারী এবং উর্দি পরা লোক বসে আছে। বুঝলুম সে নিরাপত্তারক্ষী। ভেতরে কোনও লোক দেখলুম না। কর্নেলকে দেখে সম্ভবত বিদেশি ভেবেই রক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম দিল। কর্নেল তাকে হিন্দিতে বললেন,—জগদীশপ্রসাদ রাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সাহেবকে হিন্দি বলতে দেখে রক্ষী একটু অবাক হয়েছে মনে হচ্ছে। সে ইশারায় পাশে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

সেই ঘরের দরজায় অবশ্য কোনও লোক নেই। ভেতরে ঢুকে দেখি একটা করিডোর। আর সার-সার কয়েকটা কেবিন। একটা কেবিন থেকে বেয়ারা গোছের একজন লোক বেরিয়ে এসে কর্নেলকে দেখে থমকে দাঁড়াল। কর্নেল হিন্দিতে বললেন,—মিস্টার রাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বলে তিনি তার হাতে নিজের নেমকার্ড গুঁজে দিলেন।

লোকটা তখনই যে কেবিন থেকে বেরিয়েছিল, সেই কেবিনে ঢুকে গেল। তারপর প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে সেলাম দিয়ে বলল,—আপলোগ আইয়ে।

কর্নেলের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে দেখলুম প্রকাণ্ড অর্ধবৃত্তাকার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে একজন তাগড়াই চেহারার টাই-স্যুট পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন। কর্নেল বাংলায় বললেন, —আপনি কি মিস্টার জগদীশপ্রসাদ রাও?

মিস্টার রাও খাঁটি বাঙালির মতোই বললেন,—আগে বসুন, তারপর কী বলতে চান বলুন।

আমরা দু-জনেই পাশাপাশি বসলুম। তারপর কর্নেল বললেন,—আপনার এই অকশন হাউসের নামডাক শুনেছি। তবে আমি সেজন্য আসিনি। এসেছি অন্য একটা কারণে। আমার এক আত্মীয় বারিন দত্ত আপনার বাড়িতে ছিল।

মুহূর্তে মিস্টার রাওয়ের চোখদুটো জ্বলে উঠল। আস্তে বললেন,—তাকে কেউ গত শুক্রবার রাতে মার্ডার করেছে। আপনি কি পুলিশের কাছে সেই খবর শুনে আমাকে কিছু জিগ্যেস করতে এসেছেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। বারিন আপনার বাড়িতে খুন হয়েছে তা জানি। আমি শুধু আপনার কাছে জানতে এসেছি, তাকে কেউ খুন করার পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?

মিস্টার রাও সেইরকম জ্বলন্ত চোখ পাকিয়ে বললেন,—আমি জানতুম না সে একজন চোর। সে আমাকে বলেছিল পুরোনো জিনিস কেনাবেচার ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা আছে। আমি যদি তাকে থাকবার জায়গা দিই তাহলে সে আমাকে আমার কাজে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু সে আমার অফিস থেকে তিনটে দামি পোর্ট্রেট চুরি করেছিল। সেটা তার মৃত্যুর পর জানতে পেরেছি। কাজেই ওর সম্পর্কে আমি কোনও কথা বলব না। আপনারা আসতে পারেন।

ছয়

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ জগদীশবাবুর দিকে ঘুরে বললেন,—একটা জরুরি কথা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি। আশা করি আপনি সঠিক জবাব দেবেন।

জগদীশবাবু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন,—জবাব দেওয়ার মতো হলে তবেই দেব।

কর্নেল বললেন,—আপনি কখনও আপনার ব্যবসার কাজে কি যদুগড়ে গিয়েছিলেন?

—যদুগড়? কোন যদুগড়?

—বিহারের যদুগড়।

জগদীশবাবু একটু চমকে উঠলেন মনে হল। তিনি বললেন,—কেন?

—সেখানকার রাজবাড়িতে অনেক মূল্যবান জিনিস আছে।

—তা সব রাজবাড়িতেই থাকতে পারে।

এবার কর্নেল একটু গম্ভীর কণ্ঠস্বর বললেন,—আপনি যদুগড় রাজবাড়ির কেয়ারটেকার মধুরকৃষ্ণবাবুকে কি চেনেন?

আবার লক্ষ করলুম জগদীশবাবু কেমন যেন বিব্রত বোধ করছেন। তিনি আস্তে বললেন,—তাকে আমি চিনি না।

কর্নেল তেমনই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বললেন,—আমার কাছে খবর আছে আপনি তাকে চিনতেন, এবং এখনও চেনেন। কারণ গত তিনবছর ধরে মধুরবাবু কলকাতাতেই আছেন এবং তিনি বারিনবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু। তাই প্রায়ই আপনার বাড়িতে, অর্থাৎ বারিনবাবুর কাছে যাতায়াত করতেন।

জগদীশবাবু এবার যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তাঁর হাবভাব একেবারে বদলে গেল। তিনি বললেন,—আপনি কে? আপনার প্রকৃত পরিচয় কী?

কর্নেল আগের মতো মেজাজে বললেন,—আপনার কাছে একজন প্রাইভেট ডিকেটিভ মিস্টার কে. কে. হালদার গিয়েছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু কী ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—মিস্টার হালদারের পিছনে আপনি কেন একজন খুনি দুর্বৃত্তকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন? না, আপনি কিছু গোপন করার চেষ্টা করবেন না। আমি সবই জানি।

—আপনি কি সি. বি. আই. অফিসার?

—আপনি আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। মধুরবাবু সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা ঠিক কি না?

জগদীশবাবু একটু ইতস্তত করার পর বললেন,—মধুরবাবু কি না জানি না, একজন বেঁটে বলিষ্ঠ গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক বারিনবাবুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা করতে আসতেন। পোশাক-আশাকে তাঁকে সাধারণ লোক বলেই মনে হতো।

—গত শুক্রবার বিকেলে আপনি কি বাড়িতে ছিলেন?

—না! ব্যবসার কাজে বেরিয়েছিলুম।

—কখন বাড়ি ফিরেছিলেন?

—রাত দশটার পরে।

—বারিনবাবুর ঘরে তখন কি আলো জ্বলছিল?

—অত লক্ষ করিনি। তা ছাড়া রাতে বারিনবাবু মাতাল অবস্থায় থাকতেন। তাই তাঁকে এড়িয়ে থাকতুম।

কর্নেল তাঁকে বললেন,—আপনি আমাকে যেসব কথা বললেন, পুলিশ আপনাকে জেরা করলে যেন ঠিক তাই বলবেন।

বলে কর্নেল শার্টের বুক পকেট থেকে একটা খুদে টেপ রেকর্ডার বের করে তাঁকে দেখালেন এবং বললেন,—আপনি উলটো কথা বললে বিপদে পড়বেন, কারণ এই যন্ত্রে আপনার সবকথা রেকর্ড করা হয়ে গেছে। আরও শুনুন, আপনি যদি মিস্টার হালদারের মতো আমাদের পিছনেও গুন্ডা লেলিয়ে দেন, তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর।

আমাকে অবাক করে কর্নেল তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে তাঁর রিভলভারটি দেখিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণে দেরি করলুম না।

এরপর রাস্তা পেরিয়ে আমার গাড়িতে ওঠার পর কর্নেল হেসে উঠলেন। বললুম,—হাসছেন কেন? ব্যাপারটা তো খুব সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে। আপনি কী করে জানলেন যে মধুরবাবুর ও বাড়িতে যাতায়াত ছিল?

কর্নেল বললেন,—আন্দাজে বহুবার ঢিল ছুড়ে লক্ষভেদ করতে পেরেছি। এবারও পারলুম। সেজন্যই হাসছি। তা ছাড়া সঠিক জায়গায় ঢিলটি লাগলে অন্যপক্ষের কী অবস্থা হয়, তা তো নিজের চোখেই দেখলে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে যেতে-যেতে বললুম—এবার নিশ্চয়ই বাড়ি?

কর্নেল বললেন,—অবশ্যই।

যেতে-যেতে বলুলুম,—এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। মধুরবাবু বারিনবাবুর কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন, আপনি এমনটা কী করে অনুমান করলেন? সব অনুমানের মোটামুটি এক অস্পষ্ট ভিত্তি তো থাকেই!

কর্নেল বললেন,—ওটা আমার নিছক একটা অঙ্ক।

—তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে মধুরবাবু যে ঘটনার কথা বলে ব্রিফকেসটা নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ঘটনা একেবারে মধুরবাবুর বানানো।

কর্নেল বললেন,—এখন এসব কথা নয়। বাড়ি ফিরে স্নানাহার করার পর বিশ্রাম দরকার।

—কেন? রহস্যের জটিল জট তো প্রায় আপনাআপনি খুলেই পড়েছে।

কর্নেল টুপি খুলে মাথার টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—জয়ন্ত, তোমাকে বহুবার যুক্তিশাস্ত্রে অবভাস তত্ত্বের কথা বলেছি। যা যেমনটি দেখছ তা সবময়ই সর্বক্ষেত্রে তেমন নাও হতে পারে। রেললাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি দেখবে দুটো লাইন যেন ক্রমশ কাছাকাছি হতে-হতে একত্রে মিশে গেছে। কিন্তু ওটা তোমার দেখার ভুল।

এরপর আর কথা বলা চলে না। বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় পৌনে একটা বেজে গিয়েছিল। স্নানাহারের পর খেয়ে নিয়ে কর্নেল ড্রইংরুমে তাঁর ইজিচেয়ারে বসেছিলেন এবং চুরুট টানছিলেন। আমি যথারীতি ডিভানে চিৎপাত হয়ে ভাতঘুমের চেষ্টা করছিলুম। একটু পরে লক্ষ করলুম, কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়েল করছেন। তাপপর তিনি মৃদু স্বরে কার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন বোঝা যাচ্ছিল না।

এই অবস্থায় ভাতঘুমের হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। সেই ভাতঘুম ভেঙেছিল ষষ্ঠীর ডাকে,—সাহেব!

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তাকে জিগ্যেস করেছিলুম,—আজ তোমার বাবামশাই আমার গাড়ি চুরি করেননি তো?

ষষ্ঠী সহাস্যে বলল,—আজ্ঞে দাদাবাবু, বাবামশাই আপনার গাড়ি চুরি করেননি। লালবাজারের সেই পুলিশবাবু, কী যেন নাম তার—

বললুম,—নরেশবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। লালবাজারের নরেশবাবুই বটে। ওই যাঃ, ছাদের বাগানে কাকের বড় উৎপাত।

বলে সে হন্ত-দন্ত হয়ে চলে গেল। ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সাব-ইনসপেক্টর নরেশ ভদ্র এসে কর্নেলকে তুলে নিয়ে গেছে। তাহলে দেখছি রহস্যটা আবার অন্যদিকে মোড় নিল।

কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিলুম। হালদারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। দুষ্টুমি না করে বললুম—আপনি কোথা থেকে বলছেন।

—জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেল স্যার নেই?

—না বেরিয়েছেন।

—আমি যদুগড় থিক্যা কইত্যাসি। আমি উঠসি সরকারি ডাকবাংলোতে। আর মধুরবাবু আছেন রাজবাড়িতে। একটু আগে মধুরবাবু টেলিফোনে আমারে কইলেন, কুমারবাহাদুর তাঁর ফিরে যাওয়াতে খুশি হয়েছেন। কিন্তু কুমারবাহাদুরের জামাই তাঁকে যেন থাকতে দিতে চান না। তাই তিনি এক বাল্যবন্ধুর বাড়িতে গিয়া থাকবেন ভাবসেন। আমি তাঁরে কইলাম, অপমান সহ্য কইরা অন্তত আরও একটা দিন থাকেন। আমি কর্নেলস্যারেরে ফোন করত্যাসি, যাতে তিনি শিগগির আইসা পড়েন।

বললুম,—কর্নেল এলেই কথাটা বলছি। আর কোনও জরুরি কথা আছে? যদুগড়ের পশ্চিমে নদীর ধারে আদিবাসিরা বুনো আলুর খোঁজে মাটি খুঁড়ত্যাছিল। সেখানে তারা একটা পাথরের মূর্তি দেখসে। সেই মূর্তি দেখার জন্য সেখানে সারাদিন খুব ভিড়।

—আপনি যাননি দেখতে?

—না। কর্নেল স্যার আইলে ওনারে শিগগির আইতে কইবেন।

হালদারমশাই লাইন কেটে দিলেন। আর প্রায় মিনিট পনেরো পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তখন তাঁকে হালদারমশাইয়ের টেলিফোনের কথাটা বললুম। তিনি বললেন,—আজ রাতের ট্রেনেই আমরা যদুগড় যাচ্ছি।

একটু পরে ষষ্ঠী কফি আর স্ন্যাকস দিয়ে গেল ঘরের আলোও জ্বেলে দিল। কফি খেতে-খেতে বললুম,—লালবাজারে নরেশবাবু আপনাকে নাকি উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—শ্রীমান ষষ্ঠীচরণের শ্রীমুখের খবর তা বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ, জয়ন্ত, ষষ্ঠীও ক্রমশ গোয়েন্দা হয়ে উঠছে।

বললুম,—তা হতেই পারে। আপনি বলুন না ব্যাপারটা কী।

কর্নেল বললেন,—ধূর্ত জগদীশ রাও লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে ফোন করে আমার চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল। এবং সবকথা জানিয়েছিল। ভাগ্যিস ফোনটা ধরেছিলেন নরেশবাবু! তিনি ওকে আরও ভয় দেখিয়ে বলেছেন, আমি সত্যিই সি.বি.আই. অফিসার। নিহত বারিনবাবু সম্পর্কে এখনও কোনও গোপন তথ্য থাকলে যেন পুলিশকে জানিয়ে দেয়।

—কিন্তু আপনাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন নরেশবাবু?

—জগদীশবাবুর কথায় নরেশবাবু জেনে গিয়েছিলেন বারিনের হত্যাকাণ্ডের রহস্যে আমি নাক গলিয়েছি। তাই নরেশবাবু আমার কাছে জানতে এসেছিলেন কথাটা সত্যি কি না। যাইহোক সেই সুযোগে আমি ওঁর কাছে বারিনবাবুর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং ফরেনসিক তদন্তের ফলাফল জানতে চেয়েছিলুম। নরেশবাবু সঙ্গে কেস ফাইল আনেননি। তাই ওঁর সঙ্গে লালবাজারে গিয়ে সেই রিপোর্ট দেখে এলুম।

—রিপোর্টে কী দেখলেন, বলতে আপত্তি আছে?

—না। গুলি করা হয়েছিল বারিনবাবুর কপালে আগ্নেয়াস্ত্রের নল ঠেকিয়ে। গুলিটা পয়েন্ট বত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভার থেকে ছোঁড়া। ফরেনসিক রিপোর্টে বারিনবাবুর হাতের মুঠোর কাঁচাপাকা চুলের গোছা পরচুলা নয়। তিনি আততায়ীর মাথার চুল খামচে ধরেছিলেন। খুনির মাথার চুলগুলো ছিল লম্বা। আর একটা ব্যাপার, নরেশবাবুর নিজের মনে হয়েছে খুনির রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো ছিল, তাই কেউ গুলির শব্দ শুনতে পায়নি। যাই হোক, লালবাজারে বসেই তোমার জন্য ট্রেনের ফার্স্টক্লাসের একটা স্লিপার বুক করতে বলেছি। তুমি তো জানো, ইস্টার্ন রেলের সব অফিসারই আমাকে খানিকটা পাত্তা দেন।

এবার কর্নেল কফিতে মন দিলেন। আমি জানি রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার হিসেবে কোথাও ট্রেনে বা প্লেনে যেতে কর্নেলের পয়সা খরচ হয় না। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের চোখেও উনি একজন ভি.ভি.আই.পি.।

রাত দশটায় ডিনার সেরে নিয়ে কর্নেলের নির্দেশে তৈরি হয়ে নিলুম। মাঝে-মাঝে কর্নেলের ডেরায় আমাকে কাটাতে হয় বলে আমার কয়েক প্রস্থ পোশাক-আশাক এখানেই থাকে। আর যেহেতু আমি কর্নেলের কনিষ্ঠ সহযোগী এবং তাঁর রহস্যভেদের কাহিনি ফলাও করে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লিখি, সেইহেতু কর্নেলের কথামতো বাইরে বেরুলেই আমাকে পকেটে লাইসেন্সড রিভলভার এবং কিছু বুলেট রাখতে হয়।

কর্নেল বলেছিলেন, হাওড়া স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন ছাড়বে রাত সাড়ে এগারোটায়। তাই সাড়ে দশটাতেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম। ছ'নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে যেতেই একজন রেলওয়ে অফিসার কর্নেলকে নমস্কার করে তাঁর হাতে যেটা গুঁজে দিলেন, সেটা আমারই টিকিট। কর্নেল পার্স বের করে টাকা মিটিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—থ্যাঙ্কস রজত। তুমি জয়ন্তকে দেখতে চেয়েছিলে তো, এই সেই জয়ন্ত।

ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করলেন। প্রতি নমস্কার করে আমি কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। কারণ অবাক হয়ে দেখলুম কথাটা বলেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কাছে গিয়ে বললুম,—এখনও তো গাড়ি ছাড়ার সময় হয়নি। আপনি হঠাৎ ঘোড়দৌড় শুরু করলেন কেন?

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—মহাবলী অকশন হাউসের মালিক সেই জগদীশবাবুকে দূর থেকে লক্ষ করেছি। তিনি আমাদের দেখতে পেয়েছেন কি না জানি না। হুইলার বুকস্টলের ওপাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা ব্রিফকেস।

বললুম,—গিয়ে জিগ্যেস করলেই হয়, তিনি যদুগড় যাচ্ছেন কি না।

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন,—এই থামের আড়ালে আমরা দাঁড়াই। দেখা যাক উনি আমাদের দেখতে পেয়েছেন কি না।

প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমি জিগ্যেস করলুম,—এই ট্রেনেই কি আমরা যাব?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, আমরা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। এই কামরাতেই আমরা যাব।

—তা হলে উঠেপড়া যাক।

—এক কাজ করো। তুমি উঠে গিয়ে বারো নম্বর ক্যুপের একটা লোয়ার সিটে বসে পড়ো, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

—তার মানে জগদীশবাবু এই ট্রেনেই চাপছেন কি না তা দেখতে চান।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—যা বললুম করো। তুমি ডান দিকে কাত হয়ে সবেগে পা ফেলে দরজায় উঠবে।

তাঁর কথামতো আমি কামরায় উঠে গেলুম। তারপর বারো নম্বর ক্যুপ খুঁজে নিয়ে বাঁ-দিকে নিচের বার্থে জানালার কাছে বসলুম। আমার একটা সুটকেস আর ব্যাগ সিটের তলায় ঢুকিয়ে রাখলুম। তারপর জানলা দিয়ে কর্নেলকে খুঁজলুম। তাঁর পিঠের কিটব্যাগটি যথারীতি আঁটা আছে এবং চেনের ফাঁক দিয়ে প্রজাপতি ধরার জালের লাঠির কিছু অংশ মাথা উঁচিয়ে আছে। ডান হাতে একটা গাবদাগোবদা ব্যাগ। তিনি হুইলার স্টলের দিকেই তাকিয়ে আছেন। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি ট্রেনে উঠলেন। তারপর বারো নম্বর ক্যুপে ঢুকে ডান দিকে লোয়ার বার্থে বসলেন। জিগ্যেস করলুম,—জগদীশবাবুকে কি এই ট্রেনে উঠতে দেখলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ভদ্রলোক কোটিপতি। বাড়িতে এবং অফিসে এয়ারকন্ডিশনড ঘরে থাকেন। কাজেই এই ট্রেনেও তিনি এ.সি. কম্পার্টমেন্টে চেপে যাবেন তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

—আচ্ছা কর্নেল, এমন তো হতে পারে উনি এই ট্রেনে দিল্লি যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, তাও যেতে পারেন। তবে যদুগড় স্টেশনে নেমে তুমিও একটু সতর্ক থেকো এবং চোখ খোলা রেখো।

—তার মানে আমাদের যেন তিনি দেখতে না পান—এই তো?

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল ট্রেন ছাড়ার খবর। তারপরই হুইসেল দিয়ে ট্রেনটা চলতে শুরু করল। সেই সময়েই কি একটা অস্বস্তি এবং আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসল। জগদীশবাবু এই ট্রেনে যাচ্ছেন!

সাত

যদুগড় স্টেশনে ট্রেনটা যখন থেমেছিল, তখন ভোর পৌনে ছ'টা বাজে। কর্নেলের পিছনে সাবধানে নেমে বললুম,—জগদীশবাবুকে কি দেখতে পাচ্ছেন?

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপচাপ থাকতে বললেন। মাঝারি স্টেশন কিন্তু ট্রেনটা দিল্লি যাবে বলেই বড্ড ভিড়। প্রায় আধঘণ্টা সামনে টি-স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে দুজনে চা খেলুম। চা খেয়ে কর্নেল চুরুট ধরালেন। সেই চুরুট শেষ হওয়ার পর তবে তিনি পা বাড়ালেন। জগদীশবাবুর কথা আর তাঁকে জিগ্যেস করলুম না।

গেটে গিয়ে দেখলুম কয়েকটা বাস আর অজস্র রিকশা নিচের চত্বর থেকে সামনের রাস্তায় পৌঁছুনোর জন্য যেন যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার অবাক লাগল ঘন কুয়াশা দেখে। কুয়াশায় সবকিছু ঢেকে আছে। আর শীতের কথা বলার নয়।

জিগ্যেস করলুম,—আমরা কোন বাহনে চেপে যাব? একে-একে সবগুলোই তো চলে গেল।

কর্নেল হাসলেন,—ওই দ্যাখো, একটা জিপ এগিয়ে আসছে।

অবাক হয়ে বললুম,—ওটা তো পুলিশের জিপ মনে হচ্ছে।

কর্নেল কিছু বলার আগেই জিপটা এসে আমাদের কাছাকাছি থেমে গেল। তারপর একজন পুলিশ অফিসার জিপ থেকে নেমে কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বললেন,—একটু দেরি হয়ে গেল স্যার।

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—মোটেও দেরি হয়নি।

কর্নেল জিপের সামনে উঠলেন এবং পিছনের সিটে ওঠার জন্য আমাকে অনেক কসরত করতে হল। পুলিশ অফিসার জিপে স্টার্ট দিয়ে বললেন,—আমি কখনও আপনাকে স্বচক্ষে দেখিনি। আমার সৌভাগ্য যে আপনার সেবা করতে পারছি।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—আপনার পরিচয়ই তো এখনও দিলেন না।

—স্যার আমার নাম শাহেদ খান। আমার বাংলা বলা শুনে আপনি অবাক হতে পারেন। আসলে আমার বাবা ইউ.পি.-র লোক। আর মা কলকাতার বাঙালি মেয়ে, আমি কলকাতাতেই মানুষ হয়েছিলুম।

কুয়াশায় চারদিক ঢাকা থাকলেও আবছা দেখা যাচ্ছিল উঁচু-নিচু নানা আকারের টিলা-পাহাড়। চড়াই-উতরাই হয়ে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর আমরা একটা নদীর ব্রিজ পেরিয়ে গেলুম। নদীতে তত জল নেই। বালির চড়া আর কালো-কালো পাথর দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে জিপ বাঁয়ে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তায় এগিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা একটা বাংলোর সামনে পৌঁছুলাম। মিস্টার খান বললেন, —এটা যদুগড়ের এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের গেস্টহাউস বলতে পারেন। এস.পি. সাহেবের মেসেজ পেয়েই ও.সি. মিস্টার জয়রাম পাণ্ডে এই বাংলোটাই আপনার জন্য ঠিক করেছেন। শুনেছি আপনি প্রকৃতির মধ্যে ঘুরতে ভালোবাসেন। তাই আমার ধারণা আপনার এখানে থাকতে ভালোই লাগবে।

একটা টিলার গায়ে এই একতলা বাংলোতে ঢুকে আমার ভালোই লাগল। বাংলোর চৌকিদার আমাদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে একটা ঘরে ঢোকাল। কর্নেল তখনও লনে দাঁড়িয়ে মিস্টার খানের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

তারপর মিস্টার খান জিপ নিয়ে চলে গেলেন এবং কর্নেল এসে বাংলোয় ঢুকলেন। বললুম—কখনও দেখিনি আপনি রহস্যের সমাধানে পুলিশের অতিথি হয়েছেন, আমার মাথায় একটা ধাঁধা ঢুকে গেছে।

কর্নেল মিটি-মিটি হেসে বললেন,—তুমি কি দ্যাখোনি, বরাবরই রহস্যের শেষ দৃশ্যে আমাকে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়।

চমকে উঠে বললুম,—বলেন কী? আপনি বারিনবাবুর হত্যা রহস্যের শেষ দৃশ্যে পৌঁছে গেছেন, অথচ আমি আপনার পাশে থেকেও কিছু টের পেলুম না?

কর্নেল পিঠের কিটব্যাগ এবং গলায় ঝোলানো ক্যামেরা ও বাইনোকুলার খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর মাথার টুপি খুলে রেখে বললেন,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এবং একটু বুদ্ধি থাকলেই চারপাশে কী হচ্ছে টের পাওয়া যায়। না ডার্লিং, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই মোটেই বলছি না, দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধি তোমার যথেষ্টই আছে। তবে তুমি তা খরচ করতে বড্ড আলসেমি করো—এই যা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলোর চৌকিদার ট্রেতে কফি আর স্ন্যাকস নিয়ে এল। কর্নেল তাকে হিন্দিতে জিগ্যেস করলেন,—তোমার নাম কী?

সে সেলাম দিয়ে বলল,—সাব, হামার নাম গয়ানাথ।

—তোমার বাড়ি যদুগড়ে?

—হাঁ সাব।

—তুমি যদুগড়ের রাজবাড়ি কেয়ারটেকার মধুরবাবুকে চেনো?

—জি সাব, ওই বাবুকে হামি চিনতুম। তিনবছর আগে রাজবাড়ি থেকে তাকে কুমারবাহাদুর তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলে সে একটু হেসে উঠল,—তাজ্জব বাত সাব, কাল বিকেলে সেই মধুরবাবুকে আবার দেখতে পেলুম। বাজারে এক ব্যবসায়ী আছে। তার টি.ভি., ক্যামেরা, এইসব জিনিসের কারবার। মধুরবাবু তার টেবিলের সামনে বসে চা খাচ্ছিলেন।

—তা হলে মধুরবাবু আবার যদুগড়ে ফিরেছেন?

—আপনি কি তাকে চেনেন সাব?

—হ্যাঁ, চিনি।

—মধুরবাবুর নামে এখানে বদনাম আছে। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।

কথাটা বলেই গয়ানাথ চলে গেল।

কফি খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আমি বাথরুম থেকে আসছি ইতিমধ্যে যদি টেলিফোন বাজে তুমি ধরবে এবং একটু অপেক্ষা করতে বলবে।

বলে তিনি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। মিনিট দশেক পরে পোশাক বদলে তিনি ফিরে এলেন। বললুম,—কেউ আপনাকে ফোন করেনি।

কর্নেল বললেন,—তা হলে আমি হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব।

নোটবই খুলে নম্বর দেখে তিনি ডায়াল করলেন। সাড়া পেয়ে বললেন,—আমি মিস্টার কে. কে. হালদারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।...কী হালদারমশাই, কেমন বুঝছেন?...হ্যাঁ আমরা এসে গেছি।...ধরমচাঁদ লাখোটিয়ার বাংলোতে উঠেছি। আপনি চলে আসুন।

ততক্ষণে কুয়াশা সরে রোদ ফুটছে। বাংলোর নিচে কিছুটা দূরে এই নদীটা দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারে আগাছার জঙ্গলের ভেতর বড়-বড় কালো পাথর হাতির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার ওধারে ঘন শালবন।

মিনিট কুড়ি পরে সাইকেল রিকশায় চেপে গোয়েন্দা প্রবর আবির্ভূত হলেন। কর্নেল বারান্দায় গিয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করে ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—একখান আশ্চর্য খবর লইয়া আইসি। আমি বাংলোর বারান্দায় বইয়া চা খাইত্যাসি, সেই সময়ই দেখলাম, কলকাতার সেই জগদীশবাবু একটা গাড়ি থিক্যা নামলেন, তারপর তিনি একটা বাড়ির বারান্দায় উঠলেন। গাড়িখান বাড়িটার পাশের গ্যারেজ ঘরে ঢুকল। কিন্তু আমার চোখ ছিল জগদীশবাবুর দিকে একটু পরে দরজা খুইল্যা এক ভদ্রলোক বারাইলেন। তারপর জগদীশবাবুরে ঘরের ভেতর লইয়া গেলেন। সেই সময়ই বাংলোর চৌকিদার কইল আমার টেলিফোন আছে।

যাইহোক ফোনে আপনার কথা শুইন্যা এখানে আসবার সময়ই বাড়িটা লক্ষ করসি। গেটে ইংরিজিতে লেখা আছে 'মাতাজি ধাম'। তার নিচে লেখা আছে হরদয়াল অগ্রবাল।

· আমি বলে উঠলুম,—সেই হরদয়ালবাবুর বাড়ি? যিনি স্মাগলিং করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন? কিন্তু এখন তো তিনি বেঁচে নেই, কাজেই হালদারমশাই যাঁকে দেখেছেন, তিনি তাঁর ছেলে রামদয়াল।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—আঃ জয়ন্ত, হালদারমশাইকে কথা বলতে দাও।

বকুনি খেয়ে চুপ করে গেলুম। হালদারমশাই বললেন,—এবার মধুরবাবুর কথা শোনেন, কাইল সন্ধ্যায় উনি আমার কাছে আইসিলেন। তিনি কইলেন, কুমারবাহাদুর জামাই রাজবাড়িতে তাঁর থাকা পছন্দ করসে না। তাই তিনি তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে থাকবেন। তারপর আপনারা এলে তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। কাইল দুপুরে আদিবাসিরা বুনো আলুর লতা খুঁজতে গিয়ে কী একটা দেবতার মূর্তি উদ্ধার করসে। সেই মূর্তি এখন—।

কর্নেল তার কথার ওপরে বললেন,—পুলিশের জিম্মায়।

হালদারমশাই হতভম্ব হয়ে বললেন, আপনি ক্যামনে জানলেন?

কর্নেল বললেন,—পুলিশ সূত্রে জেনেছি। যাইহোক, এবার আপনাকে একটু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি। আপনি আপনার বাংলো থেকে 'মাতাজি ধাম' বাড়িটার দিকে লক্ষ রাখবেন। দৈবাৎ যদি মধুরবাবুকে ওই বাড়িটার কাছে দেখতে পান, অমনি আমাকে টেলিফোনে খবর দেবেন। এক মিনিট, বরং আপনি এখনই রাজবাড়িতে গিয়ে আগে খবর নিন মধুরবাবু নামে কেউ ওখানে আছেন কি না। জিগ্যেস করলে বলবেন, মধুরবাবুর সঙ্গে আপনার চেনাজানা আছে।

হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—যাই গিয়া। তবে একটা কথা কর্নেলস্যার। রাজবাড়িতে যদি মধুরবাবু না থাকেন আমি কি মাতাজি ধামে এসে কারুকে জিগাইমু?

কর্নেল বললেন,—ওঃ না। আপনি শুধু লক্ষ রাখবেন বাড়িটার দিকে।

হালদারমশাই যথারীতি সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল চৌকিদারকে সাড়ে আটটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে বলেছিলেন। ব্রেকফাস্টের পর কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। সাড়া পেয়ে বললেন,—মর্নিং! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।....নমস্কার মিস্টার পাণ্ডে....না-না, একেবারে রাজার হালে আছি। এবার শুনুন, আমি কিছুক্ষণ পরে রাজবাড়িতে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে যাব। একটা জরুরি কাজের কথা তাই বলে নিই। আমি যেখানে থেকেই হোক আপনাকের রিং করলে আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোর্স নিয়ে পৌঁছোনোর জন্য যেন তৈরি থাকবেন।....হ্যাঁ, মিস্টার খানের কাছে শুনেছি, লালবাজার পার্টি দুপুরের ট্রেনে এসে যাবেন।....হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এই কেসটা কলকাতা এবং যদুগড় দুটো জায়গারই কেস। তবে ধড়টা এখানকার, লেজটা কলকাতার। বলে কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

জিগ্যেস করলুম,—এখনই কি বেরুচ্ছেন?

—হ্যাঁ, রেডি হয়ে নাও। আমরা পায়ে হেঁটেই যাব। রাজবাড়ি শর্টকাটে যাওয়া যায়। বলে তিনি তাঁর সেই পেটমোটা ব্যাগ খুলে যা বের করলেন তা দেখে আমার অবাক হওয়ার কারণ ছিল না। বারিনবাবুর ব্রিফকেসে পাওয়া সেই তিনটে ছবি তিনি সেই তোয়ালেতেই জড়িয়ে বাঁধলেন। তারপর সেটা বগলদাবা করে বললেন,—চলো, বেরুনো যাক, হালদারমশাইয়ের ফোন যখন পেলুম না, তখন বোঝা যাচ্ছে তিনি মাতাজি ধামের কাছে মধুরবাবুকে দেখতে পাননি। এমনও হতে পারে রাজবাড়িতে গিয়েই আমরা হালদারমশাইয়ের দর্শন পাব।

বাংলোর পাশ কাটিয়ে একটা সংকীর্ণ পায়ে চলা পথে কর্নেল হাঁটছিলেন। পথের দু-ধারে ঘন ঝোপ। আমরা যাচ্ছি উত্তর দিকে। বাঁ-দিকে একটু দূরে ঘর-বাড়ি চোখে পড়ো। তারপর পথের দু-ধারের ঘন গাছপালা আর কিছু দেখতে দিল না।

মিনিট দশেক হাঁটার পর কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। আস্তে বললেন,—আমরা রাজবাড়ির কাছে এসে পড়েছি। এবার তোমাকে কষ্ট করে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

একটু পরে চোখে পড়ল উঁচু একটা বাউন্ডারি ওয়াল। জায়গায়-জায়গায় ফাটল ধরেছে, ইটও বেরিয়ে আছে। সেই পাঁচিলের সমান্তরালে পশ্চিম দিকে কিছুটা চলার পর খোলামেলা একটা জায়গায় পৌঁছলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—কুমারবাহাদুরকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছা আছে। তাছাড়া সদর রাস্তায় বগলে এই বোঁচকাটা রাখা নিরাপদ মনে করিনি।

চমকে উঠে জিগ্যেস করলুম,—নিরাপদ মনে করেননি? কেন?

—ভুলে যেও না, জয়ন্ত, এই তোয়ালেটা এবং তার ভেতরের জিনিস এখানে কারও চেনা হতেই পারে।

আরও অবাক হয়ে বললুম,—এটা মধুরবাবু ছাড়া আর কে চিনবেন?

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। আবার উত্তরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাউন্ডারি ওয়ালের শেষে একটা গেটের সামনে পৌঁছুলাম। গেটের কাছে গাঁট্টাগোট্টা চেহারার হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরা একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। কর্নেলকে দেখা মাত্র সে সেলাম ঠুকে বলে উঠল,—কর্নেলসাব! আপনি যে আসবেন তার খবর তো দেননি? খবর দিলে আপনাকে কষ্ট করে পায়ে হেঁটে আসতে হতো না।

কর্নেল বললেন,—কুমারবাহাদুর আছেন?

—হ্যাঁ, কর্নেলসাব। আপনারা আসুন, আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি।

বিহার অঞ্চলে রাজা-জমিদারদের রাজবাড়ি কর্নেলের সঙ্গগুণে অনেক দেখেছি। তবে এই রাজবাড়ি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং দেশি-বিদেশি ফুল এবং গুল্মে সাজানো। আমরা এগিয়ে কিছুটা গেছি, এমনসময় কর্নেলের মতোই বৃদ্ধ এবং প্রকাণ্ড চেহারার পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক গাড়িবারান্দার ছাদে আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন,—কী আশ্চর্য, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

কর্নেল বললেন,—না, হঠাৎ-ই আমাকে চলে আসতে হল। হাতে সময় কম, আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই বেরুতে হবে।

গেটে দেখা সেই লোকটি আমাদের হলঘরের ভেতর দিয়ে দোতলায় নিয়ে গেল। চওড়া বারান্দায় কয়েকটা বেতের চেয়ার এবং টেবিল ছিল। সেখানে আমরা বসলুম। কুমারবাহাদুর বললেন,—আপনার সঙ্গী এই যুবকটিকে দেখে আমার ধারণা ইনিই সেই সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি।

এরপর কর্নেল বগলদাবার তোয়ালে জড়ানো ছবিগুলো টেবিলে রেখে বললেন,—দেখুন তো, এগুলো চিনতে পারেন কিনা?

তোয়ালে খুলে ছবিগুলো দেখামাত্র কুমারবাহাদুর কর্নেলের হাত চেপে ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। আমি তো হতবাক।

কর্নেল বললেন,—কুমারবাহাদুর, আমার হাতে সময় কম। এই ছবিগুলো আমি কীভাবে উদ্ধার করেছি যথাসময়ে জানতে পারবেন। এবার আর দুটো হারানো জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

বলে উনি জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ সিলটা এবং ভাঁজকরা ম্যাপটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কুমারবাহাদুর সিল এবং ম্যাপটা দু-হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, —সত্যিই আমি স্বপ্ন দেখছি।

—স্বপ্ন নয়। আপনাদের জাদুঘর থেকে এই ছবি এবং সিল হারানোর কথা আপনার কলকাতার বেয়াইমশাইয়ের কাছে শুনেছি। কিন্তু তার আগেই দৈবাৎ এগুলো আমার হস্তগত হয়েছিল। তাই দেরি না করে আপনার হারানো জিনিস আমি ফেরত দিতে এসেছি।

কুমারবাহাদুর চোখ মুছে বললেন,—আমার মেয়ে-জামাই আজ পাটনা গেছে। ওরা ফিরবে কয়েকদিন পরে। ওরা থাকলে খুবই আনন্দ পেত।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—মধুরবাবু ফিরে এসেছেন শুনলুম, কোথায় তিনি?

—কাল পাটনা যাওয়ার আগে জামাই মধুরকে দেখে খুব চটে গিয়েছিল। সে বলে গেছে ওই লোকটাকে যেন আমি আর আশ্রয় না দিই। কিন্তু কী করব বলুন। মধুর এসে আমার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। তারপর বলল,—জাদুঘরের হারানো জিনিস আমি নাকি শিগগির ফিরে পাব। তাই তো পেলাম দেখছি। আমার অবাক লাগছে।

আট

কর্নেল বললেন,—এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা আছে। কিন্তু এখানে নয়, সেটা আপনার ঘরে বলতে চাই।

কুমারবাহাদুর তখনই বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলেন, আমরা তাঁকে অনুসরণ করলুম। লক্ষ করলুম তাঁর হাতে একটা চাবির গোছা আছে। একটা ঘরের পরদা সরিয়ে তালা খুললেন। তারপর বললেন,—আসুন।

ঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন,—দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।

তারপর কুমারবাহাদুর এবং আমরা একটা টেবিল ঘিরে বসলুম। কুমারবাহাদুর ছবিগুলো, ব্রোঞ্জের সিল এবং ম্যাপটা টেবিলে রাখলেন। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—আপনি কি ছবিগুলোর ফ্রেম এবং পিছন দিকটা লক্ষ করেছেন?

কুমারবাহাদুর একটা ছবি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন,—ফ্রেম তো তেমনি আছে।

—কিন্তু পিছনের দিকটা দেখে কি আপনার খটকা লাগছে না?

এবার কুমারবাহাদুর বলে উঠলেন,—কী আশ্চর্য! পিছনের দিকটাই নতুন করে কাগজ সাঁটা হয়েছে। ছবিগুলো কি কেউ খুলেছিল?

কর্নেল বললেন,—আমিই খুলেছিলাম। কারণ বহু বছর আগের বাঁধানো ছবির পিছন দিকটা দেখে সন্দেহ হয়েছিল, পিছনগুলো কেউ খুলেছে।

এবার কুমারবাহাদুর উত্তেজিতভাবে বললেন,—ছবি খোলার কারণ কী?

—কারণ ছবিচোর জানত এই তিনটে ছবির ভেতরই বহুমূল্য রত্ন লুকনো আছে। আমি দেখাচ্ছি। ভেতরে এই দেখুন দুটো করে পুরোনো পিসবোর্ড আছে। আতস কাচে দেখেছি দুটো পিসবোর্ডের মধ্যে আবছা নকশা কাটা কোনও জিনিসের ছাপ পড়েছে।

কুমারবাহাদুর চমকে উঠে বললেন,—তা হলে এর ভেতর মূল্যবান রত্ন লুকোনো ছিল।

—ছিল। সেগুলো ছবিচোর হাতিয়ে নিয়ে নতুন করে পিছনে কাগজ এঁটে রেখেছিল। ব্রোঞ্জ, সিল আর নকশা নিয়ে তার মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। তিনখানা বহুমূল্য নকশাদার হালকা পাতের

অলঙ্কার পেয়েই সে খুশি হয়েছিল। যাইহোক, আর কোনও কথা নয়, আমি একবার টেলিফোন করব।

কুমারবাহাদুর টেলিফোন দেখিয়ে দিতেই কর্নেল রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, তারপর বললেন,—হালদারমশাই কী খবর বলুন।... কতক্ষণ আগে?...এইমাত্র? ঠিক আছে। আপনি এসে বাড়িটার কাছাকাছি কোনও জায়গায় দাঁড়ান। যেখান থেকে ও বাড়ির কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না।

কর্নেল আবার ডায়াল করলেন, তারপর বললেন,—মিস্টার পাণ্ডে, আপনারা তৈরি আছেন তো?...তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়ুন এবং রামদয়াল অগ্রবালের বাড়ি 'মাতাজি ধাম' চারদিক থেকে ঘিরে ফেলুন। আমি এখনই বেরুচ্ছি।

কুমারবাহাদুর কান ভরে শুনছিলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন,—কর্নেলসাহেব, কী ব্যাপার বলতে আপত্তি আছে?

কর্নেল হেসে বললেন,—আপাতত আছে। কারণ আমার এই অভিযান সার্থক হবে কি না নিশ্চিত নই। আপনি অপেক্ষা করুন, যথাসময়ে এসে আপনাকে সব বলব।

কর্নেল ঘরের দরজা খুলে বেরুলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে একবার ঘুরে দেখলুম কুমারবাহাদুর দরজার বাইরে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমরা গেটের কাছাকাছি পৌঁছেছি এমনসময় পাশের একতলা ঘর থেকে সেই হাফপ্যান্ট পরা লোকটি সেলাম ঠুকে বলল,—এখনই চলে যাচ্ছেন কর্নেলসাব?

কর্নেল বললেন,—মগনলাল, আবার আমরা আসব।

সেই সময়ই নিচের রাস্তায় দুটো পুলিশের জিপ এবং একটা কালো রঙের প্রিজন ভ্যান ঝড়ের বেগে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল। কর্নেল বললেন,—চলো জয়ন্ত, আমরা এবার শর্টকাটে না গিয়ে সদর রাস্তা দিয়েই হেঁটে যাই।

রাস্তাটা চড়াইয়ের দিকে উঠেছে। মিনিট দশেক হাঁটার পর সমতল রাস্তায় পৌঁছে দেখলুম বাঁ-দিকে মাতাজি ধাম-এর সামনে পুলিশের তিনটে গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে। এবং রাইফেল হাতে নিয়ে পুলিশবাহিনী বাড়িটা ঘিরে রেখেছে। একটু তফাতে হালদার মশাই দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখেই হন্তদন্ত এগিয়ে এলেন। তারপর চাপাস্বরে কর্নেলকে বললেন,—এখনই জাল ফ্যালাইয়া তো দিলেন। কোন মাছটারে ধরবেন বুঝতে পারতাসি না।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—আপনার কথা শুনেই জাল ফেলেছি। আসুন দেখি কী অবস্থা।

হালদারমশাই কী বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। একদিকে আমি তো একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। কিছু বোঝার শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের দেখে সেই এস. আই. মিস্টার শাহেদ খান চাপা হেসে বললেন,—কর্নেলসাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

কর্নেল বারান্দায় উঠে শুধু বললেন,—অর্থাৎ আমার টাইমিং সেন্স কাজে লেগে গেছে।

প্রথম ঘরটা বসবার ঘর। সেই ঘরে দুজন সশস্ত্র কনস্টেবল ছাড়া আর কেউ নেই। শাহেদ খান ভেতরের ঘরের দরজায় পরদা তুলে বললেন,—স্যার কর্নেলসাহেবরা এসে গেছেন।

ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর কেউ ডাকলেন,—আসুন কর্নেল সাহেব। কর্নেল তাঁর পিছনে আমি এবং হালদারমশাই ঢুকে দেখি এটা যেন একটা গোডাউন। ঘরের এখানে-ওখানে স্তূপাকৃতি প্রকাণ্ড সব প্যাকেট সাজানো এবং এককোণে জানালার ধারে ছোট্ট সোফাসেটে বসে আছেন জগদীশ প্রসাদ। একজন ভুঁড়িওয়ালা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক এবং আমাদের সুপরিচিত সেই মধুরকৃষ্ণ মুখুজ্যেমশাই। সেন্টার টেবিলে খবরের কাগজ ছড়িয়ে রেখে তার ওপর সূক্ষ্ম নকশাকাটা অর্ধবৃত্তাকার মুকুটের মতো গড়নের তিনটে জিনিস। প্রত্যেকটিতে নানারঙের রত্নখচিত আছে। তার

ওপর আলো পড়ে আমার চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছিল। আরও একটা জিনিস দেখতে পেলুম। টেবিলের একপাশে একটা ব্রিফকেস খুলে রাখা হয়েছে। সেটা নোটে ভর্তি। হালদারমশাই আমার কানে-কানে বললেন,—কী কারবার দ্যাখসেন?

কর্নেল সোফার কাছে গিয়ে বললেন,—মিস্টার পাণ্ডে, একেবারে ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলেন দেখছি।

দৈত্যাকৃতি মিস্টার পাণ্ডের ডান হাতে রিভলভার ছিল। উনি সেটা বাঁ-হাতে নিয়ে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর বললেন,—দরজা ভেঙে ঢুকতে হয়নি। কারণ এই তিন ঘুঘু বেটাচ্ছেলে ভেবেছিল বাইরের ঘরের দরজা খোলা রাখলে সন্দেহ হবে না যে ভেতরে ঘরে কিছু হচ্ছে।

মিস্টার পাণ্ডে ছাড়া ঘরে সশস্ত্র দুজন পুলিশ অফিসার হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশও দেখতে পেলুম। বুঝলুম তারা স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক। তারপরই দেখলুম মধুরবাবু হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে উঠেছেন। তিনি কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, —আমি কিছু জানি না কর্নেলসাহেব। রাজবাড়িতে আমার জায়গা হবে না দেখে আমি রামদয়ালজির কাছে একটা চাকরির আশায় এসেছিলুম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার মতো ধূর্ত মানুষ আমি এ যাবৎ কাল দেখিনি। আমাকে একটা অদ্ভুত গল্প বলে আপনি যে নাটকের সূত্রপাত করেছিলেন, তা কোথায় পৌঁছুবে আমি জানতে পেরেছিলুম বারিনবাবুর হাতে মুঠোয় কাঁচাপাকা একগোছা চুল থাকার কথা শুনে।

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—অ্যাঁ, কী কইলেন? কাঁচাপাকা চুল?

—হ্যাঁ, হালদারমশাই। মধুরবাবুর মাথা লক্ষ করে দেখুন। উনি যেদিন আমার কাছে যান, সেদিন আমার চোখ পড়েছিল, ওঁর মাথার সদ্য ছাঁটা ছোট-ছোট চুলে। আপনারা জানেন মধুরবাবু খুব সৌখিন মানুষ ছিলেন। তাঁকে কুমারবাহাদুর ঠাট্টা করে 'বাবুর বাবু' বলতেন। তাছাড়া আমিও ওঁকে যখন প্রথম দেখেছিলুম, তখন ওঁর মাথায় ছিল, টেরিকাটা ঝাঁকড়া চুল।

মিস্টার পাণ্ডে বললেন,—কলকাতার এই জগদীশবাবুর ব্রিফকেস থেকে আমরা একটা রিভলভার উদ্ধার করেছি। মনে হচ্ছে সেটাই মার্ডার উইপন। লালবাজার থেকে আমাকে বারিন সিনহা নামে এক ভদ্রলোকের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কেস হিস্ট্রি রেডিও মেসেজে পাঠানো হয়েছে।

কর্নেল বললেন,—লালবাজারের ডিটেকটিভরা সদলবলে দুপুরের মধ্যেই এসে পড়বেন। তাঁদের হাতে এই তিনজনকেই আপনারা হয়তো তুলে দেবেন।

—দেব। কিন্তু এই কয়েক লাখ টাকার তিনটে রত্নখচিত সোনার মুকুট কোথায় এবং কে দেখতে পেয়ে চুরি করেছিল?

—আপাতত সংক্ষেপে বলি। এই মধুর মুখুজ্যে ছিল এখানকার রাজবাড়ির কেয়ারটেকার। তার বাবাও ছিলেন রাজ এসটেটের ম্যানেজার। পুরুষানুক্রমে এ বাড়িতে থাকার দরুন মধুরবাবু জানতে পেরেছিল কুমারবাহাদুরের পূর্বপুরুষদের তিনটি বাঁধানো ছবির পিছন দিকে সাবধানে এই তিনটি রত্নখচিত মুকুট লুকোনো ছিল। মধুরকৃষ্ণ রাজবাড়ি থেকে সেগুলো হাতিয়ে এই জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলেছিল এবং ছবির পেছনে নতুন করে কাগজ এঁটে দিয়েছিল। তাই প্রথম দিনই ওর কাটা চুল এবং এই নতুন করে আঁটা কাগজ আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। এরপর মধুরকৃষ্ণ প্রথমে বারিনের সঙ্গে তারপর জগদীশপ্রসাদের সঙ্গে এগুলো নিয়ে দরাদরি শুরু করে। এ অবশ্য আমার অনুমান।

তারপর জগদীশ আর মধুরকৃষ্ণ দুজনে কেন বারিন সিনহাকে খুন করল তাও আমার কাছে স্পষ্ট। এই মুকুটগুলোর দাম বাজার দরে এত বেশি টাকা, যে বারিনের পক্ষে তা কেনা সম্ভব ছিল

না। তার চেয়ে বড় কথা বারিন বেঁচে থাকলে তাকেও সমান বখরা দিতে হবে। অতএব তাকে শেষ করে ফেলাই উচিত।

এরপর মধুরকৃষ্ণ খুব ভয় পেয়েছিল। কারণ জগদীশপ্রসাদ এরপর তাকেও হয়তো মেরে ফেলবে। তাই নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে সে একটা ব্রিফকেসে শুধু ছবিগুলো আর দু-একটা জিনিস ভরে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে একটা গপ্পো ফেঁদে আসলে আমার কাছে আশ্রয়ই চেয়েছিল। সে জানে আমি তার গল্পটা শোনার পর তাকে আশ্রয় দেব। যাইহোক, সে রত্নগুলো নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে আমার কথা মতো প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিস্টার হালদারের সঙ্গে যদুগড়ে এসেছিল। এটা কিন্তু আমারই একটা চাল। শেষ পর্যন্ত সে এখানে এসে সাধু সেজে রাজবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে নিশ্চয়ই কোটিপতি স্মাগলার এই রামদয়ালের কাছে রত্ন বেচতে চাইবে। এটা আমি অনুমান করেছিলুম।

মিস্টার পাণ্ডে জগদীশ প্রসাদকে দেখিয়ে বললেন,—কিন্তু এই ভদ্রলোক কীভাবে জানলেন যে মধুরবাবু এখানে এসে রামদয়ালের দ্বারস্থ হবে?

কর্নেল বললেন,—আমার অনুমান জগদীশ প্রসাদের হাত থেকে বাঁচতে মধুরকৃষ্ণ অনেক ভেবে তাকেও বখরা দিতে চেয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, এদের তিনজনের মধ্যেই একটা যোগাযোগ হয়ে যায়, এবং ঠিক সময়ে জগদীশ তার বখরা নিতে এখানে এসে পড়ে। আজকাল টেলিফোনের উন্নতির যুগে পরস্পর যে যেখানেই থাকুক যোগাযোগ করা কঠিন কিছু নয়।

মিস্টার পাণ্ডে বললেন,—সবকথা আমি এই তিন বেটাচ্ছেলের মুখ থেকে বের করে নেব। আমার নাম জয়রাম পাণ্ডে! আমি যে কী, তা অন্তত এই রামদয়াল অগ্রবাল ইতিমধ্যেই ভালোই জেনে গেছে।

কর্নেল বললেন,—তা হলে আপনার বমাল আসামিদের নিয়ে থানায় চলে যান। লালবাজারের লোকেরা এসে পড়লেই আইনত যে ব্যবস্থা করা উচিত তা করবেন।

এই বলে কর্নেল সবে ঘুরেছেন, হালদারমশাই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কয়েক পা বাড়িয়ে মধুরবাবুর মাথায় একটা জায়গায় চুল সরিয়ে দেখালেন। তারপর বললেন,—দ্যাখসেন! বাঁ-কানের পাশে একটুখানি জায়গা লাল হইয়া আসে। এই জায়গাটা কাইল দুপুরে হঠাৎ আমার চোখে পড়সিল। জিগাইলাম ফোঁড়া হইসে নাকি মধুরবাবু? মধুরবাবু সেইখানে হাত বুলাইয়া কইলেন, কী একটা হইসিল। আমি চুলকাইয়া দিসিলাম। কে জানে সেপটিক না হয়!

বলে হালদারমশাই খি-খি করে হাসতে-হাসতে কর্নেলকে অনুসরণ করলেন।

* * * * *

আমরা তিনজনে 'মাতাজি ধাম' থেকে বেরিয়ে যে বাংলোয় কর্নেল এবং আমি উঠেছি, সেখানে গেলুন। কর্নেল চৌকিদারকে বললেন,—একজন গেস্ট আছে। কোনও অসুবিধে হবে না তো?

চৌকিদার বলল,—কোনও অসুবিধে হবে না স্যার, শুধু হুকুম করুন, কখন আপনারা লাঞ্চ খাবেন।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ঠিক একটায় আমরা খেয়ে নেব। তবে আপাতত তুমি আমাদের তিন পেয়ালা কফি এনে দাও।

কিছুক্ষণ পরে চৌকিদার কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে-খেতে গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—একটা কথা বুঝতে পারত্যাসি না কর্নেলস্যার।... হঃ, আপনি কথাটা তখন মিস্টার পাণ্ডেরে কইসিলেন বটে, কিন্তু আমি বুঝি নাই।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—বলুন হালদারমশাই।

—মধুরবাবু মিথ্যা একখান গল্প কইয়া আপনার কাছে গিসল ক্যান? সে তো ওই রত্নগুলি হাতাইয়া বাকি সব জিনিস নষ্ট কইরা ফেলতে পারত। কিন্তু তা না কইরা সে আপনার কাছে গেল ক্যান?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জগদীশপ্রসাদের ভয়ে।

—এবার কন যখন সে বারিনবাবুর কাছে গিয়াসিল তখনই কি জগদীশবাবু বারিনবাবুকে খুন করেন?

—হ্যাঁ।

—তা হলে বারিনবাবু জগদীশবাবুর চুল না ধইরা মধুরবাবুর চুল ধরলেন ক্যান?

—দৃশ্যটা আমি মনে-মনে সাজিয়েছি। শুক্রবার রাত্রে তিন স্যাঙাতে মিলে মধুরবাবুর চুরি করা রত্ন নিয়ে আলোচনা করছিল। ধরা যাক, তিনজনেই ঠিক করে রত্নগুলো যদুগড়ে গিয়ে রামদয়ালের কাছে বিক্রির প্রস্তাব করা হবে। কারণ, তিনজনই রামদয়ালকে চেনে। জগদীশবাবুও যে চিনত, তা তো আমরা এখন জানি। এখানে এসে তার বাড়িতেই জগদীশবাবু ঢুকেছিল।

যাইহোক, এবার সেই দৃশ্যের কথায় আসি, কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর মধুরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময়েই জগদীশবাবু মধুরবাবুর চক্রান্ত অনুসারে আচমকা এগিয়ে এসে বারিন সিনহার কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে গুলি করেন। আচমকা আক্রান্ত হওয়ার মুখে মানুষ সহজাত বোধে যা করে, বারিনবাবু ঠিক তাই করেছিল। হাত বাড়িয়ে জগদীশবাবুর চুল ধরতে গিয়ে মধুরবাবুর মাথাটা হাতের কাছে পেয়েছিল। তাই সে মধুরবাবুরই একগোছা চুল ছিঁড়ে নেয়।

আমি জিগ্যেস করলুম,—আপনি তা হলে একেবারে প্রথম থেকেই মধুরবাবুকে সন্দেহ করেছিলেন।

—সে তো আগেই বলেছি। মধুরবাবুর মাথার চুলছাঁটা দেখে আমার অবাক লেগেছিল। যখন অবাক লেগেছিল। তখন অবশ্য তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মধুরবাবু যখন বলল,—বারিন নামে তার এক বন্ধু খুন হয়েছে, সে নাকি ব্রিফকেস দিয়েছিল—তার হাতের মুঠোয় একগোছা কাঁচাপাকা চুল আছে। জয়ন্ত, খুনি যত ধূর্তই হোক এইভাবেই একটা বেঁফাস কথা বলে ফেলে কিংবা তার ধরা পড়ার কোনও সূত্র নিজের অজান্তে রেখে যায়। একটু চিন্তা করো জয়ন্ত, ভিকটিমের হাতের মুঠোয় কাঁচাপাকা চুল থাকার কথাটা বলে মধুরকৃষ্ণ কি বোকামি করেনি? আসলে সে বারিনবাবুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছিল।

হালদারমশাই ততক্ষণে কফি শেষ করেছেন। একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—আমরা কি আইজ যদুগড়ে থাকব?

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—নিশ্চয়ই থাকব। আর এই সুযোগে আপনাকে আর জয়ন্তকে রাজবাড়ির বিস্ময়কর পাতাল-জাদুঘর দেখাব।

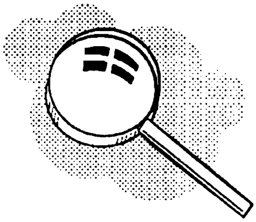

প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

এক

সেবার ডিসেম্বরের মাঝামাঝিও কলকাতায় শীতের তত সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর হঠাৎ এক বিকেলে আকাশ ধূসর করে এসে গেল ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর সেই সঙ্গে এলোমেলো বাতাস। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে কনকনে ঠান্ডা হিমশীতের পাল্লায় পড়ে গেলুম। পাঁচটায় সন্ধ্যা নেমে গেছে। চৌরঙ্গি রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সামনে যানজট। অগত্যা বাঁ-দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে লিন্ডসে স্ট্রিট হয়ে ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে পৌঁছে দেখি, সেখানেও সামনে জ্যাম। তখন আবার বাঁ-দিকের গলি হয়ে ইলিয়ট রোডের মুখে চলে গেলুম। তারপরই কথাটা মাথায় এসে গেল।

এই বৃষ্টিঝরা শীতের সন্ধ্যায় ইলিয়ট রোডে আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে গেলে মন্দ হয় না! ষষ্ঠীচরণের তৈরি গরম কফি খেতে-খেতে এবং কর্নেলের সঙ্গে গল্প করতে-করতে ততক্ষণে যানজট ছেড়ে যাবে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস হয়ে সল্টলেকের ফ্ল্যাটে ফিরতে বেশি সময় লাগবে না।

'সানি ভিলা'-র গেটে গাড়ি ঢুকিয়ে পোর্টিকোর কাছাকাছি পার্ক করলুম। শুধু একটাই চিন্তা। বৃষ্টিটা বেড়ে গেলে ইলিয়ট রোডে জল জমবে।

কিন্তু এখন আর তা নিয়ে চিন্তার মানে হয় না। তিনতলায় উঠে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ডোরবেলের সুইচ টিপলুম। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল এবং কর্নেল সহাস্যে বললেন, —এসো জয়ন্ত! তোমার জন্য একটু আগে ষষ্ঠীকে তেলেভাজা আনতে পাঠিয়েছি।

ওঁর জাদুঘরসদৃশ্য ড্রয়িংরুমে ঢুকে বললুম,—আমি আসব তা কি আপনি ধ্যানবলে জানতে পেরেছিলেন?

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে বললেন,—অঙ্ক কষে জয়ন্ত! স্রেফ অঙ্ক!

—জ্যোতিষীদের অঙ্ক?

প্রকৃতিবিজ্ঞানী মিটিমিটি হেসে বললেন,—উঁহু। স্রেফ পাটিগণিত।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—পাটিগণিতের অঙ্ক কষে আপনি আজকাল জানতে পারেন কে আসবে?

অন্য কারও কথা নয় জয়ন্ত, তোমার আমার কথা।—কর্নেল তাঁর টাক এবং সাদা দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে বললেন, অঙ্কটা সোজা। আজ সোমবার, তোমার দশটা-পাঁচটা ডিউটি। তুমি অফিস থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গি হয়ে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে সল্টলেকে যাবে। একদিকে আজ সন্ধ্যায় ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট দিল্লি থেকে কলকাতা এসে রাজভবনে রাত কাটাবেন। তাই এয়ারপোর্ট থেকে বাইপাস ধরে পার্ক স্ট্রিট এবং রাজভবন পর্যন্ত তাঁর গমনপথ ট্রাফিকপুলিশ পরিষ্কার রেখেছে। নিরাপত্তারক্ষীরা প্রত্যেকটি মোড়ে টহল দিচ্ছে। যাই হোক, এই অবস্থায় তোমার অলি-গলি শর্টকাট করে এই রাস্তায় এসে পড়াটা অনিবার্য এবং এসে পড়লে এই বৃদ্ধের কথা, বিশেষ করে বৃষ্টিঝরা শীতের সন্ধ্যায় ষষ্ঠীচরণের তৈরি দুর্লভ স্বাদের কফির কথা তোমার মনে আসাটা অনিবার্য।

ওঁর পাটিগণিতের হিসেব শুনতে-শুনতে হেসে ফেললুম,—এই যথেষ্ট! বুঝে গেছি।

কর্নেল আস্তে বললেন,—তুমি তেলেভাজা খেতে ভালোবাসো, এটাও আমার জানা।

বললুম,—ওহ! আপনার হাড়ে-হাড়ে এইসব হিসেবি বুদ্ধি কর্নেল!

ডার্লিং! আমাদের অবচেতন মনই সচেতন মনকে চালনা করে। সম্ভবত অফিস থেকে বেরুনোর পর তোমার অবচেতন মন এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমার ডেরার কথা ভেবেছিল। শীতের বৃষ্টি, কফি এবং প্রত্যাশা—যদি দৈবাৎ দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য একটা রোমাঞ্চকর স্টোরি পেয়ে যাও!—কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন, হ্যাঁ। স্টোরির একটুখানি লেজ তুমি আগাম দেখে নিতেও পারো সেটা রোমাঞ্চকরও বটে!

বলে কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ইনল্যান্ড লেটার বের করে আমাকে দিলেন। ভাঁজ খুলে চিঠিটা পড়তে শুরু করলুম।

শ্রীযুক্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

বড় বিপদে পড়িয়া আপনাকে গোপনে এই পত্র লিখিতেছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক সত্বর আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন। সাক্ষাতে পূর্ণ বিবরণ পাইবেন। অত্র পত্রে সংক্ষেপে শুধু জানাইতেছি যে, তিনমাস পূর্বে বিশেষ কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া ফুটপাতে 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক দুই টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম। বাড়ি ফিরিয়া পুস্তকখানি পড়িবার অবকাশ পাই নাই। সিঁড়ি হইতে পড়িয়া বাম হাঁটু ভাঙিয়া গিয়াছিল। প্রায় একমাস শয্যাশায়ী ছিলাম। তার মধ্যে প্রতি রাত্রে ভৌতিক উৎপাত। বহুপ্রকার অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাই। পাশের ঘরে কাহারা ফিসফিস করিয়া কাথাবার্তা বলে। ভূতের ওঝা, ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন, পাহারার ব্যবস্থা সকলই করিয়াছি। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। গতকল্য সন্ধ্যায় লাঠি ধরিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ অদৃশ্য হস্তে কেহ আমাকে সজোরে চাঁটি মারিল এবং আবার আছাড় খাইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছি। এদিকে সেই পুস্তকটিও অদ্ভুত আচরণ করিতেছে। সাক্ষাতে সকলই বলিব। শীঘ্র মদীয় ভবনে পদার্পণ করিতে আজ্ঞা হয়। নমস্কারান্তে ইতি—

শ্রী অক্ষয়কুমার সাঁতরা
সাকিন—হাটছড়ি পোঃ অঃ বড়হাটছড়ি
জেলা—নদীয়া।

চিঠি পড়া শেষ হতে-হতে ষষ্ঠীচরণ এসে গিয়েছিল। ভেজা ছাতি সাবধানে মুড়ে সে একগাল হেসে বলল,—বাহ। এই দাদাবাবু এসে পড়েছেন। বাবামশাই বললেন, তোর দাদাবাবুর জন্যে গরম-গরম তেলেভাজা নিয়ে আয়।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—প্লেটে করে নিয়ে আয়। আর তার পেছন-পেছন পটভর্তি কফি যেন আসে।

ষষ্ঠী পর্দা তুলে ভেতরে চলে গেল। চিঠিটা কর্নেল আমার হাত থেকে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে

রাখলেন। বললুম,—গ্রাম্য মানুষ। তবে মোটামুটি ভালোই লিখতে পারেন। বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে। কুসংস্কার! বইটার নাম 'প্রেতাত্মার অভিশাপ'। তাই হয়তো—আপনি একটু আগে অবচেতন মনের কথা বলছিলেন, ভদ্রলোক অবচেতন মনে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন,—বইটার অদ্ভুত আচরণের কথা লিখেছেন অক্ষয়বাবু! সেটাই কিন্তু ওঁর চিঠির একটা বড় পয়েন্ট।

একটু হেসে বললুম,—হাটছড়ি! গ্রামের নামটাও বেশ অদ্ভুত। তো আপনি সেখানে পদার্পণ করবেন নাকি?

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে আবার বললেন,—বইটার অদ্ভুত আচরণ!

—কিন্তু গ্রামটা কোথায় এবং কীভাবে সেখানে যাওয়া যায়, তা তো লেখেননি ভদ্রলোক!

পোস্টঅফিস বড়হাটছড়ি। তার মানে পাশাপশি দুটো গ্রাম।—কর্নেল এইরকম অন্যমনস্কতায় বললেন, গঙ্গার তীরে এক জোড়া জনপদ। ছোট এবং বড়। হুঁ—পোস্টঅফিসে খোঁজখবর নিলে হদিস মিলতে পারে। বিশেষ করে জি.পি.ও-তে। ওখানে আমার চেনাজানা এক অফিসার আছেন। বিনোদবিহারী ঘড়াই। এক মিনিট। দেখি, ওঁর বাড়ির ফোন নাম্বার খুঁজে পাই নাকি।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে একটা মোটা ডায়রি টেনে নিলেন টেবিল থেকে। এই সময় ষষ্ঠী একটা প্লেটে তেলেভাজা রেখে গেল। কর্নেলের দৃষ্টি ডায়রির পাতায়। কিন্তু দিব্যি হাত বাড়িয়ে একখানা বিশাল বেগুনি তুলে নিলেন। অবাক লাগল। উনি নিজে তেলেভাজা পছন্দ করেন না। আজকাল নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বড় সতর্ক। এখন দেখি, সাদা গোঁফ দাড়ি বেগুনির পোড়া তেলে ভিজে যাচ্ছে। তবু ভ্রুক্ষেপ নেই।

কিছুক্ষণ পরে বললেন,—হ্যাঁ। পাওয়া গেছে। তবে একটু পরে ফোন করব। কাল অফিসে গিয়ে উনি আমাকে জানিয়ে দিতে পারবেন আশা করি।

বললুম,—আপনি তেলেভাজা খাচ্ছেন দেখছি!

কর্নেল সে-কথায় কান দিলেন না। বললেন,—ঠিকানা খুঁজে বের করার একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি পোস্ট অফিসের শরণাপন্ন হওয়া। ধরো, কলকাতারই কোনও গলিরাস্তার একটা নম্বর খুঁজছ। কিন্তু পাচ্ছ না। বিশেষ করে কলকাতার মতো পুরনো শহরে কোনও ঠিকানা জানা সত্ত্বেও খুঁজে বের করা শক্ত। তখন পোস্টম্যানের সাহায্য নাও। পেয়ে যাবে।

তেলেভাজা শেষ হতে-হতে কফি এসে গেল। সেইসময় উঁকি মেরে বৃষ্টির অবস্থা দেখে এলুম জানালায়। সেইরকম ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর নেই। ছিটেফোঁটা ঝরছে। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, —হাটছড়ি গ্রামে তাহলে—

কর্নেল ঝটপট বললেন,—অবশ্যই। বইটার অদ্ভুত আচরণ যা-ই হোক, গ্রামটা গঙ্গার তীরে। কাজেই আশা করছি ওই এলাকায় গঙ্গার অববাহিকায় জলা বা বিল থাকতে বাধ্য। বিল থাকলে এই শীতের মরশুমে নানা প্রজাতির বিদেশি পাখিরও দেখা পেয়ে যাব।

হাসতে-হাসতে বললুম,—বেচারা অক্ষয়বাবু আপনার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁকে ফেলে আপনি পাখির পেছনে ছোটাছুটি করে বেড়াবেন?

না, না। আগে অক্ষয়বাবু, তারপর বিদেশি পাখি।—কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, এবং রীতিমতো রোমাঞ্চকর একটা স্টোরি যদি চাও, তাহলে তুমিও আমার সঙ্গী হবে।

—আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা বোগাস! ভদ্রলোকের পাগলামি!

বইটা জয়ন্ত, বইটা আমার পয়েন্ট। ফুটপাতে অনেকসময় অনেক পুরনো এবং দুষ্প্রাপ্য বই পাওয়া যায়। সেইসব বইয়ে যা-ই লেখা থাক, বইগুলোর পেছনে বহুক্ষেত্রে অজানা তথ্য লুকিয়ে

থাকে।—কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এমনকী বইয়ের ভেতরেও থাকে। একবার আমার হাতে একটা বই এসেছিল—

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে ষষ্ঠী এসে বলল,—এক ভদ্রলোক বাবামশাই! বলছেন, খুব জরুরি দরকার।

—নিয়ে আয়।

ধুতি এবং তাঁতের কাপড়ের পাঞ্জাবি পরা উস্কোখুস্কো চেহারার একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—আজ্ঞে বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিল।

কর্নেল বললেন,—বসুন। আপনার নাম?

ভদ্রলোক বিনীতভাবে বসে বললেন,—আমার নাম ভক্তিভূষণ হাটি। আমি থাকি গোবরার ওদিকে কান্তি খটিক লেনে! আমি ট্যাংরা থানা থেকে আসছি। থানার বড়বাবু বললেন, আপনি কর্নেলসায়েবের কাছে যান। ভূতপ্রেতের কেস পুলিশের আওতায় পড়ে না। পেনাল কোডে নাকি তেমন কোনও ধারা নেই।

ভদ্রলোক বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাগুলো বলছেন দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। কর্নেলও কিন্তু সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন,—বড়বাবু ঠিকই বলেছেন। তো আপনাকে ভূতে জ্বালাচ্ছে বুঝি?

ভক্তিবাবুর কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল! ব্যাগে হাত ভরে বললেন,—আগে বইটা দেখাই!

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন—বই? 'প্রেতাত্মার অভিশাপ'?

ভক্তিবাবু অবাক হয়ে বললেন,—আপনি জানতে পেরেছেন? হ্যাঁ—থানার বড়বাবু তাহলে ঠিকই বলেছিলেন। স্যার! খুলেই বলি তা হলে।

ব্যাগের ভেতর হাত তেমনি রেখে ভক্তিবাবু বললেন,—আমি রেলওয়েতে চাকরি করতুম। গতবছর রিটায়ার করেছি। একা মানুষ। পৈতৃক একতলা বাড়ি আছে। তার একটা ঘরে ভাড়াটে থাকে। অন্য ঘরটায় আমি থাকি। তো সময় কাটাতে বরাবর বই পড়ার অভ্যাস আছে। কদিন আগে কলেজস্ট্রিটের ফুটপাত থেকে বইখানা কিনেছিলুম। রাত্তিরে পড়ব বলে টেবিলে রেখেছিলুম। বিকেলে প্রতিদিন বেড়াতে বেরোই। বাড়ি ফিরে স্বপাক খাই। খাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ব। কিন্তু কোথায় বই? খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে দেখি, বইটা আলমারির তলায় পড়ে আছে। এতো ভারি আশ্চর্য! যাই হোক বইটা ঝেড়েমুছে যেই পড়তে বসেছি, অমনি লোডশেডিং হয়ে গেল। বইটা টেবিলে রেখে মোমবাতি জ্বেলে দেখি, বইটা টেবিলে নেই!

কর্নেল মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন,—হুঁ। তারপর?

ভক্তিবাবু চাপা গলায় বললেন,—বইটা টর্চ জ্বেলে খুঁজতে শুরু করলুম। তারপর দেখি, ওটা কুলুঙ্গিতে চড়ে বসে আছে। এবার খুবই ভয় পেলুম। ভয়ে-ভয়ে বইটা মোমের আলোয় যেই খুলেছি, জানলা দিয়ে একটা ইয়া মোটা গুবরে পোকা এসে মোমবাতিটা উল্টে ফেলে দিল।

কর্নেল বললেন,—দেখি আপনার বইটা।

ভক্তিবাবু বইটা বের করে তাঁর হাতে দিলেন। দেখলুম, আসল মলাটটা কবে ছিঁড়ে গেছে। লেখকের নাম বা টাইটেল পেজও নেই। বইবিক্রেতা হলদে রঙের মোটা কাগজে মলাট করে বইটাকে লাল সুতো দিয়ে সেলাই করেছে। সেই মলাটে লাল কালিতে লেখা আছে 'প্রেতাত্মার অভিশাপ'।

কর্নেল বইটা খুলে দেখে বললেন,—বইটার নাম দেখছি ভেতরে কোথাও ছাপা নেই।

ভক্তিবাবু বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ। যে লোকটা পুরনো বই বেচছিল, তাকে জিগ্যেস করেছিলুম। সে বলেছিল, বইটার যা নাম ছিল, তাই-ই সে লিখেছে। তবে লেখকের নামের পাতা ছিল না বলে লেখকের নাম সে লিখতে পারেনি।

কর্নেল বললেন,—খুব পুরোনো বই দেখছি। পোকায় ইচ্ছে মতো কেটেছে। কোনও এক রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জীবনকাহিনি। যাই হোক, আর কী ঘটেছে বলুন!

ভক্তিবাবু বললেন,—সেইদিন থেকে বইটা লুকোচুরি খেলেছে। ধরুন, বিছানায় রেখে বাথরুমে গেছি। ফিরে এসে দেখি, বইটা টেবিলের তলায় পড়ে আছে। সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, যখনই পড়ব বলে খুলেছি, অমনি বাধা পড়েছে। কেউ এসে ডেকেছে। নয়তো আরশোলা উড়ে এসে চোখে বসেছে। কিংবা আচমকা ঝরঝর চুনবালি খসে পড়েছে।

—আর কিছু?

হ্যাঁ। সেটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক। —ভক্তিবাবুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল, রাত্তিরে অদ্ভুত শব্দ হয় ঘরের ভেতর। কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। ছাদের ওপর ধুপধুপ শব্দ শুনি। কখনও জানালার কাছে ছায়ামূর্তি এক সেকেন্ডের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

আমি বললুম,—কিন্তু এখন তো কর্নেল বইটা খুলে পড়ছেন। কিছু হচ্ছে না!

আমি কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কর্নেলের টাকে একটা মোটা কালো পোকা চটাস শব্দে পড়ল। কর্নেল খপ করে পোকাটাকে ধরে ফেলে বললেন,—গুবরে পোকা মনে হচ্ছে!

ভক্তিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাংশু মুখে বললেন,—স্যার! এর একটা বিহিত করুন। বাড়ি ফিরতে আমার ভয় করছে। আমার নাম-ঠিকানা এই কাগজে লিখেই এনেছি। দয়া করে রেখে দিন।

বলে তিনি একটুকরো কাগজ কর্নেলের হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

কর্নেল গুবরে পোকাটাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসে বললেন,—প্রেতাত্মার অভিশাপই বটে! জয়ন্ত! পড়বে নাকি বইটা?

বললুম,—নাহ্। আপনার ছাদের বাগান থেকে শীতের বৃষ্টিতে তাড়া খেয়ে গুবরে পোকারা চলে আসছে সম্ভবত। আমি গুবরে পোকার চাঁটি খেতে রাজি নই।

কর্নেল শুধু বললেন,—আমার ছাদের বাগানে গুবরে পোকা?...

দুই

পরদিন সকালে কর্নেলকে টেলিফোন করলুম। সাড়া পেয়ে তাঁর মতোই বললুম,—মর্নিং কর্নেল! আশা করি রাতে সুনিদ্রা হয়েছে?

কর্নেল বললেন,—আমার হয়েছে। ষষ্ঠীর হয়নি! সে নাকি বেজায় ভূতুড়ে স্বপ্ন দেখেছে।

—বইটার খবর বলুন!

—বইটা পড়তে গিয়ে আচমকা লোডশেডিং। তিন ঘণ্টা পরে বিদ্যুৎ এসেছিল। তবে অত রাতে আর পড়ার ইচ্ছে ছিল না।

—কিন্তু ওটা ঠিক জায়গায় ছিল তো?

বালিশের তলায় রেখেছিলুম। আমার মাথার ওজন আছে। তাই প্রেতাত্মা ওটা বের করতে পারেনি।—বলে কর্নেল হাসলেন, তো তুমি আমার ছাদের বাগানে গুবরে পোকার কথা বলেছিলে! কাল রাতে আমার টাকে যেটা পড়েছিল, সেটা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলা বোকামি হয়েছিল। সকালে বাগানে উঠে দেখি, একটা ক্যাকটাসের গোড়ায় বজ্জাতটা চিত হয়ে পড়ে আছে। যাই

হোক, ওটা পাশের নিমগাছে ক্ষুধার্ত কাকদের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছি। কাকগুলো ঠুকরে ওকে ভাগাভাগি করে খেয়েছে।

—এখন কি বইটা আপনি পড়ছেন?

—নাহ্! আলমারির ভেতর রেখে তালা বন্ধ করেছি। এবার একটু বেরুব। রাখছি জয়ন্ত!...

কর্নেল টেলিফোন রেখে দিলেন। আজ আমার ইভনিং ডিউটি। বিকেল তিনটে থেকে রাত নটা। ভাবলুম, অফিস যাওয়ার পথে কর্নেলের বাড়ি হয়ে যাব। ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছিল। নদীয়া জেলার কোনও হাটছড়ি গ্রামের অক্ষয় সাঁতরা এবং পূর্ব কলকাতার কান্তি খটিক লেনের ভক্তিভূষণ হাটি দুজনেই একই বই কিনে ঝামেলায় পড়েছেন।

আড়াইটে নাগাদ কর্নেলের ডেরায় হাজির হয়েছিলুম। আমাকে দেখে প্রকৃতিবিদ বললেন, —এসো জয়ন্ত! তোমার কথাই ভাবছিলুম!

—বইটার খবর বলুন! কোনও উৎপাত করেনি তো?

করবে কী করে? আলমারির চাবি আমার কাছে। —কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন তো শোনো। হাটছড়ি গ্রামের খোঁজ পেয়েছি। জি.পি.ও-র মিঃ ঘড়াই জানিয়েছেন, বড়হাটছড়ি কৃষ্ণনগর পোস্টাল সার্কেলে। অতএব কৃষ্ণনগর ডাকঘরে পৌঁছুতে পারলে বাকি খবর পাওয়া যাবে। চলো। বেরুনো যাক।

—আমি যাব কী? অফিস যেতে হবে। বিকেল চারটেয় রাজভবনে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন,—তোমার কাগজের চিফ রিপোর্টার সরলবাবুকে একটু আগে জানিয়ে দিয়েছি, জয়ন্ত আমার সঙ্গে এক প্রেতাত্মাকে ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছে। সরলবাবু বুদ্ধিমান লোক। বললেন, যেন ঘুণাক্ষরে অন্য কাগজের কেউ টের না পায়। দৈনিক সত্যসেবক এক্সক্লুসিভ স্টোরি ছাপবে। এই হল ওঁর শর্ত।

নিচে কর্নেলের গাড়ির গ্যারাজ-ঘর অনেকদিন থেকে খালি আছে। কারণ কর্নেল তাঁর পুরনো ল্যান্ডরোভার গাড়িটা রাগ করে বেচে দিয়েছিলেন। গাড়িটা যখন-তখন অচল হয়ে যেত। সেই খালি গ্যারাজে আমার ফিয়াটগাড়ি ঢুকিয়ে রেখে তালা এঁটে দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। একটা ব্যাগে একপ্রস্থ জামাকাপড়, দাড়িকাটার সরঞ্জাম, টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান ইত্যাদি সবসময় আমার সঙ্গে থাকে। কারণ রিপোর্টারের চাকরি করি। কখন কোথায় হুট করে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাতে সময়ও থাকে না।

কর্নেলের পিঠে আঁটা কিটব্যাগ, প্রজাপতি ধরা জাল, গলায় ঝোলানো ক্যামেরা আর বাইনোকুলার—সেই একই ট্যুরিস্টমার্কা বেশভূষা। শীতের কারণে গায়ে পুরু জ্যাকেট আর মাথায় টাকঢাকা টুপিও চড়িয়েছিলেন।

ট্রেনে কৃষ্ণনগর পৌঁছুতে সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। কর্নেল ট্রাঙ্ককলে সরকারি বাংলোর একটা ডাবলবেড রুম বুক করে রেখেছিলেন। কাজেই রাত কাটাতে কোনও অসুবিধে ছিল না। বাংলোর কেয়ারটেকার মধুবাবু কর্নেলের পরিচিত। রাতে খাওয়ার তদারকে নিজেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। কথায়-কথায় কর্নেল তাঁকে জিগ্যেস করেছিলেন,—আচ্ছা মধুবাবু, বড়হাটছড়ি নামে একটা গ্রাম আছে গঙ্গার ধারে। চেনেন নকি? আপনি তো স্থানীয় মানুষ। তাই জিগ্যেস করছি।

মধুবাবু বলেছিলেন,—খুব চিনি। এখান থেকে বাসে মাত্র আট কিলোমিটার। তবে গ্রাম আর নেই স্যার! এখন রীতিমতো টাউন। তা সেখানে বেড়াতে যাবেন নাকি?

—ইচ্ছে আছে।

—বেড়ানোর মতো জায়গা নয় স্যার! অবশ্য গঙ্গা আছে। কিন্তু গঙ্গা দর্শনের জন্য বড়হাটছড়ি যাওয়ার মানে হয় না!

—আসলে ওই এলাকায় নাকি একটা বিশাল জলাভূমি আছে। শীতের সময় নানারকম বিদেশি হাঁস আসে শুনে—

মধুবাবু হেসে অস্থির—বুঝেছি। বুঝেছি! আপনি হাঁসখালি বিলের কথা বলছেন। সেটা অবশ্য কাছাকাছিই বটে। ছোটহাটছড়ির পাশেই। ছোটহাটছড়ি স্যার, বড়হটাছড়ির লেজের টুকরো বলতে পারেন। মধ্যিখানে একটা ছোট্ট সোঁতা বিল থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। সোঁতার ওপর কাঠের ব্রিজ আছে। তবে স্যার, সত্যি বলতে কী, ওটাই ছিল পুরনো আমলের আসল হাটছড়ি। গঙ্গার ভাঙনে ওখান থেকে বসতি সরে গেছে যেখানে, সেটাই এখন বড়হাটছড়ি।

—ছোটহাটছড়িকে তাই নাকি শুধু হাটছড়ি বলা হয়?

—ঠিক ধরেছেন স্যার! মূল নাম তো হাটছড়িই ছিল। ওখানে এখনও একটা জমিদারবাড়ি আছে। অর্ধেকটা গঙ্গায় তলিয়ে গেছে। বাকি অর্ধেকটাতে প্রাক্তন জমিদারবংশের কেউ-কেউ থাকেন। জমিদারবংশের পদবি কিন্তু সাঁতরা স্যার!

—মধুবাবু! ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা বলেন 'সামন্তরাজ' কথাটা থেকেই অপভ্রংশে সাঁতরা পদবি।

—তা-ই বটে স্যার। আমি ভাবতুম সাঁতরা পদবি জমিদারদের হয় কী করে?...

সবখানে দেখেছি, কর্নেল স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে অনেক তথ্য জোগাড় করে ফেলেন। তা হলে হাটছড়ি গ্রাম এবং অক্ষয় সাঁতরার ব্যাকগ্রাউন্ড জানা গেল। এতক্ষণে আমার মনে ক্ষীণ আশা জাগল, সত্যিই একটা রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা স্টোরি হয়তো পেয়ে যাব এবং দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পাঠকরা তো গোগ্রাসে গিলবে।

সকালে ব্রেক ফাস্ট করে আমরা বাসস্ট্যান্ডে গেলুম। বড় হাটছড়ির বাস ছাড়ল সাড়ে ন'টায়! ভাগ্যিস আমরা বসার সিট পেয়েছিলুম। বাসটা যখন ছাড়ল, তখন বাসটার ভেতরে তিলধারণের জায়গা নেই। তারপর রাস্তায় যেখানে সেখানে থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পিলপিল করে যাত্রী বাসটার দুধারে, পেছনে, মাথার ওপর যেন মৌমাছির চাকের মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছে। ভয় হচ্ছিল রাস্তার যা অবস্থা, দুধারে গভীর খাদ—বাসটা টাল সামলাতে না পেরে উলটে যাবে না তো?

মাত্র আট কিলোমিটার যেতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল। কর্নেল একটা সাইকেল রিকশ ডাকলেন। কিন্তু হাটছড়িতে সাঁতরাবাবুদের বাড়ি যাবেন শুনে সে বলল,—পায়ে হেঁটে চলে যান স্যার! ওই কাঠের বিরিজ দেখছেন! রিকশর ভার সহ্য করতে পারবে না। কোন কালের বিরিজ! সাবধানে লোক চলাচল করে।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—আমার ওজন সইতে পারবে তো হে? কী মনে হয় তোমার?

রিকশওয়ালা পরামর্শ দিল,—কিনারা দিয়ে যাবেন না যেন। শুনেছি, বড় সাঁতরাবাবু বিরিজ ভেঙে নাকি পড়ে গিয়েছিলেন। হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গিয়েছিল।

—অক্ষয়বাবুর কথা বলছ?

—আজ্ঞে।

—উনি বড়। তাহলে ছোটর নাম কী?

—কালীপদবাবু। উনি রোগা প্যাঁকাটি লোক স্যার!

রিশওয়ালা দুজন যাত্রী পেয়ে তক্ষুনি চলে গেল। কর্নেল বাইনোকুলারে ওদিকটা দেখে নিয়ে বললেন,—চলো জয়ন্ত! বেশিদূর নয়। গাছপালার ফাঁকে দোতলা বিশাল একটা পুরোনো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওটাই সম্ভবত অক্ষয়বাবুর বাড়ি।

কাঠের সাঁকোটার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। কর্নেল সাবধানে পেরিয়ে গেলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুধারে ঘন গাছপালা ঝোপঝাড়। রাস্তায় পুরোনো আমলের ইটের খোয়া মাথা উঁচিয়ে আছে। ডাইনে বাঁক নিয়ে দেখি ভেঙে পড়া গেট এবং ধ্বংসস্তূপ। বাঁ-দিকে কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে। গেটের পর এবড়ো-খেবড়ো খোয়াঢাকা রাস্তার দুধারে পাম গাছের সারি। মাঝে-মাঝে একটা করে গাছ মরে দাঁড়িয়ে আছে কন্ধকাটার মতো। কিছুটা এগিয়ে সামনে নতুন তৈরি পাঁচিল। বাড়িটা দুভাগে ভাগ হয়ে আছে। দুটো দরজা। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বড়বাবু এবং ছোটবাবুর আলাদা-আলাদা দরজা। তার মানে দুই ভাই পৃথগন্ন। প্রথমে ডাইনের দরজাটার কড়া নাড়া যাক।

কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল এবং তাগড়াই চেহারার ফতুয়া ও খাটো ধুতি পরা কালো রঙের একটা লোক করজোড়ে প্রণাম ঠুকে বলল,—সায়েবরা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আমি অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই!

সে বলল,—ভেতরে আসুন আজ্ঞে! বড়কর্তামশাই দোতলার জানলা দিয়ে আপনাদের দর্শন পেয়েছেন।

ভেতরে একটুকরো উঠোন। উঠোনে ফুলের গাছের সঙ্গে আগাছার জঙ্গল গজিয়ে আছে। এক কোণে একটা গাই গরু চরছে। নিঝুম হয়ে আছে বাড়িটা। লোকটা আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। একটা ঘরের সামনে সে একটু কেশে বলল,—আজ্ঞে ওনারা এসে গেছেন বড়কর্তামশাই।

ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সাড়া এল,—ভেতরে নিয়ে আয় হতভাগা! যেন বিনয়ের অবতার!

পুরোনো জীর্ণ পর্দা তুলে সে বলল,—আসতে আজ্ঞা হোক!

সত্যিই লোকটা বিনয়ের অবতার। ঘরটা বেশ বড়। বনেদি আসবাবপত্রে সাজানো। এমনকী ঝাড়বাতিও ঝুলছে। কোণের দিকে জানলার পাশে একটা উঁচু মস্ত বড় পালঙ্ক। পালঙ্কে ওঠার জন্য কাঠের ছোট্ট টুলের ওপর বিবর্ণ গালিচা ঢাকা। পালঙ্কে বালিশ ঠেস দিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক পা ছড়িয়ে এক পা হাঁটু অব্দি তুলে বসে ছিলেন। নমস্কার করে বললেন,—আসুন কর্নেলসায়েব! এখানে এসে বসুন।...ধানু! তুই এঁদের জন্য কফি নিয়ে আয়। কর্নেলসায়েব কফির ভক্ত। আর শোন! শিগগির রান্নার ব্যবস্থা করতে বল নবঠাকুরকে।

ধানু চলে গেলে অক্ষয়বাবু বললেন,—বাঁ হাঁটুতে ব্যান্ডেজ কর্নেল সায়েব! তাই উঠে বসতে পারছি না। কিছু মনে করবেন না যেন।

বলে একটু করুণ হেসে আমার দিকে তাকালেন,—উনি বুঝি সেই রিপোর্টার জয়ন্তবাবু? নমস্কার! নমস্কার কী সৌভাগ্য! এতদিন দৈনিক সত্যসেবকে আপনাদের দুজনকার কত কীর্তিকলাপ পড়েছি। কল্পনাও করিনি, আমার জীবনেও এমন সাংঘাতিক রহস্যময় ঘটনা ঘটবে এবং আপনাদের স্বচক্ষে দর্শন করব!

কর্নেল বললেন,—আপনার স্ত্রী এবং সন্তানাদি—

অক্ষয়বাবু বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, বিয়েই করিনি তো স্ত্রীসন্তানাদি—সারাজীবন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক। শেষজীবনে পৈতৃক বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছি। আমার বৈমাত্রেয় ভাই কালীপদ পুরো বাড়িটা দখল করে রেখেছিল। মামলা-মোকদ্দমা করে শেষে দখল পেলুম। বাড়ির অর্ধেকটা গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছিল। ওদিকটা গভর্মেন্ট দখল করে বনবিভাগের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ভাঙনরোধী জঙ্গল গজিয়েছে। নইলে এখান থেকে গঙ্গা দর্শন করা যেত।

—সেই বইটার কথা বলুন!

অক্ষয়বাবু চাপা গলায় বললেন,—আমার দুর্মতি! মাস তিনেক আগে কলকাতা গিয়েছিলুম। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। সেখানে পুরোনো বই বিছিয়ে বসে ছিল একটা লোক। হাঁকছিল, যা নেবেন তাই দু-টাকা। তো হঠাৎ চোখ গেল ওই বইটার দিকে আসল মলাট নেই। হলদে মোটা কাগজে মলাট করে—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন,—আপনার চিঠিতে বইটার অদ্ভুত আচরণের উল্লেখ আছে। সেই কথা বলুন!

অক্ষয়বাবুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। এবার উনি যা-যা বললেন, সবটাই কলকাতার কান্তি খটিক লেনের সেই ভক্তিবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। তবে ভক্তিবাবুর দু-দুবার ঠ্যাং ভাঙেনি। অক্ষয়বাবুর ভেঙেছে। এই যা তফাত।

ইতিমধ্যে ধানু কফি আর চানাচুর রেখে গেল ট্রেতে। কর্নেল কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে বললেন,—বইটা এখন কোথায় রেখেছেন?

অক্ষয়বাবু বললেন,—দেয়ালে আঁটা আয়রনচেস্টে রেখেছি।

—তা হলে তারপর আর কোনও উপদ্রব হচ্ছে না?

—উপদ্রব মানে, রাতদুপুরে আয়রনচেস্টের ভিতর বিদ্‌ঘুটে শব্দ শুনতে পাই।

—আপনার বাড়িতে আপনি, কাজের লোক ধানু আর নবঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই?

—আজ্ঞে না।

—পাশের বাড়িতে আপনার বৈমাত্রেয় ভাই কালীপদবাবু থাকেন। তাঁর ফ্যামিলিতে কে-কে আছে?

—ওর দজ্জাল বউ রাধারানি,—রাধারানির এক উড়নচণ্ডী নেশাখোর ভাই—মানে কালীর শ্যালক তাপস, কাজের মেয়ে ক্ষান্তমণি। রাধারানির সন্তানাদি নেই। ভীষণ ঝগড়াটে মেয়ে। খামোকা সকাল-সন্ধ্যা আমার নামে পিণ্ডি চটকায়।

কর্নেল দক্ষিণের জানালার দিকে আঙুল তুলে বললেন,—ওইটে বুঝি আপনাদের গৃহদেবতার মন্দির?

অক্ষয়বাবু বললেন,—হ্যাঁ। নৃসিংহদেব আমাদের গৃহদেবতা। পাঁচশো বছরের পুরনো বিগ্রহ কর্নেলসায়েব! পালা করে পুজোর খরচ বহন করি। এক সপ্তাহ আমি। পরের সপ্তাহ কালী।

—পূজারীর নাম কী?

—আমার রান্নার ঠাকুর নবই বরাবর পূজারী। কালীর সঙ্গে রফা করেছিলুম। বাইরের পূজারী রাখলে অনেক বেশি দিতে হবে। নবঠাকুরকে কালী যা দেয়, তা আমার দেওয়ার অর্ধেক। কম খরচায় কালী পুণ্যার্জন করছে। তবু ওর লোভ যায় না।

—কীসের লোভ?

অক্ষয়বাবু একটু ইতস্তত করে বললেন,—ওর বিশ্বাস, আমাদের পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া ধনরত্ন নাকি আমি গোপনে গচ্ছিত রেখেছি। অথচ দেখুন মাত্র তিনবছর হল আমি বাড়ি ফিরেছি। সারাজীবন পাহাড়পর্বত অরণ্যে সাধু-সঙ্গ করে বেড়িয়েছি। কোনও গোপন ধনরত্ন থাকলে তার খবর কালীরই রাখার কথা পিতৃদেবের মৃত্যুকালে কালীই মাথার কাছে ছিল। আমি তখন কোথায়?

—আপনার কী ধারণা?

—কী বিষয়ে?

—পূর্বপুরুষের ধনরত্ন—

অক্ষয়বাবু জোরে মাথা নেড়ে হাসলেন,—কর্নেলসায়েব! ধনরত্ন যা কিছু ছিল, তা আমার ঠাকুর্দাই খরচ করে গেছেন। ঠাকুমার মুখে ছোটবেলায় শুনেছি। খুব খরুচে লোক ছিলেন তিনি।

বলে অক্ষয়বাবু হাত বাড়িয়ে পালঙ্কের পেছনে একটা সুইচ টিপলেন নিচের দিকে ক্রিরিরিরিং করে চাপা শব্দ হল। এতক্ষণে লক্ষ করলুম বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে।

ধানু দরজার বাইরে থেকে সাড়া দিল,—আজ্ঞে বড়কর্তামশাই?

—হতভাগার এই স্বভাব। ভেতরে আয়!

ধানু ভেতরে এলে অক্ষয়বাবু বললেন,—সায়েবদের থাকার ঘর ঠিক করেছিস?

আজ্ঞে, নিচের ঘরে গেসরুমে।

গেস্টরুম বল।—অক্ষয়বাবুর হাসলেন, কর্নেলসায়েবদের নিয়ে যা আপনারা বিশ্রাম করুন। খাওয়া-দাওয়ার পর যথাসময়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

নিচের তলায় পশ্চিমদিকের গেস্টরুমটা মন্দ নয়। দক্ষিণে খোলা বারান্দা। পশ্চিমের দরজা খুললে কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা সরকারি জঙ্গল। তবে দক্ষিণের বারান্দায় রোদ্দুর আছে। বারান্দার নিচে শানবাঁধানো চত্বর। তার শেষে মন্দির। কর্নেল বাইনোকুলারে জঙ্গলে সম্ভব পাখি খুঁজছিলেন। হঠাৎ বললেন,—সর্বনাশ এই জঙ্গলে ভালুক এল কোত্থেকে?

অবাক হয়ে বললুম,—ভালুক? বলেন কী!

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন,—কয়েক সেকেন্ডের দেখা। ঝোপে লুকিয়ে গেল। জয়ন্ত! আমাদের সাবধানে থাকা দরকার।... কর্নেলের কথায় ভয় পেয়েছিলুম। পশ্চিমের দরজা খুললে ভাঙা জমিদারবাড়ির পাঁচিল, তার ওধারে বনদফতরের কাঁটাতারের বেড়া কোনও ভালুককে আটকাতে পারবে না। আবার দক্ষিণেও তাই। পাঁচিল ধসে পড়েছে কবে। তার ওপর আগাছা গজিয়েছে। কাজেই ভালুক ইচ্ছে করলে দুটো দিক থেকেই এসে হানা দিতে পারে।

এখানে ঠান্ডাটা বড্ড বেশি। তাই স্নান করলুম না। আর কর্নেলের তো সামরিক জীবনের অভ্যাস। স্নান না করে দিব্যি দুসপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারেন। আমাদের ঘরে টেবিল-চেয়ার আছে। দুপুরে খাওয়াটা সেখানেই হল। ধানু বাইরে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। নবঠাকুর ভালোই রাঁধেন।

কর্নেল তাঁকে জিগ্যেস করলেন,—পুরনো বাড়িতে নাকি ভূতের উপদ্রব হয়। এ বাড়িতে হয় না?

নবঠাকুর বললেন,—আগে হত না। ইদানীং হচ্ছে স্যার! রাতবিরেতে নানককম বিদঘুটে শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তবে আমি একটু আধটু তন্ত্রমন্ত্র চর্চা করি। মন্ত্র পাঠ শুরু করলেই প্রেতাত্মা পালিয়ে যায়। ধানুকে জিগ্যেস করে দেখুন।

ধানু বলল,—আমি স্যার ওপরতলায় বড়কর্তামশাইয়ের পাশের ঘরে থাকি। অত্যাচারটা ওপরতলায় বেশি হয়। ছাদে মচমচ ধুপ-ধুপ শব্দ শুনতে পাই। বড়কর্তার জানলার পাশে ফিসফিস করে কারা কথাবার্তা বলে, টর্চ জ্বালি। কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না।

কর্নেল বললেন,—ইলেকট্রিক আলো জ্বলে?

আলোর কথা বলবেন না স্যার!—ধানু হাসল, এই আছে, এই নেই। কোনও-কোনও রাতে তো কারেন্ট থাকেই না। সেইজন্য ওই দেখুন, আপনাদের জন্য লণ্ঠনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

—আচ্ছা ধানু, ওই জঙ্গলে বুনো জন্তুজানোয়ার আছে কি না জানো?

জবাব দিলেন নবঠাকুর,—কিছুদিন থেকে একটা ভালুক দেখা যাচ্ছে শুনেছি। তবে আমি দেখিনি স্যার!

ধানু বলল,—হ্যাঁ স্যার! গাঁয়ের লোকেরা নাকি দেখেছে। আমি পরশু সন্ধ্যাবেলা গাইগরু আর বাছুরটাকে ওই গোয়ালঘরে ঢোকাতে যাচ্ছিলুম হঠাৎ টর্চের আলোয় পাঁচিলের ওপর কালো মুন্ডু দেখলুম। মুন্ডুটা তক্ষুনি ওধারে নেমে গেল। গরুটা খুব চমকে উঠেছিল। ভালুকই বটে। সেইজন্যে পাঁচিলের ওপর কাঁটাঝোপ কেটে চাপিয়ে রেখেছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার বড়কর্তা ভালুক দেখে সিঁড়িতে পড়ে হাঁটু ভাঙেননি তো?

ধানু গম্ভীর মুখে বলল,—জানি না স্যার! উনি খুলে কিছু বলেননি। রাত দুপুরে কেন নিচে নামছিলেন জানি না। লোডশেডিং ছিল। হঠাৎ হুড়মুড় শব্দ আর ওনার চ্যাঁচানি শুনে গিয়ে দেখি সিঁড়ির নিচে হাঁটু চেপে ধরে ককাচ্ছেন। সেই রাত্তিরে নাড়ুবাবু ডাক্তারকে বড়হাটছড়ি থেকে ডেকে আনলুম। উনি ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। একমাস বড়কর্তামশাই বিছানায় শুয়ে ছিলেন।

—আবার নাকি আছাড় খেয়ে হাঁটুতে আঘাত পেয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়কর্তামশাইয়ের বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস আছে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে ওই জঙ্গলের মধ্যিখানের রাস্তা ধরে গঙ্গার ধারে যেতে হয়। যেই বিছানা ছেড়ে লাঠি হাতে হাঁটতে শুরু করেছেন, অমনি সেই অভ্যাস চাগিয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গার ধারে আবার আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। ভাগ্যিস জেলেপাড়ার লোকেরা ওনাকে দেখতে পেয়েছিল। ধরাধরি করে বয়ে এনেছিল। আবার নাড়ু ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছেন।

এই সময় নিচে কোথাও ঘণ্টি বাজল ক্রিরিরিরিং! শোনামাত্র ধানু চলে গেল।

খাওয়ার পর কর্নেল দক্ষিণের দরজা খুলে চেয়ার নিয়ে গিয়ে রোদে বসলেন। চুরুট ধরিয়ে বাইনোকুলার তুলে সম্ভবত জঙ্গলে ভালুকটা খুঁজতে থাকলেন। আমি ভাত-ঘুম দিতে বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি। নবঠাকুরের ডাকে চোখ খুলে দেখি, সে চা এনেছে। বাইরে শেষবেলার ধূসর আলো। তারপরই ভালুকের কথা এবং কর্নেলের সাবধানবাক্য মনে পড়ল। আঁতকে উঠে দেখি, দক্ষিণের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমার গায়ে কম্বল। হ্যাঁ—কর্নেলের কাজ। জিগ্যেস করলুম—ঠাকুরমশাই! কর্নেলসায়েবকে দেখেছেন?

নবঠাকুর বললেন,—সায়েব তো কখন বেরিয়ে গেছেন। বোধ করি, বেড়াতে গেছেন।

চা খাওয়ার পর দক্ষিণের দরজা খোলার সাহস হল না, উত্তরের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরদিকের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলুম। বিদ্যুৎ আছে। কেন না বাড়িতে আলো জ্বলছে। ডানদিকে ছোটকর্তা কালীপদবাবুর বাড়ির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, এক ভদ্রমহিলা দোতলার জানলা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলুম, উনিই সেই দজ্জাল মহিলা। কালীপদবাবুর স্ত্রী। একটু পরে সম্ভবত ওঁরই চিৎকার কানে এল,—ক্ষান্তমণি! অ ক্ষান্ত! বঁটিতে শান দিয়ে রেখেছিস তো?

কেউ চেরা গলায় বলল,—হ্যাঁ গিন্নিমা! এমন শান দিয়েছি যে, এক কোপে দু-দুটো বলি হয়ে যাবে!

সর্বনাশ! নিশ্চয় আমাকে এবং কর্নেলকে লক্ষ করে কথা হচ্ছে। আস্তে ডাকলুম,—ঠাকুরমশাই!

নবঠাকুর কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন। ফিক করে হেসে বললেন,—কান দেবেন না স্যার! আমরা প্রতিদিন শুনে-শুনে অভ্যস্ত। তবে মজাটা দেখবেন?

বলে সে জোরে ডাকল—ধানু! অ ধানু! জঙ্গলে ভাল্লুক এসেছে। বল্লমটা শান দিয়েছ তো?

ধানু গোয়ালঘরে গরু ঢোকাচ্ছিল। সেখান থেকে সাড়া দিল—বল্লম চকচক করছে ঠাকুরমশাই! ভাল্লুক এঁফোড়-ওফোঁড় করে ফেলব।

দ্বিগুণ জোরে ভদ্রমহিলা বললেন,—ক্ষান্ত! অ ক্ষান্তমণি! বঁটিখানা দে তো!

ক্ষান্তমণির সাড়া এল,—এই নিন গিন্নিমা! জোরে ছুঁড়ে মারবেন! খ্যাচাং করে মুণ্ডু কেটে যাবে।

তারপর পুরুষকণ্ঠে কেউ ধমক দিল,—কী হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায়? শাঁখে ফুঁ না দিয়ে মুণ্ডু কাটাকাটি কেন?

এই সময় কর্নেল ফিরে এলেন। আমার মাথার ওপর কোথাও বেল বেজে উঠল। ধানু হন্তদন্ত হয়ে ওপরে চলে গেল। তারপর কান ফাটানো শাঁখ বাজল। নবঠাকুর পট্টবস্ত্র পরে কোষাকুষি গঙ্গাজলের ঘটি, ফুলের ডালি নিয়ে সিঁড়ির পাশের দরজা খুলে মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন। কর্নেল এসে চাপাস্বরে বললেন,—ভাগ্যিস অক্ষয়বাবু বিয়ে করেননি। যা বোঝা গেল, এ বাড়িতে একজন মহিলা থাকলে কেলেঙ্কারি হত। জ্ঞাতিকলহ সাংঘাতিক ব্যাপার!

বললুম,—আপনি প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছিলেন? নাকি হাঁসখালির বিলে হাঁস দেখতে?

কর্নেল হাসলেন,—নাহ্! জঙ্গলে ভালুক খুঁজতে!

—বলেন কী! ভালুক অকারণে হিংস্র হয়ে ওঠে শুনেছি!

—হ্যাঁ। তবে ভালুকের বদলে তার কয়েকগাছা লোম কুড়িয়ে পেয়েছি!

—কোথায়? কোথায়?

—মন্দিরের পেছনে একটা ঝোপের ভেতর।

ধানু এসে বিনীতভাবে বলল,—বড়কর্তামশাই সায়েবদের ডাকছেন আজ্ঞে! আপনারা চলুন ওপরে। ঠাকমশাই মন্দিরে আছেন। আমি কফি তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

কর্নেলের পিঠে কিটব্যাগ এবং তার চেনের ফাঁকে প্রজাপতি ধরা জালের স্টিক উঁচিয়ে আছে। গলা থেকে ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার ঝুলছে। মাথার টুপি ঝেড়ে পরলেন। তারপর নিচে নেমে উঠোনের ঘাসে হান্টিং জুতোর তলা ঘষে সাফ করে বললেন,—চলো জয়ন্ত! সাজসরঞ্জাম সঙ্গেই থাক।

দোতলায় অক্ষয়বাবু ঘরে আলো জ্বলছিল। তবে লোডশেডিংয়ের কথা ভেবে পাশে একটা টেবিলের ওপর চিনে লণ্ঠন দম কমিয়ে রাখা হয়েছে। জানলাগুলো বন্ধ। ওপরে শীতের হাওয়ার উপদ্রব বেশি।

আমরা বসলুম। অক্ষয়বাবু গম্ভীরমুখে বললেন,—স্বকর্ণে শুনলেন কালীর বউ অকারণ ঝগড়া বাধাতে চায়?

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ ভদ্রমহিলা সম্ভবত মানসিক রোগী।

অক্ষয়বাবুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—ঠিক। ঠিক ধরেছেন! আমার ভয় হয় কবে না সত্যি এ বাড়িতে কারও দিকে বঁটি ছুঁড়ে মারে। কালীর উচিত ওকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া। কে বলবে বলুন?

কর্নেল বললেন,—জঙ্গলের রাস্তায় গঙ্গার ধারে গিয়েছিলুম। কাছেই শ্মশান আছে দেখলুম।

—ওটাই সাবেক আমলের শ্মশান। শ্মশানকালীর মন্দির ছিল ধ্বংস হয়ে গেছে।

—আপনি কি ওখানে গিয়েই অদৃশ্য হাতের চাঁটি খেয়েছিলেন?

অক্ষয়বাবুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল। ঝটপট বললেন,—আজ্ঞে হাঁ। নিতান্ত কৌতূহল। শ্মশানের কাছাকাছি যেই না গেছি, অমনি মাথায় জোরে চাঁটি। আছাড় খেয়ে পুরনো আমলের ঘাটের একটুকরো পাথরে পড়ে গিয়েছিলুম। পড়বি তো পড়, সেই বাঁ হাটু ঠুকে—উঃ! একটুও নড়ানো যাচ্ছে না। কলকাতা গিয়ে চিকিৎসা করাব কি না ভাবছি।

এই সময় খট খটাং করে চাপা শব্দ হতে থাকল। অক্ষয়বাবু আঁতকে উঠে বললেন,—ওই শুনুন! আয়রন চেস্টের ভেতর বইটা যেন লাফাচ্ছে!

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর খুদে কিন্তু জোরালো আলোর টর্চ বের করে আয়রনচেস্টের কাছে গেলেন। তারপর ওটার গায়ে কান পেতে বললেন,—হ্যাঁ। একটা কিছু নড়াচড়া করছে বটে!

—বইটা! ভূতুড়ে বইটা!

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। কর্নের্লে বললেন,—আয়রনচেস্টের চাবিটা দিতে আপত্তি না থাকলে একবার দিন।

না, না। আপত্তি কীসের? এই নিন। —বলে অক্ষয়বাবু বালিশের তলা থেকে একটা প্রকাণ্ড চাবি তাঁর দিকে ছুড়ে দিলেন। কর্নেল চাবিটা লুফে নিয়ে আয়রনচেস্ট খুললেন। ভারী এবং মোটা ইস্পাতের দরজার হাতল টানার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের মুখের ওপর একটা বই ছিটকে পড়ল। উনি দ্রুত মুখ ঘুরিয়েছিলেন। তাই বইটা ওঁর দাড়িতে লেগেছিল। বইটা ধরে উনি আয়রনচেস্টের ভেতরটা দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর তালা এঁটে দিলেন।

কর্নেল চাবিটা অক্ষয়বাবুকে ফেরত দিয়ে বইটা খুলছেন, এমন সময় লোডশেডিং হয়ে গেল। অক্ষয়বাবু হাত বাড়িয়ে চিনা লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন—দেখলেন? দেখলেন?

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন,—থাক। বইটা এখন খোলার দরকার নেই। বলা যায় না, লণ্ঠনটা নিভে গেলে কেলেঙ্কারি। আমার টর্চ জ্বেলে যদি পড়ার চেষ্টা করি, হয়তো প্রেতাত্মা আমার টর্চ বিগড়ে দেবে। ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই।

হলুদ মলাটে লাল সুতোয় সেলাই করা এবং লাল কালিতে লেখা ‘প্রেতাত্মার অভিশাপ’। ঠিক একই বই কলকাতায় ভক্তিবাবু দিয়ে গেছেন কর্নেলকে। বইটা উনি কিটব্যাগে ঢুকিয়ে চেন এঁটে দিলেন। তারপর বললেন,—আচ্ছা অক্ষয়বাবু, বাই এনি চান্স আপনি ভক্তিভূষণ হাটি নামে কোনও ভদ্রলোককে চেনেন?

অক্ষয়বাবু বললেন,—ভক্তিভূষণ হাটি? না তো। কোথায় থাকেন তিনি?

—কলকাতায়।

—তা ওঁর কথা কেন জিগ্যেস করছেন কর্নেলসায়েব?

—উনিও এক কপি ‘প্রেতাত্মার অভিশাপ’ কিনে আপনার মতো বিপদে পড়েছেন!

—অ্যাঁ? বলেন কী?

—তবে ওঁকে অবশ্য প্রেতাত্মা আছাড় মারেনি। চাঁটিও মারেনি। উনি দিব্যি চলাফেরা করে বেড়াচ্ছেন।

অক্ষয়বাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন,—উনিও কি আপনার সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। বইখানা আমি আপনার মতো আলমারির লকারে চাবি এঁটে রেখে এসেছি।

—আলমারির ভেতর কোনও শব্দটব্দ—

—আমি শুনিনি। তবে আমার কাজের লোক ষষ্ঠীচরণ শুনেছে।

এই সময় ধানু কফি এবং স্ন্যাক্সের ট্রে নিয়ে এল। এতক্ষণ নিচের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছিল। এবার থেমে গেল। ধানু ট্রে রেখে দ্রুত চলে গেল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—ওই জঙ্গলে একটা বুনো ভালুক আছে শুনলাম। দুপুরে বাইনোকুলারে কী একটা কালো জন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমিও দেখেছি।

অক্ষয়বাবু বললেন,—হ্যাঁ। ধানুও ভালুকটার মুখ দেখেছে বলছিল। বুঝতে পারছি না। ওই জঙ্গলে ভালুক কী করে এল। এক হতে পারে, কোনও মাদারির খেলোয়াড় ভালুক হয়তো পালিয়ে এসেছে। শুনেছি, পোষা ভালুক কোনও কারণে হঠাৎ খেপে যায়। তখন বুনো ভালুকের চেয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে। কেউ থানায় পুলিশকে বা ফরেস্ট অফিসে কেন খবর দিচ্ছে না? দেখি, ধানুকে দিয়ে আমিই খবর পাঠাব।

কফি খেয়ে পেয়ালা রেখেছি এবং কর্নেল চুরুট ধরিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ ছাদের ওপর ধুপধুপ শব্দ হল এবং কড়িবরগার ফাঁকে ঝরঝর করে একটু চুনবালি খসে পড়ল। অক্ষয়বাবু আঁতকে উঠে বললেন,—ওই শুনুন! তারপর তিনি ডাকলেন, ধানু! ধানু!

বিদ্যুৎ নেই। তাই কলিংবেল বাজানোর উপায় নেই। ধানু নিচে থেকে সাড়া দিল,—বড়কর্তামশাই! যাচ্ছি!

অক্ষয়বাবু হাঁক দিলেন,—বল্লম! বল্লম নিয়ে চিলেকোঠায় চলে যা ধানু! আবার সেই অত্যাচার!

কর্নেল পকেট থেকে টর্চ বের করে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম। অক্ষয়বাবু বললেন,—যাবেন না কর্নেলসায়েব। আপনারা আমার অতিথি। অতিথির বিপদ হলে মুখ দেখাতে পারব না!

কর্নেল সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার ছাদে গিয়ে টর্চ জ্বাললেন। আশ্চর্য! ছাদে কেউ নেই। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে পশ্চিমের আলিসায় ঝুঁকে টর্চের আলো জ্বেলে বললেন,—আশ্চর্য!

জিগ্যেস করলুম,—কী? কী?

—কয়েকসেকেন্ডের জন্য দেখলুম পাইপ বেয়ে সেই ভালুকটা নামছে! সার্কাসের ভালুক নাকি?

—আর দেখতে পেলেন না?

—নাহ্। নিচে ঝোপ জঙ্গল আছে।

ধানু বল্লম আর টর্চ হাতে উঠে এল এতক্ষণে। বলল,—বল্লমটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। কিছু দেখতে পেলেন আপনারা?

কর্নেল বললেন,—নাহ।

ধানু পুবদিকে টর্চের আলো ফেলে বলল,—ছাদও পাঁচিল তুলে ভাগ করা হয়েছে। ছোটকর্তামশাইয়ের ছাদে যে আলো ফেলে খুঁজব, তার উপায় নেই! বঁটি নিয়ে ছোট গিন্নিমা তেড়ে আসবেন।

আমার মনে হয় ওদিকে কোনও শব্দ হয়নি।—কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, তা হলে ওঁরা ওঁদের অংশের ছাদে খুঁজতে আসতেন।

ধানু চাপাস্বরে বলল,—কিছু বলা যায় না। ছোটকর্তামশাই পাঁচিল ডিঙিয়ে এ ছাদে এসে ধুপ-ধুপ শব্দ করেন কি না কে জানে?

আমরা সিঁড়ির মুখে গেছি, এমনসময় কালীপদবাবুর অংশের ছাদে কে জড়ানো গলায় গেয়ে উঠল—'তালুকদারের ভালুক গেল শালুক খেতে পুকুরে—এ—এ....'

ধানু হাসি চেপে বলল,—ছোটকর্তামশাইয়ের শালাবাবু। তাপসবাবু আজ্ঞে! নেশা করেছেন মনে হচ্ছে

কর্নেল বললেন,—বাহ! তাপসবাবুর ভালুকদর্শন হয়েছে।...

চার

ছাদ থেকে দোতলায় নেমে কর্নেল বললেন,—ধানু! তোমার কর্তামশাইকে বলো, আমরা আপাতত নিচে যাচ্ছি। আমাকে পোশাক বদলাতে হবে। হাঁসখালির বিলে হাঁস দেখতে গিয়েছিলুম। পোশাকে কাদা লেগে আছে।

নিচে গেস্টরুমের দরজায় লণ্ঠন জ্বেলে রেখে নবঠাকুর রান্নাঘরে ছিলেন। উঁকি মেরে বললেন, —আপনারা কলকাতার মানুষ স্যার! কটায় খাবেন?

কর্নেল বললেন,—তোমার কর্তা কটা বাজলে খান?

—আজ্ঞে নটায়।

—ঠিক আছে আমরাও ওইসময় খাব। আপাতত এক বালতি জল চাই।

—একটু গরম জল মিশিয়ে দিচ্ছি স্যার! যা ঠান্ডা পড়েছে! জল একেবারে বরফ!

তা-ই দাও।—বলে কর্নেল লণ্ঠন তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। লণ্ঠন টেবিলে রেখে কিটব্যাগ খুলে দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে দিলেন। টুপিটাও ঝুলিয়ে রেখে চেয়ারে বসলেন।

বললুম,—ভূতুড়ে বইটা দেখছি আপনার কিটব্যাগের ভেতর একেবারে শান্ত হয়ে আছে।

কর্নেল হাসলেন,—ক্লান্তি জয়ন্ত, ক্লান্তি! তখন আরনচেস্টের ভেতর অত নাচানাচি করেছে। তারপর আমার দাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুড়সুড়ি খেয়েছ। তাই ক্লান্তিতে ঝিমোচ্ছে! ভয়ও পেয়েছে বইকী! আবার যদি দাড়িতে চেপে ধরি?

চাপাস্বরে বললুম,—ব্যাপারটা সত্যি অবিশ্বাস্য! বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না। তা ছাড়া ছাদেই বা ভালুক উঠল কেন?

—ভালুক গাছে চড়তে পারে। পাইপ বেয়ে ছাদে চড়তে পারে না?

—কিন্তু কেন?

—সম্ভবত সার্কাসের ভালুক। এই শীতে গ্রামাঞ্চলেও সার্কাসের দল আসে। কোনও দল থেকে পালিয়ে এসেছে। তো তুমি বলছ, ছাদে চড়ল কেন? অভ্যাস! ট্রাপিজের খেলায় পাকা। তাই ছাদে চড়ে কসরত দেখাচ্ছিল!

কর্নেলের চুরুট নিভে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিলেন। বললুম,—পোশাক বদলাবেন বললেন। কিন্তু সঙ্গে তো আমার মতো বাড়তি একপ্রস্থ পোশাক আনেননি আপনি।

—আলবাত এনেছি। কিটব্যাগটা কেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখতে পাচ্ছ না?

বলার সঙ্গে-সঙ্গে কিটব্যাগটা ব্র্যাকেট থেকে ধপাস করে নিচে পড়ে গেল। চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল উঠে গিয়ে ব্যাগটা তুলে বললেন,—মরচে ধরা পুরনো ব্র্যাকেট। হুকগুলো ক্ষয়ে গেছে। বরং ব্যাগটা টেবিলে রাখি।

কর্নেল নিচে থেকে ব্র্যাকেটের ভাঙা হুকটা কুড়িয়ে বাইরে ছুড়ে ফেললেন। বললুম,—কর্নেল! ব্যাপারটা কিন্তু সন্দেহজনক।

উনি কোনও কথা বললেন না। চেন খুলে প্যান্ট-শার্ট বের করে নিলেন। তারপর চেন এঁটে টেবিলে লম্বালম্বি ব্যাগটাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। একটু পরে নবঠাকুর এক বালতি জল এনে সংলগ্ন বাথরুমে রেখে এলেন। এতক্ষণে বিদ্যুৎ এল।

কর্নেল জ্যাকেট খুলে সেই ব্র্যাকেটের হুক পরীক্ষা করে শক্ত একটা হুকে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর পোশাক বদলাতে বাথরুমে ঢুকলেন।

একটু পরে দেখি, টেবিলে কিটব্যাগটা কাত হয়ে পড়ল। আমার বুকের ভেতর যেন ঠান্ডাহিম ঢিল গড়িয়ে গেল। এবার যদি কিটব্যাগটা নাচতে শুরু করে, কী করব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

কিন্তু কিটব্যাগটা কাত হয়েই রইল। কর্নেল প্যান্ট-শার্ট বদলে তোয়ালেতে মুখ মুছে দাড়ি এবং টাকের তিনপাশের চুল আঁচড়ে ধোপদুরস্ত হয়ে বেরুলেন। জ্যাকেটটা পরে নিলেন। তারপর খাটের তলা থেকে রবারের চটি পরে চেয়ারে বসলেন। একটু হেসে বললেন,—কিটব্যাগটা দ্বিতীয়বার পড়ায় তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক, কিছু বলার নেই।

একটু দ্বিধার সঙ্গে বললুম,—না—মানে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। কারণ আপনিই বলেন, কোনও ঘটনাকে তার সঠিক ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে বিচার করা উচিত। কিটব্যাগে 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' আছে। তাই—

কর্নেল হাসলেন,—ব্যালান্স, জয়ন্ত! ব্যালান্স! এ ধরনের লম্বাটে কোনও ব্যাগকে সোজা বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা কঠিন। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ব্যাপার! তবে আমি ইচ্ছে করেই ব্যাগটা ওভাবে দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলুম। নাহ্! তুমি দেখছি, দিনে-দিনে ক্রমশ—

ওঁর কথা থেমে গেল। পশ্চিমদিকের দরজায় আচমকা শব্দ হল এবং নড়তে থাকল। সেইসঙ্গে খরখর খসখস অদ্ভুত শব্দ। কর্নেল সোজা উঠে গিয়ে দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললেন,—বাবা ভালুক! খামোকা রিভলভারের একটা গুলি খরচ করাবে কেন? আজকাল গুলির যা দাম বাবা! এভাবে কিছু হবে না ডার্লিং! তুমি ভুল পথে হাঁটছ!

অমনি দরজার নড়াচড়া এবং শব্দটা থেমে গেল। বললুম,—কী সর্বনাশ! ভালুকটা নাকি?

কর্নেল বললেন,—সার্কাসের ভালুক তো! মানুষের কথা বোঝে।

বললুম,—কালই আপনি থানায় এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে বরং খবর দিয়ে আসুন। এভাবে একটা ভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখন কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলা যায় না।

হুঁ। দেব।—বলে কর্নেল চোখ বুজে টাকে হাত বুলোতে থাকলেন।

নবঠাকুর দরজার সামনে এসে বললেন,—কফি খেতে ইচ্ছে হলে বলবেন স্যার! কর্তামশাই আপনার জন্য কেষ্টনগর থেকে কফি আনিয়ে রেখেছেন।

কর্নেল চোখ বুজে বললেন,—কেষ্টনগরে আমরা একবার কফির বদলে চাফি খেয়েছিলুম। মনে আছে জয়ন্ত?

বললুম,—হ্যাঁ। চা আর কফি মিশিয়ে চাফি। তার সঙ্গে অবশ্য সরপুরিয়া ছিল।

নবঠাকুর বললেন,—আজ্ঞে, সরপুরিয়াও আছে। রাত্তিরে খাওয়ার সময়—

কর্নেল বললেন,—না ঠাকুরমশাই। সকালে ব্রেকফাস্টে দেবেন বরং!

—ঠিক আছে স্যার। ফ্রিজে রাখা আছে। কারেন্ট থাক আর না-ই থাক, সরপুরিয়া কখনও নষ্ট হয় না।

ধানু এসে বলল,—বড়কর্তামশাই আপনাদের ডাকছেন আজ্ঞে!

ঘড়ি দেখে কর্নেল বললেন,—চলো জয়ন্ত! সময় কাটছে না। অক্ষয়বাবুর সঙ্গে গল্প করা যাক।

বললুম,—দরজা খোলা থাকবে?

—থাক।

ধানু বলল,—দরজায় শেকল আটকে দিচ্ছি স্যার। ঠাকমশাই আছেন। আমিও আছি। কিচ্ছু চুরি যাবে না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বললুম,—ফিরে গিয়ে যদি দেখেন, বইটা কিটব্যাগ থেকে বেরিয়ে টেবিলের তলায় কিংবা বিছানায় চলে গেছে?

যাক না।—কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, প্রেতাত্মাকে স্বাধীনতা দিয়ে দেখা যাক, কী করে।

অক্ষয়বাবু পালঙ্কে একই অবস্থায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। বিছিয়ে রাখা পায়ের হাঁটু মেলে ব্যান্ডেজে হাত বোলাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে ধুতি টেনে পা ঢেকে বললেন—আসুন কর্নেলসায়েব!

আমরা ওর পালঙ্কের কাছে সেকেলে সোফায় বসলুম। কর্নেল বললেন,—ওপাশের ছাদে কালীবাবুর শ্যালক মাতাল হয়ে গান গাইছিলেন!

অক্ষয়বাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—কালীকে ওই ছোকরাই সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে। দিদির কাছে তাপস নাকি নেশার টাকা আদায় করে। কালীর বউ আবার ভাইয়ের এতটুকু বদনাম শুনলে খেপে যায়। তো আপনার সামনেই দু-দুবার অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চয় কোনও চিন্তাভাবনা করেছেন?

কর্নেল বললেন,—কিছু বুঝতে পারছি না। তবে ওই ভালুকের ব্যাপারটা আলাদা। ওটা নিশ্চয় কোনও সার্কাস দলের ভালুক। অনেক কসরত জানে।

—আমার পা ভালো থাকলে ভালুকটাকে গুলি করে মারতুম!

—আপনার বন্দুক আছে বুঝি?

আছে।—বলে বিছানার ওপাশ থেকে দোনলা বন্দুক তুলে দেখালেন অক্ষয়বাবু! এলাকায় চুরিডাকাতি হয়। তাই বন্দুকের লাইসেন্স জোগাড় করেছিলুম। কিন্তু ভালুককে গুলি করে মারা যায়। প্রেতাত্মাকে তো যায় না। সেটাই প্রবলেম। আপনি দেখলেন তো! ভূতুড়ে বইটা কী খেল দেখাল!

—হ্যাঁ। আমি মুখ না ঘোরালে নাক ভেঙে দিত!

—ওহ্! কী সর্বনেশে বই! ওটাকে কেন যে গঙ্গায় ফেলে দিইনি? আসলে আমার মনে হয়েছিল, এর পেছনে কোনও জটিল রহস্য আছে। তাই আপনাকে ডেকে বইটা না দেখানো পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলুম না। হ্যাঁ—বইটা কি নিচে রেখে এসেছেন?

কর্নেল হাসলেন,—আমার ব্যাগে ভরে রেখেছি। তবে ব্যাগটা দেয়ালের ব্র্যাকেট ঝুলিয়েছিলুম। ব্র্যাকেটের হুক ভেঙে ব্যাগটা নিচে পড়ে গিয়েছিল।

—অ্যাঁ! বলেন কী?

—ব্যাগটা টেবিলে সোজা রেখে বাথরুমে ঢুকেছিলুম। এসে দেখি ব্যাগটা কাত হয়ে পড়ে আছে। জয়ন্তের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে!

অক্ষয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন,—বইটা তাহলে নিচে রেখে আসা ঠিক হয়নি।

এইসময় হঠাৎ আমাদের পিছন দিকে জানলার ওধারে ফিসফিস শব্দে কারা কথা বলে উঠল। অক্ষয়বাবু নড়ে বসলেন। ইশারায় আঙুল তুললেন।

কর্নেল পালঙ্কের পাশ দিয়ে এগিয়ে জানলা খুললেন। তারপর টর্চের আলো জ্বাললেন। বললেন,—আশ্চর্য! এদিকে তো দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই। খাড়া দেয়াল নেমে গেছে!

অক্ষয়বাবু বললেন,—সেই তো বলছি! আমার বুদ্ধিসুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে।

ফিসফিস কথাবার্তার শব্দ ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি হতবাক হয়ে বসে আছি। ভয় যে পাইনি, তা নয়। তবে কর্নেল পাশে আছেন বলে সাহস পাচ্ছিলুম।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আপনাদের গৃহদেবতা নৃসিংহদেবের পুজোআচ্চা নিয়মিত হয়। অথচ তিনিও প্রেতাত্মাটাকে জব্দ করতে পারছেন না। এটাই আশ্চর্য!

পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ বিকট মেয়েলি কান্নার শব্দ ভেসে এল। অক্ষয়বাবু বললেন,—ওই আরেক জ্বালা! মেন্টাল পেশেন্ট!

ধানু!—বলে হেঁকে উনি পালঙ্কের পাশে একটু সুইচ টিপলেন।

ধানু বাইরে থেকে বলল,—বলুন আজ্ঞে!

—ভেতরে আসবি তো? কী হয়েছে রাধারানির? অমন কান্নাকাটি করছে কেন?

ধানু ভেতরে ঢুকে বলল,—বলেন তো জেনে আসি আজ্ঞে!

—তোর তো ক্ষান্তমণির সঙ্গে কথা হয়। তাকে চুপিচুপি ডেকে শুনে আয় অমন মড়াকান্না কাঁদছে কেন?

—আজ্ঞে, ক্ষান্তমণি আমার মামাতো বোন বড়কর্তামশাই! আপনি যখন আসেননি, তখন আমি ছোটকর্তামশাইয়ের বাড়ি কাজ করতুম তো। যখন আপনি এলেন, তখন ক্ষান্তমণিকে এনে দিলুম ওনাদের জন্য।

—নে! ইতিহাস শুরু করে দিল। যা! জেনে আয় শিগগির! আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছে!

ধানু চলে গেল। কর্নেল বললেন,—বোঝা যাচ্ছে ধানু আপনাদের পরিবারের পুরাতন ভৃত্য!

—হ্যাঁ। আমি যখন ফিরে এলুম, তখন বাবার কথামতো ধানু আমার সারভ্যান্ট হয়েছিল। বাবা নাকি মৃত্যুর আগে ধানুকে এই আদেশ দিয়েছিলেন।

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন,—আপনি একটু আগে বললেন, আপনার ভ্রাতৃবধূর কান্না শুনে আপনার অস্বস্তি হচ্ছে। কেন অস্বস্তি হচ্ছে তা বলতে আপত্তি আছে?

অক্ষয়বাবু চাপা গলায় বললেন,—ওই যে নেশাখোর ছোকরা তাপসের কথা বলছিলুম। ও এখানকার যত নেশাখোর গুন্ডা-মস্তানের সঙ্গে মেলামেশা করে। আমার ভয় হয়, কালী বউয়ের ভয়ে ওকে যা প্রশ্রয় দেয়, কবে না টাকার লোভে হতভাগা কালীকেই—

বলে উনি চোখ বুজে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করলেন। আপনমনে আবার বললেন,—প্রভু নৃসিংহদেব! রক্ষা করো প্রভু!

অক্ষয়বাবু করজোড়ে চোখ বুজে গৃহদেবতার নাম আওড়াতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে ধানু এসে বাইরে সাড়া দিল,—আজ্ঞে বড়কর্তামশাই!

অক্ষয়বাবু চোখ খুলে বললেন—ভেতরে আসতে কি লজ্জা করে হতভাগা?

ধানু ভেতরে ঢুকে বলল,—কেষ্টনগরে ছোটকর্তামশাইয়ের শ্বশুরমশাইয়ের হঠাৎ অসুখ। সেই খবর পেয়ে ছোটগিন্নিমা কান্নাকাটি করছেন। ছোটকর্তামশাই বাড়ি ছেড়ে যাবেন কী করে? তাই শালাবাবু আর ক্ষান্তমণি ছোটগিন্নিমাকে নিয়ে কেষ্টনগর যাবেন। সাড়ে নটায় লাস্ট বাস! সেই বাসে চেপে যাবেন আজ্ঞে!

যতসব!—অক্ষয়বাবু রুষ্টমুখে বললেন, আমি ভাবি না জানি কী সর্বনাশ হয়েছে বাড়িতে।

ধানু চলে গেল।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ওঠা যাক। বিকেলে হাঁসখালির বিলে বুনো হাঁসের ছবি তুলতে গিয়ে খুব হাঁটাহাঁটি করেছি। ক্লান্ত লাগছে।

অক্ষয়বাবু বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ। আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন। নবঠাকুরকে বলা আছে, যখন খেতে চাইবেন, তখনই ব্যবস্থা হবে। যা শীত পড়েছে! হঠাৎ শীত। বুঝলেন? পরশু আর কাল এদিকে খুব বৃষ্টি হল। তাই এবার শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে। আর—বইটা!

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ, বইটা প্রেতাত্মার। কাজেই একটু দুষ্টুমি করতেই পারে।

নিচে এসে দেখি, ধানু আর নবঠাকুর রান্নাঘরের মেঝেয় বসে গল্প করছেন। আমাদের দেখে ধানু উঠে এসে দরজার শেকল খুলে দিল।

কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন,—বইটার কী অবস্থা দেখা যাক!

তিনি কিটব্যাগের চেন খুলে বললেন,—এ কী? বইটা নেই দেখছি!

আমার চোখ গেল পশ্চিমের দরজার কাছে। দেখলুম, বইটা দরজার নিচে পড়ে আছে। কর্নেলকে বললুম,—ওই দেখুন!

কর্নেল বইটা তুলে এনে কিটব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন,—প্রেতাত্মাই বটে! ধানু পাশের বাড়িতে খবর আনতে গিয়েছিল! ঠাকুরমশাই রান্নাঘরে ছিলেন। তখন প্রেতাত্মা চুপিচুপি ঘরে ঢুকে এই কর্মটি করেছে।

বলেই উনি চমকে উঠলেন হঠাৎ,—জয়ন্ত! জয়ন্ত টেবিলে ভালুকের লোম পড়ে আছে দেখছ?

অবাক হয়ে দেখলুম, টেবিলে সত্যি কয়েকটা কালো লোম পড়ে আছে।...

পাঁচ

একে তো নতুন জায়গায় গেলে আমার ঘুম আসতে চায় না, তার ওপর প্রেতাত্মা এবং ভালুকের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! কতক্ষণ পরে সবে চোখের পাতায় ঘুমের ঘোর লেগেছে, হঠাৎ সেটা কেটে গেল কী একটা শব্দে। নিঝুম রাতে যে-কোনও ছোট্ট শব্দ বড় হয়ে কানে ধাক্কা দেয়।

মন্দিরের দিকে কার চলাফেরার শব্দ এবং চুপিচুপি কথাবার্তার শব্দ। কর্নেলের নাক ডাকছিল। চাপাস্বরে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

ওঁর নাকডাকা থেমে গেল। তারপর ঘুমজড়ানো গলায় বললেন— ঘুমোও।

জানালার ফাঁকে বাইরের বিদ্যুতের আলো আর দেখা যাচ্ছিল না। বুঝলুম লোডশেডিং চলছে। বাইরের শব্দও থেমে গেল হঠাৎ।

কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়? কর্নেলের পরামর্শ মনে পড়ল। ঘুম না এলে একশো থেকে উলটো দিকে নিরানব্বুই-আটানব্বুই করে গুনতে হয়। এতে কাজ হয়েছিল। কখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি।

সেই ঘুম ভেঙে গেল বাইরে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে। হুড়মুড় করে উঠে বসলুম তারপর মশারি থেকে বেরিয়ে দেখি, কর্নেল বিছানায় নেই। মশারিটা অর্ধেক তোলা আছে। দক্ষিণের দরজা হাট করে খোলা। বাইরে ভোরের আলো গাঢ় কুয়াশায় ধূসর হয়ে আছে। দক্ষিণের মন্দির চত্বর থেকে চ্যাঁচামেচি হচ্ছিল। তাই দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় গেলুম। দেখলুম, নবঠাকুর হাউমাউ করে কর্নেলকে কী বলছেন। ধানু ভেউ-ভেউ করে কাঁদছে। দোতলা থেকে অক্ষয়বাবু চিৎকার করে বলছেন,—ধানু! ধানু! কী হয়েছে?

চত্বরে নেমে গিয়ে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—কী হয়েছে কর্নেল?

কর্নেল ভারী গলায় বললেন,—মার্ডার!

—মার্ডার—মানে খুন? কে খুন হয়েছে?

কর্নেল বললেন,—কালীবাবু।

তারপর ধানুকে বললেন,—শিগগির থানায় যাও। পুলিশে খবর দাও! গিয়ে বলো, কালীপদবাবু খুন হয়েছেন।

বলে তাকে ধাক্কা দিলেন কর্নেল।

ধাক্কায় কাজ হল। ধানু দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। নবঠাকুর পূজারীর বেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কান্নাজড়ানো গলায় আমাকে বললেন,—গঙ্গাস্নান করে পুজো করতে এসে দেখি মন্দিরের দরজা খোলা। ছোটকর্তাবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। ওই দেখুন! রক্তারক্তি অবস্থা!

কর্নেল তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন,—আপনি অক্ষয়বাবুকে গিয়ে বলুন কী হয়েছে—উনি ডাকাডাকি করছেন, শুনতে পাচ্ছেন না?

নবঠাকুর চলে গেলেন। আমি মন্দিরের সিঁড়িতে উঠে দেখলুম, এক রোগাটে গড়নের ভদ্রলোক উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। পায়ের দিকটা দরজার বাইরে এবং বাকি অংশ দরজার ভেতরে। পরনে ধুতি। গায়ে জামার ওপর সোয়েটার। কিন্তু সেটা ছিঁড়ে ফালাফালা। মাথার পেছনে চাপচাপ রক্ত।

দেখেই নেমে এসে বললুম,—কর্নেল! এ সেই শয়তান ভালুকটার কাজ!

কর্নেল মোজাপরা-পায়ের চটি খুলে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপর ওঁর খুদে টর্চ জ্বেলে নৃসিংহদেবের মূর্তির পেছনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মূর্তিটা পাথরের এবং সিঁদুরে লাল হয়ে আছে।

একটু পরে উনি বেরিয়ে এসে বললেন,—তুমি এখানে থাকো। আমি আসছি।

বলে কালীবাবুর বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উধাও হয়ে গেলেন। আমি একা মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমের জঙ্গল এবং দক্ষিণে ভেঙেপড়া পাঁচিলের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলুম। ভালুকটা আবার এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে কী করে আত্মরক্ষা করব? আমার মনে হচ্ছিল, কালীপদবাবু কোনও কারণে মন্দিরে এসেছিলেন এবং সেইসময় ভালুকটা এসে ওঁর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভালুকের নখ খুব ধারাল। মাথার খুলি পর্যন্ত নখের আঘাতে ভেঙেচুরে দিয়েছে। সোয়েটার ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলেছে।

একটু পরে কালীপদবাবুর বাড়ির ভেতর থেকে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম,—জয়ন্ত! জয়ন্ত! শিগগির এখানে এসো।

কর্নেল যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন, সেখান দিয়ে ঢুকে দেখি, উঠোনের কোনায় পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে সেই ভালুকটা দুই ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে এবং দুই হাত তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে নাড়ছে। মুখ দিয়ে চাপা হুঙ্কার ছাড়ছে ভালুকটা। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

কর্নেল তার দিকে রিভলভারের নল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে তিনি সহাস্যে বললেন,—সার্কাসের খেলা দেখো জয়ন্ত! এত বলছি, এবার খেলা শেষ। কথা শুনছে না। ওকে যে ধরব, তার ঝুঁকি আছে। নখগুলো দেখছ? বরং তুমি আমার রিভলভারটাও নাও। অটোমেটিক উইপন। গুলি ভরা আছে। আমাকে আক্রমণ করলেই ওকে গুলি করবে।

কর্নেলের রিভলভারটা হাতে নিয়ে ভালুকটার দিকে তাক করলুম। কিন্তু কর্নেল আমাকে অবাক করে এবার বললেন,—আসলে আমি চুরুট ধরানোর সুযোগ পাচ্ছিলুম না। এবার চুরুট ধরিয়ে নিই। হাতে ফায়ারআর্মস নিয়ে চুরুট ধরানো যায় না।

উনি জ্যাকেটের পকেট থেকে চুরুট বের করে লাইটারে ধরালেন। তারপর রিভলভারটা আমার হাত থেকে নিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন,—আর কী ভক্তিবাবু? খোলস বদলান। জয়ন্তকে এই মজাটা দেখানোর জন্য ডেকেছি। উঁহু হু! যথেষ্ট হয়েছে। আমি জানি, আপনি এই ঘটনায় কী ভূমিকা পালন করেছেন। ভক্তিবাবু! এবার নিজমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করুন।

আমি হতভম্ব হয়ে বললুম,—কী বলছেন কর্নেল?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। ইনিই কান্তি খটিক লেনের সেই ভক্তিভূষণ হাটি। একসময় ম্যাজিসিয়ান ছিলেন। তখন নিজেকে বলতেন প্রোফেসর বি বি হাটি। তারপর এশিয়ান সার্কাসে ঢোকেন। আমার টাকে গুবরেপোকা ছুড়ে মেরেছিল হাটিবাবু। স্রেফ হাতের ম্যাজিক। ভক্তিবাবু! এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে আর দেরি করবেন না!

এবার ভালুকবেশী ভক্তিভূষণ হাটি পিঠের দিকের জিপ টেনে ভালুকের খোলস ছেড়ে বেরুলেন। তারপর করুণ মুখে বললেন,—আমাকে ছেড়ে দিন স্যার! লোভে পড়ে আমি অন্যায় করে ফেলেছি। আর কখনও—

তাঁকে থামিয়ে কর্নেল বললেন,—সব জানি ভক্তিবাবু! আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কলকাতা থেকে জেনেই এসেছি।

বলে এগিয়ে গিয়ে ভালুকের খোলসটা তুলে নিলেন কর্নেল তারপর সেটা আমাকে দিয়ে হাটিবাবুর জামার কলার ধরলেন,—চলুন! এবার যাওয়া যাক।

ভক্তিবাবুর পরনে আঁটো প্যান্ট। গায়ে শার্ট এবং ফুলহাতা সোয়েটার! তাঁকে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন কর্নেল। তারপর সেখান থেকে অক্ষয়বাবুর বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকালেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কর্নেল ডাকলেন,—অক্ষয়বাবু! অক্ষয়বাবু!

নবঠাকুর আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। অক্ষয়বাবুর কান্না শোনা যাচ্ছিল। আমরা ভেতরে ঢুকলে উনি কান্না থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

কর্নেল বললেন,—কাল আপনাকে জিগ্যেস করেছিলুম ভক্তিভূষণ হাটি নামে কাউকে চেনেন কি না। এই সেই ভক্তিভূষণ হাটি, ওরফে প্রোফেসর বি বি হাটি। ম্যাজিসিয়ানও বটে, সার্কাসের খেলোয়াড়ও বটে। দেখুন তো এঁকে চিনতে পারছেন কি না?

অক্ষয়বাবু ভাঙাগলায় বললেন,—না।

কর্নেল বললেন,—এই লোকটাই ভালুকের পোশাক পরে ভালুক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অক্ষয়বাবু সঙ্গে-সঙ্গে দোনলা বন্দুক তাক করে গর্জে উঠলেন,—ওকে আমি গুলি করে মারব। কালীকে এই শয়তানটাই খুন করেছে।

কর্নেল হাটিবাবুকে নিয়ে তক্ষুনি বসে পড়লেন এবং অক্ষয়বাবুর বন্দুক থেকে পরপর দুটো গুলি বেরিয়ে দেয়ালের ছবিতে লাগল। এ এক সাংঘাতিক অবস্থা! কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! অক্ষয়বাবুর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নাও।

আমি ছুটে গিয়ে ওঁর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিলুম। অক্ষয়বাবু হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, —ওকে সহজে ছাড়ব না। ওকে পুলিশে দেব। ও হো-হো! আমার ভাই কালীকে ওই ব্যাটাচ্ছেলে ভালুক সেজে মেরে ফেলেছে!

ভক্তিবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন,—একটাও কথা নয়। চলুন আমরা এবার নিচে যাই। পুলিশ আসছে দেখতে পাচ্ছি। বন্দুকটা এবার অক্ষয়বাবুকে ফিরিয়ে দাও জয়ন্ত!

নিচে গিয়ে আবার মন্দির প্রাঙ্গণে আমরা দাঁড়ালুম। নবঠাকুর মন্দিরের বারান্দায় বসে নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। একটু পরে পুলিশ এসে গেল। একজন প্রকাণ্ড চেহারার পুলিশ অফিসার কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—এস.পি. সায়েব কাল রাতে ওয়্যারলেসে মেসেজ পাঠিয়েছেন। আপনার কথা বলেছেন। আপনার অনেক কীর্তির কথা এ যাবৎ শুনে আসছি। এতদিনে সৌভাগ্যবশত চাক্ষুষ পরিচয় হল। আমার নাম তরুণ রায়। বড়হাটছড়ি থানার অফিসার-ইন-চার্জ।

কর্নেল বললেন,—আপনাদের যাছে নিশ্চয় একটা ভালুকের খবর গিয়েছিল?

—হ্যাঁ স্যার। তবে বিশ্বাস করতে পারিনি।

—এই দেখুন সেই ভালুক।

—তার মানে?

—এঁর নাম ভক্তিভূষণ হাটি। প্রোফেসর বি. বি. হাটি ম্যাজিশিয়ান। পরে এশিয়ান সার্কাসে যোগ দেন। ইনিই এই ভালুকের পোশাক পরে ওই জঙ্গলে ঘুরতেন। অক্ষয়বাবুর বাড়ি ছাদে উঠে ভূতুড়ে শব্দ করতেন। এঁকে অ্যারেস্ট করুন। জয়ন্ত! ভালুকের পোশাকটা ওঁকে দাও!

একদল পুলিশ মন্দিরের দরজায় কালীবাবুর মৃতদেহ দেখছিল। একজন এস. আই বললেন, —সাংঘাতিক মার্ডার স্যার! মাথার খুলি ভেঙে গেছে। পিঠের দিকটা ফালাফালা!

ও.সি. তরুণ রায় বললেন,—এই লোকটাকে থানায় নিয়ে যান ব্রতীনবাবু। এই নিন এর ভালুকের পোশাক।

এস আই ব্রতীনবাবু বললেন,—কী অদ্ভুত! এই লোকটাই ভালুক সেজে ছোট সাঁতরাবাবুকে খুন করেছে?

হাটিবাবুকে দুজন কনস্টেবল পিছমোড়া করে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল। ব্রতীনবাবু তাদের সঙ্গে গেলেন। ও.সি বললেন,—অ্যাম্বুলেন্স আনা গেল না। স্ট্রেচার নিয়ে আসতে বলেছি। ডাক্তারবাবু আর ফটোগ্রাফার হরিবাবু এখনই এসে পড়বেন। আইনের কিছু ব্যাপার আছে কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—জানি। বডি কী অবস্থায় ছিল, তার ফটো তুলতে হবে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানাবেন মৃত না জীবিত। ততক্ষণে ওদিকে চলুন মিঃ রায়। কিছু জরুরি কথাবার্তা সেরে নিই।

ওঁরা দুজনে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। চাপা গলায় কর্নেল কথা বলতে থাকলেন।

একটু পরে ফটোগ্রাফার হরিবাবু এসে বললেন,—কোথায় বডি?

একজন কনস্টেবল তাঁকে দেখিয়ে দিল। তখন তিনি জুতো খুলে মন্দিরের বারান্দায় উঠে নানাদিক থেকে ফ্ল্যাশবাল্ব জ্বেলে অনেকগুলো ফোটো তুললেন। ততক্ষণে ডাক্তারবাবু এসে পড়েছেন। তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন,—কী সর্বনাশ! সাঁতরা ফ্যামিলিতে নৃসিংহদেবের অভিশাপ লেগেছে মনে হচ্ছে। অক্ষয়বাবু পড়ে গিয়ে হাঁটু জখম। পর-পর দু-বার। তারপর কালীবাবু ভালুকের পাল্লায় পড়ে গেলেন!

বুঝলুম, ইনিই সেই নাড়ুবাবু-ডাক্তার। বডি পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এসে বললেন, —ডেড। রক্তের অবস্থা দেখে মনে হল অন্তত ঘণ্টা ছয়েক আগে ভালুক ওঁকে আক্রমণ করেছিল। পোস্টমর্টেমে সঠিক সময় জানা যাবে। মাথার পেছনে থাবা মেরেছে। পিঠের দিকে শুধু সোয়েটার ছিঁড়েছে ধারালো নখে। ক্ষতচিহ্ন নেই পিঠে।

হাসপাতাল থেকে চারজন লোক স্ট্রেচার এনেছিল। তারা কালীবাবুর মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেল। ও.সি. তরুণ রায় বললেন,—ডাক্তারবাবু! আপনি প্লিজ শিগগির যান। ডেডবডি সম্পর্কে একটা প্রাইমারি রিপোর্ট শিগগির চাই।

অক্ষয়বাবুকে একবার দেখে যেতুম।—নাড়ু ডাক্তার বললেন, হাঁটু দু-দুবার ভেঙে বেচারা শয্যাশায়ী!

—পরে দেখবেন।

ডাক্তারবাবু হন্তদন্ত চলে গেলেন। কর্নেল বললেন,—মিঃ রায়! আসুন। এবার নৃসিংহদেবকে দর্শন করবেন।

জুতো খুলে রেখে দুজনে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর অবাক হয়ে দেখলুম, কর্নেল ওঁকে বিগ্রহের পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন এবং দুজনে হাঁটু মুড়ে বসে কী দেখতে থাকলেন।

একটু পরে দুজনে বেরিয়ে এলেন। কর্নেল বললেন,—আপনি অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা বলুন। আর জয়ন্ত, তুমিও মিঃ রায়ের সঙ্গে যাও। হ্যাঁ—পরিচয় করিয়ে দিই মিঃ রায়। এর নাম জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার।

ও.সি. বললেন,—নমস্কার! নমস্কার! আমি আপনার লেখার ভক্ত জয়ন্তবাবু! মুখোমুখি আলাপ হয়ে খুশি হলুম। চলুন। অক্ষয়বাবু এ বিষয়ে কী বলেন শোনা যাক।

ভেতরে ঢুকে দেখি, নিচের বারান্দায় ধানু দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। নবঠাকুর তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

আমরা দোতলায় গিয়ে অক্ষয়বাবুর ঘরে ঢুকলাম। ও.সি. বললেন,—আপনিই অক্ষয়কুমার সাঁতরা?

অক্ষয়বাবু নমস্কার করে বললেন,—বসুন। কালী আমার বৈমাত্রেয় ভাই হলেও ওকে স্নেহ করতুম। আমার বুকের পাঁজর ভেঙে গেল দারোগাবাবু!

আমরা বসলুম। অক্ষয়বাবু ভাঙা গলায় 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' বই কেনা থেকে শুরু করে তাঁর দু-দুবার হাঁটু ভাঙা এবং ভৌতিক উপদ্রব সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

এতক্ষণে কর্নেল এসে বললেন,—মিঃ রায়! যা ভেবেছিলুম ঠিক তা-ই। জিনিসটা আমি নিচে কনস্টেবলদের জিম্মায় রেখে এলুম।

অক্ষয়বাবু বললেন,—কর্নেল! এ কী হল বুঝতে পারছি না! প্রেতাত্মার সঙ্গে ভালুকবেশী ওই লোকটার কী সম্পর্ক?

কর্নেল বললেন,—আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি। আপনি শুধু এবার আমাকে আয়রনচেস্টের চাবিটা দিন!

—কেন? কেন?

—প্লিজ অক্ষয়বাবু! প্রেতাত্মারহস্য উন্মোচনের জন্য আপনি আমাকে ডেকেছিলেন। আমি এসেছি। এবার রহস্যটা ফাঁস করা দরকার নয় কি?

অনিচ্ছার ভঙ্গিতে আয়রনচেস্টের চাবি দিলেন অক্ষয়বাবু! কর্নেল চাবি দিয়ে আয়রনচেস্ট খুলে ডাকলেন,—মিঃ রায়! জয়ন্ত! প্রেতাত্মার কীর্তি দেখে যাও!

আমরা ওঁর কাছে গেলুম। কর্নেল বললেন,—এখানে আপনারা বসুন। আমি ব্যাপারটা দেখাচ্ছি।

বলে উনি সোজা অক্ষয়বাবুর কাছে গেলেন এবং পালঙ্কের পাশে একটা সুইচ টিপলেন। বিদ্যুৎ ছিল। সুইচ টেপার সঙ্গে-সঙ্গে আয়রনচেস্টের ভেতর একটা ছোট্ট গোলক নড়তে শুরু করল এবং ঘটাং ঘট শব্দ হতে থাকল। তরপর হঠাৎ সেটা খানিকটা এগিয়ে এল। কর্নেল বললেন,—বইটা ছিল গোলকটার সামনে দাঁড় করানো। সুইচ জোরে টিপতেই বইটাকে গোলকটা ধাক্কা মেরেছিল এবং ছিটকে এসে আমার দাড়িতে পড়েছিল।

এবার শুনুন ফিসফিস কথাবার্তা—বলে আরেকটা সুইচ টিপলেন কর্নেল।

অমনি জানলার বাইরে ফিসফিস কথাবার্তার শব্দ শোনা গেল। কর্নেল জানলা খুলে একটা ছোট্ট টেপরেকর্ডার সাবধানে টেনে ছুড়লেন। অক্ষয়বাবুকে লক্ষ্য করলুম। মুখটা পাথরের মুখ হয়ে গেছে যেন।

ছয়

বুঝতে পারছিলুম না, অক্ষয় সাঁতরা প্রেতাত্মার ম্যাজিক কেন দেখিয়েছিলেন! কর্নেল ওঁর বিছানার পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিলেন। তারপর সোফায় এসে বসলেন। ভাবলুম, ভাইয়ের মৃত্যুতে যা খেপে আছেন অক্ষয়বাবু, বন্দুক সরিয়ে রাখা উচিত।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—তা হলে অক্ষয়বাবু! প্রেতাত্মার রহস্য ফাঁস হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার বন্ধু ভক্তিভূষণ হাটিই আপনাকে এই যান্ত্রিক ম্যাজিক শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

অক্ষয়বাবু গলার ভেতর থেকে বললেন,—আমি নিজেই ওটা তৈরি করেছিলুম!

—কেন অক্ষয়বাবু?

—আপনার রহস্যভেদী বলে খ্যাতি আছে। তাই পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলুম আপনাকে।

—পরীক্ষায় আমি পাস করেছি বলুন?

—হুঁ।

—কিন্তু হাটিবাবুকে ভালুক সাজিয়েছিলেন কেন?

—কখনও না। আমি ওকে চিনি না।

—চেনেন। আসলে দু-কপি 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' বই ফুটপাত থেকে কিনে এক কপি আপনি হাটিবাবুকে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। এর একটাই উদ্দেশ্য। প্রেতাত্মার ব্যাকগ্রাউন্ডকে মজবুত করা। কলকাতার গোবরা এলাকায় কান্তি খটিক লেনের একটা লোক ওই বই কিনে একই উপদ্রবে ভুগছে। বাহ্! চমৎকার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়ে গেল।

ও.সি মিঃ রায় বললেন,—এই ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরির উদ্দেশ্য কী?

—বৈমাত্রেয় ভাই কালীপদকে হত্যা!

অক্ষয়বাবু নড়ে উঠলেন,—ওই লোকটা ভালুক সেজে কালীকে মেরেছে। আমি খোঁড়া হয়ে শয্যাশায়ী।

কর্নেল হাসলেন। প্রথমে প্ল্যান ছিল, কালীপদবাবুকে প্রেতাত্মা হত্যা করবে। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না ভেবে প্ল্যান বদলানো হল। হাটিবাবু সার্কাসের খেলোয়াড়। বাঘ ভালুককে খেলিয়েছেন। অতএব তাঁকে কৃত্রিম ভালুকের পোশাকে সাজানোর প্ল্যান হল। নখগুলো দেখুন! ধারালো লোহায় তৈরি। এদিকে আমি এসে গেছি। অতএব হাটিবাবুকে ভালুক সাজিয়ে আমার এবাড়িতে উপস্থিতির সময় কালীবাবুকে খুন করলে দোষটা গিয়ে পড়বে বুনো ভালুকের ওপর।

মিঃ রায় বললেন,—কালীবাবুকে হত্যার মোটিভ কী?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—বলছি। তার আগে যা ঘটেছে তা বলা দরকার। আমাকে ভুল পথে হাঁটানো হয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম, কেউ ভালুক দিয়ে অক্ষয়বাবুকে হত্যার প্ল্যান করেছে। সম্ভবত ওঁর বৈমাত্রেয় ভাই কালীবাবুই হত্যা করতে চান অক্ষয়বাবুকে। কারণ তাহলে সব সম্পত্তি কালীবাবু পাবেন। যাই হোক, কাল সন্ধ্যায় আয়রনচেস্টের ম্যাজিক দেখে আমার ভুল ভেঙেছিল। কিন্তু তখনও আঁচ করতে পারিনি কালীবাবুই ভিকটিম হবেন। কারণ কালীবাবুর স্ত্রী বর্তমান। কালীবাবু মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি তাঁর স্ত্রী পাবেন। তাহলে এই খেলার উদ্দেশ্য কী? আজ ভোরে নবঠাকুরের চিৎকার শুনে ছুটে গেলুম। তারপর হতবাক হয়ে দেখলুম, কালীবাবু নিহত। অমনি মনে পড়ল, অক্ষয়বাবু আমাকে বলেছিলেন কালীবাবুর সঙ্গে পৈতৃক ধনরত্ন নিয়ে তাঁর ঝগড়া। সন্দেহবশে তাই মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহের পেছনে গেলুম। মিঃ রায় আপনাকেও দেখিয়েছি বেদিতে পিছনদিকে চাবি ঢোকানোর ছিদ্র আছে। ওটা দেখামাত্র আমার মনে পড়ে গেল একটা পুরোনো রহস্যের কথা। বাবা দুই ছেলেকে দুটো চাবি দিয়ে মারা যান। পর-পর দুটো চাবি ছাড়া বিগ্রহ বেদির তালা খুলবে না। জয়ন্ত সেই ঘটনা 'কা-কা-কা রহস্য' নামে একটা গল্পে লিখেছিল।

আমি বললুম,—এখানেও কি সেই ব্যাপার?

কর্নেল বললেন,—কতকটা। তো ঘটনাটা মনে পড়া মাত্র কালীবাবুর বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকলুম। সোজা দোতলায় উঠে যে ঘরটা খোলা পেলুম, সেটা কালীবাবুর শোবার ঘর এবং সেই ঘরে ভালুকবেশী ভক্তি হাটি ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছে। পকেট থেকে রিভলভার বের করতেই সে পাশের ঘর দিয়ে পালিয়ে গেল। কী খুঁজছিল সে? বালিশের তলায় কিছু নেই। কিন্তু তোশকের তলায় একটা ভাঁজ করা চিঠি পেয়ে গেলুম। চিঠিটাতে চোখ বুলিয়েই বুঝলুম কী হয়েছে। তারপর ভালুকের খোঁজে ছুটে গেলুম উঠোনে সে লুকোবার চেষ্টা করছিল। যাই হোক, মিঃ রায়! চিঠিটা পড়ে দেখুন।

কর্নেল জ্যাকেটের পকেট থেকে চিঠিটা ওঁকে দিলেন। আমি পাশে বসে আছি। কাজেই চিঠিটা আমারও পড়া হয়ে গেল।

স্নেহের কালীপদ,

অবশেষে ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। তুমি আমার অনুপস্থিতিতে পিতৃদেবের শেষকৃত্য করিয়াছ। বাড়িরও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছ। কাজেই গৃহদেবতার মুকুট তোমারই প্রাপ্য। আমি শুধু হারছড়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। তুমি অদ্য সন্ধ্যায় কোনও কৌশলে তোমার স্ত্রী এবং শ্যালককে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিবে। কারণ বিশেষ করিয়া তাপসের উপস্থিতিতে বহুমূল্য রত্নরাজি তুমি লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তাপস মহা ধূর্ত। তোমার স্ত্রী তাহাকে খুবই স্নেহ করে। তাছাড়া স্ত্রীজাতির পেটে কথা থাকে না। তাই উহারা দুইজনেই যেন না জানিতে পারে। তুমি কাল শেষ রাত্রে গোপনে মন্দিরে তোমার চাবি লইয়া উপস্থিত থাকিবে। আমি শয্যাশায়ী। কিন্তু কষ্ট করিয়া লাঠির সাহায্যে মন্দিরে আমার চাবিসহ উপস্থিত হইব। তোমার চাবি দ্বারা অগ্রে বেদির তালা এক পাক ঘুরাইতে হইবে। আমি আমার চাবি দ্বারা দ্বিতীয় পাক ঘুরাইলেই বেদি খুলিয়া যাইবে। তখন দুই ভ্রাতা মিলিয়া পূর্বোক্তরূপে দেবতার রত্ন ভাগ করিয়া লইব। সাবধান! ঘুণাক্ষরে কেহ যেন জানিতে না পারে।

ইতি—আশীর্বাদক অঃ কুঃ

ও.সি. তরুণ রায় চিঠি ভাঁজ করে পকেটে রেখে সহাস্যে বললেন,—অঃ কুঃ মানে অক্ষয়কুমার! অক্ষয়বাবু তাহলে আপনি লাঠি ধরে আজ শেষ রাত্রে মন্দিরে গিয়েছিলেন?

অক্ষয়বাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—না, না! আমি চিঠিটা লিখেছিলুম বটে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে নামতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাথার চোটে পা বাড়াতে পারিনি। ওই ভালুকবেশী বদমাস জানত না দুটো চাবি ছাড়া বেদি খোলা যাবে না। বেশ বুঝতে পারছি, ওই শয়তানটা কালীপদর চাবি হাতিয়ে রত্নমুকুট আর মুক্তোর হার চুরি করার লোভে কালীকে খুন করেছে! ব্যাটা ওঁত পেতে ছিল কোথায়!

ও.সি. বললেন,—কিন্তু হাটিবাবু রত্নমুকুট এবং মুক্তোর হারের কথা জানল কীভাবে?

কালীটা ছিল বোকা! —অক্ষয়বাবু বললেন, কালী আমাকে বিশ্বাস করতে না পেরে নিশ্চয় ওকে কিছু বলেছিল। বিশ্বাস করুন, আমি পা নড়াতে পারি না। দু-দুবার আছাড় খেয়ে হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গেছে। নাড়ু ডাক্তারকে জিগ্যেস করলে জানতে পারবেন। তিনি আমার সাক্ষী। এই দেখুন তাঁর প্রেসক্রিপশন। এক্সরে প্লেটও দেখাচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—থাক। মিঃ রায়! অক্ষয়বাবুর বন্দুকটা আপাতত পুলিশের কাছে জমা থাক। কী বলেন?

ও.সি. বন্দুকটা নিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। ভাইয়ের শোকে অক্ষয়বাবুর মাথার ঠিক নেই। রাগের চোটে যাকে–তাকে গুলি করে মারতে পারেন। বিশেষ করে হাটিবাবুকে লক্ষ করে উনি গুলি ছুঁড়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—অক্ষয়বাবু! তা হলে আপনার বক্তব্য, আমার রহস্য ফাঁস করার ক্ষমতা পরীক্ষার জন্যই আপনি প্রেতাত্মার আয়োজন করেছিলেন?

অক্ষয়বাবু জোর দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। শয্যাশায়ী হয়ে আছি। সময় কাটে না। তাই আপনাকে নিয়ে একটু মজা করতে চেয়েছিলুম। জানতুম না, নির্বোধ কালী ওই ভক্তি হাটির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করবে।

ঠিক আছে। —কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন, তা হলে আপনার পরীক্ষায় আমি পাস করেছি। এবার কলকাতা ফিরে যাই। ওঠো জয়ন্ত!

আমরা নিচে গিয়ে গেস্টরুম থেকে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ও.সি. তরুণ রায়ের সঙ্গে হেঁটে চললুম। দুজন কনস্টেবলও তাঁর আদেশে চলে এল। সাবধানে কাঠের সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে কর্নেল বললেন,—তা হলে মিঃ রায়! আমরা বনদফতরের বাংলোয় গিয়ে উঠছি। আশা করি, যথাসময়ে দেখা হবে।

ও.সি একটু হেসে বললেন,—ভাববেন না। পাখি ডানা মেলার সুযোগ পাবে না। এতক্ষণ লোক চলে গেয়ে যথাস্থানে।

একটা সাইকেল রিকশতে চেপে আমরা গঙ্গার ধারে বনদফতরের বাংলোতে পৌঁছলুম। কর্নেল বললেন,—কৃষ্ণনগরে এস. পি সায়েবকে বলে বাংলোর একটা ঘর বুক করে রেখেছিলুম। আমার ধারণা ছিল, আমরা সাঁতরা বাড়িতে থাকার রাতেই কিছু ঘটবে। অঙ্ক জয়ন্ত, স্রেফ অঙ্ক!

বাংলোর কেয়ারটেকার আমাদের দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিমের একটা ডাবলবেড ঘরে নিয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন,—আগে এক দফা কফি আর কিছু স্ন্যাক্স। সাড়ে নটায় ব্রেকফাস্ট করব।

দক্ষিণের ব্যালকনিতে রোদ পড়েছে। পশ্চিমে গঙ্গা। দক্ষিণে ভাঙনরোধী ঘন জঙ্গল। ঘটনার চাপে আমার স্নায়ু একেবারে বিধ্বস্ত। উর্দিপরা ক্যান্টিনবয় ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স রেখে গেল। তারপর কফিতে চুমুক দিতে-দিতে স্নায়ু চাঙ্গা হল। বললুম,—বাপ্‌স্‌! কী সাংঘাতিক রহস্য!

কর্নেল হাসলেন,—রহস্যের আর বাকি কী থাকল ডার্লিং?

বললুম,—রত্নমুকুট আর মুক্তোর হার স্বচক্ষে দেখতে পেলে জানতুম রহস্য ফর্দাফাঁই হয়েছে।

—আশা করি দেখতে পাবে!

একটু পরে বললুম,—ওই ভক্তিভূষণ হাটি লোকটি ডাবল এজেন্টের কাজ করেছে। অক্ষয়বাবুর সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এটা স্পষ্ট। কারণ দুজনেই 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' বই নিয়ে আপনাকে লড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আপনিও বলছিলেন, পরে ভালুকের হাতে মৃত্যুর প্ল্যান করা হয়েছিল। যেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, অক্ষয়বাবু সত্যি শয্যাশায়ী। কাজেই ভক্তি হাটি গোপনে কালীবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে অক্ষয়বাবুকে রত্নমুকুট আর মুক্তোর হার থেকে বঞ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছিল। তারপর সে মন্দিরে কালীবাবুকে মেরেছে। কিন্তু সে জানত না, একটা চাবিতে বেদি খুলবে না। মাঝখান থেকে—

কর্নেল বললেন,—আর ওসব কথা নয়। কারণ এখনও তোমার নার্ভ চাঙ্গা হয়নি।

—কেন? কেন?

—ভালুকবেশী ভক্তি কী খুঁজতে কালীবাবুর ঘরে ঢুকেছিল?

—টাকাকড়ি সোনাদানা চুরি করতে ঢুকেছিল। কারণ দেবতার সম্পদ সে পায়নি। কথায় বলে, চোরের কৌপিন লাভ। কিছু না পেলে চোর অগত্যা সাধুর কৌপিন নিয়ে পালায়।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার কথায় যুক্তি আছে অস্বীকার করা যায় না।

গঙ্গার ধারে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস বইছিল। তাই ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম। কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাস্ট এল।

খিদে পেয়েছিল। খাওয়ার পর বললুম,—আপনি আবার হাঁসখালির বিলে হাঁস দর্শনে যাবেন নাকি?

—যাব। তবে আপাতত একবার থানা ঘুরে আসি। প্রোফেসর বি বি হাটি কী করছেন, দেখে আসি।

কর্নেল চলে গেলেন। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। এখানে প্রেতাত্মা বা ভালুকের ভাবনা নেই। কাজেই নিরুপদ্রবে ঘুমুনো যাবে। গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

কর্নেল ফিরে এসে ঘুম ভাঙালেন। তখন সাড়ে বারোটা বাজে। বললুম,—প্রোফেসর হাটির ম্যাজিক দেখলেন?

—হুঁউ। তবে তুমি স্নান করে ফেলো গরম জলের ব্যবস্থা আছে। আজ আমিও স্নান করব।

স্নানের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—একটু জিরিয়ে নাও। তিনটেয় বেরুব। শীতের বেলা তিনটে মানে আলোর দফারফা। হাঁসখালির বিলে আজ আর পাওয়া হবে না। গঙ্গার ধারে বাঁধের পথে বরং হাটছড়ি গ্রামের পুরনো শ্মশানে গিয়ে প্রাচীন সামন্তরাজাদের প্রত্ন নিদর্শন দেখব। শুনলুম একসময় ওখানে শ্মশানকালীর মন্দির ছিল। অমাবস্যার রাতে নরবলি হত।

তিনটেয় আমরা গঙ্গার ধারে বাঁধের ওপর নির্জন একফালি রাস্তায় হাঁটছিলুম। ডাইনে নিচে গঙ্গা। বাঁদিকে ঘন জঙ্গল। প্রায় আধ কিলোমিটার হাঁটার পর দেখলুম, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একফালি রাস্তা এসে বাঁধে মিশেছে। নিচে ঘাট। একটু এগিয়ে বিশাল বটগাছ এবং মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল। তার পাশে শ্মশান। এখনও মড়া পোড়ানো হয়। তাই খানিকটা জায়গা জুড়ে চিতার ছাই, ভাঙা মাটির কলসি এইসব জিনিস পড়ে আছে।

কর্নেল বটগাছের পেছনে প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড়ের ওপর বসে বললেন,—চুপটি করে বোসো।

বললুম,—এই পাথরটা বুঝি সামন্তরাজাদের আমলের?

—চুপ। কথা নয়।

কর্নেল বাইনোকুলারে গঙ্গাদর্শন করতে থাকলেন। বুঝতে পারছিলুম না, এখানে এভাবে চুপচাপ বসে থাকার মানেটা কী! ক্রমে সূর্য গঙ্গার ওখানে গাছপালার আড়ালে নেমে গেল। কিছুক্ষণ গঙ্গার জলে লাল ছটা ঝকমক করতে থাকল। তারপর ধূসরতা ঘনিয়ে এল। এই সময় চোখে পড়ল, একটা ছোট নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ল। অমনি কর্নেল আমাকে ইশারায় গুঁড়ি মেরে বসতে বললেন।

তারপর যা দেখলুম, ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম। কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সে নৌকোর মাঝিকে নৌকাটা আরও একটু এগিয়ে আনতে ইশারা করল। সঙ্গে-সঙ্গে কর্নেল দৌড়ে গিয়ে কম্বল মুড়ি দেওয়া লোকটিকে ধরে ফেললেন। আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে কয়েকজন পুলিশকেও বেরুতে দেখলুম। কর্নেল বললেন,—অক্ষয়বাবু! কাঠের সাঁকোয় পা হড়কে পড়ে হাঁটু ভাঙার ভান করেছিলেন। এক রিকশওয়ালার কাছে সে-কথা শুনেছি। দ্বিতীয়বার প্রেতাত্মার চাঁটি খেয়ে নয়, মিথ্যামিথ্যি এখানে আবার আছাড় খেয়েছেন বলে নাড়ুবাবু ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপনি দিব্যি হাঁটতে পারেন। তা ছাড়া আপনি বন্দুকবাজও বটে। ভক্তিবাবুর মুখ বন্ধ করতে গুলি ছুঁড়েছিলেন। ভাগ্যিস, আমি সতর্ক ছিলুম।

ততক্ষণে দুজন কনস্টেবল অক্ষয়বাবুকে ধরে ফেলেছে। কর্নেল একটানে কম্বল সরাতেই দেখা গেল, তাঁর হাতে একটা পুঁটুলি। কেড়ে নিয়ে কর্নেল বললেন,—এর মধ্যে নৃসিংহদেবের রত্নমুকুট আর মুক্তোর হার আছে।

অক্ষয় সাঁতরা মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নৌকাটা পালিয়ে যাচ্ছিল। একজন কনস্টেবল লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে আটকাল। মাঝি বলল,—আমার কোনও দোষ নেই স্যার! ধানুকে দিয়ে বড়কর্তাবাবু খবর পাঠিয়েছিলেন নৌকায় চেপে ওপারে যাবেন।

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে এতক্ষণে ও.সি তরুণ রায়কে আসতে দেখলুম। উনি এসে সহাস্যে বললেন,—তাহলে পাখি ডানা মেলতে যাচ্ছিল দেখা যাচ্ছে। বাহ্! দিব্যি দুই ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছেন সাঁতরাবাবু। চলুন! এবার শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করবেন। বৈমাত্রেয় ভাই কালীপদ সাঁতরাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে খুন করার অভিযোগ আপনাকে গ্রেফতার করা হল। চলুন তাহলে। আর কী?

কর্নেল বাঁধের পথে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,—পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ধারালো কিছু ভারী জিনিস দিয়ে মাথার পেছনে তিন জায়গায় আঘাত করার কথা বলা হয়েছে। হাতুড়িটা পেছনে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন অক্ষয়বাবু। আমি সেটা সকালেই কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। হাতুড়িটার একদিক শূলের মতো। অন্যদিক ভোঁতা। শূলের দিকে মারলে অনেকটা ভালুকের নখের আঘাত বলে মনে হতে পারে তবে হাতুড়িটা অর্ডার দিয়ে বানানো। এক আঘাতেই মগজের ঘিলু ভেদ করে ফেলবে। মিঃ রায়! আপনারা এগোন। আমরা দুজনে ধীরেসুস্থে যাচ্ছি।

পুলিশের দলটি আসামিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। নৌকাটায় একজন কনস্টেবল বসে আছে এবং মাঝি বেচারা কিনারায় লগি মেরে উজানে নিয়ে চলেছে।

কর্নেল একখানে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন,—কী জয়ন্ত? কেমন রোমাঞ্চকর স্টোরি পেয়ে গেলে! আসলে অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি বলে একটা প্রবচন আছে। নিজেকে নিরাপদে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যেই অক্ষয় সাঁতরা এতসব আয়োজন করেছিলেন! তাঁর বন্ধু ভক্তিভূষণ হাটি কবুল করেছেন, একসময় অক্ষয় সাঁতরা এশিয়ান সার্কাসের ম্যানেজার ছিলেন। বাবার মৃত্যু-সংবাদ শুনে চাকরি ছেড়ে হাটছড়িতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর আগে নবঠাকুরকে গোপনে একটা চাবি দিয়ে বলেছিলেন, অক্ষয় ফিরে এলে যেন চাবিটা তাকে তিনি দেন। নবঠাকুর জানতেন না চাবিটা কীসের। অক্ষয়বাবুও সম্ভবত জানতেন না। কালীপদবাবুই তাঁকে গোপন কথাটা বলে থাকবেন। কারণ ধনরত্নের লোভ সাংঘাতিক লোভ।

—নবঠাকুর তা-ই বলেছেন বুঝি?

হ্যাঁ। —বলে কর্নেল পা বাড়ালেন, চলো জয়ন্ত! বাংলোয় ফিরে কড়া কফি খাওয়া যাক। গঙ্গার হাওয়া বেজায় ঠান্ডা।...

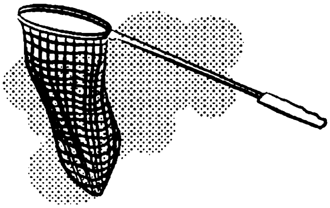

সিংহগড়ের কিচনি-রহস্য

সেবার অক্টোবর মাসে কর্নেলের সঙ্গে সিংহগড়ে বেড়াতে গিয়ে এক অদ্ভুত পাগলের পাল্লায় পড়েছিলাম। অদ্ভুত বলার কারণ, সে আচমকা একটা গাছের ডাল থেকে আমার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করছিল একটা ছড়া শেখানোর জন্য।

হ্যাঁ—একটা অদ্ভুত ছড়া।

তবে ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলা যাক। সিংহগড় বিহারের একটা সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। আমরা উঠেছিলুম জনপদ থেকে একটু দূরে ধারিয়া নদীর তীরে একটা টিলার গায়ে সরকারি ডাকবাংলোতে। রাত্রে পৌঁছে ভোরে যথারীতি কর্নেল মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন। এবং ফিরে এসে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরুব, জয়ন্ত। সিংহগড়ের পুরনো বসতি এলাকায় একটা গাছে দুর্লভ প্রজাতির একটা অর্কিড দেখে এলুম। অত উঁচুতে এই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে উঠতে পারলুম না। এবার গিয়ে দেখা যাক, উঁচু গাছে চড়ার জন্য কোনও লোক খুঁজে পাই নাকি। খিদে পেয়েছিল বলে তাড়াতাড়ি চলে এলুম।

ব্রেকফাস্ট করে আমরা ন'টা নাগাদ বেরিয়েছিলুম। পাহাড়ি এলাকা। পুরনো বসতি নির্জন খাঁ-খাঁ করছিল। রাস্তাটাও এবড়ো-খেবড়ো। দু-ধারে ঢেউ খেলানো মাটির ওপর একটা করে পুরনো বাড়ি। অনেক বাড়িরই চৌহদ্দির পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। বাড়িগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, বাগানবাড়ির মতো। রাস্তার দু-ধারে যত ঝোপঝাড়, তত গাছ। কর্নেল আমাকে একখানে দাঁড়াতে বলে সামনে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেই বাড়িটার উঠোনে একটি কিশোর গরু চরাচ্ছিল। ঘাস আর ঝোপঝাড় ভর্তি উঠোন।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ওপর থেকে মাথায় ঝাকড়মাকড় চুল, মুখে গোঁফদাড়ি, গায়ে ময়লা, ছেঁড়া হাওয়াই শার্ট, পরনে হাঁটু থেকে ছেঁড়া পাতলুন, একটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে হি-হি হেসে বলল, এই ছড়াটা বল দিকি! নইলে কাতুকুতু দেব।

বলেই সে আওড়াল :

পঞ্চভূতে ভূত নাই
মুখে ঈশ ভজ ভাই
তালব্য শ পালিয়ে গেলে
যোগফলে অঙ্ক মেলে
হর হর ব্যোমভোলা
খাও ভাই গুড়ছোলা।।...

আমি চমকে গিয়ে হতবাক। সে আমাকে নোংরা আঙুলে কাতুকুতু দিতে শুরু করল। বল। বল। নইলে কাতুকুতু-কাতুকুতু-কাতুকুতু...

অগত্যা চেঁচিয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেল সেই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছেন। আমার চিৎকার কানে ঢুকছে না। এদিকে পাগল আমাকে ছড়াটা না শিখিয়ে ছাড়বে না। বারবার ছড়াটা বলছে আর কাতুকুতু দিচ্ছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতেও পারছি না।

সেই সময় ডানদিকের বাড়ি ভাঙাচোরা গেট সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটি ছড়ি। তিনি তাড়া করে এলেন। অ্যাই বাঁদর। আবার বদমাইসি শুরু করেছ? লাঠিপেটা করব হতভাগাকে।

পাগল সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিয়ে এক দৌড়ে গাছপালার ভেতর উধাও হয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন, কিছু মনে করবেন না। ও আমার ছোটভাই বিক্রমজিৎ। ক'মাস থেকে উন্মাদ রোগে ভুগছে। রাঁচির কাছে কাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলুম। সেখান থেকে পালিয়ে এসে লোককে জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। তা আপনারা কি কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন?

এতক্ষণে কর্নেল ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। বললেন, কী হয়েছে জয়ন্ত?

ভদ্রলোক বিব্রতভাবে বললেন, তেমন কিছু না। আমার ভাইয়ের কথা হচ্ছিল। আমার ভাই বিক্রমজিৎ উন্মাদ রোগে ভুগছে।

কর্নেল হেসে ফেললেন। জয়ন্তকে কাতুকুতু দিচ্ছিল দেখলুম। আপনি কি এখানকার বাসিন্দা?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ। আমার নাম অমরজিৎ সিংহ। এই বাঙালিটোলায় থাকি। ওই আমার বাড়ি। আপনাদের পরিচয় পেলে খুশি হতুম।

কর্নেল তাঁর একটা নেমকার্ড ওঁকে দিলেন। উনি সেটা পড়ে বললেন, আপনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার? নেচারিস্ট মানে?

প্রকৃতি প্রেমিক বলতে পারেন। আর আমার এই তরুণ বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার। অমরজিৎ আমাদের নমস্কার করে বললেন, কী বলব কর্নেলসায়েব! আমারই পূর্বপুরুষের নামে সিংহগড় নাম। একসময় আমার পূর্বপুরুষ এখানকার জমিদার ছিলেন। তাঁদের পদবি ছিল রাজা। এখন প্রায় নিঃস্ব অবস্থা বলতে পারেন। অভিশাপ কর্নেলসায়েব। দেবতার অভিশাপ।

কর্নেল বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহ হচ্ছে। তবে আমার এই হবি। ওই গাছের ডগায় একটা অর্কিডের ঝাড় আছে। এই ছেলেটিকে দিয়ে সেটা পেড়ে আনাই আগেই। তারপর কথা হবে।

অমরজিৎ সিংহ বললেন, চলুন। আপনাদের সঙ্গে যাই নইলে পাগল বিক্রমজিৎ হয়তো আবার উৎপাত শুরু করবে। এদিকটাতে বাইরের লোক দেখতে পেলেই ওর পাগলামি বেড়ে যায়।

বাঁ-দিকে পোড়ো একটা বাড়িরই অংশ ছিল জায়গাটা। সেখানে জঙ্গল হয়ে আছে। একটা বিশাল শিরীষ গাছের ডগায় কর্নেল অর্কিডটা ছেলেটিকে দেখিয়ে দিলেন। সে তরতর করে চড়ে গেল ডগায় এবং কর্নেলের নির্দেশ মতো অর্কিডের ঝাড়টা উপড়ে নিয়ে নেমে এল। কর্নেল তাকে দশ টাকা বখশিস দিলেন। সে খুশি হয়ে চলে গেল।

কর্নেল পিঠে আঁটা কিটব্যাগ থেকে একটা পলিথিনের থলি বের করলেন। থলির ভেতর কালো কাদার মতো জিনিসের ওপর অর্কিডের ঝাড়টা বসিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যাস! আমার কাজ শেষ।

অমরজিৎ বললেন, থলের তলায় এগুলো কি সার?

কর্নেল হাসলেন। সার বলার চেয়ে পরজীবী এই উদ্ভিদের খাদ্য বলা উচিত। ওগুলো পচা কাঠের গুঁড়ো। তার সঙ্গে কিছু মাটি মেশাতে হয়েছে। আসলে কাঠে কার্বন আছে। গাছের ডালের কোনওে খোঁদলে বৃষ্টির জল জমে জায়গাটায় পচন ধরে। সেখানে অর্কিডের সূক্ষ্ম বীজকণিকা বাতাসে উড়ে এসে পড়লে অর্কিড গজায়। তার খাদ্য ওই পচা কাঠের কার্বন।

রাস্তায় গিয়ে অমরজিৎ বললেন, এখানে একসময় প্রচুর বাঙালি ভদ্রলোক বাস করতেন। এখন অনেকেই বাড়ি বেচে দিয়ে বা ফেলে রেখে চলে গেছেন। কালেভদ্রে বাঙালিরা এখানে বেড়াতে আসেন। আপনারা দয়া করে যদি গরিবের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেন, খুশি হব।

কর্নেল বললেন, অবশ্যই। বিশেষ করে আপনার পূর্বপুরুষই এই সিংহগড়ের প্রতিষ্ঠাতা। আপনার কাছে পুরনো কথা শুনলে ভালো লাগবে।

গেটটা লোহার। কিন্তু মরচে ধরে অর্ধেকটা ভেস্তে গেছে। বাউন্ডারি ওয়াল মোটামুটি টিকে আছে। উঠোনে শুকনো ফোয়ারা এবং গাড়িবারান্দা বা পোর্টিকো আছে। দোতলা বাড়ি। আমাদের নিচের হলঘরে বসিয়ে অমরজিৎ ওপরে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, দিদিকে বললুম আপনাদের কথা। আপনারা অতিথি। অন্তত এক কাপ চা না খাওয়ালে চলে?

ঘরটা হলঘরই বটে। একপ্রান্ত থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে সিঁড়িটা কাঠের। বনেদিয়ানার নিদর্শন এটা। কিন্তু ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। কয়েকটা ছেঁড়াফাটা গদি আঁটা চেয়ার আর একটা বিশাল গোল টেবিল। একপাশে তক্তাপোশে মাদুর পাতা এবং একটা বিছানা গোটানো আছে।

আমরা চেয়ারে বসলুম। উল্টোদিকে মুখোমুখি অমরজিৎ বসে একটু হেসে বললেন, যমপুরীর যম হয়ে বসে আছি কর্নেলসায়েব। কিন্তু যম তো ধনসম্পদ পাহারা দেয়। আমি কি পাহারা দিচ্ছি? শুধু বংশের স্মৃতি এই বাড়িটা। বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেই গায়ের জোরে কেউ দখল করে ফেলবে। যেমন, বেশ কিছু বাড়ি বেদখল হয়ে গেছে। এদিকে বাড়ি যে বেচব, কিনবে কে? এদিকটায় লোকে আসতে চায় না। কারণ, টাউনশিপের দিকে যেসব সুযোগসুবিধা—রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জলের কল এসব আছে, এদিকটায় সেসব নেই। কুয়ো থেকে জল তুলতে হয়। বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। পূর্বদিকে ধারিয়া নদীর ধারে একটা জেলেবসতি আছে। তারা গরিব লোক। মহাজন তাদের রক্ত শুষে নেয়।

কর্নেল বললেন, আপনি দেবতার অভিশাপের কথা বলেছিলেন।

অমরজিৎ জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠাকুরদার ঠাকুরদা যে দুর্গপ্রাসাদে বাস করতেন, সেটা এখন ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। ঠাকুরদা বাবার আমলে জমিদারির খানিকটা টিকে ছিল। তিনিই এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। মাঝে-মাঝে এসে এই বাগানবাড়িতে বাস করতেন। পরে দুর্গপ্রাসাদ মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। তখন শেষ জীবনটা এ বাড়িতে কাটান। সেই সময় দুর্বুদ্ধিবশে তিনি গৃহদেবতার রত্নালঙ্কার বিক্রি করে ব্রিটিশ সরকারের প্রাপ্য বার্ষিক কর পরিশোধ করেন। কর না মেটালে জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যেত। ব্যাস! গৃহদেবতার অভিশাপ লাগল। ঘোড়ায় চড়ে যেতে-যেতে হঠাৎ সেই ঘোড়া কেন যেন খেপে গিয়ে তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়। তিনি পাহাড়ের খাদে পড়ে মারা যান। আমার ঠাকুরদা শত্রুজিৎ সিংহের বাতিক ছিল পায়রা পোষা। এ বাড়ির ছাদে পায়রা ওড়ানোর সময় তিনি পা ফস্কে নিচে পড়ে মারা যান। আমার বাবার নাম ছিল ইন্দ্রজিৎ। তাঁর শখ ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর। ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে তিনিও—

অমরজিৎ হঠাৎ থেমে গেলেন। ওপর থেকে সাদা থানপরা এক মহিলা মৃদুস্বরে ডাকছিলেন, ঝন্টু, ঝন্টু!

অমরজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে একটা ট্রে নিয়ে এলেন। তাতে দু'কাপ চা আর দুটো প্লেটে দুটো করে সন্দেশ ছিল। তাঁর অনুরোধে সন্দেশ খেতে হল। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, আশ্চর্য লাগছে। পর-পর দুর্ঘটনায় মৃত্যু!

অমরজিৎ বললেন, অভিশাপ। তাছাড়া আর কী বলব? ঠাকুরমা আমাদের দু-ভাই এবং দিদিকে মানুষ করেছিলেন। দিদির বিয়ে দিয়েছিলেন পাটনায়। জামাইবাবু ছিলেন রেলের অফিসার। বিয়ের দু-মাস পরে তিনি ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। অথচ আমাদের বংশের ওপর দেবতার অভিশাপ। যাই হোক, ঠাকুরমা মারা গেলে দিদি আমাদের দুই নাবালক ভাইয়ের গার্জেন হলেন। জমিদারি বাবার আমলেই হাতছাড়া হয়েছিল। কিছু জমি আর একটা আমবাগানের জোরে প্রাণরক্ষা।

এখানকার আম খুব বিখ্যাত। গ্রীষ্মে এলে আম খাওয়াতে পারতুম। তবে চোরের উৎপাতে অস্থির। আজকাল গাছের মুকুল এলে আম ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে দিই। একথোক টাকা পাই।

কর্নেলে চুরুট ধরিয়ে বললেন, আপনার ভাই পাগল হয়েছেন কবে?

গত ডিসেম্বরে মন্টু—মানে বিক্রমজিৎ গড় জঙ্গলে ঢুকেছিল। ওর পাখি পোষার বাতিক আছে। পাখি ধরতে গিয়েছিল ওর বন্ধু মাধবের সঙ্গে। মাধবের কাছেই শুনেছিলুম, হঠাৎ মন্টু পা হড়কে পড়ে যায়। তারপর হাত-পা ছুঁড়ে প্রলাপ বকতে-বকতে দৌড়ুতে থাকে। মাধব আমাকে খবর দিয়েছিল। কয়েকজন লোক নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ একটা গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আবোলতাবোল কী সব বলতে শুরু করল। ওকে ধরে নিয়ে এলুম। তারপর শেষে কাঁকে হাসপাতালে রেখে এলুম। কিছুদিন আগে কীভাবে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। শুধু দিদির কথা শোনে। রাতে ওই বিছানায় শুয়ে থাকে। দরজার ভেতরে তালা এঁটে দিই। সারা রাত প্রলাপ বকে। দেবতার অভিশাপ ছাড়া আর কী বলব? বাবার মৃত্যুর পর মা হৃদরোগে মারা যান। শুধু আমি আর দিদি অভিশাপ থেকে এখনও পর্যন্ত মুক্ত আছি। সবই দেবতার রহস্যময় লীলা। আমাদের দুজনকে হয়তো আরও সাংঘাতিক কোনও শাস্তি দেবেন।

আপনার দিদির নাম কী?

পরমেশ্বরী।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মন্টুবাবু কী একটা ছড়া বলেছিলেন যেন?

অমরজিৎ হাসলেন। ঠাকুরমা আমাদের দু-ভাইকে ওই ছড়াটা শেখাতেন। কিছু বুঝি না।

ছাড়াটা কী যেন?

অমরজিৎ আওড়ালেন :

পঞ্চভূতে ভূ নাই
মুখে ঈশ ভজ ভাই
তালব্য শ পালিয়ে গেলে
যোগফলে অঙ্ক মেলে
হর হর ব্যোমভোলা
খাও ভাই গুড় ছোলা।...

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে অমরজিৎ জিগ্যেস করলেন, আপনারা কোথায় উঠেছেন কর্নেলসায়েব?

কর্নেল বললেন, সরকারি ডাকবাংলোতে। আমরা কয়েকটা দিন আছি। সকাল ন'টায় ব্রেকফাস্টের সময় কিংবা সন্ধ্যার দিকে বাংলোয় থাকব। যদি ওখানে যান, খুশি হব। আপনাদের বংশের ঘটনাগুলো ভারি অদ্ভুত। আমারও অনেকরকম হবি আছে। অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা ঘটলে আমি সেখানে নাক গলাই।

অমরজিৎ কথাটা শুনেই চাপা গলায় বলে উঠলেন, তাহলে আজ সন্ধ্যায় আমি যাব। কারণ, বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলেন। থাক। যথাসময়ে সব বলব।

কর্নেল অর্কিড ভর্তি থলেটা আমাকে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, জয়ন্ত! পাগলের হাতে কাতুকুতু খেয়ে তুমি জামাটা নোংরা করে ফেলেছ।

দেখে নিয়ে বললুম, ছ্যা, ছ্যা। কালি মাখিয়ে দিয়েছে দিখছি। ওর আঙুলে কালি লেগে ছিল।

কালি নয়। মনে হচ্ছে, পচা পাঁক ঘেঁটেছিল কোথাও। বলে কর্নেল হাসলেন। তুমি একটা কথা মনে রেখ। পাগল যা-যা করবে, তুমিও ঠিক তাই-তাই করলে সে তোমাকে পাগল ভেবে তক্ষুনি

পালিয়ে যাবে। তুমি যদি ওকে পাল্টা কাতুকুতু দিতে, দেখতে ও তখুনি বলত, আরে, এ যে দেখছি এক পাগল। তারপর কেটে পড়ত।

বলেন কী? কোনও বইয়ে পড়ছেন বুঝি?

হ্যাঁ। পড়েছি। এই আচরণকে ইংরেজিতে বলে 'লোগোথেরাপি'। এই মন্টু পাগল আজ আমাকেও কাতুকুতু দিতে হামলা করেছিল। আমি উল্টে ওকে কাতুকুতু দিতে গেলুম। কাতুকুতু কাতুকুতু কাতুকুতু। ব্যাস মন্টু থমকে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলে উঠল, দুচ্ছাই। এ যে দেখছি একটা বদ্ধ পাগল। বলে কেটে পড়ল।

আপনার 'লোগোথেরাপি' অনুসারে তোতলাদের সঙ্গে তোতলামি করতে গেলে কিন্তু বিপদ।

না। তোতলামি সারাতে তোতলাদের কোনও নাটকে তোতলার পার্ট দিতে হয়। আমি বলছি পাগলদের কথা। কর্নেল বাইনোকুলারে কী দেখে নিলেন। তারপর বললেন, কী কাণ্ড। পাগল মন্টু একটা গাছের মগডালে চড়ে বসে আছে দেখছি। আগে জানলে ওকে দিয়েই অর্কিডটা পেড়ে নিতুম।

দুই

দুপুরে আমাদের ঘরে ক্যান্টিন-বয় খাবার দিতে এল। কর্নেল তাকে জিগ্যেস করলেন, তোমার নাম কী?

সে বিনীতভাবে বলল, আমি রামপরসাদ আছি স্যার।

আচ্ছা রামপ্রসাদ, এখানে গড়ের জঙ্গলটা কোথায়?

সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, জি সার, আপনি কিচনি-কিলার কথা বলছেন?

কিচনি কেন?

রামপ্রসাদ মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বলল, ওহি কিলার চারতরফ খাদা আছে সার। বহত পানি ভি আছে। খাদার পানিতে কিচনি আছে।

কর্নেল হাসলেন। তুমি দেখেছ?

না সার। উয়ো কিচনি যিসকো দেখা দেতি, উয়ো পাগলা হো যাতা। অর মর যাতা।

রামপ্রসাদ চলে গেলে জিগ্যেস করলুম, কিচনি কী?

জলের প্রেতিনী। শুনলে তো? যাকে সে দেখা দেয়, সে পাগল হয়ে মারা পড়ে। মন্টু—মানে বিক্রমজিৎ সিংহ তাহলে গড়ের জঙ্গলে কিচনি দেখেই পাগল হয়েছে।

যত সব বাজে কুসংস্কার।

কর্নেল মাছের টুকরো থেকে কাঁটা ছাড়িয়ে মুখে ভরলেন। বললেন, এখানে নদী থাকায় মাছের অভাব নেই। কী অপূর্ব স্বাদ। আমার ধারণা গড়ের জঙ্গলের গড়খাইয়ে যে মাছগুলো আছে, তাদের স্বাদ আরও খাসা। সঙ্গে ছিপ আনলে মাছ ধরার চেষ্টা করতুম।

হেসে ফেললুম। তারপর কিচনি দেখে পাগল হয়ে আমাকে বিপদে ফেলতেন। আপনাকে রাঁচির কাঁকে উন্মাদাশ্রমে পাঠাতে হত।

তবে যে বললে বাজে কুসংস্কার?

হ্যাঁ। তবে কুসংস্কার মানুষকে নির্বোধ করে ফেলে এই যা।

কর্নেল তারিয়ে-তারিয়ে মাছ খেতে-খেতে বললেন, দেড়টা বাজে। আড়াইটেতে আমরা গড়ের জঙ্গল দেখতে যাব। সাবধান জয়ন্ত, তুমি যেন হঠাৎ কিছু দেখে নির্বোধ হয়ে পড়ো না।

খাওয়ার পর রামপ্রসাদ ট্রে নিতে এল। কর্নেল তাকে বললেন, রামপ্রসাদ! তুমি তখন সবই বললে। কিন্তু কিচনিকেলা কোথায় তা তো বললে না?

সে পশ্চিমের খোলা জানালার দিকে আঙুল তুলে বলল, উয়ো দেখিয়ে সার। ওহি জঙ্গল আছে।

লক্ষ করে দেখলুম, প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটা উঁচু টিবি দেখা যাচ্ছে। সেটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। যতদূর দেখা যাচ্ছে, ঢেউ খেলানো মাঠ—কোথাও আবাদি, কোথাও অনাবাদি এবং ঝোপঝাড়ে ঢাকা। তিনদিকে আরও দূরে নীল পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় সাদা মেঘ ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাংলোর নিচে দক্ষিণে একটা কাঁচা রাস্তা এগিয়ে গেছে। এঁকেবেঁকে অসমতল সবুজ প্রান্তরের বুক চিরে রাস্তাটা হয়তো কোনও পাহাড়ি জনপদে পৌঁছেছে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। কর্নেল যথারীতি পিঠে কিটব্যাগ এঁটে এবং তার মধ্যে প্রজাপতি ধরা জাল গুঁজে রেখেছেন। স্টিকটা টিনের ফাঁকে বেরিয়ে আছে। গলায় ঝুলছে ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার। রোদ থেকে টাক বাঁচাতে টুপি পরেছেন। পায়ে হান্টিং বুট পরেছেন। একেবারে অভিযাত্রীর প্রতিমূর্তি।

আমরা কাঁচা রাস্তায় জলকাদা বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটছিলুম। কর্নেল মাঝে মাঝে থেমে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। পাখি কিংবা প্রজাপতি।

দূরের কোনও পাহাড়ি গ্রাম থেকে একদল আদিবাসী আসছিল। তারা আমাদের দেখেও দেখল না। পাশ দিয়ে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে-বলতে চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর দেখলুম, রাস্তাটা গড়ের জঙ্গলকে এড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে। সেখানে একটা অনুর্বর টাঁড় জমির উপর দিয়ে কর্নেল হাঁটতে শুরু করলেন। বললেন, গড়ের জঙ্গলে মানুষজন সত্যি যায় না দেখা যাচ্ছে। কোনও পায়ে চলা পথের চিহ্ন নেই।

বাঁদিকে নাক বরাবর এগিয়ে যতই টিবির ওপর জঙ্গলটার কাছাকাছি হচ্ছিলুম, কে জানে কেন একটু গা-ছমছম করছিল। জঙ্গলের ছায়া পূর্বে কিছুটা এগিয়ে এসেছে। কারণ সূর্য পশ্চিমের আকাশে একটু ঢলে পড়েছে। চারদিকে অসংখ্য গ্রানাইট পাথর ছড়িয়ে আছে ঝোপঝাড়ের ভেতর। গড়খাইয়ের সামনে পৌঁছে কর্নেল বললেন, ওই দেখ জয়ন্ত। ওইখানে ছিল দুর্গপ্রাসাদে যাওয়ার পথ। ব্রিজ ভেঙে জলে পড়ে গেছে। তবে এই টুকরোগুলোর ওপর দিয়ে জঙ্গলে ঢোকা যায়।

সেখানে গিয়ে লক্ষ করলুম, গড়খাইয়ের এপারে পুরনো রাস্তার কিছু চিহ্ন এখনও আছে। পাথরে বাঁধানো রাস্তার ওপর দু-ধারের মাটি ধুয়ে নেমে পথটাকে লুকিয়ে ফেলেছে। ব্রিজের কাঠামো পাথরে খিলান করা। ওপারে বিশাল তোরণের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। মধ্যিখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। তারপর পাথরের ইটের তৈরি পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। নানারকম রঙবেরঙের ফুলে ভরা ঝোপঝাড়।

কর্নেল বাইনোকুলারে ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, এস জয়ন্ত। সাবধানে পা ফেলবে। পাথরগুলো পিছল মনে হচ্ছে।

বললাম, ভাববেন না। মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ট্রেনিং কাজে লাগাব।

গড়খাইয়ের জলটা কালো এবং কেমন আঁশটে গন্ধ যেন। সম্ভবত রাশিরাশি পাতা পচে এই অবস্থা হয়েছে। পেরিয়ে গিয়ে কর্নেল বললেন, এক মিনিট। দুটো ডাল কেটে লাঠি তৈরি করে নিই। সাপ থাকা খুবই সম্ভব। তা ছাড়া টাল সামলানোর জন্যও লাঠি দরকার।

উনি কিটব্যাগ থেকে ডালকাটা 'জাঙ্গল নাইফ' বের করে একটা বেঁটে অজানা গাছের শক্ত দুটো লম্বা ডাল কাটলেন। তারপর লাঠি তৈরি করে একটা আমাকে দিলেন।

দিলেন বটে, কিন্তু সাপের কথা ভেবে প্রতি মুহূর্তে শিউরে উঠছিলুম। ঝোপঝাড় এবং ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর একটা উঁচু পাথরের দেয়াল এবং ঘরের একটা অংশ চোখে পড়ল। ঘর বলা উচিত নয়। ঘরের অংশ। লোহার কড়িবরগা কোনও কালে কারা খুলে নিয়ে গেছে। স্থানে স্থানে উঁচু গাছও বিকেলের হাল্কা বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। জায়গাটা পাখির

চিড়িয়াখানা বলা চলে। কর্নেল পাখি দেখছিলেন বাইনোকুলারে। দক্ষিণের ঢালে গাছপালার মাথায় বসে থাকা এক সারস দম্পতির ছবি তুললেন। ক্যামরার টেলিলেন্স ফিট করে নিয়েছিলেন আগেই। তারপর উত্তরে বাইনোকুলারে কী দেখতে-দেখতে চাপা স্বরে বলে উঠলেন। কী আশ্চর্য! জয়ন্ত, বসে পড়।

আমাকে কাঁধ চেপে বসিয়ে দিয়ে কর্নেল বসলেন। জিগ্যেস করলুম, কী?

কর্নেল বললেন, কিচনি নয় মানুষ।

কোনও আদিবাসী হয়তো শিকারে এসেছে?

না। বলে উনি আবার বাইনোকুলার চোখে রাখলেন। আস্তে বললেন, ভদ্রলোককে আমি বাংলোয় দেখেছি। দোতলার উত্তরদিকের ঘরে উঠেছেন। কিন্তু উনি এখানে কী করছেন?

এতক্ষণে লোকটাকে দেখতে পেলুম। প্যান্ট, চকরাবকরা গেঞ্জি এবং মাথায় টুপি পরা ষণ্ডামার্কা চেহারার একটা লোক। মুখে জমকালো গোঁফ আছে। একটা চ্যাপটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে। একটু পরে সে চমকে ওঠার ভঙ্গিতে ডাইনে ঘুরে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে দুহাতে ধরে দুবার গুলি ছুড়ল। নিঝুম জঙ্গলে আচমকা বিকট শব্দ এবং ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ে পালিয়ে গেল।

লোকটা এবার যেন ভয় পেয়েই পাথর থেকে লাফ দিয়ে নেমে গুঁড়ি মেরে দৌড়োতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে দেখলুম পূর্বের তোরণের ধ্বংসস্তূপের কাছে একবার ঘুরে কিছু দেখল এবং আবার একটা গুলি ছুড়ে নেমে গেল ঢাল বেয়ে।

কর্নেল এবার একটু উঁচু হয়ে বাইনোকুলারে দেখতে-দেখতে বললেন, পালিয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। জানি না, কিচনি দেখে গুলি ছুঁড়ে পালাচ্ছেন কি না। বাংলোয় ফিরে হয়তো আর একজন পাগলের দেখা পাব।

কর্নেলের কৌতুকে কান দিলুম না। বললুম, আপনি অদ্ভুত ঘটনা দেখলে নাক গলান। এটা একটা সাংঘাতিক অদ্ভুত ঘটনা।

হুঁ। একটু অপেক্ষা করো। ভদ্রলোক আরও দূরে চলে গেলে ব্যাপারটা দেখতে যাব।

আমি সেই পাথরের চত্বরটার দিকে লক্ষ রেখেছিলুম। এতক্ষণে দেখলুম, কী আশ্চর্য, সেই মন্টু পাগল চত্বরটাতে উঠে ধেই-ধেই করে নাচছে এবং ছড়াটা আওড়াচ্ছে।

একটু পরে সে অদৃশ্য কোনও লোককে কাতুকুতু দিতে থাকল। মুখে বলছিল সে, কাতুকুতু, কাতুকুতু, কাতুকুতু।

কর্নেল বললেন, পাগলকে দেখে ওই ভদ্রলোক ভয় পেয়ে গুলি করলেন কেন? অমন করে পালিয়েই বা গেলেন কেন? চলো জয়ন্ত আমরা মন্টুবাবুর কাছে যাই।

বললুম, যদি ও ঢিল ছোঁড়ে?

এস তো দেখা যাক।

কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। কিছুটা এগিয়ে একটা চাঙড়ে উঠে কর্নেল ডাকলেন, মন্টুবাবু। কাতুকুতু দেব। কাতুকুতু, কাতুকুতু, কাতুকুতু।

অমনি পাগল করজোড়ে বলে উঠল, ওরে বাবা। মরে যাব। মাইরি মরে যাব।

তাহলে চুপটি করে দাঁড়ান।

দাঁড়িয়েই তো আছি মুনিবর। পাগল হেসে অস্থির হল। মুখে দাড়ি দেখলে মাইরি সাধু সন্নেসি মনে হয়। সক্কালে দূর থেকে চোখে কালো চোঙ লাগিয়ে কী দেখছিলে বলো তো?

কর্নেল বললেন, আপনাকে দেখছিলুম। আপনি গাছে-গাছে গেছোবাবা হয়ে ঘোরেন কেন?

পাগল বলল, ঘুরি কি সাধে রে ভাই? দেখতে পেলে যে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। তারপর অ্যায়সা কাতুকুতু দেবে, ওরে বাবা!

কথা বলতে-বলতে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কর্নেল। আমি তাঁর পেছনে। পাথরের চত্বরটার কাছাকাছি গিয়ে কর্নেল চাপা গলায় বললেন এক ভদ্রলোক এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হঠাৎ গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে পালিয়ে গেলেন কেন?

পাগল হেসে কুটিকুটি হয়ে বলল, ভয় পেয়ে পালাল।

কিচনি দেখে?

ওরে বাবা। বোলো না। নাম করলেই বিপদ।

কিন্তু আপনাকে তো কিচনি কিছু বলেন না!

পাগল গম্ভীর মুখে বলল, ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। বলে দুপা পিছিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকাল সে। এই! তোমরা রাঁচি থেকে আমাকে ধরতে আসো নি তো?

কখনও না। আমরা কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছি। তা আপনি নাকি ক'মাস আগে এই গড়ের জঙ্গলে এসে কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তারপর পাগল হয়ে—

পাগল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমি পাগল না রে ভাই। আমাকে পাগল বললে খুব দুঃখ পাই।

ঠিক আছে আপনি পাগল না। কিন্তু এখানে কেন এসেছিলেন? কেন এখানে এখনও আসেন?

কী কথার ছিরি! আসব না? ছোটবেলা থেকে আসি। আমার চৌদ্দ পুরুষের জায়গা। ঠাকুরমা বলতেন, রোজ গড়ের জঙ্গলে যাবি। বলে সে ঠোঁটে তর্জনী রাখল। নাহ্। বলব না। ঠাকুরমা পই-পই করে বলেছিলেন, কাউকে কিছু বলবিনে।

দাদাকেও বলবেন না?

কখনও না।

দিদিকে?

উঁহু।

জোরে মাথা নেড়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে নিচে নামল। তারপর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে কোথায় লুকিয়ে গেল।

কর্নেল পাথরের চত্বরে উঠে বাইনোকুলারে তাকে খুঁজতে থাকলেন। তারপর বললেন, আশ্চর্য তো! কোথায় গেলেন মন্টুবাবু?

হয়তো কোথাও গুঁড়ি মেরে বসে আছেন।

কর্নেল চত্বর থেকে নেমে বললেন, এস তো। যেদিক থেকে উনি এসেছিলেন, সেই দিকটা একবার দেখা যাক।

উত্তর-পশ্চিম কোণে পাথরের ঘরের যে অংশটুকু টিকে আছে, সেখানে গিয়ে কর্নেল খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর কয়েকপা এগিয়ে গিয়ে হেসে উঠলেন।

জিগ্যেস করলুম, হাসছেন কেন?

ওই দেখ জয়ন্ত। এখানে-ওখানে কারা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। আসলে সর্বত্র প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ গুপ্তধনের গুজব রটনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

প্রকৃত পাগল এই গুপ্তধন সন্ধানীরা। বলে কর্নেল পূর্বদিকে ঘুরলেন। চলো। ফেরা যাক। আলো কমে এসেছে।

আমরা পূর্বদিকের ভাঙা তোরণের কাছে পৌঁছুলুম। তোরণের ধ্বংসস্তূপের ওপর একটা উঁচু অশ্বত্থ গাছের ডগা থেকে মন্টু পাগলের চিৎকার শোনা গেল। সেই ছড়াটা সুর ধরে সে আওড়াচ্ছে—

পঞ্চভূতে ভূত নাই
মুখে ঈশ ভজ ভাই
তালব্য শ পালিয়ে গেলে
যোগফলে অঙ্ক মেলে
হর হর ব্যোমভোলা
খাও ভাই গুড়ছোলা।...

আমরা সাবধানে গড়খাই পেরিয়ে গিয়ে সে পথে এসেছিলুম, সেই পথে ফিরে চললুম। বাংলোয় পৌঁছতে ছটা বেজে গেল। দোতলায় উঠে কলিংবেল বাজিয়ে রামপ্রসাদকে ডেকে কর্নেল কফি আনতে বললেন। তারপর দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসলেন। এই সময় দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল বললেন, কাম ইন।

অবাক হয়ে দেখি, সেই চকরাবকরা গেঞ্জি পরা ষণ্ডামার্কা ভদ্রলোক। তিনি নমস্কার করে বললেন, একটু বিরক্ত করতে এলুম। কিছু মনে করবেন না। জানলা দিয়ে আপনাদের গড়ের জঙ্গল থেকে ফিরতে দেখছিলুম। তাই একটা কথা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল। আপনারা ওখানে ভয়ঙ্কর চেহারার কালোকুচ্ছিত একটা প্রাণীকে দেখতে পাননি?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য। আমরা কিচনির দর্শন পাইনি।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বললেন, ওহ। আমার একটা হরিব্‌ল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।

কর্নেল বললেন, বলুন। শোনা যাক।...

তিন

ভদ্রলোকের পরিচয় জানা গেল কথার ফাঁকে। তাঁর নাম হীরালাল রায়। পাটনায় থাকেন। বংশ পরম্পরায় বাঙালি। পাটনায় কন্ট্রাক্টর এবং অর্ডার সাপ্লাই-এর ব্যবসা আছে তাঁর। সিংহগড়ে ব্যবসার কাজে এসেছেন। এখানে এসে গড়ের জঙ্গলে কিচনির গল্প শুনেছেন। তাঁর এই একটা স্বভাব। অদ্ভুত কোনও গল্প শুনলেই তার সত্যমিথ্যা যাচাই করা। তাই তিনি জেদের বশে গড়ের জঙ্গলে গিয়েছিলেন।

•

তারপর ঘুরতে-ঘুরতে একখানে থপ-থপ শব্দ শুনে চমকে ওঠেন। পরক্ষণে তাঁর চোখে পড়ে, বিশাল ব্যাঙের মতো একটা কালো রঙের জন্তু। কিন্তু মাথায় বড়-বড় চুল আছে। মুখটা ভয়ঙ্কর। দুটো লাল চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে।

দেখামাত্র হীরালালবাবু তাঁর লাইসেন্স করা রিভলভার থেকে দুবার গুলি ছোড়েন। লক্ষভ্রষ্ট হয়েছিল গুলি। তিনি আঁতকে দিশাহারা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে-যেতে একবার ঘুরে দেখেন, বীভৎস জন্তুটা তাঁকে তাড়া করে আসছে। তখন আবার একবার গুলি ছোড়েন। কিন্তু এবারও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তখন তিনি প্রাণভয়ে গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, তাঁকে আমরা পালাতে বা গুলি ছুড়তে দেখেছি। কিন্তু কর্নেল আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন, আমরা কিন্তু কিছুই দেখিনি। তবে একজন পাগলকে উঁচু গাছের মগডালে চড়ে গান গাইতে দেখেছি।

হীরালাল ভুরু কুঁচকে বললেন, পাগল? গাছের ডালে?

হ্যাঁ। বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কে গাছের মগডালে চড়ে গান গাইবে?

এই সময় রামপ্রসাদ কফির ট্রে নিয়ে এল। কর্নেল হীরালালবাবুকে কফি খেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি চা-কফি কিছুই খান না। তিনি এবার বললেন, আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড দিলেন। আমিও আমার নেমকার্ড দিলুম। হীরালালবাবু কার্ড দুটো পড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি রিটায়ার্ড কর্নেল! আর আপনি সাংবাদিক। কর্নেলসায়েব আপনি গভমেন্টকে যদি জানান, তাহলে মিলিটারি পাঠিয়ে গড়ের জঙ্গল খুঁজে আজব জন্তুটাকে ধরে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে। আর জয়ন্তবাবু আপনি খবরের কাগজে ব্যাপারটা লিখলে তা আরও ভালো হয়।

কর্নেল হাসলেন। আগে কিচনির দর্শন পাই এবং তার ফটো তুলি, তবে তো?

হীরালালবাবু চলে গেলেন। ততক্ষণে আলো জ্বেলে দিয়েছিল রামপ্রসাদ। আমরা চুপচাপ কফি খেতে থাকলুম। একটু পরে কর্নেল আস্তে বললেন, ভদ্রলোকের কথা শুনে কী মনে হল জয়ন্ত?

সত্যি কথাই বললেন। কিছু গোপন করলেন না।

হ্যাঁ। তবে একজন ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কতটা স্বাভাবিক এটাই প্রশ্ন।

ব্যবসায়ী হলে কি কেউ অ্যাডভেঞ্চারার হতে পারে না?

পারে হয় তো। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কর্নেল চুপচাপ কফি খাওয়ার পর চুরুট ধরিয়ে বললেন, একটা অস্বাভাবিকতা থেকে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসার কাজে সিংহগড়ে এসেছেন। কাজেই পরিচিত লোকজন আছে। সত্যি কিচনি দেখার জন্য গড়ের জঙ্গলে গেলে হীরালালবাবুর পক্ষে সঙ্গীসাথী নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। একা গিয়েছিলেন কেন? কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে আপন মনে বললেন, নাহ্। ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া ওঁর বয়স। উনি যুবক নন যে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে উৎসাহ থাকবে। ওঁর বয়স পঞ্চাশের বেশি বলেই মনে হল। এ বয়সে—নাহ্ জয়ন্ত। খটকা থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া আমরা ওঁকে নেমকার্ড দিলুম। কিন্তু উনি আমাদের ওঁর নেমকার্ড দিলেন না। আজকাল ব্যবসায়ীরা পকেটে নেমকার্ড নিয়ে ঘোরে।

কর্নেলের ব্যাখ্যায় যুক্তি ছিল। তবে এ নিয়ে ওঁর মাথা ঘামানোর অর্থ হয় না। স্পোর্টিং গেঞ্জি এবং প্যান্ট পরা শক্ত সমর্থ গড়নের মানুষ হীরালাল রায়। সঙ্গে লাইসেন্স করা রিভলভারও আছে। রিভলভার—

অ্যাঁ? নিজের চিন্তায় নিজেই অবাক হয়ে মুখ দিয়ে শব্দটা বের করে ফেললুম।

কর্নেল বললেন, কী হল জয়ন্ত?

আচ্ছা কর্নেল, কোনও ব্যবসায়ী রিভলভার রাখতে পারেন, যদি শত্রুর ভয় থাকে তবেই। তাই না?

কর্নেল শুধু বললেন, হুঁ।

কিংবা যে ব্যবসায়ী দামি জিনিসের কারবার করেন, সঙ্গে প্রচুর টাকাকড়ি থাকে, তিনি আত্মরক্ষার জন্য—

কথায় বাধা পড়ল। রামপ্রসাদ এসে সেলাম দিয়ে বলল, এক বাবুসাব আসলেন সার। আপনাদের সঙ্গেতে দেখা করবেন।

পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর একটা বাড়তি কাপপ্লেট দিয়ে যাও। পটে এখনও কফি আছে।

রামপ্রসাদ যাঁকে নিয়ে এল, তিনি অমরজিৎ সিংহ। পরিচ্ছন্ন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। হাতে একটা ছড়িও আছে। নমস্কার করে ব্যালকনিতে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

কর্নেল বললেন, গড়ের জঙ্গলে বিকেলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে আপনার ভাইকে দেখলুম।

অমরজিৎ বললেন, ওকে আটকে রাখতে পারি না। বেঁধে রাখলে দিদি বকাবকি করে। ওই গড়ের জঙ্গলে ঢুকে কী দেখে আতঙ্কে পাগল হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রাণটা হারাবে। কী করব বলুন?

রামপ্রসাদ একটা কাপপ্লেট দিয়ে গেল। কর্নেল বললেন, জয়ন্ত। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এস।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলুম। কর্নেল অমরজিৎবাবুকে কফি তৈরি করে দিয়ে বললেন, আপনি কীসব ঘটনার কথা বলবেন বলেছিলেন। এবার স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

অমরজিৎবাবু কফি খেতে-খেতে বললেন, মন্টু পাগল হওয়ার পর থেকে ন'মাসে মোট ন'খানা উড়ো চিঠি পেয়েছি। একই কথা। একই কাগজে লাল কালিতে লেখা। সঙ্গে এনেছি। দেখাচ্ছি। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না।

বলে পাঞ্জাবির ভেতর পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন উনি। খামটা হলুদ রঙের। কর্নেলের হাতে দিয়ে আস্তে বললেন, চিঠিগুলো প্রতি ইংরেজি মাসের মাঝামাঝি ভোরবেলা গেটের ভেতর ভাঁজ করে কেউ ফেলে দিয়ে যায়। দিদিরি পরামর্শে এ নিয়ে পুলিশের কাছে যাইনি। পড়ে দেখলেই বুঝবেন।

কর্নেল খাম থেকে ভাঁজ করা চিঠিগুলো বের করলেন। চোখ বুলিয়ে আমাকে একটা চিঠি দিলেন দেখলুম, সম্বোধনহীন চিঠিতে আঁকাবাঁকা বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—

দেবতার অভিশাপ থেকে বাঁচতে হলে শীঘ্র তাঁকে
উদ্ধার করে গড়ের জঙ্গলে ঈশান কোণে
শিমুলতলায় গোপনে রেখে এস। রাখার পর আর
পিছনে তাকিও না। তাহলে আবার অভিশাপ
লাগবে। সাবধান। এই কথা যেন কেউ জানতে
না পারে। জানালে অনিবার্য মৃত্যু।

কর্নেল ন'খানা চিঠিতে চোখ বুলিয়ে ভাঁজ করে খামে ভরে বললেন, আপনাদের গৃহদেবতা কী?

অমরজিৎ বললেন, শিব। আমাদের বাড়িতে ছোট একটা মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে। দিদি তাঁর পুজোআচ্চা নিজেই করে। আগে একজন ব্রাহ্মণ পূজারি ছিলেন। অর্থাভাবে তাঁকে বিদায় দিতে হয়েছিল। আমরা ক্ষত্রিয়। কিন্তু দিদির মতে, ক্ষত্রিয়েরও পুজোর অধিকার আছে। যাই হোক, এসব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু চিঠিগুলো অদ্ভুত। কোন দেবতাকে উদ্ধার করতে হবে বা কীভাবে করতে হবে, জানি। তিনি কোথায় আছেন, তাও জানি না।

কর্নেল বললেন, আপনি বলছিলেন, আপনার ঠাকুরদার বাবা নাকি গৃহদেবতার অলঙ্কার বিক্রি করার ফলে অভিশাপ লেহেছিল। কিন্তু শিবলিঙ্গে তো রত্ন বা অলঙ্কার পরানো হয় না।

অমরজিৎ গম্ভীর মুখে বললেন, ঠাকুরমার মুখে শোনা কথা। তবে তখন আমি নিতান্ত বালক। তাই এ প্রশ্ন মাথায় আসেনি। পরে এসেছিল। তারপর এই চিঠি পাওয়ার পর দিদির সঙ্গে আলোচনা করেছি। দিদি বলেন, জন্মাবধি আমরা বাড়ির মন্দিরে শিবলিঙ্গ দেখে আসছি।

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, আচ্ছা, এমন তো হতে পারে। আপনার ঠাকুরদার বাবার মৃত্যুর আগে ওই মন্দিরে অন্য কোনও বিগ্রহ ছিল। সেটা হঠাৎ হারিয়ে গেলে আপনাদের ঠাকুরদা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অমরজিৎ নড়ে বসলেন। হ্যাঁ। হ্যাঁ। দিদিও ঠিক এই কথা বলেছিলেন। মোট কথা, এমন কিছু ঘটে থাকলে তা আমাদের জন্মের আগেই ঘটেছিল।

আমি বললুন, আপনাদের কোনও জ্ঞাতি—মানে নিকটাত্মীয় কেউ নেই এখানে?

অমরজিৎ বললেন, নাহ্, আর নিকটাত্মীয় বলতে ঠাকুরমার দাদার বংশধররা আছে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কস্মিনকালে যোগাযোগ নেই। শুনেছি আমার ঠাকুরমা পাটনার মেয়ে ছিলেন।

কর্নেলের দিকে তাকালুম। উনি চোখ বুজে চুরুট টানছেন।

অমরজিৎ বললেন, আর যদি নিকটাত্মীয় ধরেন, জামাইবাবুর দাদা এবং ছোটভাই। তাঁরাও পাটনার লোক। তবে তাঁদের এসব কিছুই জানার কথা নয়।

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, এছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেছে?

না। কিন্তু আমার ভাবতে অবাক লাগে, গড়ের জঙ্গলে গত ডিসেম্বরে মন্টু কোনও পাথরে পা হড়কে গিয়ে আচমকা পাগল হল্ কেন? দিব্যি সুস্থ শান্ত ভদ্র ছিল মন্টু। মাধব ওর সঙ্গে ছিল। সেও খুব অবাক হয়েছিল।

ওর সেই বন্ধু মাধব এখন কোথায় আছেন?

মাধব এখানেই আছে। সিংহগড় টাউনশিপে বড় একটা দোকান করেছে। যে বাড়ির উঠোনে গরুচরানো রাখালটাকে ডেকে আপনি গাছে চড়িয়েছিলেন, ওটাই মাধবদের বাড়ি। বাড়িটা এখন খালি পড়ে আছে। ওরা টাউনশিপে নতুন বাড়ি করেছে।

মাধবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। ওঁর ঠিকানাটা বলুন।

অমরজিৎ বললেন, গান্ধী মার্কেট বললে যে-কোনও রিকশাওয়ালা পৌঁছে দেবে। ওখানে বিজয়া ভ্যারাইটি স্টোর্স বেশ বড় দোকান। মাধাবকুমার বোস। ডাকনাম বাবু।

কর্নেল বললেন, চিঠিগুলো আমার কাছে রাখতে আপত্তি আছে?

আজ্ঞে না। আপনি যদি এর একটা কিনারা করতে পারেন, আতঙ্ক থেকে রক্ষা পাই। আর—দিদি বলছিল, কাল দয়া করে যদি দুপুরবেলা এই গরিবের বাড়িতে দুমুঠো খান—

সে হবেখন। আপনার দিদির হাতে সময় মতো চেয়ে খাব। কাল সকালে আপনার দিদির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

অবশ্যই। দিদিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আমরা সাড়ে নটার মধ্যে যাব। বলে কর্নেল ঘরে ঢুকে খামটা তাঁর ব্যাগে ঢোকালেন। তারপর ব্যালকনিতে ফিরে এসে বসলেন। আচ্ছা অমরজিৎবাবু, গড়ের জঙ্গলে কিচনি বা জলের প্রেতিনী আছে বলে এখানে গুজব শুনলুম। এ বিষয়ে আপনার কী ধারণা?

অমরজিৎবাবুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। আস্তে বললেন, হ্যাঁ। ওখানে একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী বলুন বা ভূতপেত্নি যাই বলুন, আছে সেকথা সত্যি।

আপনি দেখেছেন?

অমরজিৎ চাপা গলায় বললেন, মন্টু পাগল হওয়ার পর কাঁকে মানসিক হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দিয়ে এসে একদিন খেয়ালবশে গড়ের জঙ্গলে গিয়েছিলুম। মন্টু কি কিচনি দেখে ভয়

পেয়ে পাগল হয়ে গেছে? কিচনি বলে সত্যি কি কিছু আছে? মনে এই প্রশ্নটা তোলপাড় করছিল। খুলেই বলছি কর্নেলসায়েব। আমার এখানে একটু বদনাম আছে। ডানপিটে সাহসী জেদি স্বভাবের জন্যও বটে, আবার মারকুটে বলেও বটে। অনেক বদমাশকে আমি এ যাবৎ ধোলাই দিয়েছি। শরীরে ক্ষত্রিয়ের রক্ত বইছে। যাই হোক, গড়ের জঙ্গলে ইচ্ছেমতো ঘোরঘুরি করে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল, খানিকটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে কী একটা প্রকাণ্ড কালো জন্তু বসে আছে। ভালুক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু না। বিশাল একটা ব্যাঙের মতো প্রাণী। মাথায় লম্বা চুল। দুটো লাল চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। জন্তুটা চলতে শুরু করলে থপ থপ শব্দ হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার আর সাহস হল না দাঁড়িয়ে থাকতে। গুঁড়ি মেরে পালিয়ে এলুম। তারপর মাথার জেদ চেপে গিয়েছিল। এখানকার জেলে এবং আদিবাসীদের মধ্যে সাহসী লোক জোগাড় করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গড়ের জঙ্গলে পরদিন হাঁকা লাগালুম। হাঁকা বোঝেন তো সার?

হ্যাঁ। শিকারের জন্য জঙ্গল তোলপাড় করা।

ঢাক-ঢোল-শিঙে বাজিয়ে হাঁকা শুরু হল। বিকেল পর্যন্ত তন্নতন্ন খোঁজা হল। কিন্তু কোথায় সেই বিদঘুটে জন্তুটা? তার পাত্তাই পেলুম না।

ঠিক আছে। কাল সকালে তা হলে যাচ্ছি। খাওয়ার আয়োজন নয়। দিদিকে বলবেন।

অমরজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে চলি?

আমরা এগিয়ে দেব কি বাড়ি অবদি? ওদিকটায় তো আলো নেই।

অমরজিৎ হাসলেন। টর্চ আছে। তবে কর্নেলসায়েব কি আমার কথা মন দিয়ে শোনেননি। ঝন্টু সিংহের নাম শুনেই গুণ্ডা বদমাস লেজ তুলে পালিয়ে যায়। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।

কর্নেল দরজা খুলে ওঁকে বিদায় দিয়ে এসে আস্তে বললেন, করিডরে হীরালালবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। আমি দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

বললুম, তাহলে আমাদের সাবধানে থাকা দরকার।

কর্নেল সে কথায় কান দিলেন না। বললেন, চিঠিগুলো তো তুমি দেখেছ। কী মনে হল?

সবগুলো দেখিনি।

কর্নেল হাসলেন। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় পরীক্ষা করে দেখবে চলো। তারপর বলবে।

ঘরে ঢুকে কর্নেল খামটা আমাকে দিলেন। চিঠিগুলো বের করে খুঁটিয়ে দেখলুম। তারপর বললুম, একই ভাষা। একই হাতের লেখা।

আর কিছু?

আর কিছু—মানে, কোনও বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

লোকটা বাঙালি এবং শিক্ষিত।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, জয়ন্ত। এই চিঠিগুলো একটা চিঠির ফোটো কপি। মূল চিঠিটা লোকটার কাছে আছে। সে প্রতি মাসে একটা করে ফোটো কপি পাঠাচ্ছে।

অবাক হয়ে বললুম, তাই তো। কাগজগুলো মোটা। অক্ষরগুলোও হুবহু একরকম। যেন জেরক্স কপি।

জেরক্স কপির রঙ কালো হয়। এগুলো লাল। এ থেকে বোঝা যায়, লোকটার নিজস্ব প্রিন্টিং মেশিন আছে। সেই মেশিনটা সম্ভবত অর্ডার দিয়ে বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। স্পেশাল কোনও মেশিন। যাই হোক, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। জয়ন্ত আমার কাজটা এবার সহজ হয়ে গেল।...

চার

কর্নেল অভ্যাসমতো ভোরে বেরিয়েছিলেন। সাড়ে আটটায় ফিরে এসে বললেন, তুমি আজ সকাল-সকাল উঠেছ দেখছি।

একটু হেসে বললুম, হয়তো হীরালালবাবুর ভয়ে। আপনি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যান। সেই সুযোগে লোকটা হানা দিতে পারত।

কর্নেল কিটব্যাগ, ক্যামেরা ও বাইনোকুলার রেখে বললেন, হীরালালবাবুকে দূর থেকে দেখেছি।

কোথায়?

গড়ের জঙ্গলের চারদিকে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন অবশ্য।

মন্টুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি?

নাহ। বলে কর্নেল বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে নিচের ক্যান্টিনে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সাবেক বসতি এলাকায় যাবার পথে গাছের দিকে লক্ষ রেখেছিলুম। আচমকা পাগল মন্টুবাবু ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কাতুকুতু না দেন। জামা নোংরা করে ফেলাটা কাতুকুতুর চেয়ে বিচ্ছিরি।

অমরজিৎবাবু গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে খাতির করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। হল ঘরে গিয়ে বললেন, মন্টু রাতে বাড়ি ফেরেনি। দিদি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। আমারও ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। মন্টু যেখানেই থাক, সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আসে। খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলুম ভোরবেলায়। কেউ তাকে দেখেনি।

আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন অমরজিৎ। তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় পুরনো বেতের চেয়ারে বসালেন। তাঁর দিদি পরমেশ্বরী এসে আমাদের নমস্কার করে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। মুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

কর্নেল বললেন, মন্টুবাবু রাতে বাড়ি ফেরেননি শুনলুম!

পরমেশ্বরী একটু চুপ করে থেকে বললেন, গাছ থেকে পড়ে যেতেও পারে। ওর ওই দুর্বল শরীর। আবার কেউ ওকে মেরে ফেলতেও পারে।

কেন?

আপনি ঝন্টুর কাছে উড়ো চিঠিগুলো তো দেখেছেন?

হুঁ। কর্নেল একটু ইতস্তত করে বললেন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। সেজন্যই এসেছি।

বলুন।

আপনার তো পাটনায় বিয়ে হয়েছিল। সেখানকার হীরালাল রায় নামে কোনও ব্যবসায়ীকে চেনেন?

না তো। পাটনা থেকে কবে চলে এসেছি। এমন হতে পারে, হয়তো চিনলেও ভুলে গেছি। কেন এ কথা জিগ্যেস করছেন?

ভদ্রলোক গড়ের জঙ্গলে কাল থেকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছেন।

অমরজিৎ বললেন, গুপ্তধনের গুজবে অনেক নির্বোধ ওখানে গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে। সরকার জায়গাটা দখল করেছেন এই মাত্র। শুনেছিলুম, প্রত্নবিভাগ ওখানে উৎখনন করে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে দেখবেন। এখনও সেই প্ল্যান নাকি ফাইলচাপা আছে।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন, যাই হোক, পরমেশ্বরী দেবীকে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। আপনাদের বাড়িতে যে মন্দির আছে, সেখানে শিবলিঙ্গ আছে। আপনি কি জানেন, অতীতে ওই মন্দিরে অন্য কোনও বিগ্রহ ছিল?

না। ছোটবেলা থেকে শিবলিঙ্গ দেখে আসছি। তবে—বলে পরমেশ্বরী হঠাৎ থেমে গেলেন।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ। বলুন।

ঠাকুমার কাছে শুনেছি, ঠাকুরদার বাবার আমলে সিংহগড় প্রাসাদে শিবের বিগ্রহই ছিল। সেই বিগ্রহের রত্নালঙ্কার বিক্রি করে বংশে অভিশাপ লেগেছিল।

অমরজিৎ বললেন, আমি কিন্তু কোথাও শিবের বিগ্রহ—মানে মূর্তি দেখিনি। শুনেছি দক্ষিণ ভারতে নটরাজরূপী বিগ্রহ আছে। উত্তর ভারতে হরপার্বতীর যুগ্ম বিগ্রহ দেখেছিলুম।

কর্নেল বললেন, উড়ো চিঠিতে বিগ্রহ দাবি করা হয়েছে। লিঙ্গরূপী বিগ্রহ হলে তা এতদিন উড়ো চিঠি লেখার বদলে উপড়ে নিয়ে যেত লোকটা। আচ্ছা পরমেশ্বরীদেবী, মাধববাবুর বাবা বা ঠাকুরদাকে কি আপনি দেখেছেন?

হ্যাঁ। ওঁদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক বন্ধুত্ব ছিল। মাধবের পূর্বপুরুষ আমাদের পূর্বপুরুষের কর্মচারী ছিলেন।

মাধবের সঙ্গে আপনার ছোটভাইয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল?

হ্যাঁ। স্কুল থেকে ওরা সহপাঠী। এখানে কলেজ ছিল না। আমাদের আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না। তাই মন্টুকে আর পড়ানো সম্ভব হয়নি। মাধব পাটনা কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু বি এ-তে ফেল করেছিল। তারপর আর পড়াশোনা করেনি।

অমরজিৎ বললেন, আমিও কলেজে পড়ার সুযোগ পাইনি। এখন অবশ্য এখানে কলেজ হয়েছে।

কর্নেল বললেন, মাধবের বাবা বেঁচে আছেন?

পরমেশ্বরী বললেন, হ্যাঁ। ওর বাবা কমলকুমার বোস হাসপাতালে কম্পাউন্ডারি করতেন রিটায়ার করে নিজেই ডাক্তার হয়েছিলেন।

অমরজিৎ বললেন, হাতুড়ে ডাক্তার। তবে গরিবদের ডাক্তার হিসাবে সুনাম ছিল। এখন বয়স হয়েছে। ধর্মে মতি হয়েছে। তীর্থ ভ্রমণের বাতিক আছে। তাঁর ছেলে মাধব স্টেশনারি দোকানের সঙ্গে ওষুধের দোকানও করেছে। তাই মায়ের নামে বিজয়া ভ্যারাইটি স্টোর্স খুলেছে। আমার অবাক লাগে, মাধব মন্টুর মতোই টো টো করে ঘুরে বেড়াত। কয়েক মাসের মধ্যে ব্যবসা করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

কর্নেল পরমেশ্বরীদেবীকে বললেন, হীরালাল রায়ের কথাটা স্মরণ করার চেষ্টা করবেন।

পরমেশ্বরী বললেন, হ্যাঁ। আমার স্বামী রেলের কর্মী ছিলেন। কত লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল। বন্ধুদের কোয়ার্টারে ডেকে এনে ছুটির দিনে খাওয়াতে ভালবাসতেন।

আমার পক্ষে সম্ভব হলে হীরালালবাবুর একটা ছবি তুলে আপনাকে দেখাব।

চেনা হলে নিশ্চয় চিনতে পারব।

আমি তাহলে উঠি।

পরমেশ্বরী ব্যস্ত হয়ে বললেন, এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যান কর্নেলসায়েব।

ধন্যবাদ। আবার এসে খাব। বলে কর্নেল উঠলেন। অমরজিৎবাবু, আপনার ভাইকে যদি দুপুর অব্দি খুঁজে না পান, আমাকে যেন জানাবেন। আর হ্যাঁ, পরমেশ্বরীদেবীকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। গড়ের জঙ্গলে জলের পেত্নি কিচনি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

পরমেশ্বরী গম্ভীর মুখে বললেন, ঝন্টু নাকি দেখেছিল। তবে আমার ধারণা, ওর চোখের ভুল। আসলে গড়ের জঙ্গলে গুপ্তধনের গুজবের মতো এও একটা গুজব। বিহারের গ্রামাঞ্চলে কিচনির ওপর লোকের অগাধ বিশ্বাস।...

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে কর্নেল বললেন, কোনও রহস্যময় ঘটনার উৎস খুঁজতে হলে আগে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড স্পষ্ট জানা চাই। মোটামুটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড জানা হয়ে গেল। চল। এবার টাউনশিপে যাওয়া যাক।

সরকারি বাংলোর নিচের চত্বরে সাইকেল রিকশা পাওয়া গেল। কর্নেল রিকশাওয়ালাকে বললেন, গান্ধী মার্কেট। জলদি জানা পড়েগা ভাই।

কয়েকটা চড়াই উতরাই এবং পোড়ো জমি, ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে আমরা টাউনশিপে পৌঁছুলুম। রিকশাওয়ালা কুড়ি টাকা ভাড়া চেয়েছিল। সেটা ন্যায্য ভাড়া বলতে হবে। গান্ধী মার্কেট আধুনিক ধাঁচের বাজার। তার মানে, সাধারণ মানুষের জন্য এ বাজার নয়।

বিজয়া ভ্যারাইটি স্টোর্স বিশাল দোকান। কর্নেল তাঁর ক্যামেরার জন্য দু-রিল কালার ফিল্ম কিনলেন। তারপর ফার্মেসির কাউন্টারে গিয়ে কয়েকটা অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট কিনে কর্মচারীটিকে বললেন, প্রোপাইটার মাধববাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। তিনি কি আছেন?

কর্নেলের সায়েবি চেহারা এবং দাড়ি দেখে কর্মচারীটির মনে সম্ভবত ভক্তি জেগেছিল। সে বলল, উয়ো দেখিয়ে। উনহি মাধবজি আছেন। এ ভারুয়া, সাবলোঁগকো মাধবজিকা পাশ লে যা।

এক তরুণ আমাদের দোকানের ভেতর এদিক-ওদিক গলিঘুঁজি ঘুরিয়ে মালিকে কাছে পৌঁছে দিল। গোল টেবিলের এক কোনায় ক্যাশিয়ার কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন। অন্য কোনায় দুটো টেলিফোনের সামনে আরামদায়ক আসনে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সি প্যান্ট-স্পোর্টিং গেঞ্জি পরা এক ভদ্রলোক বসে দুটো টেলিফোনেই পালাক্রমে কথাবার্তা বলছেন। আমাদের দেখে ইশারায় তিনি সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

আমরা বসলুম। একটা পরে টেলিফোন রেখে তিনি বললেন, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ সার?

অমরজিৎবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলছে না। টো টো করে বনেবাদাড়ে ঘোরা মন্টুবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির একটা ছবি মনে দাঁড় করিয়েছিলুম। ছবিটা মুছে গেল। কর্নেল তাঁর নেমকার্ড দিয়ে বললেন, অমরজিৎ সিংহের কাছে আপনার পরিচয় পেয়ে আলাপ করতে এলুম।

মাধববাবু কার্ডটা দেখে রেখে দিলেন। তারপর হাসি মুখে বললেন, আমি কি আপনার মতো মানুষের আলাপের যোগ্য? বলুন, হট না কোল্ড—

ধন্যবাদ। বেশিক্ষণ সময় নেব না। আপনি ব্যস্ত মানুষ।

চাপে পড়ে ব্যস্ত হয়েছি। নইলে আমি একসময় ছিলুম টো-টো কোম্পানিতে।

তাঁর হাসির সঙ্গে কর্নেলও হাসলেন, হ্যাঁ। ঝন্টুবাবু বলেছিলেন। আপনি তাঁর ভাই মন্টুবাবুর বন্ধু। দুজনে বনেজঙ্গলে পাখির খোঁজে বেড়াতেন। তো মন্টুবাবু হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

খুব ট্র্যাজিক ঘটনা। বেচারা এত ভালো, ভদ্র আর সরল ছেলে ছিল। ছোটবেলা থেকে আমার বন্ধু সে।

আমার জানতে আগ্রহ হচ্ছে। ডিসেম্বরে গড়ের জঙ্গলে গিয়ে কী এমন ঘটেছিল যে মন্টুবাবু—

হাত তুলে কর্নেলকে থামিয়ে মাধববাবু বললেন, আমি নিচে দাঁড়িয়ে ছিলুম। মন্টু একটা পাথরের স্ল্যাবে উঠে ফাঁদ পাততে যাচ্ছিল। পা স্লিপ করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। অনেক চেষ্টার পর তার জ্ঞান ফেরে। তারপর প্রলাপ বকতে শুরু করে। আমার বাবা ডাক্তার। তিনি পরে ওকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন মাথার ভেতর কোনও নার্ভে চোট লেগে ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এনিওয়ে, আপনার এ ব্যাপারে আগ্রহের কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?

আছে। কার্ডে আপনি দেখেছেন, আমি একজন নেচারিস্ট। নেচার—অর্থাৎ প্রকৃতিতে অনেক রহস্যময় জিনিস আছে। আমি সেই রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়াই। মন্টুবাবু প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে হঠাৎ পাগল হয়েছিলেন। সেই রহস্য আমাকে আগ্রহী করেছে।

সিংহ ফ্যামিলির সঙ্গে কি আপনার আগে থেকে আলাপ ছিল?

না। সদ্য কাল আলাপ হয়েছে। অর্কিড সংগ্রহও আমার হবি। তো অমরজিৎবাবুর বাড়ির উল্টোদিকে একটা উঁচু গাছের মাথায় বিরল প্রজাতির একটা অর্কিড দেখেছিলুম। হঠাৎ একটা গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এক পাগল আমার এই তরুণ বন্ধুটিকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করছিল।

মাধববাবু হাসলেন। হ্যাঁ। পাগল হওয়ার পর মন্টু এমন করে বেড়াচ্ছে শুনেছি।

কর্নেল বললেন, অমরজিৎবাবু দৌড়ে এসে একে বাঁচান। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ছোটভাইয়ের পাগল হওয়ার ঘটনা তাঁর কাছেই শুনেছি। আপনার সঙ্গে মন্টুবাবুর বন্ধুত্বের কথা এবং কীভাবে মন্টুবাবু পাগল হন, সবই বলেছেন তিনি। তা আমার মনে হয়েছে, গড়ের জঙ্গলে কোনও রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তির পাল্লায় পড়েই কি মন্টুবাবু পাগল হয়েছিলেন? যেহেতু আপনি ঘটনাস্থলে ছিলেন, তাই আমার আপনার সবটা শোনার আগ্রহ জেগেছে।

ওই তো বললুম। তেমন কোনও অলৌকিক দৃশ্য আমি দেখিনি।

গড়ের জঙ্গলে কিচনি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

মাধববাবু কথায়-কথায় হাসেন। হাসতে-হাসতে বললেন, কে জানে মশাই। গড়ের জঙ্গল নিয়ে কত অদ্ভুত গুজব চালু আছে। আমি কিচনি-টিচনি দেখিনি। তবে সম্প্রতি পাটনা থেকে আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু এখানে এসেছেন। তিনি কাল বিকেলে গড়ের জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে নাকি স্বচক্ষে কিচনি দেখে পালিয়ে এসেছেন।

তাঁর নাম কী? কোথায় উঠেছেন তিনি?

হীরালাল রায়। সরকারি বাংলোতে উঠেছেন। আজ তাঁকে আমার বাড়িতে চলে আসতে বলেছি।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। আপনার বন্ধুর সঙ্গে আমার তাহলে আলাপ হয়েছে। উনি কিচনি দেখে নাকি রিভলভার বের করে গুলি ছুঁড়েছিলেন।

হীরালাল রায়ও এক পাগল। বলে মাধববাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন। ওঁর রিভলভার আছে জানতুম না।

একটা কথা। আজ সকালে অমরজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি বললেন, মন্টুবাবু রাতে বাড়ি ফেরেননি। তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাগলের ব্যাপার। কোথাও আছে। ফিরবেখন।

আপনার বাবা ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুশি হতুম।

বাবা হরিদ্বার গেছেন। একেকজন একেক রকমের পাগল। বাবা ধর্মপাগল।

উঠে আসার সময় লক্ষ করলুম, মাধববাবু বেজায় গম্ভীর হয়ে গেছেন। বাইরে গিয়ে কথাটা কর্নেলকে বললুম। কর্নেল বললেন, বন্ধু রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন, এই ব্যাপারটা সম্ভবত ওঁকে চিন্তিত করেছে। যাই হোক, চলো, আমরা আপাতত বাংলোয় ফিরি।...

বাংলোর লনে রঙবেরঙের ফুলগাছ। তাতে প্রজাপতি ওড়াউড়ি করে বেড়াচ্ছিল। কর্নেল হঠাৎ প্রজাপতির ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেই সময় দেখলুম, একটা ব্রিফকেস এবং কাঁধে মোটা একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে হীরালালবাবু বেরিয়ে আসছেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে কর্নেলের ছবি তোলা দেখে চলে গেলেন।

কর্নেল ছবি তোলা বন্ধ করে এগিয়ে এলেন। তারপর একটু হেসে চাপা স্বরে বললেন, কাজ হয়ে গেল। ভাগ্যিস ভদ্রলোককে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলুম।

জিজ্ঞেস করলুম, কিন্তু কী কাজ হয়ে গেল?

প্রজাপতির ছবির সঙ্গে হীরালাল রায়ের ছবি তুললুম। রোদে স্ন্যাপশট। ছবিটা ভালই হবে।

আমরা দোতলায় নিজেদের ঘরে ফিরে পোশাক বদলে দক্ষিণের ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। কর্নেল বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গল দেখতে-দেখতে হঠাৎ বলে উঠলেন, সর্বনাশ। যা সন্দেহ করেছিলুন, তাই হয়েছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঝন্টুবাবুকেও দেখতে পাচ্ছি। একদল লোক তাঁর সঙ্গে গড়ের জঙ্গল থেকে—হ্যাঁ। ওরা একটা মাচায় চাপিয়ে মড়া বয়ে আনছে। জয়ন্ত। পাগল মন্টুবাবু মারা পড়েছেন।

কর্নেলের হাত থেকে বাইনোকুলার নিয়ে দেখলুম, সত্যি তাই। গাছের ডাল কেটে মাচা বানিয়ে একদল লোক সেটা বয়ে আনছে। উজ্জ্বল রোদে দেখা যাচ্ছিল মন্টুবাবুকে। মাচায় চিত হয়ে আছেন। আগে হেঁটে চলেছেন তাঁর দাদা ঝন্টুবাবু।

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত। আমি এখনই আসছি। তুমি ঘর ছেড়ে নড়ো না। সাবধান।...

পাঁচ

কর্নেল ফিরে এলেন প্রায় একঘণ্টা পরে। কলিং বেল টিপে রামপ্রসাদকে ডেকে খাবার আনতে বললেন। তারপর বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখে জল দিয়ে তোয়ালেতে মুছে বললেন, তুমি কি স্নান করেছ?

বললুম, না। স্নান করব না। ঘটনাটা আগে বলুন।

কর্নেল চেয়ার টেনে বসে বললেন, কয়েকজন আদিবাসী গড়ের জঙ্গলে খরগোস শিকারে ঢুকেছিল। তারা পাগল মন্টুর ক্ষতবিক্ষত মড়া দেখতে পেয়ে ঝন্টুবাবুকে খবর দিয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, উড়ো চিঠিতে যে শিমুল গাছের কথা আছে, তার তলায় পড়েছিলেন মন্টুবাবু। আমি বাংলো থেকে যাবার সময় কেয়ারটেকারের ঘর থেকে থানায় টেলিফোন করে গিয়েছিলুম। ঝন্টুবাবুর ধারণা, গাছ থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে গেছে। ওঁকে বুঝিয়ে বললুম, তবু পোস্টমর্টেম করা দরকার। পুলিশকেও জানানো দরকার যাই হোক, শিগগির জিপে চেপে পুলিশ এসে গিয়েছিল। সেই মাচায় চাপিয়েই বডি মর্গে নিয়ে গেল। আদিবাসীরা সিংহগড়ের রাজবংশের প্রতি খুব অনুগত দেখলুম। তবে এখন ওসব কথা থাক। খিদে পেয়েছে।

ট্রেতে খাবার এনে টেবিলে রেখে রামপ্রসাদ বলল, সার! আজ কিচনি এক বাবুকো মার ডালা। উয়ো এক পাগল আদমি থা। পহেলা কিচনি দেখকার বাবু পাগল হো গয়া। দুসরা বার কিচনি উসকো মার ডালা।

কর্নেল বললেন, শুনেছি রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদ ভয়ার্ত মুখে বলল, আপনারা নতুন আসিয়েছেন সার। কভি কিচনিকি কিলামে মাত ঘুসিয়ে। উয়ো বহত খতরনাক জাগাহ আছে।...

খাওয়ার পর কর্নেল ব্যালকনিতে বসে চুরুট ধরালেন। আমি অভ্যাস মতো বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছিলুম। চোখের পাতায় ঘুমের টান এসেছিল। কর্নেলের ডাকে চোখ খুলতে হল। উঠে পড়ো জয়ন্ত। বেরুব।

উনি সেজেগুজে তৈরি। আমি প্যান্ট-শার্ট পরে তৈরি হয়ে নিলুম। তারপর কাল বিকেলে যে রাস্তা ধরে গড়ের জঙ্গলে গিয়েছিলুম, সেই রাস্তায় হেঁটে চললুম।

আধঘণ্টার মধ্যে গড়ের জঙ্গলে পৌঁছে গেলুম আমরা। কর্নেল বাইনোকুলারে শিমুল গাছটা খুঁজে বের করে বললেন, কালকের লাঠি দুটো রাস্তায় ফেলে গিয়েছিলুম। আসার সময় দেখতে পেলুম না। দাঁড়াও। আগে দুটো লাঠি দরকার।

কালকের মতো গাছের লম্বা ডাল কেটে লাঠি তৈরি করে আমরা ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললুম। শিমুল গাছটার তলায় গিয়ে দেখি, পাথরের ওপর শুকনো রক্তের ছাপ এখনও রয়ে গেছে। শিমুল গাছটা শরৎকালে খুব ঝাঁপালো হয়ে আছে। কিন্তু কাঁটাভর্তি গুঁড়ি বেয়ে কারও পক্ষে এই গাছে চড়া সম্ভব নয়।

কর্নেল খুঁটিয়ে চারপাশটা দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন। তারপর ঘাসের দিকে ঝুঁকে বললেন, এই ঘাসগুলো কাত হয়ে গেছে। রক্তের ছাপও দেখতে পাচ্ছি। বোঝা যাচ্ছে, কেউ মন্টুবাবুর লাশ টেনে নিয়ে গিয়ে শিমুল গাছের তলায় রেখেছিল।

কর্নেল আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললেন, এখানেও রক্তের ছাপ দেখা যাচ্ছে। জয়ন্ত, তুমি বিশেষ করে পেছনে আর দুপাশে লক্ষ রাখবে।

উনি গুঁড়ি মেরে রক্তের ছাপ অনুসরণ করছিলেন। আমি সতর্ক দৃষ্টে পিছনে এবং দুপাশে লক্ষ রেখে হাঁটছিলুম। একখানে আবার একটা পাথরের স্ল্যাব দেখা গেল। বেশ চওড়া। কয়েকটা কোণ আছে পাথরটার। নক্ষত্রের প্রতীক বলা চলে। কর্নেল বললেন, এটা বোধ হয় দুর্গপ্রাসাদের ছাদে কোনও জায়গার ওপর থামের মাথায় বসানো ছিল। মোগল আমলের স্থাপত্যে চবুতরার মাথায় এ ধরনের ছাদ থাকত। হ্যাঁ, ভাঙা থামের চিহ্নও লক্ষ করছি। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এখানেই রক্তের ছাপ শেষ হয়েছে। জয়ন্ত, আমার সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হল।

কী সন্দেহ?

মন্টুবাবুকে খুন করেছে কেউ। আমার মনে আগে থেকেই এই সন্দেহটা থেকে গেছে। মন্টুবাবু সম্ভবত এমন কিছু গোপন কথা জানতেন, তা ওঁর কাছে জানার জন্য ওঁকে পীড়ন করায় উনি পাগল হয়ে যান।

বলেন কী! মাধববাবু তো—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, মাধববাবু মিথ্যা বলতেও পারেন। হ্যাঁ। ওই দেখ এই পাথরের ওপাশে ছেঁড়া নাইলনের দড়ির কয়েকটা টুকরো পড়ে আছে। জয়ন্ত। কাল সারারাত এবং আজ সকাল পর্যন্ত মন্টুবাবুকে দড়ি বেঁধে এখানে ফেলে রাখা হয়েছিল।

বলে কর্নেল পাথরটার শেষদিকে গিয়ে ঝুঁকে বসলেন। সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। এখানে। মন্টুবাবুর লাশে বুকের কাছে আর গালে পোড়া দাগই আমি দেখেছিলুম। তখন মনে হয়েছিল, ওগুলো ময়লা বা কাদার ছোপ। কর্নেল মুখ তুলে সামনে একটা ঝোপের দিকে তাকালেন। বললেন, ওই দেখ জয়ন্ত। ওগুলো বিছুটির ঝোপ। গায়ে বিছুটিপাতা লাগলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। কয়েকটা বিছুটি গাছ পড়ে আছে লক্ষ করো। হাতে গ্লাভস পরে কেউ পাগলের ওপর অকথ্য পীড়ন করেছে। শেষে ধৈর্য হারিয়ে মেরে ফেলেছে।

আমি বিছুটির জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। সেই কোথাও চাপা থপ থপ শব্দ হল। কর্নেলও শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে শব্দটা লক্ষ করে বাইনোকুলার তুললেন। বললেন, কী একটা কালো প্রকাণ্ড জন্তুর পিঠ দেখতে পেলুম। মাথায় লম্বা চুলও আছে। সেই কিচনি। থাক। বিরক্ত করব না। থানা থেকে সি আই ডি ইন্সপেক্টর রমেশ পাণ্ডের আসার কথা। এতক্ষণ এসে পড়া উচিত ছিল। জিপে আসার অসুবিধে নেই। পৌনে তিনটে বেজে গেল।

কর্নেল ঘড়ি দেখে শিমুল গাছটার তলায় গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলুম। জায়গাটা উঁচু বলে পূর্বদিকে তোরণের ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বাইনোকুলারে আবার চারদিক দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে জিপের শব্দ এল কানে। কর্নেল ঘুরে দেখে বললেন, এসে গেছেন রমেশ পাণ্ডে।

চারজন সশস্ত্র কনস্টেবলের সঙ্গে রোগাটে চেহারার এক পুলিশ অফিসার সাবধানে ভাঙা ব্রিজের পাথরে পা রেখে গড়ের জঙ্গলে ঢুকলেন। কর্নেল হাত নেড়ে ডাকলেন, মিঃ পাণ্ডে। এখানে আসুন।

পুলিশের দলটি বুটের শব্দে জঙ্গল কাঁপিয়ে এগিয়ে এল। রমেশ পাণ্ডে বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল কর্নেল সরকার। ডেডবডির পোস্টমর্টেমের প্রাইমারি রিপোর্ট পেয়ে কোয়ার্টারে ফিরে খাওয়াদাওয়া করে বেরুতে—যাই হোক। আপনি এতক্ষণ নিশ্চয়ই কিছু সূত্র পেয়ে গেছেন।

কর্নেল তাঁকে রক্তের ছোপগুলো দেখাতে-দেখাতে সেই খাঁজকাটা পাথরটার কাছে গেলেন। নিজের মতামত দিয়ে বললেন, মর্গের রিপোর্ট কী বলছে বলুন?

রমেশ পাণ্ডে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। ডেডবডিতে অত্যাচারের চিহ্ন আছে। তবে মারা হয়েছে গুলি করে। মাথার পেছনে গুলি করে পাথর দিয়ে থ্যাঁতলানো হয়েছে। পিঠে এবং কোমরেও ভোঁতা জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। যাতে মনে হয় উঁচু জায়গা থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে মারা গেছে লোকটা। মাথার ভেতর হাড়ের খাঁজে বুলেটনেল আটকে ছিল। পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভার থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করা হয়েছিল। দৈবাৎ গুলিটা ঘুরতে-ঘুরতে হাড়ের খাঁজে আটকে গিয়েছিল। মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চান্স ছিল। তা হলে ডাক্তার অন্য রিপোর্ট লিখে বসতেন। আসলে অত খুঁটিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই এখানকার হাসপাতালে। হ্যাঁ, ডাক্তারের মতে, ভোরের দিকে মারা হয়েছিল। রাইগর মর্টিস সবে শুরু হয়েছে, এমন সময়ে বডি ডাক্তারের হাতে দেওয়া হয়।

কর্নেল বললেন, আপনাকে এক ভদ্রলোকের কথা বলেছিলুম।

পাণ্ডে হাসলেন। পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছি। এবার গিয়ে ওঁর অস্ত্রটা চাইব। লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস কি না এবং কত ক্যালিবার, তাও দেখব। কিন্তু একজন পাগলকে এমন করে খুন করার কোনও মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার কী ধারণা?

কর্নেল বললেন, ভিকটিমের দাদা অমরজিৎ সিংহ কোনও আভাস দিতে পারেননি?

না। আসার সময় ওঁর সঙ্গে দেখা হল। হাসপাতালে বডির ডেলিভারি নিতে যাচ্ছিলেন। উনি শুধু বললেন, দেবতার অভিশাপ ছাড়া কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

কর্নেল হাসলেন। গুলি করে মারাও কি দেবতার অভিশাপ?

পাণ্ডে চাপা স্বরে বললেন, ব্যাকগ্রাউন্ডটা তদন্ত করলে জানা যাবে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে কোনও গন্ডগোল ছিল কি না। মাধব বোস ভিকটিমের বন্ধু ছিলেন। এখন ভদ্রলোক বড় ব্যবসায়ী। তাঁর কাছেও যাব আমরা।

ইন্সপেক্টর রমেশ পাণ্ডে নাইলনের দড়িগুলো, সিগারেটের টুকরো এবং সাবধানে বিছুটির ডালগুলো খবরের কাগজ ব্যাগ থেকে বের করে মুড়ে নিলেন। তারপর বললেন, চলুন। ফেরা যাক।

কর্নেল বলেন, আপনারা এগোন। আমি এই জঙ্গলে অর্কিড আছে কি না খুঁজে দেখি। তাছাড়া দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতিও এখানে দেখতে পাওয়া সম্ভব।

পাণ্ডে হাসলেন। সাবধান কর্নেল সরকার। গড়ের জঙ্গলে নাকি কিচনি আছে, জলের প্রেতিনী।

কর্নেলও হাসতে-হাসতে বললেন, দেখা গেলে তো ভালো হয়। ছবি তুলব।

কিন্তু সাবধান। এখানে নাকি সাপের খুব উপদ্রব আছে।

বলে রমেশ পাণ্ডে কনস্টেবলদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। ভদ্রলোক দেখতে রোগাটে হলেও খুব স্মার্ট মনে হল।

উনি চলে যাওয়ার পর জিগ্যেস করলুন, আপনার পরিচয় কি উনি জানেন?

আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। এই পরিচয়ই যথেষ্ট। ওঁকে আমার নেমকার্ড দিয়েছি। যদি বেশি উৎসাহী হন, তাহলে কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে লালবাজার পুলিশে হেটকোয়ার্টারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে খবর নেবেন। তাতে আমার বেশি সুবিধে হবে।

কর্নেল বাইনোকুলারে আবার কিছুক্ষণ চারদিক খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর পা বাড়িয়ে আস্তে বললেন, কিচনি সত্যি এখানে আছে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে, কিচনি কেন মন্টুবাবুকে রক্ষা করতে আসেনি! মন্টুবাবু বলেছিলেন, কিচনির সঙ্গে তাঁর নাকি ভাব হয়েছে।

বোগাস। আপনিও কী দেখতে কী দেখছেন। ভালুক-টালুক হয় তো।

কর্নেল হঠাৎ থেমে ইশারায় আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর বাঁ-দিকে একটা স্তূপের আড়ালে হাঁটু মুড়ে বসে ক্যামেরায় কীসের ছবি তুললেন। পরপর তিনবার ক্যামেরার শাটার ক্লিক করল।

তারপর সরে এসে আস্তে বলেলেন, চলো। কেটে পড়া যাক।

গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আগের রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে জিগ্যেস করলুম, অমন চুপিচুপি কীসের ছবি তুললেন এবার বলুন।

কিচনির।

ভ্যাট।

বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। এক মিনিট। এখনও আলো আছে। ফিল্মের রিলটাতে আর দু-তিনটে ছবি তোলা যায়। রিলটা শেষ করে আজ রাতেই ওয়াশ ডেভালাপ প্রিন্ট করে ফেলব।

কর্নেল তাঁর স্যুটকেসে পোর্টেবল স্টুডিও সরঞ্জাম এনেছেন। বাইরে কোথাও গেলে ওটা সঙ্গে নিয়ে যান। বাথরুমকে ডার্করুমে পরিণত করেন। টাঁড় জমিটার ওপর যেতে-যেতে কর্নেল হাঁটু মুড়ে বসে মুখে হুস শব্দ করলেন। অমনি এক ঝাঁক পাটকিলে রঙের পাখি উড়ে গেল। কর্নেল পর-পর শাটার টিপে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ওঁর মুখে কেমন বিরক্তির ছাপ লক্ষ করে বললুম, কী? ছবি উঠবে না মনে হচ্ছে নাকি?

কর্নেল বলেন, না জয়ন্ত। ছবি উঠবে। আসলে, সিংহ পরিবারের দেবতার অভিশাপের মতো আমার জীবনেও যেন এই একটা অভিশাপ। যেখানে এই লালঘুঘুর ঝাঁক দেখেছি, সেখানেই খুনোখুনিতে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। কাল সকালে এখানে এই লালঘুঘুর ঝাঁক দেখেছিলুম। ছবি তোলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু বরাবরকার মতো মনে-মনে একটু আঁতকে উঠেছিলুম। তুমি কুসংস্কার বলবে। বলো। কিন্তু এটা হয়।...

বাংলোয় ফিরে যথারীতি ব্যালকনিতে বসে আমরা কফি খেলুম। তারপর কর্নেল বললেন, বাথরুমে যেতে হলে যাও জয়ন্ত। এবার ঘণ্টা তিনেকের জন্য বাথরুম ডার্করুম হবে।

বাথরুমকে ডার্করুম বানিয়ে কর্নেল ঢুকে গেলেন। ঘরের আলোও নিভিয়ে দিয়ে গেলেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রইল। আমি ব্যালকনিতে বসে সময় কাটাতে আরও এক পেয়ালা কফি সাবাড় করলুম। পটে আরও কফি লিকার ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এবার টেবিলল্যাম্প জ্বেলে আমার কাছে এসে বসলেন। বললেন, চারটে নেগেটিভ প্রিন্ট করতে দিলুম। হীরালালবাবুর ছবি ভালোই উঠেছে। ফুলের সামনে হীরালাল। আর কিচনির ছবি আশানুরূপ না হলেও মোটামুটি উঠেছে। জায়গাটাতে পুরো রোদ ছিল না। তিনটেই পাশ থেকে তোলা।

বললুম, তাহলে ভূতপেত্নি নয়। কোনও জন্তু!

নিশ্চয়। কর্নেল হাসলেন। পেত্নি হলে কি আর ছবি উঠত?

এই সময় দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল উঠে গিয়ে বললেন, কে?

রামপ্রসাদের সাড়া এল। হামি রামপ্রসাদ আছি সার। আপনার টেলিফোন আসল। তাই বড়াসাব বলল, কর্নিলসাবকো খবর দো।

কর্নেল দরজা খুলে বললেন, চলো যাচ্ছি। জয়ন্ত, দরজা আটকে দাও। সাড়া না পেলে দরজা খুলো না।

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। দরজা আটকে ঘরেই বসলুম। আমার একটা লাইসেন্স করা ফায়ার আর্মস আছে। বাইরে গেলে সঙ্গে নিই। এবার তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছিলুম। অস্ত্রটা সঙ্গে থাকলে সাহস বেড়ে যেত। কিন্তু এখন আর আক্ষেপ করে লাভ নেই।

মিনিট পনেরো পরে কর্নেলের সাড়া পেয়ে দরজা খুলে দিলুম। উনি দরজা বন্ধ করে ব্যালকনিতে গিয়ে বললেন, মিঃ পাণ্ডের টেলিফোন। হীরালাল রায়কে অ্যারেস্ট করেছেন। আচমকা মাধববাবুর বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন ওঁরা। হীরালালবাবুর কাছে একটা পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভার পাওয়া গেছে। সিক্স রাউন্ডার ফায়ার আর্মস দুটো গুলি ভরা আছে। বাকি চারটে ফায়ার করা হয়েছে। কিচনির কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি মিঃ পাণ্ডে। বললুম, হীরালালবাবুকে কাল আমরা তিনটে গুলি ছুঁড়তে দেখেছিলুম। তাহলে চতুর্থটা মন্টুবাবুর মাথায় ঢুকেছে।

কর্নেল বললেন, আমি মিঃ পাণ্ডেকে বললুম, এখানে ফরেন্সিক এক্সপার্ট বা ব্যালাস্টিক মিসাইল এক্সপার্ট নেই। ডাক্তারের অনুমানের ওপর নির্ভর না করে বুলেট নেলটা পাটনায় ফরেন্সিক এক্সপার্টের কাছে পাঠান।

কিন্তু হীরালালবাবুর আচরণ সন্দেহজনক।

কর্নেল একটু চুপ করে বললেন, জয়ন্ত, আজ সকালে হীরালালবাবু গড়ের জঙ্গলে আর একটা গুলি কিচনিকে লক্ষ করে ছুঁড়েছিলেন। আমি কাছাকাছি টাঁড় জমিটার পাশে ছিলুম। উনি জঙ্গল থেকে পড়ি কি মরি করে পালিয়ে এসে এক রাউন্ড ফায়ার করেছিলেন।

বললুম, তাহলে কে মারল মন্টুবাবুকে? রহস্য যে জট পাকিয়ে গেল।

কর্নেল বলেন, তাছাড়া সমস্যা হল, একই ক্যালিবারের ফায়ার আর্মস অন্যেরও থাকতে পারে। কাজেই রহস্য সত্যিই জটিল হল।

ছয়

রামপ্রসাদ রাতের খাবার রেখে গিয়েছিল। কর্নেল তাকে বলেছিলেন, আমরা আজ দেরি করে খাব। তুমি বরং সকালে এসে এঁটো থালাবাটি আর ট্রে নিয়ে যেও।

রাত সাড়ে দশটায় কর্নেল বাথরুমে ঢুকে আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন। লক্ষ করেছিলুম, দড়িতে ক্লিপ এঁটে চারটে ছবি ঝোলানো আছে। তখনও ছবিগুলো শুকোয় নি। আমরা খেয়ে নিয়েছিলুম। তারপর রাত এগারোটা নাগাদ কর্নেল ছবির প্রিন্টগুলো নিয়ে এসে টেবিলল্যাম্পের আলোয় আমাকে কিচনির ছবি তিনটে দেখিয়েছিলেন।

পাশের ঝোপের উচ্চতা আন্দাজ করে বোঝা গিয়েছিল, জন্তুটা অন্তত পাঁচফুট উঁচু। অবিকল প্রকাণ্ড ব্যাঙের মতো দেখতে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আছে। বসে আছে ঠিক ব্যাঙের মতো। পাশ থেকে তোলা ছবি। তাই শুধু দেখা যাচ্ছিল একটা চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে। অজানা কোনও প্রাণী হওয়াই সম্ভব।

পরদিন ভোরে কর্নেল বেরিয়েছিলেন। আমার ঘুম ভেঙেছিল সাতটা নাগাদ। কলিং বেল বাজিয়ে রামপ্রসাদকে ডেকে আজ বেডটি আনিয়ে নিলুম। কর্নেল সকাল-সকাল ফিরে এলেন।

বললেন, আজ বেড়ানো হল না। সিংহবাড়ি গিয়েছিলুম। পরমেশ্বরীকে হীরালালের ছবি দেখালুম। উনি ছবি দেখে অবাক হয়ে বললেন, এ তো তাঁর দেবর বনবিহারী। গোঁফ রেখেছে। দেখতে মোটাসোটাও হয়েছে। খুব দুর্ধর্ষ ছেলে ছিল। রেলের চোরাই লোহালক্কড় বিক্রির অভিযোগে দুবার ধরা পড়েছিল। তাঁর স্বামী ভাইকে অনেক তদ্বির করে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ বাড়িতে সে কয়েকবার এসেছে। অমরজিৎবাবুও সায় দিয়ে বললেন, ছবিটা দেখে তাঁর চেনা লাগছে। মাধবের সঙ্গে বনবিহারীর আলাপ হয়েছিল এখানেই। মন্টু, মাধব আর বনবিহারী একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত। ওঁরা দুজনেই খুব অবাক হয়েছেন। কেন বনবিহারী তাঁদের বাড়ি না এসে বাংলোয় উঠেছে? কেনই বা সে হীরালাল নাম নিয়েছে? তাকে পুলিশ খুনের দায়ে গ্রেফতার করেছে শুনেও দুজনে অবাক। মন্টুকে কেন সে খুন করবে? যাই হোক, অমরজিৎ এবং পরমেশ্বরীকে চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিয়ে এলুম।

জিগ্যেস করলুম, ওঁদের কিচনির ছবির কথা বলেননি?

কর্নেল হাসলেন। চেপে যাও জয়ন্ত। কিচনি সম্পর্কে ভুলেও মুখ খুলবে না।

ন'টায় ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর কর্নেলের কথামতো বেরুনোর জন্য তৈরি হচ্ছি, সেইসময় দরজায় কেউ নক করল। দরজা খোলা ছিল কর্নেল বললেন, কাম ইন।

ঘরে ঢুকলেন রমেশ পাণ্ডে। পরনে পুলিশের পোশাক নেই। প্যান্ট-শার্ট পরে এসেছেন। তিনি একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, বুলেট নেলটা কাল সন্ধ্যায় স্পেশাল মেসেঞ্জার মারফত পাটনায় ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠিয়েছিলুম। কিছুক্ষণ আগে ট্রাঙ্ককলে ব্যালাস্টিক মিসাইল এক্সপার্ট রঘুবীর সিনহা জানালেন, বুলেটটা থ্রি নট থ্রি। তবে ওটা পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলবার থেকে ছোঁড়া হয়েছে। এই অবস্থায় হীরালাল বাবুকে আটকে রাখার মানে হয় না। তাঁর রিভলভারটার লাইসেন্স আছে। ব্যবসায়ী লোক। সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে ঘোরেন। তাই—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, ভদ্রলোকের আসল নাম কিন্তু বনবিহারী রায়। উনি ভিকটিম মন্টুবাবুর দিদি পরমেশ্বরী দেবীর দেবর। আপনি অমরজিৎবাবু এবং পরমেশ্বরীদেবীর কাছে গেলে এ খবর পেয়ে যাবেন। আমি সকালে হীরালালবাবুর ছবি নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়েছিলুম।

পাণ্ডে বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি হীরালালের ছবি তুলেছিলেন?

হ্যাঁ। কর্নেল হাসলেন। গড়ের জঙ্গলে ওঁর যাতায়াত দেখে সন্দেহ হয়েছিল। তাই কাল লনে ফুলে বসা প্রজাপতির ছবি তোলার ছলে ওঁর ছবি তুলেছিলুম। আমার সঙ্গে ফটো প্রিন্টের পোর্টেবল সরঞ্জাম আছে। ছবিটা আপনাকে দিচ্ছি। পাটনায় এই ভদ্রলোকের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে পারেন।

ছবিটা পকেটে রেখে রমেশ পাণ্ডে একটু হেসে বললেন, কর্নেল সরকারের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও কাল রাতে জেনে গেছি। আমাদের সবরকম সহযোগিতা পাবেন। আপনি নিজের পথে হাঁটুন। আমরা আমাদের পথে হাঁটি। আশা করি, এক জায়গায় পরস্পর মুখোমুখি হতে পারব।

কর্নেলের কথায় কলিং বাজিয়ে রামপ্রসাদকে ডেকে কফির অর্ডার দিলুম। রমেশ পাণ্ডে বললেন, সিংহগড়ে পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের লাইসেন্সড রিভলভার কারও নেই। যদি থাকে সেটা বেআইনি। আপনি নিশ্চয় জানেন, বিহার মুল্লুকে বেআইনি অস্ত্র প্রচুর আছে। আমরা বহু ক্ষেত্রে অসহায়। রাজনীতিকদের চাপে সব জেনেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

কর্নেল বললেন, আচ্ছা মিঃ পাণ্ডে, সিংহগড়ে অফসেট বা লেজার প্রিন্টিং প্রেস আছে?

সিংহগড়ে? নাহ্ কর্নেল সরকার। তবে সাবেক আমলের ট্রেডল মেশিনের প্রিন্টিং প্রেস আছে। বিজ্ঞাপন, পাঁউরুটির মোড়ক ইত্যাদি ছাপা হয়। এখানে ওসব আধুনিক টেকনলজির প্রিন্টিং প্রেসে কী ছাপবে?

রমেশ পাণ্ডের জন্য কফি এল। স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে তিনি কিছুক্ষণ বকবক করলেন। একসময় কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, সিংহগড়ে প্রাচীন মূর্তি বা ভাস্কর্য পাচারের কোনও চক্র কি কখনও ধরা পড়েছিল মিঃ পাণ্ডে?

হ্যাঁ। গতবছর একটা চক্র আমরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলুম। এলাকার বিভিন্ন মন্দির থেকে প্রাচীন বিগ্রহ চুরি করে ট্রাকে পাচার করা হচ্ছিল। দলে পাঁচজন লোক ছিল। চারজন ধরা পড়েছিল। তারা জেল খাটছে এখনও। একজন ধরা পড়েনি। সেই কিন্তু রিং লিডার। তার আসল নাম ধোলাই দিয়ে সাগরেদের কাছে আদায় করতে পারিনি। তারা বলেছিল, তাকে ব্যাঙবাবু বলে জানে। সেই ব্যাঙবাবু নাকি বাঙালি। তবে সে কোথায় থাকে, তা তারা জানে না।

ব্যাঙবাবু? কর্নেল কেন যেন একটু চমকে উঠলেন। ব্যাঙা ডাকনাম শুনেছি। কিন্তু ব্যাঙবাবু তো অদ্ভুত নাম!

পাণ্ডে বললেন, বুঝুন কর্নেল সরকার। থার্ড ডিগ্রি ধোলাই কী জিনিস নিশ্চয় জানেন। সেই ধোলাই খেয়েও তারা 'ব্যাঙবাবু' ছাড়া অন্য নাম বলেনি। আমার ধারণা, লোকটা বাইরে থাকত। পাটনা হোক, কি কলকাতা হোক। তার চেহারার বর্ণনা আদায় করেছিলুম। বেঁটে, গোলগাল লোক। কাঁচা পাকা চুল। বয়সে বৃদ্ধ। কিন্তু তার গায়ে নাকি প্রচণ্ড জোর। তারা বারতিনেক রাতের বেলায় তাকে বাঙালিটোলার একটা পোড়োবাড়িতে দেখেছিল বাড়ি সার্চ করে আমরা কোনও সূত্র পাইনি। দিনরাত ওত পেতে থেকেও তার পাত্তা মেলেনি। বলে পাণ্ডে একটু হাসলেন। তো মূর্তি পাচারের কথা কেন বলুন তো?

কর্নেল বললেন, পাগল মন্টুবাবুকে অত্যাচার করে মেরে ফেলায় এই প্রশ্নটা মাথায় এসেছে। মন্টুবাবু কি কোনও প্রাচীন দামি বিগ্রহের খোঁজ রাখতেন?

হ্যাঁ। আপনারা প্রশ্নে যুক্তি আছে। রমেশ পাণ্ডে কফি দ্রুত শেষ করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কর্নেল সরকার। আমার মাথায় এটা আসা উচিত ছিল। মন্টুবাবু সিংহগড় রাজবংশের লোক। তাঁর পড়ে পূর্বপুরুষের কোনও বিগ্রহের খবর জানা সম্ভব ছিল—যা তাঁর দাদা জানতে পারেননি। মন্টুবাবুকে হত্যার একটা মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, চলি। প্রয়োজনে পরস্পর যোগাযোগ রাখব।

রমেশ পাণ্ডে চলে গেলে কর্নেল আপন মনে বললেন, ব্যাঙবাবু।

বললুম, গড়ের জঙ্গলে তোলা কিচনির ছবিটা কিন্তু ব্যাঙের মতোই।

কর্নেল হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। চল, বেরুনো যাক। এই খেলাটা সেই ব্যাঙের বলেই মনে হচ্ছে। তবে আপাতত ব্যাঙবাবুর চেয়ে ব্যাঙজাতীয় ওই জন্তুটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি বাংলোর পশ্চিমে অসমতল সেই মাঠের রাস্তায় গিয়ে বললুম, আবার গড়ের জঙ্গলে? কর্নেল একই জায়গায় বারবার গিয়ে শুধু এই বিদঘুটে জন্তুটার ছবি তুলে কী হবে? জন্তুটা আর যাই করুক, পাগল মন্টুবাবুকে সে তো খুন করেনি।

কর্নেল বললেন, বুঝতে পারছি। তুমি বনবিহারী ওরফে হীরালালের মতো ওই জন্তুটাকে ভয় পাচ্ছ।

রামপ্রসাদ বলছিল, এখানকার সব মানুষই ওর ভয়ে গড়ের জঙ্গলে ঢোকে না।

কিন্তু আদিবাসীরা ওখানে শিকার করতে ঢোকে। মন্টুবাবুর লাশ তারাই দেখতে পেয়েছিল।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, জন্তুটা আদিবাসীদের দেখা দেয় না। কেন দেখা দেয় না, তার কারণ অনুমান করা যায়। আদিবাসীদের বিষাক্ত তীরকে ভয় পায় জন্তুটা। তাদের লক্ষভেদও অব্যর্থ। জন্তুটা যেভাবেই হোক, এটা বোঝে।

হাঁটতে-হাঁটতে সেই উঁচু টাঁড় জমিটার কাছে পৌঁছে কর্নেল বললেন, আজ আমরা গড়ের পশ্চিম দিকটা দেখব। আমার ধারণা, দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ গড়খাইয়ের জলে পড়ে সম্ভবত ওদিকে একটা রাস্তা তৈরি করেছে। কারণ, এই পথটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের নিচে একটা আদিবাসীদের গ্রামে পৌঁছেছে। ওদিক থেকে গড়ের জঙ্গল অনেক কাছে। ওরা হয়তো ওদিক দিয়েই জঙ্গলে ঢোকে।

কিছুটা এগিয়ে চোখে পড়ল, কাঁচা রাস্তাটা বাঁদিকে হঠাৎ বাঁক নিয়ে গড়ের জঙ্গলের কাছে গেছে। তারপর ডাইনে বাঁক নিয়ে চড়াইয়ে উঠে একটা ছোট্ট গ্রামে ঢুকেছে। গ্রামটা একটা টিলার কাঁধে। কিন্তু বাংলো থেকে চোখে পড়ে না।

কর্নেল রাস্তার বাঁক থেকে দক্ষিণে ঝোপঝাড়ে ভর্তি মাঠের দিকে হাঁটতে থাকলেন। একটু পরে আমরা পশ্চিমের গড়খাইয়ের ধারে পৌঁছুলুম। কর্নেলের অনুমান সত্য। দুর্গপ্রাসাদের খাড়া পাঁচিলের একটা অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে। পাথরের ইটের ফাঁকে গুল্ম লতা গজিয়েছে। গড়খাইয়ে প্রচুর পাথর পড়ে আছে বটে, কিন্তু সেগুলোতে পা ফেলে যাওয়া অসম্ভব। কর্নেল আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, বাহ! এইরকম কিছুই আশা করেছিলুম।

একটা পাথরের বিশাল পাঁচিল আড়াআড়ি ভাবে গড়খাইয়ে ভেঙে পড়েছে। পাঁচিলটার দৈর্ঘ্য গড়খাইয়ের চেয়ে বেশি। তবে জায়গায়-জায়গায় একটু অংশ জলে ডুবে আছে। ব্যালান্স রেখে হাঁটলে সহজে ওপারে পৌঁছানো যায়। কর্নেল পায়ের কাছটা দেখিয়ে বললেন, এই দেখ। দিব্যি একটা পায়ে চলা পথের চিহ্ন আছে। শরৎকাল বলে পথটা ঘাসে কিছুটা ঢাকা পড়েছে। এপথেই আদিবাসীরা শিকার করতে ঢোকে।

পাঁচিলটা প্রস্থে অন্তত পাঁচ-ছ'ফুট। কিন্তু দুটো পাশ ভেঙে মাত্র এক-দেড় ফুট জলের ওপর উঁচিয়ে আছে। কর্নেল আগে এবং আমি পেছনে ব্যালান্স রেখে সাবধানে ওপারে গেলুম। তারপর চওড়া একটা ফাটলের মতো পাথরের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে হঠাৎ কর্নেল গুঁড়ি মেরে বসলেন এবং আমাকেও বসিয়ে দিলেন।

তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখলুম, হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি পরা একটা মোটাসোটা লোক বেঁটে একটা গাছের ছায়ায় বসে সিগারেট টানছে। তার মুখোমুখি আর একটা লোক বসে হাত নেড়ে কিছু বলছে। এই লোকটা ওর চেয়ে লম্বা। পরনে প্যান্ট আর খয়েরি রঙের শার্ট। হাতে একটা বন্দুক এবং কাঁধে একটা ব্যাগ।

প্রায় হাত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ দূরে এবং আমাদের থেকে অনেকটা নিচে ওরা বসে আছে। কিছুক্ষণ পরে বন্দুকধারী লোকটা উঠে দাঁড়াল। সে আমাদের দিকে উঠে আসছে দেখে কর্নেল ফাটল থেকে সরে আমাকে ইশারায় উল্টোদিকের আড়ালে লুকোতে বললেন। কর্নেল লুকিয়ে পড়লেন ঘন ঝোপের আড়ালে। লোকটা কাঁধে বন্দুক নিয়ে শিস দিয়ে গান করতে-করতে ফাটল পথে নেমে গেল এবং গড়খাইয়ে পড়ে থাকা পাঁচিলের ওপর দিয়ে দ্রুত ওপারে পৌঁছুল। একটু পরে পশ্চিমের মাঠে ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্নেল আবার ফাটলের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। নিচের লোকটাকে এবার হেঁটে যেতে দেখলুম উত্তর-পশ্চিম কোণে টিকে থাকা ভাঙা ঘরটার দিকে। ততক্ষণে কর্নেল ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে তার ছবি তুলে নিয়েছেন। আমার কানের কাছে মুখ এনে উনি ফিসফিস করে বললেন, চিনতে পারলে কি ব্যাঙবাবুকে?

চমকে উঠে বললুম তাই তো। মোটা বেঁটে গোলগাল চেহারা। মাথায়—

চুপ। —বলে কর্নেল বাইনোকুলারে উত্তর-পশ্চিম দিকে দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, চল। এই যথেষ্ট, ফেরা যাক খিদে পেয়েছে।

কাঁচা রাস্তায় পৌঁছে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, বন্দুকওয়ালা লোকটা ওই টাঁড়ে গুঁড়ি মেরে বসে আছে।

একটু ভয় পেয়ে বললুম, আমাদের লক্ষ করে গুলি ছুঁড়বে না তো?

কর্নেল হাসলেন। না। লোকটা লালঘুঘু শিকার করতে চায়। দেখা যাক। লালাঘুঘুরা বেজায় ধূর্ত।

কর্নেল হন্তদন্ত হয় হাঁটতে থাকলেন। টাঁড় জমিটার একটু দূরে পৌঁছেছি, সেইসময় লোকটা বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ল। এক ঝাঁক লালঘুঘু উড়ে গড়ের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। কর্নেল ক্যামেরা বাগিয়ে একটা ফুলেভরা ঝোপে প্রজাপতির ছবি তুলতে গেলেন। তখন লোকটা আমাদের দেখতে পেল। সে টাঁড় থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়াল।

কর্নেল কোনও প্রজাপতিকে অনুসরণ করছেন, এই ভঙ্গিতে ক্যামেরা তাক করে গুঁড়ি মেরে বসলেন। দেখলুম, ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করাই আছে। তার মানে লোকটার ছবি তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য।

একটু পরে শাটার টিপলেন কর্নেল পরপর দুবার। লোকটা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছিল। কাছে গেলে সে বলল, ক্যা সাব? আপ ফাটরাঙ্গাকি তসবির উঠাতা হ্যায়?

কর্নেল কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতি ধরা জাল বের করে বললেন, বহতন হুঁশিয়ার ফাটরাঙ্গা। নেটমে নেহি পাকড় যাতি তো ক্যা করেগা?

ইসমে ক্যা ফায়দা?

হবি হ্যায় ভাই, হবি। আপকা য্যয়সা শিকার কি হবি হ্যায়।

আপ কাঁহাসে আতা হ্যায় সাব?

কলকত্তাসে। আপ হেঁয়াকা রহনেওয়ালা হ্যায়?

হাঁ।

আমরা তার সঙ্গে হাঁটছিলুম। কর্নেল তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। তারপর গড়ের জঙ্গলের কিচনির কথা তুললেন। সে ভয় দেখিয়ে বলল, কিচনি দেখলে লোক পাগল হয়ে যায়। কিচনি মানুষকে আছড়ে মারে। সরকারি বাংলোর কাছে পৌঁছে কর্নেল তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে শুধু বলল, মগনলাল। তারপর বন্দুক কাঁধে নিয়ে শিস দিয়ে গান করতে-করতে চলে গেল।...

স্নানাহারের পর কর্নেল চুরুট শেষ করে বললেন, তুমি গড়িয়ে নাও জয়ন্ত। আমি বাথরুমকে ডার্করুম করে ফিল্মের একটা অংশ কেটে ওয়াশ ডেভালাপ করে ফেলি। বাকি ফিল্মগুলো বাঁচিয়ে কাজটা করতে হবে।

রোদে হেঁটে ক্লান্ত ছিলুম। স্নানাহারের পর ভাতঘুম আমাকে পেয়ে বসল। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। উনি বললেন, উঠে পড়ো জয়ন্ত চারটে বাজে।

ব্যাঙবাবু আর মগনলালের ছবি চমৎকার উঠেছে। দেখবে এস।

ছবিগুলো দেখে বললুম, মিঃ পাণ্ডেকে এবার জানানো উচিত।

জানাব। কফি আসুক কফি খেয়ে বেরুব।

রামপ্রসাদ কফি দিয়ে গেল। কফি খেয়ে সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা বেরুলুম। কর্নেল সাবেক বসতি বাঙালিটোলার দিকে যাচ্ছেন দেখে জিগ্যেস করলুম, ঝন্টুবাবুর বাড়ি গিয়ে কী হবে? পুলিশকে জানাতে দেরি হলে ব্যাঙবাবু কেটে পড়তে পারে।

কর্নেল বললেন, পুলিশ পরে। আগে ঝন্টুবাবুকে দরকার।

অমরজিৎ সিংহের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। উনি কর্নেলের কাছে আসছিলেন। কর্নেল নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথমে তাঁকে মগনলালের ছবি দেখালেন। অমরজিৎ বললেন, এর ছবি

কোথায় তুললেন? এর নাম মগনলাল। সাংঘাতিক লোক। পুলিশও একে সমীহ করে চলে। এখানকার এক রাজনৈতিক নেতার ডান হাত।

কর্নেল এবার ব্যাঙবাবুর ছবিটা বের করে বললেন, এঁকে চেনেন কি?

অমরজিৎ অবাক হয়ে বললেন, আরে। ইনি তো কমলবাবু, ডাক্তার। মাধবের বাবা।

কর্নেল হাসলেন। এঁর হরিদ্বারে থাকার কথা। অথচ ইনি এখানেই আছেন। এঁর আরেকটা নাম ব্যাঙবাবু। জানেন কি?

অ্যাঁ? বলে অমরজিৎ নড়ে উঠলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়ছে। ছোটবেলায় আমরা ওঁকে ব্যাঙবাবু বলে আড়ালে ঠাট্টা করতুম। ব্যাঙের মতো হাঁটাচলা দেখে এ পাড়ায় অনেকেই কমলজেঠুকে ব্যাঙ ডাক্তার বলতেন বটে।...

সাত

অমরজিৎ সিংহকে কর্নেল আর কোনও কথা খুলে বললেন না। তাঁর সব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শুধু বললেন, যথাসময়ে জানতে পারবেন। এবার বলুন আমার কাছে কী বিশেষ কারণে যাচ্ছিলেন?

অমরজিৎ ওরফে ঝন্টুবাবু বললেন, বনবিহারী থানার হাজত থেকে দিদিকে খবর পাঠিয়েছিল। দিদি যায়নি। আমি গিয়েছিলুম। ফেরার পথে বাংলোয় আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনেছিলুম আপনারা বেরিয়েছেন।

কর্নেল বললেন, তা হলে বংলোয় চলুন। সেখানে বসে কথা হবে।

ঝন্টুবাবু বললেন, থাক। দেখা যখন হয়ে গেল, তখন কথাটা বলে চলে যাই। দিদি মন্টুর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে। তাকে একা রেখে এসেছি। তো কথাটা বলি। থানার হাজতে আমাকে দেখে বনবিহারী কান্নাকাটি করে বলল, দাদা, আমাকে বাঁচান। বিনা দোষে আমাকে পুলিশ ধরেছে। ওকে জিগ্যেস করলুম, তুমি নাম বদলেছ কেন? বনবিহারী বলল, আগের দুষ্কর্মের জন্য সে অনুতপ্ত। সৎ ভাবে বেঁচে থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করার জন্য কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে সে নাম বদলেছে। এখানে এসেছিল সে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে অর্ডার সংগ্রহ করতে মাধব তাকে আশ্বাস দিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে সময়মতো সে দেখা করতে যেত।

গড়ের জঙ্গলে কেন গিয়েছিল বলেনি?

বনবিহারী বলল যে, আগে এখানে এসে সে কিচনির গপ্প শুনেছিল। এখন তার লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস আছে। তাই সাহস করে সেখানে কিচনি খুঁজতে গিয়েছিল। কিচনির দেখা সে পেয়েছে। চারটে গুলি ছুঁড়েও কিচনিকে সে মারতে পারেনি। আমি বললুম, এ বয়সে ছেলেমানুষি এখনও যায়নি তোমার? মন্টুর সাংঘাতিক মৃত্যুর কথাও তাকে বললুম। তা শুনে সে বলল, এর প্রতিশোধ সে নেবে, যদি আমি তাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়াতে পারি। তখন ওকে জিগ্যেস করলুম, কে মন্টুকে খুন করেছে সে কি জানে? বনবিহারী বলল যে, সে জানে। কিন্তু তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনলে তবেই সে সব কথা খুলে বলবে। আমি পুলিশকে অনেক অনুরোধ করলুম। জামিন হতে চাইলুম। কিন্তু পুলিশ তাকে ছাড়বে না। মন্টুর খুনের অন্যতম আসামী করা হয়েছে তাকে। তাই কাল তাকে কোর্টে তুলবে।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু বলেছে সে?

ঝন্টুবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ। একটা কথা বনবিহারী বলছিল। কথাটা বুঝতে পারিনি। কে নাকি তাকে ঠকিয়েছে। তার অনেকগুলো টাকা গচ্চা গেছে। এর প্রতিশোধ সে নেব। পুলিশ তার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে দিল না। তাই এ ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করার সুযোগ পাইনি।

ঠিক আছে। আপনি বাড়ি যান। আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখি, কী করা যায়।

ঝন্টুবাবু চলে গেলেন। আমরা বাংলোতে ফিরলুম। কর্নেল বললেন, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো। আমি মিঃ পাণ্ডেকে টেলিফোনে পাই কি না দেখি।

দোতলায় আমাদের রুমের দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ফিরে এসে বললেন, রমেশ পাণ্ডে আসছেন। একসঙ্গে কফি খাওয়া যাবে।

তখনও দিনের আলো ছিল। কর্নেল বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গল দেখতে-দেখতে বললেন, মগনলাল আবার শিকারে বেরিয়েছে। সেই টাঁড় জমিতে লালঘুঘুর ঝাঁক খুঁজছে। লালঘুঘুর মাংস নাকি সুস্বাদু। কিন্তু ওই পাখিগুলো মগনলালের চেয়ে ধূর্ত। ব্যস। উড়ে পালিয়ে গেল। ওকে গুলি ছোঁড়ার সুযোগই দিল না। মগললাল হতাশ হয়ে কাঁচা রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে।

বললুম, ব্যাঙবাবুর কাছে যাচ্ছে।

কর্নেল বাইনোকুলার রেখে হাসলেন। সিংহ রাজাদের বিগ্রহ উদ্ধারে ব্যাঙবাবু মগনলালের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ সিংহ রাজাদের কর্মচারী ছিলেন। কাজেই ওই বিগ্রহের কথা বংশপরম্পরায় তাঁদের জানার কথা।

আমার ধারণা, বিগ্রহ গড়ের জঙ্গলেই লুকানো আছে।

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, বিগ্রহের রত্নালঙ্কার বিক্রি করেছিলেন ঝন্টুবাবুর ঠাকুরদার বাবা। তাই বলে বিগ্রহ লুকিয়ে রাখবেন কেন? লুকিয়ে রাখার পিছনে কোনও যুক্তি নেই।

তাহলে সেই বিগ্রহ গেল কোথায়?

এর সোজা এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তর হল, বিগ্রহ ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছিল।

চিন্তা করো জয়ন্ত। ঝন্টুবাবুর ঠাকুরদার বাবা দুর্গপ্রাসাদ ছেড়ে চলে এসেছিলেন কেন? মেরামতের অভাবে প্রাসাদ ভেঙে পড়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ঝন্টুবাবুর ঠাকুরদার পক্ষে ওই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বিগ্রহ উদ্ধারের ক্ষমতা ছিল না। অমন বিশাল ধ্বংসস্তূপ—কল্পনা করো, তখন জঙ্গল গজায়নি। শুধু বিশাল দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ একটা টিলার মতো উঁচু হয়ে আছে। তা সরাতে প্রচুর টাকা খরচ করে মজুর লাগানো দরকার। শুধু মজুর নয়, দক্ষ উৎখননকর্মী এবং ক্রেন দরকার ছিল। গত একশ বছরে প্রাকৃতিক কারণে গড়ের জঙ্গলের সেই চেহারা বদলে গেছে। বিশেষ করে ১৯৩৪ সালে বিহারে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল। তার ফলে ভূপ্রকৃতির গঠন বদলে গিয়েছিল। সেই ভূমিকম্পের চিহ্ন গড়ের জঙ্গলে লক্ষ করেছি। এখানে থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত এলাকা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ধারিয়া নদীর গতিপথ বদলে গিয়েছিল।

কর্নেল ভূমিকম্প নিয়ে সমানে বকবক করতে থাকলেন। ওঁর এই স্বভাব। আমি অসমতল সবুজ প্রান্তর আর দিগন্তে পর্বমালার দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছিলুম। এসময় দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল বললেন, কম ইন।

দরজা ভেজানো ছিল। দেখলুম, সাদা পোশাকে রমেশ পাণ্ডে ঢুকলেন। কর্নেল বললেন, এখানে চলে আসুন মিঃ পাণ্ডে। এখনই কফি এসে যাবে নিচে বলে এসেছি ছ'টা নাগাদ কফি পাঠাতে।

পাণ্ডে এসে ব্যালকনিতে বসলেন। একটু হেসে বললেন, আপনি অফসেট বা লেজার প্রিন্টিং প্রেসের কথা জিগ্যেস করছিলেন। আমাদের সোর্স খবর দিয়েছে, পাটনায় মাধববাবুর শ্যালক চন্দ্রনাথবাবুর ওই প্রেস আছে।

কর্নেল পকেট থেকে খামে ভরা সেই ন'খানা চিঠি বের করে দিলেন পাণ্ডেকে। পাণ্ডে চিঠিগুলো দেখে বললেন, বাংলা বলতে পারলেও আমি পড়তে পারি না। এগুলো কী?

কর্নেল তাঁকে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানিয়ে একটা চিঠি পড়ে শোনালেন।

পাণ্ডে বললেন, ঝন্টুবাবু আমাদের জানাননি। তাহলে এতদিনে ধরে ফেলতুম কে ওঁর গেটে চিঠি রেখে আসে। শুনেছি, ঝন্টুবাবু সাহসী লোক।

কর্নেল বললেন, ঝুঁকি নিতে সাহস পাননি। দিদি এবং পাগল ভাইয়ের কথা ভেবেই চুপচাপ ছিলেন। লক্ষ করুন, এগুলো সবই পুরু আর্টপেপারে ছাপা ফটো কপি। প্রত্যেকটা মূল একটা চিঠির কপি।

আপনার কি সন্দেহ মাধববাবুর শ্যালকের প্রেসে এগুলো ছাপা হয়েছে?

সম্ভবত।

পাণ্ডে হাসলেন। আপনি নিশ্চয় কোনও বিশেষ কারণে এই সন্দেহ করেছেন?

হ্যাঁ। ব্যাঙবাবুর কারণে।

রমেশ পাণ্ডে অবাক হয়ে বললেন, ব্যাঙবাবু? তাকে কি আপনি চেনেন?

কর্নেল জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এইসময় রামপ্রসাদ ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স আনল। সে চলে গেলে কর্নেলের ইশারায় আমি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলুম।

কর্নেল তিনটে কাপে কফি ঢালতে-ঢালতে বললেন, ব্যাঙবাবু গড়ের জঙ্গলে ডেরা পেতেছে। সম্ভবত ওখানে উত্তর-পশ্চিম কোণে কোনও একটা ঘর এখনও টিকে আছে। সেই ঘরে ব্যাঙবাবু মাঝে-মাঝে গিয়ে থাকে, তা স্পষ্ট। আজ দুপুরে ব্যাঙবাবুর এই ছবিটা টেলিলেন্সের সাহায্যে দূর থেকে তুলেছি। আপনি দেখুন। তারপর বলুন মগলনালকে আপনি আপনার প্রয়োজনে গ্রেফতার করতে পারবেন কি না। কারণ, সে নাকি স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতার ডানহাত।

ছবিটা দেখে পাণ্ডে বললেন, বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মগনলালের সঙ্গে ব্যাঙবাবু তাহলে যোগাযোগ করেছে?

হ্যাঁ। দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। পরে মগললালের ছবিও তুলেছি। এই দেখুন।

রমেশ পাণ্ডে একটু চুপ করে থেকে বললেন, মগললালকে গ্রেফতার করা যায়। কিন্তু তাকে আটকে রাখা যাবে না। তবে—কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, বলুন?

রমেশ পাণ্ডে গলার ভেতর থেকে বলেন, মগনলালের গার্জেনের এক প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। তিনিও প্রভাবশালী। তিনি একবার বলেছিলেন, কোনও সুযোগে এনকাউন্টারে মগনলালের মৃত্যু ঘটানো হোক। কিন্তু আমার বিবেকে বাধে। যদি সত্যিই কোনও সাংঘাতিক ক্রাইমের সময় সুযোগ মেলে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু মগললাল ধূর্ত লোক। সে ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা আদায় করে। অনেক সময় ডাকাতিও করে। কিন্তু ঘটনাস্থলে সে থাকে না। তার নামে তিনটে খুনের অভিযোগ আছে। তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। যদি খুনের সময় মুখোমুখি তাকে পেতুম, গুলি করে মেরে এনকাউন্টারে মৃত্যু বলে চালানো যেত।

কর্নেল বললেন, না-না। নরহত্যার প্রশ্ন ওঠে না। অপরাধীর আইনমাফিক বিচারই কাম্য। আমি আপনাকে কখনই এমন প্রস্তাব দেব না। বরং এমন কাজের বিরোধিতাই করব। যাই হোক, ব্যাঙবাবুর গড়ের জঙ্গলে মাঝে-মাঝে গিয়ে থাকার উদ্দেশ্য, সিংহ রাজাদের পূর্বপুরুষের বিগ্রহ খুঁজে বের করে তা বিদেশে পাচার করা। বিগ্রহ ওই জঙ্গলে ধ্বংসস্তূপের তলায় কোথাও চাপা পড়েছিল।

রমেশ পাণ্ডে বললেন, আমার মতে আজ রাতেই গড়ের জঙ্গলে হানা দিয়ে ব্যাঙবাবুকে গ্রেফতার করা দরকার। তার নামে এখনও হুলিয়া ঝুলছে।

কর্নেল হাসলেন। অথচ ব্যাঙবাবু মাথায় পরচুলা আর মুখে নকল দাড়ি পরে দিব্যি ধার্মিক সাধুসন্তের চেহারা নিয়ে সিংহগড়ে বাস করেন। মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রায় বাইরে যাবার ছলে গড়ের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকেন। বিগ্রহের খোঁজে সেখানে ব্যর্থ খোঁড়াখুঁড়ি করেন। তবে না। রাতে ওঁর ডেরা যদি খুঁজে পান আপনারা, জঙ্গলে উনি গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাবেন। তার চেয়ে কাল সকাল

সাতটা নাগাদ হানা দেওয়াই ভালো। প্রচুর ফোর্স দরকার। সারা গড়ের জঙ্গল ঘিরে রেখে হানা দিতে হবে।

পাণ্ডে চিন্তিত মুখে বললেন, সিংহগড় থানায় বেশি ফোর্স নেই। এস. পি. সায়েবকে বলে ধরমপুরা আর লখিমপুরা থানা থেকে ফোর্স আনাতে হবে। রাতের মধ্যে ফোর্স আসা দরকার। শুধু একটু অসুবিধা। গড়ের জঙ্গলের একটা রাফ ম্যাপ আগে তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

আমি করেছি। বলে কর্নেল ঘরে ঢুকে কিটব্যাগ থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ নিয়ে এলেন। সেটা খুলে বললেন, স্মৃতি থেকে আজ দুপুরে খাওয়ার পর এটা এঁকেছি। একেবারে নির্ভুল না হলেও মোটামুটি একটা রাফ ম্যাপ এটা। যেখানে মন্টুবাবুর বডি পাওয়া গিয়েছিল এবং যেখানে তাঁকে হত্যা কর হয়েছিল, সেই জায়গাটা ম্যাপে আছে।

পাণ্ডে ম্যাপটা দেখতে-দেখতে বললেন, পশ্চিমেও একটা প্রবেশ পথ দেখছি।

হ্যাঁ। ও পথে আদিবাসীরা শিকারে যায়।

আচ্ছা কর্নেল সরকার, যেখানে মন্টুবাবুকে খুন করা হয়েছিল, ওখানে স্টার চিহ্ন কেন?

ওখানে একটা পাঁচকোনা পাথর আছে লক্ষ্য করেননি? একটা কোনা অবশ্য ভাঙা।

না। লক্ষ করিনি। আসলে তখন খুনের মোটিভ নিয়েই চিন্তাভাবনা করছিলুম।

ওটা মোগল আমলের চবুতরার ছাদের অনুকরণে তৈরি। এমনভাবে ধসে পড়েছে যে কোণগুলো সহজে চোখে পড়ে না। ঘাস আর ঝোপে ঢাকা পড়েছে কিছুটা।

রমেশ পাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন। তা হলে চলি। ফিরে গিয়ে এস. পি. সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা রাতের মধ্যেই করে ফেলছি। আপনি এবং জয়ন্তবাবু আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

কর্নেল তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন, আর একটা কথা মিঃ পাণ্ডে। এস. পি. সায়েবকে বলবেন, কাল পাটনার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের অধিকর্তাকে বলে শিগগির একটা টিম পাঠানোর ব্যবস্থা যেন করেন।

কেন বলুন তো?

ধ্বংসস্তূপে চাপাপড়া প্রাচীন একটি বিগ্রহ তাঁরা উদ্ধার করে জাদুঘরে রাখবেন।

পাণ্ডে অবাক হয়ে বললেন, বিগ্রহের খোঁজ তাহলে আপনি পেয়েছেন।

হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু আগে ব্যাঙবাবুকে পাকড়াও করার পর বিগ্রহ উদ্ধারের কাজ শুরু হবে। দেরি করা চলবে না।

রমেশ পাণ্ডে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল দরজা বন্ধ করে এসে বসলেন। বললুম, বিগ্রহের খোঁজ কী করে পেলেন আপনি?

কর্নেল চাপা গলায় সুর ধরে আওড়ালেন—

পঞ্চভূতে ভূত নাই
মুখে ঈশ ভজ ভাই
তালব্য শ পালিয়ে গেলে
যোগফলে অঙ্ক মেলে
হর হর বোমভোলা
খাও ভাই গুড়ছোলা...

বললুম, হেঁয়ালি না করে খুলে বলুন না কর্নেল।

কর্নেল বললেন, আপাতদৃষ্টে উদ্ভট মনে হলেও খুব সোজা একটা ছড়া। এতে একটা গোপন তথ্য লুকানো আছে। তাই ঝন্টুবাবুর ঠাকুরমা দুই ভাইকে ছোটবেলায় এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

বড় হয়ে ছড়া থেকে তথ্য বের করে তাঁর পৌত্রেরা যদি বংশের প্রাচীন বিগ্রহ উদ্ধার করতে পারে, তাই তিনি এই ছড়া বানিয়েছিলেন।

বলে কর্নেল পকেট থেকে তাঁর খুদে নোট বই বের করে ডট পেনে লিখতে শুরু করলেন। প্রথম লাইনে বলা পঞ্চভূতে ভূত নাই। তার মানে ভূত বাদ দিলে রইল 'পঞ্চ'। এবার, মুখে ঈশ তালব্য শ গেলে রইল 'ঈ'। পরের লাইন যোগফলে অঙ্ক মেলে। তার মানে মুখের সঙ্গে ঈ যোগ করলে দাঁড়ায় 'মুখী'। এবার দাঁড়াল 'পঞ্চমুখী'। হর হর ব্যোমভোলা বলতে 'শিব'। 'পঞ্চমুখী শিব'। গুড় আর ছোলা তাঁর প্রসাদ। শিবের পঞ্চমুখী বিগ্রহ বহু জায়গায় আছে। পঞ্চমুখী শিব ছিলেন সিংহ রাজাদের আসল গৃহদেবতা। তাঁর মন্দিরের ছাদও ছিল পঞ্চমুখী। আমরা যে পাথরটা গড়ের জঙ্গলে দেখছি, তা সেই মন্দিরের ছাদ। তার তলায় বিগ্রহ চাপা পড়ে গিয়েছিল। ঝন্টুবাবুর ঠাকুরদার সেই জনবল বা অর্থবল ছিল না যে তিনি খোঁড়াখুঁড়ি করে বিগ্রহ উদ্ধার করেন। কারণ, শুধু খুঁড়লে তো চলবে না। ওই পাঁচকোনা পাথরের ছাদটা সরাতে হবে। ক্রেনের সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভবই নয়। তবে হ্যাঁ, সুড়ঙ্গ খুঁড়েও বিগ্রহ উদ্ধার করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সঠিক স্থান না জানলে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে লাভ নেই। তাছাড়া ওপরে ভারী পাথর। সুড়ঙ্গ ধ্বসে পড়ারও ঝুঁকি ছিল।

বললুম, আমার ধারণা মন্টুবাবু হয়তো জানতেন, কোনদিকে সুড়ঙ্গ খুঁড়লে বিগ্রহ পাওয়া যাবে।

কর্নেল আস্তে বললেন, ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে। 'ডেডস্ ডু নট স্পিক'। মৃতেরা কথা বলে না। কাজেই ওটা নিছক ধারণাই থেকে যাচ্ছে।

কিন্তু মন্টুবাবু পড়ে গিয়ে পাগল হয়েছিলেন কেন। এটা খুব অদ্ভুত না?

কর্নেল বললেন, কমল বোস ওরফে ব্যাঙবাবু ছিলেন হাতুড়ে ডাক্তার। তাঁকে জেরা করলে জানা যেতে পারে, ছেলে মাধবের সাহায্যে মন্টুবাবুকে গড়ের জঙ্গলে ডেকে এনে কথা আদায় করার জন্য কোনও নার্ভের ওষুধ জোর করে খাইয়ে দিয়েছিলেন কি না? নার্ভকে আচ্ছন্ন করে সাইকিয়াট্রিস্টরা রোগীর অবচেতন মনের গোপন কথা জেনে নেন। ব্যাঙবাবু হাতুড়ে ডাক্তার। হিতে বিপরীত হয়ে গিয়েছিল। দেখা যাক, আগে অপারেশন সাকসেসফুল হোক। তখন জানা যাবে।...

উপসংহার

কর্নেলের তাড়ায় ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হয়েছিল। বেড-টি খেয়ে সেজেগুজে বেরুতে-বেরুতে সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। কর্নেল বাংলোর লন পেরিয়ে গিয়ে বললেন, রমেশ পাণ্ডে বুদ্ধিমান। বাইনোকুলারে তন্নতন্ন খুঁজে গড়ের জঙ্গলের দিকে পুলিশ দেখতে পাইনি। ক্যামোফ্লেজ করে ঝোপের আড়ালে পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করেছেন। অবশ্য একটা পুলিশ ভ্যান কাঁচা রাস্তা দিয়ে আদিবাসীদের গ্রামের দিকে যেতে দেখেছি।

কর্নেল যথারীতি তাঁর প্রাতঃভ্রমণের ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন। কিছুক্ষণ পরে টাঁড় জমিটায় উঠে আমরা গড়ের পূর্বদিকে পৌছুলুম। কোথাও পুলিশের টিকিও দেখতে পেলুম না।

ধসে পড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে গড়ে ঢোকার সময় কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। কোনও পাখি শিস দিচ্ছিল। কর্নেল পালটা শিস দিলেন। তারপর একটা ধ্বংস্তূপের আড়ালে রমেশ পাণ্ডের টুপি দেখা গেল। উনি পুলিশের পোশাক পরে অপারেশনে এসেছেন। কর্নেল তাঁকে ইশারায় অনুসরণ করতে বললেন।

তারপর উনি বাইনোকুলারে চারদিকে খুঁটিয়ে দেখে এগিয়ে গেলেন উত্তর-পশ্চিম কোণে। উঁচুতে সেই ভাঙা ঘরের অংশটা লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে একটুকরো পাথরের ওপর দাঁড়ালেন।

শরৎকালের সকালবেলার রোদে সবুজ বৃক্ষলতা গুল্মে শিশির ঝলমল করছিল। পাখির ডাকে মুখর চারদিক। এমন একটা সুন্দর নিসর্গে মনোরম সকালবেলায় কমল বোস ওরফে ব্যাঙবাবুকে পাকড়াও করার জন্য অভিযান বড় বিসদৃশ ঘটনা।

হঠাৎ কর্নেল আমার উদ্দেশে একটু চড়া গলায় বললেন, জয়ন্ত সর্বনাশ। ওই বুঝি সেই সাংঘাতিক জলের পেত্নি কিচনি। ওরে বাবা! কী ভয়ঙ্কর চেহারা।

আমি কিছু দেখতে না পেলেও আঁতকে উঠে বললুম, পালান কর্নেল। শিগগির পালিয়ে যাই আসুন।

কর্নেল বললেন, ওরে বাবা। কিচনিটা যে আমাদের দিকেই আসছে।

এতক্ষণে একটা ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে বিদঘুটে জন্তুটাকে বেরুতে দেখলুম। প্রকাণ্ড একটা কালো ব্যাঙের মতো দেখতে। মুখটাও ব্যাঙের মতো। কিন্তু ধারালো সাদা দাঁত আছে মুখে। চোখ দুটো লাল এবং ঠেলে বেরিয়ে আসছে। থপথপ শব্দে জন্তুটা হাঁ করে এগিয়ে এল। তারপর গলার ভেতর ভূতুড়ে শব্দ করতে থাকল।

আমি পিছিয়ে গিয়ে প্রাণের দায়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, মিঃ পাণ্ডে। মিঃ পাণ্ডে।

জন্তুটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর দেখলুম, কর্নেল পাথর থেকে লাফ দিয়ে নেমে জন্তুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করলেন। ততক্ষণে রমেশ পাণ্ডে এবং একদল সশস্ত্র পুলিশ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কর্নেলের বিশাল শরীরের তলায় পড়ে জন্তুটা হাত-পা ছুড়ছিল। কর্নেল ডাকলেন, মিঃ পাণ্ডে। চলে আসুন এখানে। ব্যাঙবাবুকে কিচনির খোলস ছাড়িয়ে বের করুন এবার।

পাণ্ডের আদেশে কনস্টেবলরা গিয়ে জন্তুটাকে মাটিতে ঠেসে ধরল। কর্নেল বললেন, আর কী ব্যাঙবাবু। এবার খোলস ছেড়ে দেখা দিন। কালো রেক্সিনে ফোম ভরে সেলাই করে খাসা কিচনির খোলস তৈরি করেছেন।

এবার মানুষের গলায় কিচনিটা কেঁদে উঠল, বেরুচ্ছি সার। আমাকে একটু উঠে বসতে দিন।

কনস্টেবলরা হাসতে-হাসতে তাকে টেনে ওঠাল। পিঠের দিকে চেন টেনে কর্নেল খোলস থেকে একটা লোককে বের করলেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, এ কী! এ তো ব্যাঙবাবু নয়।

আমি অবাক। লোকটা রোগা। মালকোঁচা করে ধুতি পরা। গায়ে একটা নোংরা গেঞ্জি। সে হাউমাউ করে কেঁদে বলল, বাবু আমাকে এই পোশাক পরিয়ে আপনাদের ভয় দেখাতে বলে রাতেই চলে গেছেন সার। আমি জানতুম না কিছু।

পাণ্ডে তার পেটে বেটনের গুঁতো মেরে বললেন, তুই কে?

আজ্ঞে হুজুর, আমার নাম কেষ্টচরণ। আমি বাবুর বাড়িতে কাজ করি।

তোর বাবুর নাম কী?

আজ্ঞে, কমলবাবু। আগে ডাক্তারি করতেন। তিনিই।

পাণ্ডে বললেন, সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। এই ব্যাটা! তোর বাবু কোথায় গেছে?

কাল সন্ধ্যাবেলা মগললালকে দিয়ে বাবু খবর পাঠিয়েছিলেন আমাকে। আমি তাই এসেছিলুম হুজুর। বাবু বলে গেছেন, বাড়ি যাচ্ছেন। সন্ধ্যার পর আসবেন। দিনে কেউ এলে যেন ভয় দেখাই।

কর্নেল বললেন, মিঃ পাণ্ডে। এই কেষ্টচরণকে নিয়ে আপনি এখনই কমলবাবুর বাড়ি সার্চ করুন। একজন অফিসার আর জনা দুই কনস্টেবল আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। ব্যাঙবাবুর ডেরা আমি দেখতে পেয়েছি। সেখানে গিয়ে দেখা দরকার, ওটা চোরাই বিগ্রহ লুকিয়ে রাখার ঘাঁটি কি না।

কেষ্টচরণ হাঁউমাউ করে আরও কী বলার চেষ্টা করছিল। বলার সুযোগ দিলেন না পাণ্ডে। দ্রুত চলে গেলেন।

একটু পরে একজন পুলিশ অফিসার এবং দুজন সশস্ত্র কনস্টেবল এল। কর্নেল তাদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। আমি পেছনে হাঁটছিলাম। হঠাৎ গুলির শব্দ হল এবং একজন কনস্টেবল আর্তনাদ করে পড়ে গেল। দেখলুম, তার কাঁধে রক্ত ঝরছে।

পুলিশ অফিসার তখনই হুইসেল বাজালেন এবং অর্ডার দিলেন, ফায়ার।

সকালের গড়ের জঙ্গল বারুদের কটু গন্ধ আর পাখিদের আর্ত চিৎকারে ভরে গেল। এতক্ষণে দেখলুম, একটু উঁচুতে একটা গুহার মতো ফোকর লক্ষ করে ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ছে পুলিশ। সেই ফোকর থেকে আধখানা ঝুলে আছে একজন মানুষের রক্তাক্ত দেহ।

কর্নেল চিৎকার করে বললেন, স্টপ। স্টপ ইট। মগনলাল ইজ ডেড। তাহলে মগনলালকে ডেরায় পাহারায় রেখেই ব্যাঙবাবু বাড়ি গিয়েছিলেন। সেই ডেরায় পৌঁছে দেখি, ওটা একটা টিকে থাকা পাথরের ঘর। শেষদিকে একটা ঘুলঘুলি আছে। মগললালের মৃতদেহ পুলিশ টেনে নিচে নামাল। তার বন্দুকটা নিচে পড়ে গিয়েছিল।

ঘরটার ভেতর একটা কাঠের বাক্সে কয়েকটা বিগ্রহ পাওয়া গেল। একপাশে একটা খাটিয়ায় বিছানা পাতা এবং মশারি খাটানো আছে। কুঁজো ভর্তি জল, গ্লাস এবং একটা টিফিন কেরিয়ার দেখতে পেলুন। কর্নেল কাঠের বাক্স থেকে বিগ্রহগুলো দেখতে-দেখতে তলা থেকে একটা কালো রঙের রিভলভার এবং একটা বুলেটের বাক্স তুলে নিলেন। পুলিশ অফিসারটি বললেন, আরে, ব্যাঙবাবুকা ফায়ার আর্মস?

কর্নেল বললেন, ইয়ে হ্যায় মার্ডার উইপন। পাগল মন্টুবাবুকো মার ডালা ব্যাঙবাবু।

কিছুক্ষণ পরে আমরা গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গেলুম। পুলিশবাহিনীর একটা অংশ সেখানে থেকে গেল আহত কনস্টেবলকে তার সহকর্মীরা ততক্ষণে নিয়ে গেছে পুলিশ ভ্যানের কাছে। পাণ্ডের আয়োজন এতক্ষণে চোখে পড়ল। গড়ের জঙ্গলের চারদিক থেকে দলে-দলে পুলিশ মার্চ করে চলেছে সিংহগড়ের দিকে।...

বাংলোয় ফিরে ব্রেকফাস্ট করার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়েছেন, এমনসময় রামপ্রসাদ এসে জানাল, কর্নিলসাবকা ফোন।

শুনেই কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পনেরো পরে উনি ফিরে এসে হাসিমুখে বললেন, ব্যাঙবাবু ধরা পড়েছে। মাথায় পরচুলা, মুখে নকল গোঁফ দাড়ি, পরনে গেরুয়া লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে সাইকেল রিকশাতে সবে উঠে বসেছে, রমেশ পাণ্ডে গিয়ে হাজির। চল, এবার সিংহবাড়ি যাওয়া যাক। ঝন্টুবাবু এবং তাঁর দিদিকে খবরটা দিলে ওঁরা মনে একটু শান্তি পাবেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বনবিহারী কবুল করেছে, বিগ্রহ কেনার জন্য সে মাধববাবুর বাবাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙবাবু তাকে ঠকিয়েছেন। সে রাগে ফুঁসছে। কিন্তু কিছু করার নেই তার।...

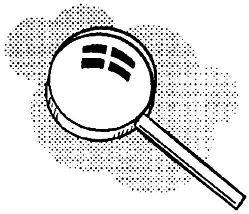

রাজা সলোমনের আংটি

এক

জুলাই মাসের সেই সন্ধ্যাবেলায় টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কর্নেলের ড্রয়িংরুমে পাঁপরভাজা আর কফি খেতে-খেতে আড্ডাটা দারুণ জমে উঠেছিল।

তবে আড্ডার যা নিয়ম। এক কথা থেকে অন্য কথা, তা থেকে আরেক কথা—এইভাবেই চলে। এটুকু মনে পড়ছে, দাড়ি রাখার সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল। রিটায়ার্ড জজসায়েব অনঙ্গমোহন হাটিই কর্নেলের দাড়ি নিয়ে কথাটা তুলেছিলেন। তারপর সেই আলোচনা এক মুখ থেকে অন্যমুখে ঘুরতে ঘুরতে কেনই বা বাদুড়ে এসে পৌঁছুল বুঝতে পারলুম না। মিঃ হাটিকে বলতে শুনলুম,—বহরমপুরে যখন আমি সেশান জাজ ছিলুম, তখন কোর্টরুমের জানালা দিয়ে দেখতে পেতুম, একটা প্রকাণ্ড গাছে অসংখ্য বাদুড় ঝুলে আছে। আচ্ছা কর্নেলসায়েব! আপনি তো বিজ্ঞ মানুষ। বাদুড় কেন উলটো হয়ে ঝুলে থাকে বলুন তো?

কর্নেলকে মুখ খোলার সুযোগ দিলেন না হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট মহেন্দ্র ঘোষদস্তিদার। তিনি বললেন,—বইয়ে পড়েছিলুম, ব্রাজিলে আমাজন নদীর অববাহিকায় দুর্গম জঙ্গলে রক্তচোষা বাদুড় আছে। তাদের পাল্লায় পড়লে রক্ষা নেই। মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ত চুষতে-চুষতে—

ডাক্তার তারক চক্রবর্তী তাঁর কথার ওপর কথা চাপিয়ে দিলেন,—ভ্যাম্পায়ার! বুঝলেন? ওদের বলা হয় ভ্যাম্পায়ার। সেই সূত্রেই তো ইউরোপে ড্রাকুলার গপ্প লিখেছিলেন—কে যেন?

ব্রাম স্ট্রোকার। —মিঃ হাটি বলে উঠলেন। তবে আমাদের দেশেও রক্তচোষা ডাইনিদের গল্প আছে। আমি মালদায় থাকার সময় আদিবাসীরা একজন বৃদ্ধাকে ডাইনি বলে মেরে ফেলেছিল। পুলিশ দশজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের গণ্ডগোলে ন'জনকে খালাস দিয়েছিলুম। একজনকে ফাঁসি।

ডাঃ চক্রবর্তী চমকে উঠে বললেন,—ফাঁসি? তারপর? তারপর?

—তারপর আর কী? হাইকোর্ট আমার রায়ে সম্মতি দিয়েছিল। লোকটার ফাঁসি হয়েছিল।

মিঃ ঘোষদস্তিদার হাসতে-হাসতে বললেন,—মিঃ হাটি! আপনি যা-ই বলুন, এ কেসে গণ্ডগোল আছে। আমি আসামীর পক্ষে দাঁড়ালে বেচারা মারা পড়ত না। চার্জশিটে দশজনের যদি নাম থাকে, তাহলে—

মিঃ হাটি কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে ডাঃ চক্রবর্তী সকৌতুকে বললেন,—ফাঁসিতে মৃত্যুও তো অপঘাতে মৃত্যু। আর অপঘাতে মৃত্যু হলে মানুষ প্রেত হয়ে যায়। ভূতও বলতে পারেন। সেই লোকটা ভূতপ্রেত হয়ে আপনাকে জ্বালাতন করেনি তো?

মিঃ হাটি গম্ভীরমুখে বললেন,—ভূতপ্রেতে আমার কস্মিনকালে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! আমার জজিয়তি-জীবনে ওই একবারই একজনের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলুম। বাকি জীবনে যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই একটা অদ্ভুত ঘটনা বারবার ঘটেছে। নাঃ, স্বপ্ন নয়! প্রত্যক্ষ ঘটনা। রাতবিরেতে জানালার ওধারে—ওঃ! এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

তাঁর চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে আড্ডায় কেমন একটা গা-ছমছম করা আবেশ সঞ্চারিত হল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার অর্থাৎ আমাদের প্রিয় হালদারমশাই সম্ভবত রহস্যের গন্ধ পেয়ে গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন,—কী দেখছিলেন স্যার?

একটা লোক। সেই ফাঁসির আসামীর মতো চেহারা। বেঁটে। কালো কুচকুচে গায়ের রং। এক মাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল।—মিঃ হাটি শ্বাস ছেড়ে বললেন : ফাঁসির হুকুম শুনে লোকটা যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল, সেইরকম দৃষ্টি। আদিম হিংস্র দুটি চোখ! শুতে যাওয়ার সময় কোনও-কোনও রাত্রে ইচ্ছে করেই খোলা জানালার বাইরে তাকাতুম! অমনই তাকে দেখতে পেতুম। তার চেয়ে সাংঘাতিক দৃশ্য, তার গলায় মোম দেওয়া সেই দড়ির ফাঁস! একদিন তো আমি আমার লাইসেন্সড পিস্তল থেকে গুলি ছুড়েছিলুম। হইচই পড়ে গিয়েছিল। আমার আর্দালি রহিম বখ্‌শ্‌ টর্চের আলোয় কোয়ার্টারের চৌহদ্দি তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল। কাকেও দেখতে পায়নি। তারপর বদলি হয়ে গেলুম কৃষ্ণনগর। সেখানেও কোনও-কোনও রাত্রে একই দৃশ্য!

হালদারমশাই বললেন,—এখনও কি আপনি তারে দেখতে পান?

গোয়েন্দাপ্রবরকে নিরাশ করে মিঃ হাটি বললেন,—নাঃ! রিটায়ার করার পর আর তাকে দেখতে পাইনি।

মিঃ ঘোষদস্তিদার বললেন,—হ্যালুসিনেশন! বলছিলুম না আপনার ওই কেসে গণ্ডগোল ছিল! আপনার অবচেতন মন নিশ্চয় ফাঁসির হুকুমের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাই—

ডাঃ চক্রবর্তী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন,—ভূতপ্রেত নিয়ে যতই জোক করি না কেন, ভূতপ্রেত আছে। বছর চল্লিশ আগের কথা। তখন আমি ডাক্তারি পড়ছি। লাশকাটা ঘরে মড়া কাটাকুটি করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অস্থি ইত্যাদি বিষয়ে হাতেকলমে শিখতে হচ্ছে। একদিন দুপুরবেলায় পথদুর্ঘটনায় মৃত একটা লোকের টাটকা লাশ মর্গে এসেছে। সেই আমলের বিখ্যাত অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, আমি তাঁর ছাত্র—প্রোফেসর চার্লস গ্রোভার পুলিশের অনুরোধে দ্রুত শবব্যবচ্ছেদের দায়িত্ব নিলেন। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র। তাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আসলে এক বড়লোকের লাশ। তো ডাঃ গ্রোভার নিজে ব্যবচ্ছেদ করছেন এবং তাঁর নির্দেশমতো আমিও ছুরি চালাচ্ছি। বললে বিশ্বাস করবেন না, হঠাৎ লাশের মুখে হাসি ফুটে উঠল। নিঃশব্দ হাসি। কিন্তু সে কী বীভৎস হাসি, তা বলে বোঝাতে পারব না। ডাঃ গ্রোভারের মতো মানুষও স্তম্ভিত হয়ে বুকে ক্রস আঁকলেন। তারপর লাশের মুখটা অন্যপাশে কাত করে দিলেন। কী সর্বনাশ! আবার মুখটা চিত হল। আবার সেই হাসি! নিঃশব্দে ভয়ঙ্কর হাসি। আর চোখদুটো—ওঃ!

অ্যাডভোকেট মিঃ ঘোষদস্তিদার বলে উঠলেন,—হ্যালুসিনেশন! হ্যালুসিনেশন!

সেই সময় ডোরবেল বেজে উঠল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

এদিকে যেন ডোরবেলের শব্দেই জমাটি আড্ডা নিমেষে ভণ্ডুল। ডাঃ চক্রবর্তী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ওঠা যাক। বৃষ্টিটা বেড়ে গেলে সমস্যা হবে। চেম্বারে এতক্ষণ রুগিরা এসে ভিড় করেছে।

মিঃ ঘোষদস্তিদার ঘড়ি দেখে বললেন,—এই রে! পৌনে আটটা বাজে। সাড়ে সাতটায় একজন বড়ো মক্কেল আসবার কথা ছিল। কর্নেলসায়েব! চলি। কথায়-কথায় দেরি করে ফেলেছি!

মিঃ হাটিও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—আমার মিসেস চটে যাবেন। আটটায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একখানে যাওয়ার কথা। চলি কর্নেলসায়েব!

ওঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর হালদারমশাই বাঁকা হেসে চাপা স্বরে বললেন,—অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক ঠিক কইছেন। হ্যালুসিনেশন! চোখের ভুল। চৌতিরিশ বৎসর পুলিশলাইফে রাত্রে ঘুরছি। কিছু দেখি নাই।

এতক্ষণে ষষ্ঠীচরণ এক ভদ্রলোককে নিয়ে এল। বুঝলুম, তিন-তিনজন প্রকাণ্ড মানুষের ফাঁক গলিয়ে ষষ্ঠীচরণ এঁকে আনতে অসুবিধেয় পড়েছিল।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের বেশি বলেই মনে হল। পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে গায়ের রঙ। মাথায় কাঁচাপাকা সিঁথিকরা লম্বা ঘাড় ছুঁইছুঁই চুল। খাড়া নাক। বসা চোয়াল চোখদুটি

টানাটানা। গোঁফদাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। পরনে ছাইরঙা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর অগোছাল ধুতি। তাঁর কাঁধে একটা কাপড়ের নকশাদার ব্যাগ। বাঁ-হাতের আঙুলে একটা পলাবসানো সোনার আংটি। তিনি করজোড়ে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—বসতে পারি?

কর্নেল তাঁকে লক্ষ করছিলেন। বললেন,—অবশ্যই।

ভদ্রলোক সোফায় বিনীতভাবে বসে বললেন,—আমার নাম গোপীমোহন হাজরা। আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম। পেয়েছেন কি না জানি না। তবে ওই যে একটা কথা আছে, গরজ বড়ো বালাই!

আপনার চিঠি আমি পেয়েছি।—বলে কর্নেল আবার হাঁক দিলেন : কফি!

অমন একটা জমজমাট আড্ডা ভেঙে দিতেই যেন এই লোকটির আবির্ভাব! আমার একটু খারাপ লাগছিল। হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালুম। তিনি যেন আমার মনের কথা টের পেয়ে কেমন চোখে ভদ্রলোককে দেখে নিলেন এবং নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন।

গোপীমোহনবাবু আমাদের দেখে নিয়ে বললেন,—কথাবার্তা একেবারে প্রাইভেট কর্নেলসায়েব।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই! উনি বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং প্রাক্তন পুলিশ অফিসার মিঃ কে. কে. হালদার। আর এর নাম জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। দুজনই আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আমার কোনও কথা এই দু'জনের কাছে গোপন থাকে না। তার চেয়ে বড়ো কথা, আপনার নিজের মুখে আপনার সমস্যার কথা এঁরা শুনলে আমার এবং আপনার দুজনকারই সুবিধে হবে। আপনি তিন-তিনটি মস্তিষ্কের সাহায্য পাবেন। তাই না?

গোপীমোহনবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—আপনার যা অভিরুচি কর্নেলসায়েব! তবে ওই যে কথাটা বললুম। গরজ বড়ো বালাই! গ্রাম্য কথা। কিন্তু কথাটা কত খাঁটি তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। তাই আপনার উত্তরের অপেক্ষায় বসে না থেকে এই বৃষ্টিবাদলার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি। বিপদের ওপর বিপদ। ট্রেন লেট করার জন্য সন্ধ্যা সাতটায় শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেছি। তিন ঘণ্টা লেট! ফেরার ট্রেন রাত বারোটা পঁচিশে। আর লেট না করলে পাক্কা তিন ঘণ্টার জার্নি! কী সাংঘাতিক রিস্ক নিয়ে এসেছি বুঝুন!

—বুঝলুম। ফেরার ট্রেন লেট না করলে আপনি রাত তিনটে পঁচিশে বা সাড়ে তিনটে নাগাদ স্টেশনে নামবেন। তারপর ভোরবেলা পর্যন্ত আপনাকে স্টেশনেই বসে থাকতে হবে। সম্ভবত ছোটো স্টেশন। শেষ রাত্রে নিঝুম খাঁ-খাঁ অবস্থা। আপনি প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করবেন, এই বুঝি সেই ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা এসে আপনার সামনে দাঁড়াল!

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। কর্নেলের কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—প্রেতাত্মা। চলতি কথায় ভূত।

হাসতে-হাসতে বললুম,—আবার সেই ভূত?

গোপীমোহনবাবু আমার প্রতি যেন ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, —আপনারা কলকাতার মানুষ। আমাদের মতো গ্রামের মানুষদের সমস্যার কথা বুঝবেন না।

এবার গম্ভীর হয়ে বললুম,—সমস্যাটা খুলে বললে নিশ্চয়ই বুঝব। দরকার মনে করলে খবরের কাগজেও লিখব। তবে সমস্যাটা ভূতপ্রেতসংক্রান্ত হলে অন্য কথা।

গোপীমোহনবাবু তেমনই ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বললেন,—আপনারা কলকাতায় সারাক্ষণ ভিড়ের মধ্যে থাকেন। চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পান। রাতবিরেতে আলো জ্বলে। পাখা ঘোরে। কিন্তু গ্রামের অবস্থা এর উলটো।

—কেন, আজকাল গ্রামেও তো বিদ্যুৎ গেছে। এই তো সেদিন বিদ্যুৎ দফতরের কর্তারা সাংবাদিকদের জানালেন, বিদ্যুৎ এত উদ্বৃত্ত যে—

থামুন স্যার! —গোপীমোহনবাবু চটে গেলেন : বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হলে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের অমন অবস্থা কেন? পাখা ঘোরে, হাওয়া পাই না। পাঁচশো পাওয়ারের বালব জ্বালালেও আলো থাকে না। হ্যারিকেন জ্বালতে হয়। তার ওপর বিদ্যুতের ভূতুড়ে লুকোচুরি খেলা। এই একটুখানি ঝিলিক দিয়েই চলে গেল তো গেল। ব্যস! আর দেখা নেই। সত্যিকার ভূতের উপদ্রবের চেয়ে গ্রামের বিদ্যুৎ আরও সাংঘাতিক ভূতুড়ে। এ সব লিখবেন কাগজে? পারবেন না। লিখবেন না। কারণ এ সব কথা লিখলে কাগজে বছরে লাখ-লাখ টাকার বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবে।

কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। এই সময় ষষ্ঠীচরণ কফি নিয়ে এল। কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে বললেন,—কফি খান গোপীমোহনবাবু!

গোপীমোহন হাজরা কফির কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন,—আসলে আমার সমস্যার সঙ্গে আমাদের ঝাঁপুইহাটির বিদ্যুতের সমস্যাও জড়িয়ে গেছে। রাতবিরেতে উজ্জ্বল আলো থাকলে ব্যাটাচ্ছেলের কখনও আমার ঘরের জানালায় উঁকি মারার সাধ্য ছিল না।

কর্নেল বললেন,—আপনার চিঠিতে ভূতের উপদ্রবের কথা ছিল। কিন্তু আমি তো ভূতের ওঝা নই। তাই উত্তর দেব কি না ঠিক করতে পারিনি। যাই হোক, আপনি নিজে এসে গেছেন যখন, তখন ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন। শোনা যাক। তারপর দেখব কী করতে পারি।

গোপীমোহনবাবু বললেন,—চিঠিতে তো সব কথা খুলে লেখা যায় না। তা ছাড়া ঝাঁপুইহাটির সাবেক জমিদারবংশের কর্মচারী আমি। কর্তাবাবুর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তাঁর কথামতো চিঠিটি লিখেছিলুম।

—আপনার কর্তাবাবুর নাম কী?

—আজ্ঞে, জয়কুমার রায়চৌধুরি। বয়স প্রায় আশি বছর হবে। কিন্তু এখনও শক্তসমর্থ মানুষ।

—আপনি কি তাঁর বাড়িতেই থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ে-টিয়ে করিনি। কর্তাবাবুর অন্নজলে বেঁচে আছি। মাইনেও যা পাই, দিব্যি চলে যায়।

—আপনার কাজটা কী?

—বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করা। কর্তাবাবুর জরুরি চিঠিপত্র লিখে দেওয়া। আমাকে ওঁর বাড়ির কেয়ারটেকার-কাম-প্রাইভেট সেক্রেটারিও বলতে পারেন। ওঁর জমিজমার ব্যাপারটা দেখাশুনা করে একজন। তার নাম কালীনাথ। সে এক পালোয়ান।

—কর্তাবাবুর স্ত্রী বা সন্তানাদি—

গোপীমোহনবাবু কর্নেলের কথার ওপর বললেন,—স্ত্রী বেঁচে নেই। দুই ছেলে আর এক মেয়ে। বড়ো ছেলে থাকে আমেরিকায়। ছোটো ছেলে বোম্বেতে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। কর্তাবাবু একা থাকেন। কখনও-সখনও ছেলেমেয়ে, জামাই আর নাতি-নাতনিরা আসে। তাদের পাড়াগাঁয়ে থাকতে ভালো লাগে না। কিন্তু কর্তাবাবু পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে এক পা নড়তে চান না। বলতে গেলে, আমরাই ওঁর ফ্যামিলির লোক। আমি, কালীনাথ, ভোলা আর তার বউ শৈল—তাছাড়া আছে রান্নার ঠাকুর নকুল মুখুজ্জে। মুখুজ্জেমশাই গৃহদেবতা রুদ্রদেবের সেবায়েত।

হালদারমশাই শুনতে-শুনতে এবার ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলেন,—ভূতের কথাটা আগে কইয়া ফ্যালেন মশয়! ভূত আপনার কী প্রবলেম বাধাইছে, তা-ই কন।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—গোপীমোহনবাবু ভূতটাকে ব্যাটাচ্ছেলে বলছিলেন। তার মানে সে পুরুষভূত। হ্যাঁ—এবার আপনি সেই ব্যাটাচ্ছেলে ভূতটার কথা বলুন!

গোপীমোহনবাবু বললেন,—ব্যাটাচ্ছেলে বলছি কি কম দুঃখে? বেঁচে থাকলে আপনি-আজ্ঞে করতুম। রাতবিরেতে আমার ঘরের জানালার ধারে এসে সে ফিসফিস করে বলে, আংটি দে! আংটি দে! কীসের আংটি, কার আংটি তা-ও তো জানি না।

—আহা, ভূতটা বেঁচে থাকতে অর্থাৎ জীবদ্দশায় কে ছিল, তাই বলুন!

—কর্তাবাবুর দূরসম্পর্কের এক ভাইপো ফেলারাম মুখুজ্জে। গতবছর এমনি বর্ষার রাত্রে কর্তাবাবু তাকে খুব বকাবকি করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা জানি না। কর্তাবাবু এমন রাশভারী মানুষ! বেশি প্রশ্ন করলে খুব চটে যান। তো সেই রাত্রে কখন ফেলারাম মুখুজ্জে বাড়ির পিছনে বটগাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করেছিলেন। ভোরবেলা শৈল ব্যাপারটা দেখে চ্যাঁচামেচি করেছিল। ওঃ! সে এক বীভৎস দৃশ্য!

—ফেলারামবাবুর ভূত প্রথম কবে আপনার জানালায় এসে উঁকি মেরেছিল?

—গতমাসে। তারিখ মনে নেই। খেয়েদেয়ে এসে শুতে যাচ্ছি, হঠাৎ লোডশেডিং! বিদ্যুৎ থাকলেও যে পাখার হাওয়ায় সুখে ঘুমুব, তার জো নেই। তবে পাখা ঘুরছে দেখলেও মনের শান্তি। তো প্রচণ্ড গরম। তাই ভাবলুম, বারান্দায় মাদুর পেতে শোব। মাদুর নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, হঠাৎ উত্তরের জানালার ওদিকে কে ফিসফিস করে বলে উঠল, আংটি দে! আংটি দে! আংটি দে! আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ। বিদ্যুৎ না হয় ক'বছর আগে এসেছে। আগে তো অন্ধকারে দিব্যি দেখতে পেতুম।

অধীর হয়ে গোন্দোপ্রবর বললেন,—ফেলারামকে জানালার ধারে দেখলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অন্ধকারে?

—ওই যে বললুম পাড়াগাঁয়ের মানুষ। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলুম সেই ফেলারাম মুখুজ্জেই বটে! গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো আছে।

—তখন আপনি কী করলেন?

—তখন তো আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছি। ভয়ে দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে কালীনাথকে ডাকলুম। সে সাহসী। গায়ের জোরও আছে। সে দৌড়ে এসে আমার কথা শুনেই লাঠি আর টর্চ নিয়ে বাড়ির পিছনে চলে গেল। কাকেও দেখতে পেল না। সে হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল। তার কয়েকদিন পরে রাত্রিবেলা আবার জানালার ধারে ফেলারাম! গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো। আর ফিসফিস করে সেই একই কথা : আংটি দে! আংটি দে! আংটি দে!

কর্নেল বললেন,—আপনার কর্তাবাবুর এ ব্যাপারে কী বক্তব্য?

গোপীমোহনবাবু গম্ভীরমুখে বললেন,—প্রথম-প্রথম উনি আমার কথা গ্রাহ্য করেননি। একদিন উনি নিচের তলায় লাইব্রেরিঘরে বসে বই পড়ছেন। তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। উনি রোজ রাত্রে লাইব্রেরিতে এসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বই পড়ে তারপর দোতালায় শুতে যান। উনি যতক্ষণ লাইব্রেরিতে থাকেন, ততক্ষণ কালীনাথ বারান্দায় দরজার কাছে বসে থাকে। তো হঠাৎ কর্তাবাবু শুনতে পেলেন, জানালার ওধারে কে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলছে—আংটি দে! আংটি দে! আংটি দে! কর্তাবাবু তাকিয়ে দেখেন গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো সেই ফেলারাম মুখুজ্জে! কর্তাবাবু রাগী মানুষ। কালীনাথকে ডেকে বললেন, ধর তো ফেলারামকে! হতভাগা মরে গিয়েও জ্বালাচ্ছে! কালীনাথ খুঁজে হন্যে হয়ে ফিরে এসেছিল।

—তাহলে আপনি আর আপনার কর্তাবাবু ছাড়া আর কেউ ফেলারাম মুখুজ্জের ভূতকে দেখতে পায়নি?

—আজ্ঞে না। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে ব্যাটাচ্ছেলের সাহস বেড়ে গেছে। গত সপ্তাহে তিনরাত্রে তিনবার সে দেখা দিয়েছে। আংটি চেয়েছে। বুদ্ধি করে টর্চ রেখেছিলুম। টর্চ জ্বাললে কিন্তু তাকে দেখতে পাইনে। টর্চ যেই নিভিয়ে দিই, অমনি সে আংটি চায়। এর মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে। বলবেন, ওঝা ডাকিনি কেন? ডেকেছিলুম। নকুল মুখুজ্জেমশাই ধার্মিক মানুষ। শান্তিস্বস্ত্যয়ন যাগযজ্ঞ সব করেছেন। এমনকী কদিন আগে গয়ায় গিয়ে ফেলারামের পিণ্ডিও দিয়ে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! ব্যাটাচ্ছেলে এখনও জ্বালাচ্ছে রাত-বিরেতে। গতরাত্রেও একই কাণ্ড। অগত্যা আপনার কাছে ছুটে আসতেই হল।

—তাহলে আমি কী করতে পারি বলে আপনার ধারণা?

গোপীমোহনবাবু চাপাগলায় বললেন,—কর্তাবাবু খুলে কিছু বলছেন না। তবে উনিই কার কাছে আপনার পরিচয় পেয়ে আমাকে চিঠি লিখতে বলেছিলেন। আজ ওঁর হুকুমেই এসেছি। ওই আংটির ব্যাপারটা নিয়ে আমারও বেজায় খটকা বেধেছে।

হালদারমশাই এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—হুঃ! খটকা আমারও বাধছে। ভূত আংটি চায় ক্যান? কর্নেলস্যার! হেভি মিস্ট্রি!

দুই

এর পর বরাবর যা হয়ে থাকে তা-ই হল। 'হেভি মিস্ট্রি'-র প্রবল আকর্ষণে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার ঝাঁপুইহাটির গোপীমোহন হাজরার সঙ্গী হলেন। গোপীমোহনবাবুর এতে আপত্তির কারণ ছিল না! বরং রাতের ট্রেনজার্নিতে এমন একজন গোয়েন্দা সঙ্গী পেয়ে তিনি খুশিই হলেন। দু'জনের মধ্যে কথা হল, গোপীমোহনবাবু শেয়ালদা স্টেশনে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হালদারমশাইয়ের জন্য অপেক্ষা করবেন। হালদারমশাই তাঁর বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।

তবে গোপীমোহনবাবু কর্নেলকেও ঝাঁপুইহাটি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে গেলেন। কর্নেল তাঁকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দিলেন, তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে পৌঁছুবেন।

প্রথমে গোয়েন্দাপ্রবর, তার কিছুক্ষণ পরে গোপীমোহনবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল চোখবুজে চুপচাপ চুরুট টানছিলেন। হঠাৎ চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে বললেন,—মাই গুডনেস। ঝাঁপুইহাটির জয়কুমার রায়চৌধুরির কথা আমাকে বাবুগঞ্জের হেমেন্দ্র সিংহরায় বলেছিলেন! গত বছর শীতকালে আমি হেমেনবাবুর আমন্ত্রণে বাবুগঞ্জ গিয়েছিলুম। ওখানে গঙ্গার অববাহিকায় বিস্তীর্ণ একটা জলাভূমি আছে। সেখানে শীতের সময় অসংখ্য প্রজাতির হাঁস আর সারস আসে। একটা জলটুঙ্গির অদ্ভুত নাম! ডাকিনীতলা।

বললুম,—ডাকিনীতলা? সর্বনাশ! ডাকিনী মানেই তো ডাইনি। দেখেছিলেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—ডাইনিরা নাকি কামরূপ কামাখ্যা থেকে আস্ত উড়ন্ত গাছে চেপে রাতবিরেতে নানা দেশে যায়। জায়গা পছন্দ হলে সেখানেই গাছটা মূলসুদ্ধ বসিয়ে দেয়। আর সেই গাছের ডালে বসে চুল এলিয়ে বাতাসের সুরে গান গায়। সেই গাছ সে-এলাকার লোকে চিনতে পারে না! বাবুগঞ্জের লোকেরা জলাভূমির একটা জলটুঙ্গিতে গাছটাকে চিনতে পারেনি। আমার মতে, ওটা ডাইনির স্পেসশিপ বা প্লেনও বলতে পারো! হয়তো কলকব্জা বিগড়ে যায় বলেই ডাইনি বেচারিকে সেখানেই ল্যান্ড করতে হয়। যাই হোক, এবার ডাইনি বেচারির দুঃখটা বুঝতে চেষ্টা করো ডার্লিং! সে আসলে নির্বাসিত। দেশে ফেরার উপায় নেই। তাই সে গান গায় না। কাঁদে। বাতাসের সুরে কাঁদে। এই হল আমার সিদ্ধান্ত।

কর্নেলের কথা শুনে হেসে আমি অস্থির। বললুম,—ঠিক বলেছেন। ডাকিনীতলার ডাইনিবেচারির কান্না আপনি তাহলে শুনেছিলেন?

—শুনেছিলুম বইকী। বিস্তীর্ণ বিলে নৌকোয় চেপে পাখিদের ছবি তুলে ফিরে আসছিলুম। সঙ্গে হেমেনবাবু। তাঁরও আমার মতো পাখিটাখির বাতিক আছে। ডাকিনীতলার জলটুঙ্গির পাশ দিয়ে আসবার সময় কুয়াশামেশানো জ্যোৎস্নায় মনে হল, কে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হেমেনবাবুকে কথাটা বললুম। উনি বললেন, হ্যাঁ। এই শব্দটা কীসের, তা বোঝা যায় না। আমি বহুবার শব্দটা শুনেছি!

—সত্যি?

—নির্ভেজাল সত্যি ডার্লিং! বড়ো রহস্যময় সেই সুরেলা কান্না। নৌকোর মাঝিরা বিড়বিড় করে 'জয় মা জয় মা' বলতে-বলতে নৌকোর গতি বাড়িয়ে দিল।

—আশ্চর্য! আপনি ওই রহস্যটার সমাধান করে এলেন না?

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মিটিমিটি হেসে বললেন,—সমাধান করেছিলুম বইকী!

—কীসের শব্দ ওটা?

—বললুম তো! নির্বাসিতা ডাইনির সুর ধরে কান্না! বেহালার সুরের মতো!

—ভ্যাট! আপনি রসিকতা করছেন।

কর্নেল হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন,—রসিকতা নয়। ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিটার দক্ষিণে বাবুগঞ্জ। দূরত্ব প্রায় আধ কিলোমিটার। আর ওটার পূর্বে ঝাঁপুইহাটি। ঝাঁপুইহাটির দূরত্ব জলটুঙ্গিটা থেকে বড়োজোর তিনশো মিটার। ঝাঁপুইহাটির একটা অংশ লেজের মতো এগিয়ে এসেছে বিলের দিকে। তো হেমেনবাবুকে কথাপ্রসঙ্গে আমি সেই রহস্যময় শব্দটাকে বেহালার সুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলুম। তখন উনি বলেছিলেন, ঝাঁপুইহাটির জমিদারবংশে বরাবর গানবাজনার চর্চা ছিল। এখন ওদের বংশে যিনি আছেন, তাঁর নাম জয়কুমার রায়চৌধুরী। এখন আর তিনি গানবাজনার চর্চা করেন না। তবে ওঁর একজন কর্মচারীকে এখনও বহাল রেখেছেন। কারণ কর্মচারীটি চমৎকার বেহালা বাজায়। হেমেনবাবুর এইসব কথা শুনে বলেছিলুম, সেই বেহালাবাদক কর্মচারী ডাকিনীতলায় রাতবিরেতে এসে বেহালা বাজান সম্ভবত। হেমেনবাবু হেসে অস্থির হয়ে বলেছিলেন, কিছু বলা যায় না। লোকটা বড্ড খেয়ালি স্বভাবের। সবসময় সঙ্গে বেহালা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কর্নেল চুপ করলে বললুম,—তাহলে ডাকিনীতলায় শীতের রাতে সেই লোকটাই গিয়ে বেহালা বাজায়? কেন বাজায়?

কর্নেল আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। চুরুট কামড়ে ধরে চোখ বুজলেন। সুতোর মতো নীল আঁকাবাঁকা ধোঁয়া তাঁর টাকের ওপর এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকল।

ফের বললুম,—লোকটার মাথায় তাহলে ছিট আছে!

কর্নেল একেবারে ধ্যানমগ্ন বেগতিক দেখে আমি উঠতে যাচ্ছি। ডোরবেল বাজল। অমনি কর্নেলের ধ্যানভঙ্গ হল। যথারীতি হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

কর্নেলের এই ড্রয়িংরুমে বাইরে থেকে ঢুকতে হলে ছোটো একটা ওয়েটিং রুমের মতো ঘর পেরিয়ে আসতে হয়। কর্নেল কোনও কাজে ব্যস্ত থাকলে ষষ্ঠীকে বলে রাখেন,—কেউ এলে ও ঘরে কিছুক্ষণ বসতে বলবি। সময়মতো আমি ডেকে নেব।

ডোরবেল বাজার কিছুক্ষণ পরে ষষ্ঠীচরণ ড্রয়িংরুমে ঢুকে একগাল হেসে বলল,—কী কাণ্ড দেখুন বাবামশাই! একেবারে মাথাখারাপ যাকে বলে!

কর্নেল বললেন,—সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন?

—আজ্ঞে। ও-ঘরে উনি—

—বেহালা রেখেছিলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে বাবামশাই! মজার লোক। দরজা খুললুম। উনি আমার পাশ কাটিয়ে ঢুকে চেয়ার থেকে নীল কাপড়ের মোড়কে ঢাকা কী একটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন। এখন মনে হচ্ছে, ওটা বেহালাই বটে! আশ্চর্য ব্যাপার! একটা কথাও বললেন না। আমি তো হতভম্ব! পরে মনে পড়ল, প্রথমবার আসবার সময় ওটা ওঁর হাতে দেখেছিলুম।

ষষ্ঠীচরণ হাসতে-হাসতে ভেতরে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে বললুম,—গোপীমোহন হাজরা তা হলে ঝাঁপুইহাটি জমিদারবাড়ির সেই বেহালা-বাজিয়ে কর্মচারী?

কর্নেল বললেন,—গোপীমোহনবাবুর সিঁথিকরা লম্বা চুল দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক সম্ভবত যাত্রা-থিয়েটার বা গানবাজনা করেন। গ্রাম্য বেহালা-বাজিয়েদের ওই রকম টিপিক্যাল চেহারা হয়। হেমেনবাবুর কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝেছিলুম, গোপীমোহন হাজরাই সেই বেহালা-বাজিয়ে কর্মচারী। কিন্তু ওঁর সঙ্গে বেহালা দেখিনি বলে দ্বিধায় পড়েছিলুম।

বললুম,—কিন্তু এই ভদ্রলোক শীতের রাতে ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিতে বেহালা বাজাতে যান কেন?

কর্নেল হাসলেন,—হয়তো ডাকিনীতলার মাহাত্ম্য বজায় রাখতে চান। রাতবিরেতে বিলে জেলেরা মাছ ধরতে যায়। তাদের মুখে-মুখে মাহাত্ম্য রটে যায় ডাকিনীর। পুজোআচ্চা হয়। মানতের পয়সাকড়ি পড়ে।

—বুঝলুম। কিন্তু ওঁর কথাবার্তা-হাভভাবে কোনও পাগলামির লক্ষণ তো দেখলুম না। দিব্যি সুস্থ মানুষ। টনটনে জ্ঞানবুদ্ধি।

—হ্যাঁ। তবে গলায় দড়ির ফাঁস এঁটে ফেলারাম মুখুজ্জের ভূত কেন ওঁকে আংটি চাইতে আসে, এটাই অদ্ভুত। দেখা যাক, হালদারমশাই কতটা এগোতে পারেন।

—আপনি কবে ঝাঁপুইহাটি যাবেন তাহলে?

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—তোমার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠেছে, তা টের পাচ্ছি। অপেক্ষা করে থাকো! সময় হলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

সত্যি বলতে কী, আংটি চাইতে আসা গলায়-দড়ি ভূতটার চেয়ে জলটুঙ্গিতে ডাকিনীতলায় গোপীমোহন হাজরার রাতবিরেতে বেহালা বাজানোর ব্যাপারটা আমার কৌতূহল তীব্র করেছিল। পরদিন বিকেলে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে বসে পুলিশসূত্রে পাওয়া দুটো ডাকাতি আর তিনটে ছিনতাই কেসের খবর লিখছি, সেই সময় কর্নেলের টেলিফোন এল,—জয়ন্ত! বাড়ি ফেরার পথে আমার ডেরায় এসো!

বললুম,—ঝাঁপুইহাটিতে নতুন কিছু কি ঘটেছে?

—ফোনে কিছু বলা যাবে না। রাখছি।

তাড়াতাড়ি খবরগুলো লিখে চিফ রিপোর্টারের টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লুম। তখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। কাল সন্ধ্যার মতোই টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। ইলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়ির লনে একপাশে গাড়ি রেখে যখন তিনতলায় তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের ডোরবেলের সুইচ টিপলুম, তখন উত্তেজনায় আমার আঙুল কাঁপছিল।

ষষ্ঠীচরণ দরজা খুলে মুচকি হেসে চাপাস্বরে বলল,—টিকটিকিবাবুর অবস্থা দেখুনগে দাদাবাবু!

সে হালদারমশাইকে আড়ালে টিকটিকিবাবু বলে। দ্রুত ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখলুম, হালদারমশাই মাথার মাঝখানে একটা পট্টি বেঁধে বসে আছেন। বললুম,—কী সর্বনাশ! আপনার মাথায় ব্যান্ডেজ কেন হালদারমশাই?

হালদারমশাই বিমর্ষমুখে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—তেমন কিছু না। কোন ব্যাটায় ঢিল ছুড়ছিল। একখান ঢিল আইয়া মাথায় পড়ল।

—কবে? কখন?

—আইজ দুপুরবেলায়।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ছড়ায় আছে না? 'ঠিক দুপ্পুর বেলা/ভূত মারে ঢেলা।'

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—ভূত না। মাইনষের কাম। জমিদারবাড়িতে লাঞ্চ খাইয়া বাড়ির আশপাশ দেখতে বারাইছিলাম। গ্রামের শেষদিকটায় বাড়ি। পশ্চিমদিকে ঝোপ-জঙ্গল। হাঁটতে-হাঁটতে কতকদূর যাইয়া দেখি ব্যাবাক জল। আমাগো পূর্ববঙ্গের মতো বিশাল বিল। একটা ঝাঁকড়া গাবগাছের তলায় খাড়াইয়া ছিলাম। হঠাৎ ঢিল পড়তে থাকল। রিভলভার রেডি ছিল। কইলাম, গুলি করুম। অমনি একখান ঢিল আইয়া মাথার মধ্যিখান পড়ল। এইটুখানি ঢিল। কিন্তু মাথার চামড়া কাইট্যা রক্ত পড়তে থাকল। রাগে এক রাউন্ড ফায়ার করলাম। তখন ঢিল পড়া বন্ধ হইয়া গেল।

জিগ্যেস করলুম,—গাবগাছের ওপর থেকে কি ঢিল পড়ছিল?

—নাঃ! ঝোপের দিক থেকে ব্যাটায় ঢিল ছুড়ছিল। ফায়ার করছি সেই দিকেই। কিন্তু গুলি লাগলে ট্যার পাইতাম।

—তারপর আপনি জমিদারবাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন?

—হঃ!

—ব্যান্ডেজ কে বেঁধে দিল?

—জয়কুমারবাবুর ফার্স্টএডের বাকসো ছিল। বুড়া হইলে কী হইব? সব কামে উনি পাকা। নিজের হাতে ব্লেডে মাথার এক ইঞ্চি চুল চাঁছলেন। ওষুধ দিয়া ব্যান্ডেজ করলেন। তো উনি কইলেন, বিলের ধারে ওই গাবগাছের খুব বদনাম আছে। দিনদুপুরেও পারতপক্ষে কেউ একা সেখানে যায় না।

—তাহলে ঝাঁপুইহাটি দেখছি খুব রহস্যময় জায়গা। আনাচে-কানাচে ভূতেরা ঘুরে বেড়ায়।

হালদারমশাই খিখি করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—কর্নেলস্যারের লগে পরামর্শ করা দরকার। তাই ফেরত আইলাম। আরও খান দুই মিসটিরিয়াস ঘটনা ঘটছে।

ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে গেল। কর্নেল বললেন,—আবার এক পেয়ালা গরম কফি খান হালদারমশাই! আপনার নার্ভ আরও চাঙ্গা হবে।

খামু? তা আপনি যখন কইতাছেন, খাই। —বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কফির পেয়ালা তুলে অভ্যাসমতো ফুঁ দিয়ে তারপর চুমুক দিলেন।

কর্নেল বললেন,—তাহলে জয়ন্ত, বুঝতেই পারছ ঝাঁপুইহাটি কী সাংঘাতিক জায়গা ঝোপজঙ্গল থেকে আচমকা কেউ ঢিলের বদলে মারাত্মক কিছু ছুড়ে মারলেই বিপদ।

হালদারমশাই বললেন,—কইলাম ঢিল। কিন্তু মাটির ঢিল নয়, পাটকেল কইতে পারেন। অথচ ওখানে ইট-পাটকেল দেখি নাই। নরম মাটি। কোন ব্যাটায় পাটকেল ছুড়ছিল। তার মানে, আমারে সে ফলো করছিল। অনেকগুলি পাটকেল সঙ্গে নিছিল।

কর্নেল বললেন,—আপনি এক রাউন্ড ফায়ার করে ভালোই করেছেন হালদারমশাই। ভূত হোক, আর মানুষ হোক, ফায়ার আর্মসকে ভয় পায়। এবার সে সতর্ক হবে।

বললুম,—আর দুটো রহস্যময় ঘটনা কী হালদারমশাই?

হালদারমশাই বললেন,—জয়কুমারবাবু দোতলার একখান ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করছিলেন। তখন রাত্রি প্রায় চাইরটা। বৃষ্টি ছিল। সবে পোশাক বদলাইয়া চেয়ারে বসছি। আর সেই

পালোয়ান কাশীনাথ মশারি লইয়া ঘরে ঢুকছে। বিদ্যুৎ ছিল লো ভোল্টেজ। উত্তরের জানালা দিয়া হঠাৎ দেখি আবছা আলোতে বৃষ্টির মধ্যে বটতলার দিকে কেউ যাইতাছে। তখনই টর্চের আলো ফোকাস করলাম। এক সেকেন্ডের জন্য চোখে পড়ল, সেই লোকটার গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো।

—তারপর? তারপর?

—তারপর সে ভ্যানিশড। কাশীনাথ কইল, ও কিছু না। কিন্তু আমি ট্রেনজার্নিতে টায়ার্ড। সারা রাত্র জাগছি। ঘুম আসতাছে। তাই শুইয়া পড়লাম।

—আর-একটা রহস্যময় ঘটনা কী?

—আইজ সকাল দশটায় ব্রেকফাস্ট করছিলাম। তারপর সেই বটগাছের কাছে তদন্ত করতে গেলাম। গিয়া দেখি, গাছটার গুঁড়ির উল্টোদিকে কাদার কয়েকখান ছাপ। কেউ গাছে চড়ছিল। রাত্রিবেলা—মানে কাইল শেষরাত্রে যারে দেখছিলাম সেই গাছে চড়ছিল। ক্যান? হেভি মিস্ট্রি।

—হেভি মিস্ট্রি তো বটেই। ভূতের পায়ে কাদা লাগবে আর সেই পায়ের ছাপ গাছের গুঁড়িতে দেখতে পাওয়া যাবে, এ কেমন ভূত?

গোয়েন্দাপ্রবর মাথা নেড়ে বললেন,—ভূত না। মাইনষের কাম। কথাটা আমি জয়কুমারবাবুর লগে আলোচনা করলাম। উনি কইলেন, মাইনষের কামই বটে। কিন্তু উনি স্বচক্ষে যারে জানালার বাইরে দেখছিলেন, সে সেই ফেলারাম ছাড়া আর কেউ না। অথচ চিতায় তার ডেডবডি পুইড়া কবে ছাই হইয়া গেছে। আমি কইলাম, আপনার চোখের ভুল হইতেও পারে। উনি কইলেন, না। উনি নাকি ঠিকই দেখছিলেন।

—আপনি আংটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি?

—করছিলাম। উনি কইলেন, আংটির কথা উনি জানেন না। ফেলারামের আঙুলে উনি আংটি দেখেন নাই। আংটি সে পাবে কোথায়? উড়নচণ্ডী নেশাখোর চালচুলোহীন লোক। দয়া কইর‍্যা বাড়িতে আশ্রয় দিছ্‌লেন। প্রায়ই সে নাকি বাড়ির দামি জিনিসপত্র চুরি করত। কোথায় কারে বেইচ্যা আসত। জয়কুমারবাবুর লাইবেরির কত দামি বই সে চুরি কইর‍্যা কোথায় কারে বেচছিল। তবে এইজন্য উনি ফেলারামবাবুরে শুধু বকাবকি করতেন। তার বেশি কিছু না।

বলে হালদারমশাই কর্নেলের দিকে ঘুরলেন,—কর্নেলস্যার! আমি এবার যাই গিয়া। যা-যা কইছেন, সেই-সেইমতো কাম হইব।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। চোখ না খুলেই বললেন,—হ্যাঁ। আপনি বাসেই সোজা বাবুগঞ্জে চলে যান। আমার চিঠিটা হেমেনবাবুকে দেবেন। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। আজ দুপুরে আমি হেমেনবাবুকে ট্রাংককল করে আমার যাওয়ার কথা বলেছি।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—বাবুগঞ্জে টেলিফোন আছে নাকি?

—বাবুগঞ্জ মফস্বল শহর হয়ে উঠেছে। সেখানেই বিদ্যুতের সাব-স্টেশন, থানা, হাসপাতাল, বাজার। পাশের গ্রাম ঝাঁপুইহাটির বিশেষ উন্নতি হয়নি। তবে রেললাইনের কাছাকাছি গ্রাম ঝাঁপুইহাটিতে একসময় রায়চৌধুরি বংশের জমিদারি দাপট ছিল বলেই স্টেশনের নাম ঝাঁপুইহাটি থেকে গেছে।

হালদারমশাই বললেন,—আমি ঝোঁকের মাথায় অন দা স্পটে গিয়ে ঠিক করি নাই। বাইরে কোথাও শেল্টার লইয়া জমিদারবাড়িতে লক্ষ রাখলে কাম হইত। কর্নেলস্যার! যাই গিয়া।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেইসময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। ...হ্যাঁ। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ...হেমেনবাবু? এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার যাচ্ছেন। ...কী? কী?... সর্বনাশ! কখন?... আপনি কী করে খবর পেলেন?...কে এসেছিল? একটু জোরে বলুন প্লিজ!... হ্যাঁ। আমি মর্নিংয়ে যাব। ... জোরে বলুন! লাইন ডিসটার্ব করছে!... হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

বুঝলুম, লাইন কেটে গেল। ট্রাংককলে এত বেশি কথা বলার সময় পাওয়া যায় না। একটা কথা। এই ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন মফস্বলে এস টি ডি লাইন চালু হয়নি। সে যাই হোক, রিসিভার রেখে কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—গোপীমোহনবাবুর ডেডবডি পাওয়া গেছে বিলের ধারে। একদল জেলে যথারীতি সূর্যাস্তের পর বিলে মাছ ধরতে যাচ্ছিল। তারাই দেখতে পায় গোপীমোহন হাজরা উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মাথার পিছনটা রক্তাক্ত। আততায়ী অতর্কিতে পিছন থেকে শক্ত কিছু দিয়ে মাথার পিছনে আঘাত করেছিল। এর পর জয়কুমারবাবুর বাড়ি থেকে কেউ বাবুগঞ্জ থানায় খবর দিতে গিয়েছিল। সে-ই হেমেন্দ্র সিংহরায়কে খবরটা জানিয়ে গেছে। এর বেশি কিছু বুঝতে পারলুম না।

কর্নেলের কথা শেষ হওয়ার পরই হালদারমশাই কোনও কথা না বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন। আমি হতবাক হয়ে শুনছিলুম। এবার বললুম,—মনে হচ্ছে, হালদারমশাই হঠাৎ চলে এসে ভুল করেছেন। উনি ওখানে থাকলে খুনি যে-ই হোক, সে হতভাগ্য গোপীমোহনবাবুকে মেরে ফেলার ঝুঁকি নিত না।

কর্নেল দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বললেন,—একটা ব্যাপার স্পষ্ট হল। ভূতের ভয় দেখিয়ে কাজ হচ্ছে না এবং কলকাতা থেকে গোয়েন্দা আনা হয়েছে। কাজেই ভূতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

তিন

পরদিন কর্নেল এবং আমি বাসে চেপে বাবুগঞ্জ পৌঁছুলুম। তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। আকাশ মেঘলা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাস থেকে নেমে দু'জনে বাসস্ট্যান্ডের ছাউনির তলায় গিয়ে রেনকোট পরে নিলুম। কর্নেল তাঁর পিঠে আটকানো কিটব্যাগ হাতে নিলেন। আমি একটা বড়সড় নীলরঙের পলিথিন ব্যাগ নিয়েছিলুম। তাতে কর্নেলের কিছু পোশাক-আশাক ঠাসা ছিল।

কর্নেল বললেন,—শর্টকাটে হেমেনবাবুর বাড়ি এখান থেকে তত কিছু দূর নয়। চলো! হেঁটে যাওয়াই ভালো। সাইকেলরিকশোতে যেতে হলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে।

বাসস্ট্যান্ডের চারদিকে বাজার। বৃষ্টির মধ্যেও ছাতি মাথায় মানুষজন ভিড় জমিয়েছে। ট্রাক-বাস-টেম্পো-সাইকেলরিকশোর ভিড়ও যথেষ্ট। জল-কাদাও চারদিকের চত্বরে থকথক করছে। এর মধ্যে দিয়ে কর্নেল পায়ে হেঁটে যেতে চাইছেন শুনে বিব্রত বোধ করছিলুম।

কিন্তু আমরা বাসস্ট্যান্ডের ছাউনি থেকে সবে বেরিয়েছি, একটা মাঝবয়সি লোক এসে সেলাম দিল। কর্নেল অমায়িক হেসে বললেন,—আরে অনিল যে! তুমি বাজারে এসেছিলে বুঝি?

অনিল নামে লোকটা বলল,—না স্যার! বাবু আপনার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন! ওই দেখুন গাড়ি। বাবু বলেছেন, বাস লেট করলে বৃষ্টিতে সায়েব ভিজে যাবেন। চলুন স্যার!

বাসস্ট্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চওড়া রাস্তার পাশে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। আমরা সেই গাড়িতে উঠে বসলুম। অনিলই ড্রাইভার। কিছুদূর দুধারে দোকানপাট। তারপর ডাইনে ঘুরে সুন্দর ছবির মতো একতলা-দোতলা বাড়ি এবং সাজানো ফুলবাগিচা। অনিল বলল,—বাবু এই নিউ টাউনশিপে এক বিঘে জায়গা কিনে রেখেছিলেন। নতুন বাড়ি করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সাবেক বাড়ি ছেড়ে আসতে পারলেন না। জায়গাটা দশলাখ টাকায় বেচে দিয়েছেন।

কর্নেল বললেন,—আমার মতে, ভালোই করেছেন। গঙ্গার ধারে পৈতৃক বাড়ি ফেলে এখানে চলে আসার মানে হয় না। পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তরে বিল। অমন জায়গা ছেড়ে আসতে আছে?

—আজ্ঞে তা অবিশ্যি ঠিক। তবে যা দিনকাল পড়েছে, ওদিকটায় জল-ডাকাতদের বড্ড উপদ্রব। নৌকোয় চেপে ডাকাতরা এসে কতবার হামলা করেছে। বাবুপাড়ার সব পয়সাওয়ালা লোক টাউনের ভেতরদিকে ক্রমে-ক্রমে চলে এসেছেন। শুধু আমার বাবুমশাই সাহস করে আছেন।

—আচ্ছা অনিল, বাসে আসবার সময় শুনলুম, ঝাঁপুইহাটিতে জমিদারবাড়ির কে নাকি খুন হয়েছে?

অনিল এবার বাঁদিকে সংকীর্ণ পিচরাস্তায় গাড়ি ঘোরাল। তারপর বলল,—ও বাড়িতে গৃহদেবতার অভিশাপ লেগেছে স্যার! গতবছর এমনি বর্ষার রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল ফেলারাম মুখুজ্জে। এবার বর্ষায় আবার অপঘাতে মরল গোপীবাবু। আমি দেখতে যেতুম না। আমার বাবুর সঙ্গে জমিদারবাড়ির কর্তাবাবুর মেলামেশা আছে। তাই বাবু আমাকে বললেন, গাড়ি বের করো অনিল। ঝাঁপুইহাটি যাব। বর্ষায় রাস্তার মোরাম কাদা হয়ে গেছে। সাবধানে গাড়ি চালিয়ে গেলুম। গাড়ি জমিদারবাড়ির কাছে রেখে বাবুর সঙ্গে বিলের ধারে গিয়ে দেখি, পুলিশ এসে গেছে। গোপীবাবুর লাশ স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালের লোকেরা। শুনলুম, মাথার পেছনে ডাণ্ডা মেরেছে কেউ। বাবুমশাই থানার অফিসারদের সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বললেন। তারপর ওঁরা জমিদারবাড়ি এসে ঢুকলেন। আমি গাড়িতে বসেছিলুম। গোপীবাবুর মতো লোককে কেউ মেরে ফেলবে এ কথা ভাবাই যায় না।

কর্নেল বললেন,—গোপীবাবু নাকি ভালো বেহালা বাজাতেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। জমিদারবাড়িতে একসময় গানবাজনার চর্চা ছিল। তাছাড়া আমাদের বাবুগঞ্জে ফাংশান হলেই গোপীবাবুকে বেহালা বাজানোর জন্য খাতির করে ডেকে আনা হতো। একটু খামখেয়ালি লোক ছিলেন। হঠাৎ-হঠাৎ চটে যেতেন। কিন্তু বেজায় নিরীহ লোক। তাঁকে কে খুন করল, কেনই বা খুন করল বোঝা যায় না।

—বাসে আসবার সময় শুনছিলুম, জমিদারবাড়িতে নাকি গলায়-দড়ি ভূতের উপদ্রব আছে?

অনিল হাসল,—কথাটা ইদানীং বাবুগঞ্জেও রটেছে স্যার। পাশাপাশি গ্রাম। ঝাঁপুইহাটির লোকেরা বাজারে আসে। কাজেই ঝাঁপুইহাটিতে কিছু ঘটলে বাবুগঞ্জে তার খবর আসতে দেরি হয় না।

—তোমার কী ধারণা?

—আজ্ঞে স্যার, ভূত-পেরেত নিশ্চয় আছে। অপঘাতে মানুষ মরলে তার আত্মার মুক্তি হয় না। কাজেই ফেলারামবাবুর আত্মা জমিদারবাড়ি ছেড়ে যেতে পারছে না।

এবার আর এক বাঁক ঘুরে গঙ্গার বাঁধের সমান্তরাল রাস্তায় কিছুদূর এগিয়ে একটা পুরোনো বিশাল বাড়ির গেটে গাড়ি পৌঁছল। গেটে দারোয়ান ছিল। হর্ন শুনে গেট খুলে দিল। নুড়িবিছানো রাস্তায় এগিয়ে গাড়ি দাঁড়াল পোর্টিকোর তলায়। একজন শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক করজোড়ে নমস্কার করে সহাস্যে বললেন,—সুস্বাগতম!

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,—কী সৌভাগ্য! আপনার এই তরুণ সাংবাদিক বন্ধুর কথা শুনেছিলুম! আসুন জয়ন্তবাবু!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়ন্তের কথা কি আপনাকে আমি বলেছিলুম?

—আপনি বলেননি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা বলেছে।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত! ইনিই হেমেন্দ্রকুমার সিংহরায়। আমি বাইনোকুলারের সাহায্যে পাখি চিনতে পারি। হেমেনবাবু খালি চোখেই চিনে ফেলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ!

হেমেনবাবু হাসতে-হাসতে আমার কাঁধে হাত রেখে হলঘরে ঢুকলেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে বললেন,—দূরদৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি কর্নেলসায়েব। কাল বিকেলেই আমি নৌকো করে বিলে গিয়েছিলুম। জেলেদের মুখে খবর পেয়েছিলুম, স্লুইস গেটের পাশে অশ্বত্থ গাছে নাকি দুটো গগনবেড় পাখি এসেছে। গিয়ে তাদের পাত্তা পেলুম না। ফেরার সময় ডাকিনীতলা জলটুঙ্গির পশ্চিমদিক হয়ে আসছিলুম। তখন সূর্য মেঘের আড়ালে ডুবে গেছে। যে গাব গাছের তলায় গোপীবাবুর লাশ পাওয়া গেছে, সেদিকে আমি নিশ্চয়ই তাকিয়ে থাকব। অথচ গোপীবাবুকে দেখতে পাইনি। দেখতে পেলে উনি বেঁচে যেতেন। আমার হাতে বন্দুক ছিল। অথচ সময়ের হিসেবে দেখছি, ঠিক ওই সময় গোপীবাবু বিলের ধারে এসেছিলেন।

কর্নেল বললেন,—ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিতে যাওয়াই ওঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত।

—ঠিক ধরেছেন। গত শীতকালে আপনার কাছে আভাস পেয়ে আমি মজাটা দেখার জন্যে একদিন ওখানে গিয়ে ওত পেতেছিলুম। হঠাৎ দেখি সন্ধ্যার একটু আগে ঝাঁপুইহাটির চরণজেলে ছোটো একটা নৌকা বেয়ে এল জেলেপাড়ার ঘাট থেকে। তারপর গোপীবাবুকে ডাকিনীতলায় পৌঁছে দিতে গেল। আপনি ঠিকই ধরেছিলেন। রাতবিরেতে গোপীবাবু ডাকিনীতলায় বেহালা বাজাতে যেতেন। চরণ ছিল তাঁর সঙ্গী।

দোতলার বারান্দায় হাঁটতে-হাঁটতে বললুম,—অদ্ভুত ব্যাপার! কেন ওঁরা—

আমার কথার ওপর হেমেনবাবু বললেন,—এই কেনটা আমাকেও বহুদিন জ্বালিয়েছিল। একদিন চরণকে হুমকি দিতেই সে রহস্যটা ফাঁস করে দিল। গোপীবাবুর নাকি গাঁজা খেলে বেহালার হাত ভালো খুলে যায়। রায়চৌধুরিমশাই টের পেলে বিপদ ঘটবে। তাই গোপনে ডাকিনীতলায় গিয়ে গাঁজা খেয়ে মনের সুখে গোপীবাবু বেহালা বাজাতেন। চরণও গাঁজার ভক্ত। মাঝে-মাঝে গাঁজা চটকে ছিলিম সাজিয়ে গোপীবাবুকে দেয় এবং তার প্রসাদ পায়। দুই গেঁজেলের কীর্তি! তবে শুনেছি, গাঁজা খেলে নাকি সত্যিই মনের কনসেন্ট্রেশন আসে। সাধুসন্ন্যাসীরা ধ্যানে বসার আগে সেইজন্য নাকি গাঁজা খান!

উত্তরদিকে শেষপ্রান্তের ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জানালা দিয়ে পশ্চিমে বাঁধের গাছপালার ফাঁকে বর্ষার উত্তরঙ্গ গঙ্গা এবং উত্তরের বিস্তীর্ণ জলাভূমি দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল বাইনোকুলারে একবার দেখে নিয়ে বললেন,—শীতকালের চেয়ে এখন বর্ষাকালেই প্রকৃতির রূপ বেশি খোলে।

হেমেনবাবু বললেন,—প্রকৃতির রূপ পরে দেখবেন। স্নান করতে হলে করে নিন। তারপর খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে বেরুবেন। না— এই অসময়ে কফি নয় কর্নেলসায়েব! আমারও খিদে পেয়েছে। আপনাদের সঙ্গে খাব বলে অপেক্ষা করছিলুম।

এতক্ষণে আমার হালদারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বললুম,—প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদারের খবর কী? ওঁর তো গতরাত্রেই এখানে আসবার কথা।

হেমেনবাবু একটু হেসে বললেন,—উনি গতরাত্রে বারোটা নাগাদ এসেছেন। কাল কর্নেলের ট্রাংককল পেয়ে আমি ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলুম। আজ ভোরে উনি বললেন, ওঁর পক্ষে ঝাঁপুইহাটির কাছাকাছি কোথাও থাকলে সুবিধে হয়। তাই ইরিগেশন বাংলোয় ওঁকে নিয়ে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বাংলোটা বাবুগঞ্জের উত্তর-পূর্ব কোণে শেষপ্রান্তে। নিচেই বিল। চমৎকার জায়গা। ওদিকে ঝাঁপুইহাটিও খুব কাছে। একটা আমবাগান আর জটাবাবার থান পেরিয়ে নাকবরাবর সিধে হাঁটলে জমিদারবাড়ি আরও কাছে। সেচবাংলোয় টেলিফোন আছে। কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করে ওঁর খোজ নিলুম। কেয়ারটেকার শচীন বলল, মিঃ হালদার ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন।

কর্নেলের তো সামরিক জীবনের অভ্যাস। সপ্তাহে দু'দিন অন্তর স্নান করেন। তবে এটা এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। নভেম্বর থেকে মার্চ সপ্তাহে মাত্র একদিন। তবে গরম জলে শরীর স্পঞ্জ করেন মাঝে-মাঝে। আমি একা স্নান করতে বাথরুমে ঢুকলুম।

তারপর পোশাক বদলে বেরিয়ে এসে দেখি, হেমেনবাবুর সঙ্গে কর্নেল কথা বলছেন। হেমেনবাবুর একটা কথা কানে এসেছিল। 'জয়কুমারদা আংটির ব্যাপারটা এতদিনে বুঝতে পেরেছেন।' আমাকে দেখে হেমেনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আমি লাঞ্চের ব্যবস্থা করি। রতন এসে আপনাদের ডেকে নিয়ে যাবে।

তিনি চলে গেলে কর্নেলকে বললুম,—আংটি রহস্য নিয়ে আপনাদের কথা হচ্ছিল। একটু আভাস অন্তত দিন!

কর্নেল হাসলেন,—আংটি এখনও রহস্য হয়েই আছে। জয়কুমারবাবু আংটির ব্যাপারে কী বুঝেছেন, তা হেমেনবাবুকে খুলে বলেননি। কাজেই তোমাকে কোনও আভাস দিতে পারছিনে।

বলে তিনি আমার ব্যাগ থেকে তাঁর একপ্রস্থ পোশাক আর তোয়ালে বের করে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। আমি পশ্চিমের জানালা দিয়ে গাছপালার ফাঁকে গঙ্গা দেখতে থাকলুম।

খাওয়ার ঘর নিচের তলায়। হেমেনবাবুর স্ত্রী সুষমা দেবী আমাদের খুব আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন। কর্নেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। কর্নেলকে সুষমা দেবী পরিহাস করে বললেন, —কর্নেলসায়েব সেবার এসে বলেছিলেন, শিগগির আবার আসব। তো এমন সময় এলেন, বেড়াতে বেরুনোর উপায় নেই। আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টি আর বৃষ্টি! বাবুগঞ্জের ইলিশ খেলেও পোষাত। এবার এখনও ইলিশের দেখা নেই।

হেমেনবাবু বললেন,—এবার বর্ষায় আশ্চর্য ব্যাপার! গঙ্গায় ইলিশ নেই! সেবার কর্নেলসাহেয়বকে শীতের সময়ও ইলিশ খাইয়েছিলুম।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে খাওয়া শেষ হল। দোতলার সেই ঘরে এসে কর্নেল ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে চুরুট ধরালেন। আমি অভ্যাসমতো ভাতঘুমের আশায় বিছানায় শুয়ে পড়লুম। কর্নেল বললেন,—আধঘণ্টা জিরিয়ে নাও। তারপর আমরা বেরুব।

বললুম,—বৃষ্টি তো বন্ধ হয়নি।

—হয়েছে। মেঘও কেটে যাচ্ছে। আশা করি বিকেলে একটুখানি রোদ্দুর ফুটবে।

কর্নেলের কথা সত্যি হল। তিনটে নাগাদ হেমেনবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে যখন চাপলুম, তখন আকাশ প্রায় পরিষ্কার। উজ্জ্বল রোদ্দুরে গাছপালা ঝলমল করছে। অনিল গাড়ি চালাচ্ছিল। বাজার পেরিয়ে সেই ব্যাসস্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে কিছুদুর যাওয়ার পর বাঁদিকে মোরামবিছানো লাল রাস্তায় গাড়ি বাঁক নিল। দুধারে সরকারের বনদফতরের তৈরি নানারকম গাছের জঙ্গল। তারপর ঝাঁপুইহাটি গ্রামে ঢুকল গাড়ি। টালি বা টিনের চালের বাড়ির পাশে ইটের বাড়িও চোখে পড়ল। একখানে সংকীর্ণ গলি রাস্তা দিয়ে ঘুরে অবশেষে উঁচু প্রকাণ্ড এবং জরাজীর্ণ একটা দেউড়ির কাছে গাড়ি থামাল অনিল। আমরা নেমে গেলুম। হেমেনবাবু বললেন,—এখানকার মাটির এই গুণ। শিগগির জল শুষে নেয় বলে তত কাদা হয় না। আজ রাত্রে যদি আর বৃষ্টি না হয়, মাটির রাস্তা শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাবে।

দেউড়ি আছে। কিন্তু কপাট নেই। হাট করে খোলা। অনিল হর্ন বাজিয়েছিল। একটু পরে একজন কালো দানবের মতো মানুষ, পরনে খাটো ধুতি এবং গায়ে ফতুয়া, করজোড়ে একটু ঝুঁকে প্রণাম করে বলল,—আসুন দাদাবাবু! কর্তামশাই আমাকে এখনই বলছিলেন, আপনার বাড়ি গিয়ে খবর নিয়ে আসি। তা ইনি সেই কর্নেলসায়েব? প্রণাম স্যার! আপনাকে দূর থেকে শীতের সময় দাদাবাবুর সঙ্গে নৌকোয় দেখেছিলুম। আসুন! ভেতরে আসুন!

হেমেনবাবু বললেন,—কালীনাথ! গোপীবাবুর বডি দাহ হয়ে গেছে তো?

—আজ্ঞে, সকালে আমরা পাড়ার কজনকে নিয়ে কেষ্টনগরে গিয়েছিলুম। ম্যাটাডোর ভাড়া করে বডি এনে আপনাদের বাবুগঞ্জের শ্মশানঘাটে দাহ করেছি। একটু আগে গঙ্গাস্নান করে ফিরেছি। গোপীদার ভাগ্য দাদাবাবু! শ্মশানে খুব ভিড় হয়েছিল। কতজনে ফুলের মালা দিয়ে ভক্তি জানাল।

—হ্যাঁ। গোপীবাবু জনপ্রিয় ছিলেন। ফাংশানে বা যাত্রা-থিয়েটারে বেহালা বাজাতেন। তো আমাকে একটু খবর দাওনি কেন?

—আজ্ঞে, মাথার ঠিক ছিল না। এখনও নেই। মাথামুন্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সবাই বলছে, খুনি ভুল করে কাকে মারতে কাকে মেরেছে!

বাউন্ডারি ওয়ালের অবস্থাও শোচনীয়। দোতলা প্রাসাদতুল্য বাড়িটা অবশ্য অটুট আছে। একতলা এবং দোতলায় সারবন্দি মোটা থাম। প্রাঙ্গণের অনেকটা জুড়ে ঝোপজঙ্গল গজিয়েছে। বাড়ির সামনে কিছু অংশ পরিষ্কার। সেখানে বারান্দার একটা অংশ অর্ধবৃত্তাকারে বেরিয়ে এসেছে। কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওখানে উঠতে হয়। সেই অর্ধবৃত্তাকার জায়গায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পরনে পাজামা আর খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি। মাথার চুল সাদা। গোঁফও সাদা। ফর্সা রং। চেহারায় বনেদি আভিজাত্যের ছাপ আছে।

আমাদের দেখে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। তারপর ছড়িসুদ্ধ হাতে কর্নেলের হাত জড়িয়ে ধরে ধরাগলায় বললেন,—সেই তো এলেন। কিন্তু বড় দেরি করে এলেন কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—জয়কুমারবাবু! আমি জানি, আপনি বিদ্বান মানুষ। আপনি এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা ভৌতিক বলেই আমি তত গুরুত্ব দিইনি। অবশ্য আংটির ব্যাপারটা শুনে আমি মনে-মনে একটা অঙ্ক কষেছিলুম। অঙ্কটা দেখা গেল ঠিক ছিল না। গোপীমোহনবাবু আমাকে নিশ্চয় সব কথা খুলে বলেননি। বললে আমার অঙ্ক হয়তো ঠিকই মিলে যেত।

জয়কুমারবাবু বললেন,—কালী! এই রোয়াকে কয়েকটা চেয়ার পেতে দে। এখানে ছায়া পড়েছে। খোলামেলা হাওয়ায় এঁদের বসাই। এই গ্রামে বিদ্যুতের যা দুরবস্থা!

অর্ধবৃত্তাকার রোয়াকে আমরা বসার পর জয়কুমারবাবু বললেন,—গোপী কি আপনাকে বলেনি ফেলারাম গতবছর এমনি জুলাই মাসের নিশুতি রাতে ওই মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল।

কর্নেল বললেন—না তো?

—আশ্চর্য! কালীনাথ কীভাবে টের পেয়ে ফেলারামকে হাতেনাতে মন্দিরের ভেতর ধরে ফেলেছিল। আমাদের গৃহদেবতা রুদ্রদেবের বেদি ধরে সে টানাটানি করছিল। সেই জন্যই তো আমি তাকে দড়ি দিয়ে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলুম। আর কীভাবে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলারাম মনের দুঃখে পেছনের বটগাছে উঠে সেই দড়ির ফাঁস গলায় আটকে ঝুলে পড়েছিল।

—গোপীবাবু এ কথা তো বলেননি। উনি বলেছিলেন কী ব্যাপারে আপনি তাঁকে বকাবকি করেছিলেন। সেই জন্য তিনি আত্মহত্যা করেন।

হেমেনবাবু বললেন,—রুদ্রদেবের বেদি ধরে কেন টানাটানি করেছিল ফেলারাম?

জয়কুমারবাবু রুষ্টমুখে বললেন,—বিগ্রহ ওপড়াতে পারেনি। তাই বেদিসুদ্ধ উপড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। তুমি ভালোই জানো হেমেন! আজকাল বিগ্রহ চুরি করে বিদেশে পাচার করে বদমাশ লোকেরা প্রচুর টাকাকড়ি পায়! কিন্তু আমার অবাক লাগছে। গোপীকে আমি এই কথাটা কর্নেলসায়েবকে গুরুত্ব দিয়ে বলতে বলেছিলুম। অথচ সে বলেনি। এ তো অদ্ভুত ব্যাপার!

হেমেনবাবু বললেন,—জয়কুমারদা! আপনি কি বলতে চাইছেন গোপীবাবু ফেলারামের সঙ্গে বিগ্রহ পাচারের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল?

—না। তা বলছি না। কিন্তু আমার খটকা লাগছে। এই আসল কথাটা না বললে কর্নেলসায়েব ভাবতেই পারেন, আমি বা আমার হুকুমে কালীনাথ কোনও বহুমূল্য আংটির লোভে তাকে ফাঁস আটকে মেরে বটগাছে লটকে দিয়েছিলুম!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ঠিক বলেছেন। আমার অঙ্কটা এইরকমই ছিল।

জয়কুমারবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন,—শুনছ? শুনছ হেমেন? গোপী ইচ্ছে করেই কর্নেলসায়েবকে ভুল পথে চালাতে চেষ্টা করেছিল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদারকে অবশ্য এ ঘটনাটা আমি বলিনি। তবে আমার সন্দেহ, ওঁকে লক্ষ করে ঢিল ছুড়েছিল হতভাগা গোপীমোহনই। আর কেউ না। মিঃ হালদারকে সে তাড়াতে চেয়েছিল। বেঁচে থাকলে সে কর্নেলসায়েবকেও তাড়ানোর চেষ্টা করত।

হেমেনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—তাহলে গোপীবাবু কর্নেলসায়েবের কাছে যাবেন কেন?

—আমার হুকুম মানতে সে বাধ্য। যদি সে ফিরে এসে বলত, কর্নেলসায়েবের দেখা পেলুম না, তাহলে আমি তোমাকে ট্রাংককল করতে বলব, গোপী তা ভালোই জানত।

এই সময় একটা গোলটেবিল এনে রাখল কালীনাথ। তারপর একটা লোক ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে চা বা কফির পট ও কাপপ্লেট ট্রেতে বয়ে এনে টেবিলে রাখল। হেমেনবাবু বললেন, —কি ভোলা? এখনও তোমার পায়ের হাড় বসেনি?

ভোলা বলল,—আজ্ঞে না। কলকাতার ডাক্তারবাবু একমাস অন্তর যেতে বলেছিলেন। কিন্তু কর্তামশাইয়ের সংসার ফেলে যাই কী করে?

জয়কুমারবাবু চটে গিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—তোমার পা ভাঙল কী করে?

ভোলা বলল,—আজ্ঞে, পেছনকার বটগাছের একটা ডাল এসে দালানে ধাক্কা মারত। রাত্তিরে অদ্ভুত শব্দ হতো। কর্তামশাই ডালটা কাটতে বলেছিলেন। ডাল কেটে নামবার সময় পা ফসকে নিচে পড়েছিলুম।

—কতদিন আগে?

—আজ্ঞে গতবছর। তার কদিন পরে ফেলাবাবু আত্মহত্যা করেছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়কুমারবাবু! ওই বটগাছটাই আসলে ভূত।

চার

কর্নেলের কথা শুনে হেমেনবাবু হেসে ফেললেন। কিন্তু জয়কুমারবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, —বটগাছটা সম্পর্কে ছোটোবেলা থেকেই অনেক ভূতুড়ে গপ্প শুনেছি। কিন্তু আমার ঠাকুরদার হাতে লাগানো গাছ। তার মানে প্রায় দুশো বছর গাছটার বয়স। আমাদের পরিবারে তাই বটগাছটা সম্পর্কে শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। গাছটা কেটে ফেলার প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। তবে মাঝে-মাঝে গাছটার ডালপালা এই দালানের ওপর চলে আসত।

ভোলা বলল,—ভূতুড়ে শব্দ শোনা যেত দালানে ধাক্কা লেগে। তা ঠিক। তবে সেজন্য নয়। চোরডাকাত বাইরে থেকে পাঁচিলে উঠে ডাল বেয়ে দোতলায় নামতে পারে ভেবেই ওইসব ডাল কেটে ফেলা হতো।

কালীনাথ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল,—তাছাড়া বটগাছটায় কাকের বড়ো উপদ্রব হয়। কাকের স্বভাব তো জানেন! দালানের ওপর কোনও ডাল এগিয়ে এলে সেখানে বাসা করত। আর রাজ্যের সব কুচ্ছিত জিনিস এনে বাসায় রাখত। ছাদে সেগুলো পড়ে যেত। ছাদ নোংরা হতো।

কর্নেল বললেন,—বুঝেছি। তবে ও কথা থাক। জয়কুমারবাবু! এবার বলুন, ফেলারাম মুখুজ্জের প্রেতাত্মাকে কি আপনি সত্যি দেখেছিলেন?

জয়কুমারবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—খালিচোখে আমি দিনের বেলা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাই। শুনলে অবাক হবেন, আমার চোখে এই আশিবছর বয়সেও ছানি পড়েনি। তবে বই বা কাগজপত্র—মানে লেখাপড়া করতে রিডিং গ্লাস দরকার হয়। রাত্রিবেলা বই পড়ার সময় জানালার ধারে ফিসফিস করে কে তিনবার 'আংটি দে' বলায় আমি চমকে উঠে তাকিয়েছিলুম।

—তখন আপনার চোখে রিডিং গ্লাস ছিল?

—ছিল। আবছা দেখেছিলুম গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো কেউ উঁকি দিচ্ছে! অমনি টর্চের আলো ফেলেছিলুম। তারপর তাকে দেখতে পাইনি।

—তাকে আপনি ফেলারাম মুখুজ্জে বলে চিনতে পেরেছিলেন?

জয়কুমারবাবু গলার ভেতর বললেন,—আসলে তার গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো দেখেছিলুম একটু স্পষ্ট। তাই ধরেই নিয়েছিলুম সে ফেলারাম! তাছাড়া মুখে গোঁফদাড়ি ছিল।

কর্নেল বললেন,—ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। রাতবিরেতে আবছা আলোতে অন্য কেউ গলায় দড়ির ফাঁস আটকে উঁকি দিলেও স্বভাবত সে ফেলারাম বলেই সাব্যস্ত হতো।

—গোপী তাকে নাকি স্পষ্ট দেখেছিল। ফেলারাম বলে চিনতে পেরেছিল।

—গোপীবাবু আর বেঁচে নেই। কাজেই আপনি এবার বলুন, আংটির ব্যাপারটা কী?

জয়কুমারবাবু চাপাস্বরে বললেন,—হেমেনকে বলেছি সে কথা। আসলে আংটির কথাটা আমার মনেই ছিল না। কালী কাল কথাপ্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিল। ঝাঁপুইহাটিতে বিদ্যুৎ এসেছিল বছর তিনেক আগে। তখন ভোল্টেজ স্বাভাবিক ছিল। তাই কুয়োর জল ছাদে একটা ট্যাঙ্কে তোলার জন্য পাম্পিং মেশিন কিনেছিলুম। দোতলায় বাথরুম তৈরি করেছিলুম। কলের মিস্তিরি ডেকে পাইপ কিনে বেসিন আর শাওয়ারের ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু পরের বছর থেকে ভোল্টেজ কমে গেল বিদ্যুতের। পাম্পে জল ওঠে না। অগত্যা পুনর্মূষিক ভব। নিচের তলায় সাবেক বাথরুম আবার ব্যবহার করতে হল।

জয়কুমারবাবু একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন,—আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরি খুব পুরোনো। ঠাকুরদার বই সংগ্রহের বাতিক ছিল। তাছাড়া নানা বিষয়ে বই থেকে নোট করে রাখতেন একটা নোটবইয়ে। সেই নোটবইয়ের একটা পাতায় লাল কালিতে লেখা ছিল—দেখাচ্ছি। একমিনিট! কালী! আমার সঙ্গে চল!

বলে উনি ছড়িহাতে উঠে গেলেন। একতলার একটা ঘরের তালা খুলতে কালীনাথকে চাবির গোছা দিলেন। কালীনাথ তালা খুলে দিলে ঘরে ঢুকে গেলেন। হেমেনবাবু মুচকি হেসে বললেন, —কর্নেলসায়েব! এবার মনে হচ্ছে আপনি জমিদারবাড়ির ভূতরহস্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লু পাবেন!

জয়কুমারবাবু একটু পরে এসে গেলেন। তাঁর হাতে একটা জীর্ণ মোটাসোটা ডায়রি বই। তিনি পকেট থেকে রিডিং গ্লাস অর্থাৎ চশমা বের করে চোখে পরলেন। ডায়রি বা নোটবইটার বিবর্ণ পোকায় কাটা পাতা সাবধানে উলটে কর্নেলকে দিলেন। বললেন,—এই দেখুন। ঠাকুরদা লালকালিতে কী লিখেছেন।

আমরা ঝুঁকে পড়লুম পাতাটা দেখতে। কর্নেল বিড়বিড় করে পড়তে থাকলেন,

'আমার বংশধরদের উদ্দেশ্যে এই গুপ্তকথা লিখিয়া রাখিতেছি। আমাদিগের গৃহদেবতা শ্রী শ্রী রুদ্রদেবের আশীর্বাদধন্য একটি অতীব প্রাচীন স্বর্ণ-অঙ্গুরীয় ক/১৮৪ সংখ্যক পুস্তকের ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছি। উহা অঙ্গুলিতে ধারণ করিলে গৃহদেবতার কৃপায় অমঙ্গল দূর হইবে। তবে সাবধান, অঙ্গুরীয় যেন কদাচ জল স্পর্শ করে না। স্নান আচমন প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করিবার সময় উহা খুলিয়া রাখিতে হইবে।...'

কর্নেল মুখ তুলে বললেন,—আপনি আংটিটি খুঁজে বের করে আঙুলে পরেছিলেন?

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কীরকম বেঢপ গড়নের আংটি। ওপরে কোনও রত্ন-টত্ন বসানো ছিল না। সেখানে ডিম্বাকৃতি নিরেট সোনার টুকরো বসানো ছিল। আমি ঠাকুরদার নির্দেশমতো আংটি পরে থাকতুম। তো গতবছর গ্রীষ্মকালে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম আংটিটা আঙুল থেকে কখন কোথায় খুলে পড়েছে। একটু ঢিলে ছিল আংটিটা। তন্নতন্ন খুঁজে কোথাও পেলুম না। ফেলারামের প্রতি সন্দেহ হল। সে কুড়িয়ে বেচে দিয়েছে হয়তো। কিন্তু সে কান্নাকাটি করে রুদ্রদেবের নামে শপথ করে কেলোর কীর্তি বাধাল। গোপী, কালী, ভোলা, ভোলার বউ শৈল আর নকুলঠাকুরকে ফেলারামের দিকে লক্ষ রাখতে বলেছিলুম। বাড়ির দামি জিনিস বিক্রি করলে ফেলারামের হাতে পয়সাকড়ি আসত। তখন তার চেহারা হাব-ভাব বদলে যেত। কিন্তু ওরা তেমন কোনও পরিবর্তন লক্ষ করেনি। অগত্যা আংটির আশা ছেড়ে দিলুম। এদিকে আমার জমিজমা নিয়ে হাজারটা সমস্যা। আংটিটার কথা মন থেকে বিসর্জন দিলুম। কিন্তু কথা হচ্ছে, উলটে ফেলারামের প্রেতাত্মা আমার বা গোপীর কাছে সেই আংটি চাইতে রাতবিরেতে হানা দেবে কেন? আংটিটা তো আমারই ছিল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—যাক্ ও কথা। মর্গের রিপোর্টে গোপীবাবুকে কী দিয়ে খুন করা হয়েছিল জানতে পেরেছেন?

হেমেনবাবু বললেন,—ভোঁতা শক্ত কোনও জিনিস দিয়ে খুনি তার মাথার পেছনে আঘাত করেছিল। থানার ও.সি. বলেছেন, লোহার রড বা লোহার মুগুরই মার্ডার উইপন।

—গোপীবাবুর বেহালা পাওয়া গেছে?

কালীনাথ বলল,—গাবতলায় ঝোপের ভেতর পাওয়া গেছে। কেউ বেহালাটা যেন শক্ত জিনিস দিয়ে ঠুকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করেছে। বেহালার কাপড়ের খাপটা কাছেই পড়ে ছিল। পুলিশ সব নিয়ে গেছে।

কর্নেল হঠাৎ একটু নড়ে বসলেন,—হ্যাঁ! জয়কুমারবাবু! বাথরুমের কথা বলছিলেন আপনি। কেন বলছিলেন?

জয়কুমারবাবু বললেন,—বলতে ভুলে গেছি। আমি বাথরুমে স্নান করতে ঢোকার পর আংটিটা খুলে উঁচু জানালার ধারে রাখতুম, যাতে জলস্পর্শ না হয়। আংটিটা হারিয়ে যাওয়ার এতদিন পরে হঠাৎ কাল স্নান করতে ঢুকে দেখলুম, একটা কাক উঁচু জানলার ওপরে বসে কিছু ঠোকরাচ্ছে। অমনি মনে হল, কাক আংটিটা নিয়ে যায়নি তো?

কালীনাথ সায় দিয়ে বলল,—কর্তামশাইয়ের কথা শুনে আমি কাল বটগাছটাতে উঠে কাকের কয়েকটা বাসা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে দিয়েছি। আংটি খুঁজে পাইনি।

আমি বললুম,—কর্নেল! হালদারমশাই তাহলে কালীনাথের পায়ের ছাপ দেখেছিলেন বটগাছের গুঁড়িতে।

হেমেনবাবু বললেন,—হালদারমশাই, মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার?

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ। বুঝতেই পারছেন গোয়েন্দারা সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখেন। ওঁর কথা থাক। জয়কুমারবাবু যা বলছেন, তাতে যুক্তি আছে। কাকের এই অদ্ভুত স্বভাব আমার সুপরিচিত। কারণ কলকাতায় আমার ছাদের বাগানের নিচে একটা নিমগাছে কাকের বড্ড উপদ্রব। আমি ওদের বাসায় মেয়েদের চুলের ফিতের টুকরো, ভাঙা চুড়ি, এমনকী লোহার ছোট্ট স্প্রিংও দেখেছি।

কালীনাথ বলল,—বাকি বাসাগুলো কালই ভেঙে দিয়ে খুঁজে দেখব।

জয়কুমারবাবু বললেন,—যে কাক আমার আংটি চুরি করেছিল, একবছর পরে সে বেঁচে আছে বা বটগাছে এখনও আছে কি না ঠিক আছে কিছু? কাকেরা জায়গা বদলায় না? গ্রামের কাকেরা আজকাল শহরে গিয়ে জুটেছে শুনেছি। আমাদের বটগাছে আগের মতো অত কাক তো আর দেখি না।

হেমেনবাবু বললেন,—কথাটা ঠিক। বাবুগঞ্জে ক্রমে কাকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। শহরে কাকেদের প্রচুর খাবার মেলে কাজেই গ্রামে কালক্রমে আর কাক দেখাই যাবে না!

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আপনারা বসুন। আমি একবার বটগাছটার অবস্থা দেখে আসি।

কালীনাথ তাঁর সঙ্গে যেতে পা বাড়িয়েছিল, কর্নেল তাকে নিষেধ করে বাড়ির পূর্বদিক ঘুরে উত্তরে অদৃশ্য হলেন। একটু পরে দক্ষিণে আগাছার জঙ্গলের ওধারে বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে একটা মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল। একটি মেয়ে—সম্ভবত ভোলার বউ শৈল শাঁখে ফুঁ দিল। জয়কুমারবাবু চেয়ারে বসেই মন্দিরের দিকে ঘুরে করজোড়ে প্রণাম করে বললেন,—সন্ধ্যারতি দিচ্ছে নকুলঠাকুর। আজকাল আমি আর সন্ধ্যারতির সময় মন্দিরে উপস্থিত থাকি না হেমেন! তুমি এঁকে বিগ্রহদর্শন করিয়ে আনো!

হেমেনবাবু একটু হেসে বললেন,—কি জয়ন্তবাবু? যাবেন নাকি?

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—চলুন! রুদ্রদেবের বিগ্রহ কখনও দর্শন করিনি। দেখা'ত আগ্রহ হচ্ছে।

হেমেনবাবুকে অনুসরণ করে প্রাঙ্গণের একখানে দেখলুম, আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সংকীর্ণ পায়েচলা পথ আছে। পথের মাঝামাঝি গিয়ে হেমেনবাবু বাঁদিকে আঙুল তুলে বললেন, —ওখানে একটা ফোয়ারা ছিল। ছোটোবেলায় এ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি বাবার সঙ্গে। তখন এই সব ঝোপঝাড় ছিল না। ফুলের বাগান ছিল। ওই ফোয়ারাটাও আস্ত ছিল। পাথরের থামটা দেখতে পাচ্ছেন? ওখানে একটা অপ্সরার মূর্তি বসানো ছিল।

মন্দিরটার চত্বর উঁচু, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। নিচে জুতো খুলে চত্বরে উঠে দরজার কাছে উঁকি দিলুম। করজোড়ে প্রণাম করলুম হেমেনবাবুর দেখাদেখি। আবছা-অন্ধকারে একটা প্রদীপ জ্বলছে। বেঁটে তামাটে রঙের এবং পট্টবস্ত্রপরা ঠাকুরমশাই পুজো করছেন। কাঁসর বাজাচ্ছে একটি ছোট্ট ছেলে। হেমেনবাবু বললেন,—নকুলঠাকুরের ছেলে। স্কুলে পড়ে।

বললুম,—নকুলবাবুর ফ্যামিলি কি এ বাড়িতে থাকেন?

—না। নকুলবাবুর ফ্যামিলি থাকে বাবুগঞ্জে। নকুলবাবু জমিদারবাড়িতে চাকরি করেন। চাকরি মানে, রান্নাবান্না-পুজোআচ্চা এইসব কাজ। এবার বিগ্রহটা লক্ষ করুন। কী মনে হচ্ছে দেখে?

খুঁটিয়ে দেখে বললুম,—কী আশ্চর্য! অবিকল যেন বুদ্ধমূর্তি।

—ঠিক ধরেছেন। বুদ্ধমূর্তি রুদ্রদেব হয়ে গেছেন। কিন্তু এ কথা যেন ভুলেও জয়কুমারবাবুকে বলবেন না! খুব প্রাচীন মূর্তি। কষ্টিপাথরে তৈরি। বেদিটাও কষ্টিপাথরের।

—ফেলারামবাবু সম্ভবত বিগ্রহটা চুরি করতে চেয়েছিলেন!

হেমেনবাবু বললেন,—আসুন। ব্যাপারটা বলছি।

মন্দির-চত্বর থেকে নেমে জুতো পরে সেই পথ দিয়ে ফিরছিলুম। হেমেনবাবু বললেন,—বেদিটা তো দেখলেন। বড়জোর দুফুট লম্বা দেড়ফুট চওড়া। লাইমকংক্রিটের সঙ্গে গাঁথা আছে। বেদি ওপড়ানো কি সম্ভব? কী মনে হল আপনার?

বললুম,—তাই তো! শাবল বা ওইরকম কিছু দিয়ে ঘা মেরেও ওপড়ানো কঠিন।

হেমেনবাবু মুচকি হেসে চাপাস্বরে বললেন,—বিগ্রহ যে চুরি করবে, সে বেদি ওপড়ানোর চেষ্টা করবে কেন? তাই না?

—ঠিক বলেছেন।

—আমার ধারণা ফেলারাম বেদিটার কোনও গোপন কথা জানতে পেরেছিল।

অবাক হয়ে বললুম,—কী গোপন কথা?

—বেদিটা সহজেই হয়তো সিন্দুকের ডালার মতো খোলা যায়।

—আপনি কি গুপ্তধনের কথা বলছেন?

—দেখুন জয়ন্তবাবু! প্রাচীনযুগে মন্দিরে ধনরত্ন নানা কারণে লুকিয়ে রাখা হতো। কাজেই যদি গুপ্তধনের কথা বলেন, আমি তাতে অবিশ্বাস করব না।

—তাহলে জয়কুমারবাবু বা তাঁর পূর্বপুরুষের নিশ্চয়ই তা জানার কথা।

—জয়কুমারদা কিছু নিশ্চয়ই জানেন। তা না হলে ফেলারাম মুখুজ্জেকে থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন কেন? উদ্দেশ্য ছিল, ভোরবেলা পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেওয়া। যে বেদি ওপড়ানো অসম্ভব, তার জন্য লোকটাকে অত কড়া শাস্তি দেওয়ার কারণ কী? কালীনাথকে আমি চিনি। সে নিশ্চয়ই ফেলারাম মুখুজ্জেকে প্রচণ্ড মারধরও করেছিল। ওই লোকটাকে এলাকার সবাই বলে কালী পালোয়ান। ঠাট্টা করে অনেকে বলে কেলে-দত্যি। কালীর স্বাস্থ্য তো দেখলেন। ওর হাতের একটা থাপ্পড়ে রোগা মানুষ ফেলারামের অক্কা পাওয়ার কথা।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—হেমেনবাবু! তাহলে কি কালীর মার খেয়ে ফেলারামবাবু মারা পড়েছিলেন। আর তাঁর গলায় ফাঁস আটকে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

হেমেনবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। আস্তে বললেন,—ঝাঁপুইহাটি পাড়াগাঁ। আত্মহত্যার কেসে যে পুলিশকে খবর দিতে হয়, তা ক'জন জানে? তাছাড়া ফেলারাম মুখুজ্জের হয়ে থানায় যাবেটা কে? সকালেই সাত তাড়াতাড়ি তাকে দাহ করা হয়েছিল বলে শুনেছি।

কথাগুলো বলেই তিনি হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। জমিদারবাড়িতে বিদ্যুতের অবস্থা বড় করুণ। বাল্‌বগুলোর ভেতর লালরঙের সূক্ষ্ম তার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কালীনাথ একটা হ্যাজাগ জ্বালছিল। সে হ্যাজাগটা বারান্দার ওপর ঝুলন্ত একটা হুকে আটকে দিল।

কর্নেল ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। জয়কুমারবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। আমরা গিয়ে বসলুম। জয়কুমারবাবু আমাকে বললেন,—বিগ্রহদর্শন করলেন? কর্নেলসায়েবকে বলছিলুম। উনি বললেন, বরং সকালে এসে দর্শন করবেন।

কর্নেল বললেন,—জয়কুমারবাবুর গান শোনার ইচ্ছা ছিল। শুনেছি, উনি অসাধারণ ধ্রুপদী সঙ্গীত গাইতে পারেন। কিন্তু গোপীবাবু নেই। কে বেহালা বাজাবেন? তবলা কে বাজায় অবশ্য জানি না।

জয়কুমারবাবু বললেন,—সঙ্গীতচর্চা এ বয়সে আর করতে পারি না। আমি তানপুরা বাজিয়েই গাইতুম। এখন হাত কাঁপে। তবলা সঙ্গত করত ভোলা। তবলায় ওর হাত খুব ভালো।

ভোলা চায়ের কাপপ্লেট নিতে এসেছিল। সে বলল,—কর্তামশাইকে কতবার বলেছি, তবলার বাঁয়া ফেঁসে আছে। সারিয়ে আনি। উনি বলেন, থাক গে!

কর্নেল বললেন,—তবলা কবে ফেঁসে গেল?

—প্রায় একবছর ধরে ফেঁসে পড়ে আছে স্যার।

—তবলা কি নিজে থেকেই ফেঁসে যায়?

—আজ্ঞে, যায়। কর্তামশাইকে জিগ্যেস করুন।

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। ওয়েদারে টেম্পারেচারের ওঠানামার দরুণ তবলা এমনিই ফেঁসে যায়। গত বছর জুন মাসে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। তারপর হঠাৎ বৃষ্টি। অনেকদিন পরে ইচ্ছে হয়েছিল, বৃষ্টির রাতে গানবাজনার আসর বসাই। তো ভোলা তবলা-বাঁয়া নিয়ে এসে বলল, বাঁয়া ফেঁসে গেছে!

কর্নেল আমাকে অবাক করে ওকে জিগ্যেস করলেন,—ভোলা, বটগাছের ডাল কাটার পর কি বাঁয়াতবলাটা ফেঁসেছিল?

ভোলা কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেল। বলে,—আজ্ঞে!

জয়কুমারবাবু একটু হেসে বললেন,—বটগাছের ডাল কাটার সঙ্গে কি বাঁয়াতবলা ফেঁসে যাওয়ার সম্পর্ক আছে কর্নেলসায়েব?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—বটগাছ স্বয়ং বৃক্ষদেবতা। অঙ্গছেদন করলে তাঁর ক্রোধ স্বাভাবিক। ভোলার ওপর প্রথমে, তারপর তাঁর ক্রোধটা তার তবলার ওপর পড়েছিল মনে হচ্ছে।

সবাই হেসে উঠলেন। জয়কুমারবাবু বললেন,—কর্নেলসায়েব এসে আমাদের মুখে হাসি ফোটালেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কাল রাত্তির থেকে বাড়ি একেবারে শ্মশান হয়ে উঠেছিল।

কর্নেল বললেন,—এবার উঠব। তার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

—করুন প্রশ্ন!

—আপনার বাবা কিংবা ঠাকুরদা কিংবা আপনার কি এমন কোনও ফোটো আছে, যাতে আঙুলে সেই আংটির—মানে, আমি আংটি পরা ছবিই দেখতে চাই।

জয়কুমারবাবু বললেন,—আছে। আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে আসুন। দেখাচ্ছি। কালী! হ্যাজাগটা খুলে নিয়ে আয়।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে সেই ঘরের তালা খুললেন জয়কুমারবাবু। কালীনাথ আগে হ্যাজাগ নিয়ে ঢুকল। তারপর একে-একে আমরা ঢুকলুম। বিশাল ঘর। চারদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা প্রকাণ্ড আলমারিতে পুরোনো বই ঠাসা আছে। কাচের ভেতর বইগুলো দেখা যাচ্ছিল। একখানে উঁচুতে একটা প্রকাণ্ড ছবি দেখিয়ে জয়কুমারবাবু বললেন,—আমার ঠাকুরদার অয়েলপেন্টিং। এক সায়েব শিল্পীর আঁকা। ওই দেখুন, ওঁর বাঁ-হাতের আঙুলে সেই আংটি।

কর্নেল টর্চের আলো ফেললেন। আংটিটা সত্যিই বেঢপ। ডিম্বাকৃতি একটা নিরেট সোনার আব যেন বসানো আছে। ছবির আয়তনের অনুপাতে আংটিটার ওই ডিম্বাকৃতি অংশটা প্রায় একইঞ্চি লম্বা এবং মাঝখানটা প্রায় আধইঞ্চি চওড়া। এই আংটি সারাক্ষণ আঙুলে পরে থাকা অস্বস্তিকর মনে হল।

কর্নেলের গলায় যথারীতি বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছিল। তিনি তাঁর ক্যামেরায় সম্ভবত আংটির ছবিটা তুললেন। ফ্ল্যাশবাল্ব ঝিলিক দিল।

ঠিক এইসময় বাইরে কেউ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—বাঁচাও! বাঁচাও!

কর্নেল দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। তারপর কালীনাথ হ্যাজাগ নিয়ে বেরুল। আলোটা সে রেখে মেঘের মতো হাঁক ছেড়ে বলল,—কী হয়েছে ঠাকুরমশাই?

দেখলুম ঠাকুরমশাই নকুল মুখুজ্জে বৃত্তাকার রোয়াকের নিচে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। তাঁর সেই ছেলেকে দেখতে পেলুম না।

পাঁচ

কিছুক্ষণ পরে নকুলঠাকুর ধাতস্থ হয়ে বললেন,—মন্দিরে সন্ধ্যারতি শেষ করে তালা এঁটে বিল্টুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। তারপর আমি এদিকে এগিয়ে আসছি, হঠাৎ পেছনে কে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আংটি দে! আংটি দে!' ঘুরে দেখি দড়ির ফাঁস আটকানো ফেলারাম। সে দু-হাত বাড়িয়ে আমার গলা টিপে ধরতে এল। আমি অমনি চ্যাচাতে-চ্যাচাতে পালিয়ে এলুম। ওরে বাবা! কী সাংঘাতিক দৃশ্য! সেই ফেলারাম!

কালীনাথ ততক্ষণে লাঠি আর টর্চ নিয়ে মন্দিরের দিকে ছুটে গেছে। জয়কুমারবাবু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন,—আমি কিছু বুঝতে পারছি না! কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না!

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা ঠাকুরমশাই! মন্দিরের কাছে আর ওই আগাছার জঙ্গলে তো আলো নেই। মন্দিরের মাথায় যে বাল্‌বটা জ্বলছে, তার আলো খুব মিটমিটে। আপনি অন্ধকারে ভুল দেখেননি তো?

নকুল মুখুজ্জে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন,—তত কিছু অন্ধকার নয়। আমি স্পষ্ট দেখছি।

—ফেলারামকে দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গলায় ফাঁস আটকানো। ওরে বাবা! সেই ফেলা মুখুজ্জে!

—একটু ভেবে বলুন। আগে গলার ফাঁস দেখতে পেয়েছিলেন, নাকি তার মুখ দেখতে পেয়েছিলেন?

—আজ্ঞে? স্যার, গলার ফাঁসের দিকে প্রথমেই চোখ পড়েছিল! তারপর মুখের গোঁফদাড়ি!

—ধরুন, যদি অন্য কেউ গলায় দড়ির ফাঁস আটকে ফিসফিস করে আংটি চায়?

—তা কী করে হবে? আমি যে ফেলারামকেই দেখলুম। চোখ জ্বলছিল। দুটো হাত বাড়িয়ে—ওঃ!

জয়কুমারবাবু বললেন,—নকুল! তুমি বিশ্রাম নাও এ বেলা— শৈল বরং রান্না করুক। ভোলা! ও ভোলা! কোথায় গেলি তুই?

বারান্দার থামের আড়াল থেকে ভোলা বেরিয়ে এল। বলল,—গোয়ালঘরে ছিলুম। মশার কামড়ে গরুগুলো ছটফট করে। ঘাসের তলায় ঘুঁটের আগুন দিচ্ছিলুম। ধোঁয়ায় চোখের অবস্থা সাংঘাতিক।

—ঠাকুরমশাইকে তাঁর ঘরে নিয়ে যা। শৈলকে বল, গরম-গরম চা করে দেবে। আর আমাদের জন্যও আরেক দফা চা।

কর্নেল বললেন,—থাক জয়কুমারবাবু! আমরা এবার চলি। একটু সাবধানে থাকবেন!

কালীনাথ এসে বলল,—কেউ কোথাও নেই। মানুষ হলে হেমেনবাবুর ড্রাইভারের চোখে পড়ত। দেউড়ি দিয়ে না পালানো ছাড়া উপায় ছিল না তার। অত উঁচু পাঁচিল ডিঙোনোর সাধ্যি নেই কারও। খিড়কির দোর ভেতর থেকে বন্ধ।

জয়কুমারবাবু বললেন,—আমার বন্দুক আর দুটো কার্টিজ এনে দে। এই নে চাবি। ফেলারামের ভূত হোক আর যে-ই হোক, গুলি করব। আর এই বদমাইশি সহ্য হচ্ছে না।

জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে দেউড়ির কাছে গিয়ে কর্নেল বললেন,—বটগাছটা ভিন্ন প্রজাতির। এ দেশে এমন বটগাছ কোথাও দেখিনি।

হেমেনবাবু বললেন,—কেন?

—সব বটগাছের প্রচুর ঝুরি নামে। জমিদারবাড়ির বটগাছটার ঝুরি নেই। এ ধরনের বটগাছ আমি ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরের দেশগুলোতে দেখেছি। ফিগট্রি বলতে আমাদের দেশে ডুমুর গাছ

বোঝায়। ডুমুর গাছও অবশ্য বটগাছেরই জ্ঞাতি। কিন্তু এই বটগাছটা ওইসব অঞ্চলের সত্যিকার ফিগট্রি। এখন বর্ষায় প্রচুর ফল ধরেছে। পাখিরা হল্লা করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফলগুলো খাচ্ছে। আমি একটা ফল কুড়িয়ে স্বাদ নিলুম। বেশ মিষ্টি। এদেশের বটফলও পাখিদের কাছে সুখাদ্য। কিন্তু এই বটফল মানুষও খেতে পারে।

হেমেনবাবু বললেন,—বলেন কী! দিনের বেলা এসে খেয়ে দেখব তাহলে!

গাড়িতে ঢুকে কর্নেল বললেন,—আমার ধারণা, রায়চৌধুরিবাবুদের পূর্বপুরুষদের কেউ পশ্চিম এশিয়া থেকে এই গাছের চারা এনেছিলেন।

আমি বললুম,—বটগাছটা নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন বলুন তো?

হেমেনবাবু একটু হেসে বললেন,—ফেলারামের ভূতরহস্যের সঙ্গে কর্নেল নিশ্চয়ই গাছটার কোনও যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন!

অনিল গাড়ি স্টার্ট দিল। হেডলাইটের আলোয় জনহীন রাস্তা আর গাছপালা ঝলসে যাচ্ছিল। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন হেমেনবাবু! জয়কুমারবাবুর ঠাকুরদার আঙুলে যে আংটি দেখলুম, সেটাকে তুর্কিরা বলে, কিং সলোমন'স রিং!

—অ্যাঁ? বলেন কী!

—বাইবেলের সেই রাজা সলোমনের আংটি। আমি এক তুর্কি ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলুম, ওই আংটির ডিম্বাকৃতি অংশের ভেতর মারাত্মক বিষ ভরা থাকত। কোনও শত্রুকে মেরে ফেলতে চাইলে তার সঙ্গে শত্রুতার মিটমাট করে নিয়ে প্রাচীনযুগের তুর্কিরা তাকে সরাইখানায় আমন্ত্রণ করত। তারপর তার অজ্ঞাতসারে আংটির বিষ শত্রুর পানীয়ে মিশিয়ে দিত।

হেমেনবাবু হেসে বললেন,—জয়কুমারদার ঠাকুরদার আংটিতে মারাত্মক বিষ ভরা ছিল না তো? আমার সত্যি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে শুনে!

কর্নেল চুপচাপ চুরুট টানতে মন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সরকারি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে আমি বললুম,—হালদারমশাই কোথায় গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছেন কে জানে!

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাইকে নিয়ে তোমার উদ্বেগের কারণ নেই। উনি পূর্ববঙ্গের মানুষ। স্থলের চেয়ে জলই ওঁর প্রিয়। এই এলাকাটা কতকটা পূর্ববঙ্গের মতোই। নদী বিল খাল! এখন সর্বত্র জল।

হেমেনবাবু বললেন,—কর্নেলসায়েব! জয়ন্তবাবুকে মন্দিরে রুদ্রদেবের বিগ্রহ দর্শন করিয়েছি। জয়কুমারদা বলছিলেন, ফেলারাম বিগ্রহের বেদি ওপড়াচ্ছিল। জয়ন্তবাবু তো দেখেছেন। বিগ্রহের বেদি ওপড়ানো অসম্ভব। ফেলারাম মুখুজ্জে মন্দিরে ঢুকে এমন কী করছিল। যে জয়কুমারদা ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন?

কর্নেল সে কথায় কান না দিয়ে বললেন,—জয়ন্ত বিগ্রহদর্শন করে পুণ্যার্জন করেছে। এবার সাধুসন্ন্যাসী দর্শন করুক। আরও পুণ্য হবে।

বললুম,—কোথায় সাধুসন্ন্যাসী!

কথাটা বলেই হেডলাইটের আলোয় দেখলুম, একজন জটাজুটধারী কৌপীনপরা সন্ন্যাসী এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে মড়ার খুলি আর কাঁধে ঝোলানো গেরুয়াঝুলি নিয়ে সামনের দিক থেকে আসছিলেন। গাড়ির হেডলাইট থেকে চোখ বাঁচাতে মড়ার খুলিটা চোখের সামনে তুলে রাস্তার বাঁদিকে ঘাসের ওপর সরে দাঁড়ালেন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ করলুম, সন্ন্যাসী খুলিটা নামিয়ে কর্নেলকে যেন দেখে নিলেন। কর্নেল বললেন,—সাক্ষাৎ অবধূত। অবশ্য কাপালিকও হতে পারেন।

হেমেনবাবু বললেন,—... জলটুঙ্গিতে মাঝে-মাঝে সন্ন্যাসীদের এসে ডেরা পাততে দেখেছি।

—ইনিও সেখানে যাচ্ছেন সম্ভবত।

আমি সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরেছিলুম। গোয়েন্দাপ্রবর হালদারমশাই ছাড়া কেউ নন। উনি এই ছদ্মবেশটা ধরতে খুব পটু। কথাটা চেপে গিয়ে বললুম,—আকস্মিক যোগাযোগটা বিস্ময়কর। কর্নেল সন্ন্যাসীর কথা বলামাত্র সন্ন্যাসীদর্শন হয়ে গেল!

কর্নেল বললেন,—তুমি সামনে দূরে তাকালে সন্ন্যাসীকে অনেক আগেই দেখতে পেতে!

হেমেনবাবু সকৌতুকে বললেন,—জয়ন্তবাবু সাংবাদিক। আপনি বলছেন, জয়ন্তবাবুর দূরদৃষ্টি নেই?

কর্নেল হাসলেন,—জয়ন্তকে আপনি তাতিয়ে দিচ্ছেন হেমেনবাবু!

এইসব হাসি-পরিহাসের দিকে আমার মন ছিল না। আমি ভাবছিলুম, নকুলঠাকুরের কথা! আমরা ও-বাড়িতে থাকার সময়ই ফেলারামবাবুর 'গলায়-দড়ি' ভূতটা ওঁকে দেখা দিল কোন সাহসে? ওঁর হাবভাব দেখে বুঝতে পারছিলুম, সত্যিই উনি ভয় পেয়েছেন।

অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, কর্নেল একা বাড়ির পিছনদিকে বটগাছটা দেখতে গিয়েছিলেন। ওঁকে ভূতটা দেখা দেয়নি! ফেলারামবাবুর প্রেতাত্মা কর্নেলকে আংটি চাইলেও পাবে না বলেই কি দেখা দেয়নি? হ্যাঁ—অ্যাংটিই ভূতটার টার্গেট। এদিকে কর্নেল বলছেন, ওই আংটি পশ্চিম এশিয়ায় তুর্কিরা ব্যবহার করে। কিং সলোমন'স রিং। এমন অদ্ভুত রহস্যের পাল্লায় কর্নেল কখনও পড়েছেন বলে মনে পড়ে না।

বাবুগঞ্জের বাজার পেরিয়ে যাওয়ার সময় শুনলুম, হেমেনবাবু ফেলারাম মুখুজ্জেকে কালীনাথের প্রচণ্ড প্রহারের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছেন। আমাকে যা সব বলছিলেন। মৃত ফেলারামবাবুকে বটগাছে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে চালানোর ওপর হেমেনবাবু গুরুত্ব দিচ্ছেন। কর্নেল একটু পরে বললেন,—সেটা অসম্ভব নয়। তবে ফেলারামবাবুর মন্দিরে ঢোকার উদ্দেশ্যটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু এটুকু অনুমান করা যায়, ওই আংটির সঙ্গে সম্ভবত মন্দিরের বিগ্রহ রুদ্রদেবের সম্পর্কের সম্ভাবনা আছে।

হেমেনবাবু বললেন,—আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আলোচনার সময় গুপ্তধনের সম্ভাবনার কথা বলেছিলুম। এমন হতেই পারে, জয়কুমারদা জানেন না ওই আংটির মধ্যে মন্দিরে লুকিয়ে রাখা তাঁর পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের সূত্র আছে। কী মনে হয় আপনার?

কর্নেল বললেন,—আপনার কথায় যুক্তি আছে। দেখা যাক, এই সম্ভাবনাটার কোনও ক্লু পাওয়া যায় নাকি।

হেমেনবাবু বললেন,—থানার ও. সি. তপন বিশ্বাস আপনার সঙ্গে আলাপের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। ডি.আই.জি. সায়েবের মুখে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা তিনি শুনেছেন!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ডি.আই.জি. মানে শচিন রুদ্র?

—হ্যাঁ। চেনেন তাঁকে?

—শচিন কলকাতার লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ট্রাফিকে ডি.সি. ছিল। সেখান থেকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কিছুকাল থাকার পর পায় ডবল প্রমোশন। একটা আন্তর্জাতিক চোরা মাদক চালানচক্রকে সে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। উচ্চশিক্ষিত ছেলে। পুলিশে এ ধরনের প্রতিভাবান উচ্চশিক্ষিত ছেলে যত বেশি ঢুকবে, তত পুলিশের বদনাম ঘুচবে। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

—হয়েছে। চেহারা দেখে বোঝা যায় না কিছু। বয়স তিরিশ-বত্রিশ বলে মনে হয়েছে।

—এই প্রমোশনে শচিন খুশি হয়নি। বুঝতেই পারছেন, কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ ওকে প্রমোশনের নামে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

হেমেনবাবু বললেন,—অনিল! থানার সামনে গাড়ি দাঁড় করাবে।

বাবুগঞ্জ থানার অফিসার-ইন-চার্জ তপন বিশ্বাস কর্নেলকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকতে যাচ্ছিলেন! কর্নেল খপ করে তাঁর হাত ধরে ফেলে করমর্দন করলেন। বললেন,—আপনাদের ডি.আই.জি. শচিন রুদ্র আমাকে 'ফাদার খ্রিসমাস' বলে। অবশ্য সেটা শীতকালে।

তপনবাবু বললেন,—বসুন স্যার। রুদ্রসায়েবের কাছে শুনেছি আপনি কফির ভক্ত। তবে এখানে খাওয়ার মতো কফি পাওয়া যায় না।

কর্নেল খুশি হয়ে বললেন,—হ্যাঁ। এই মুহূর্তে কফি আমার দরকার। নার্ভ ঝিমিয়ে পড়েছে। ঝাঁপুইহাটির জমিদারবাড়ি গিয়ে ভূতের গপ্প শুনে ক্লান্তও হয়েছি।

তপনবাবু কফি আনতে বললেন একজন কনস্টেবলকে। তারপর বললেন,—আমার কোয়ার্টার থেকেই কফি আসবে। হেমেনবাবু টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, সন্ধ্যার পর যে-কোনও মুহূর্তে আপনি এসে যাবেন।

কর্নেল বললেন,—গোপীমোহন হাজরার পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর কী কারণ বলা হয়েছে?

তপনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—ভূতের হাতে মারা পড়েননি ভদ্রলোক। এমনিতেই ওঁর হার্টের একটা ভালভ খারাপ ছিল। তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, বেঁচে থাকলে শিগগির ওঁর লাং-ক্যান্সার হতো। শক্ত ভোঁতা কোনও ভারী জিনিস দিয়ে মাথার পেছনে খুনি এত জোরে আঘাত করেছিল, মাথার খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়েছিল। সমস্যা হল, অমন নিরীহ এক আর্টিস্ট লোককে খুনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আশ্চর্য ব্যাপার, খুনি প্রচণ্ড রাগে ওঁর বেহালাটা ভেঙে প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বেহালার খাপ ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করেছে। ঘটনাটা প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ বলে আপাতদৃষ্টে মনে হয়। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে ওঁর তেমন কোনও শত্রু ছিল বলে জানা যায়নি। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এস. আই. মনোরঞ্জন পাল এখনও হাল ছাড়েননি।

হেমেনবাবু বললেন,—খুনির গায়ে জোর প্রচণ্ড বলতে হবে!

—হ্যাঁ। এক ঘায়ে মাথার পিছনটা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দিতে হলে প্রচণ্ড শক্তি দরকার। বিশেষ করে মানুষের মাথার পিছনদিকটা অন্য অংশের চেয়ে শক্ত।

হেমেনবাবু একটু হেসে বললেন,—ওরকম গায়ের জোর জমিদারবাড়ির কালীনাথেরই আছে। কিন্তু কালী পালোয়ানের দুটো হাতই যথেষ্ট। গোপীবাবু তার এক ঘুঁসিতেই মারা পড়তেন। তাছাড়া কালী পালোয়ান ওঁকে মারবে কেন?

কফি এসে গেল। তার সঙ্গে কাজুবাদাম, পটেটো চিপস। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, —অসাধারণ! কফির স্বাদ নির্ভর করে হাতের ওপর। যার হাত এই কফি করেছে, তার প্রতিভা আছে!

তপনবাবু সহাস্যে বললেন,—আমার গৃহিণী আপনার ফ্যান। জয়ন্তবাবুরও ফ্যান। সত্যি কথাটা এবার বলি কর্নেলসায়েব! ডি.আই.জি. সায়েব আপনার পরিচয় দেওয়ার বহু আগে থেকেই আমার গৃহিণীর সূত্রে আপনার এবং জয়ন্তবাবুর পরিচয় আমার জানা হয়ে গেছে। কেয়া বলে, 'দা মাস্টার ট্রায়ো।' কিন্তু 'ট্রায়ো'-র তৃতীয়জন প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদারকে রেখে এলেন কেন?

হেমেনবাবু বলে দিলেন,—তিনিও আছেন। গত পরশু রাত ১২টা থেকে দুপুর পর্যন্ত মিঃ হালদার আমার গেস্ট ছিলেন। তারপর—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন,—হালদারমশাই খেয়ালি আর হঠকারী প্রকৃতির মানুষ। আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেক্টর ছিলেন। পুলিশজীবনের প্রায় সবটাই ওঁর মফস্বলে কেটেছে। কাজেই পাড়াগাঁয়ের নাড়ি-নক্ষত্র চেনেন। বাই দা বাই, জমিদারবাড়িতে 'গলায়-দড়ে' ভূতের উপদ্রবের কথা কি আপনি শুনেছেন?

তপন বিশ্বাস হেসে উঠলেন,—শুনেছি। সর্বত্র রটে গেছে। জমিদারবাড়ির ফেলারাম মুখুজ্জের আত্মহত্যার সময় আমি এ থানায় ছিলুম না। আগের ও.সি. চন্দ্রমোহনবাবু ঘটনাটা নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁর কাছে শুনেছিলুম, ফেলারামবাবুর অনেক ধারদেনা ছিল। ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন।

—আশ্চর্য ব্যাপার, সেই ফেলারামবাবু ভূত হয়ে জমিদারবাড়ির লোকেদের খুব জ্বালাতন করছেন।

তপনবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—আমাদের সোর্সে শুনেছি, ফেলারামবাবুর ভূত আংটি চাইতে আসে। ওদিকে জয়কুমারবাবুর নাকি একটা সোনার আংটি কবে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই আংটি ফেলারামবাবুর প্রেতাত্মা চাইতে আসে কেন? আংটি তো তার নয়। যাই হোক, কর্নেলসায়েব বলুন, কিছু আঁচ করতে পেরেছেন নাকি?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—নাঃ! বড্ড গোলমেলে কেস। গোলকধাঁধায় ঢুকে গেছি। কথা দিচ্ছি, আপনার প্রয়োজন হলে সবরকম সাহায্য আপনি পুলিশের কাছে পাবেন।

আমরা ও.সি. তপনবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে থানা থেকে বের হয়ে গাড়িতে চাপলুম। তারপর হেমেনবাবুর বাড়িতে ফিরলুম।

তখন রাত প্রায় সওয়া আটটা। কর্নেল বললেন,—আরেক দফা কফি খাব রাত নটা নাগাদ। অসুবিধে না হলে ডিনার খাব রাত দশটায়।

হেমেনবাবু বলে গেলেন,—আপনার যা অভিরুচি!

বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর থেকে গুমোট গরম টের পাচ্ছিলুম। বাবুগঞ্জে বিদ্যুতের অবস্থা ভালো। ফ্যানের নিচে বসে বললুম,—আমি একটা অঙ্ক কষেছি কর্নেল!

কর্নেল টুপি খুলে ইজিচেয়ারে বসে বললেন,—বলো! শোনা যাক।

—জয়কুমারবাবুর ঠাকুরদার তুর্কি আংটির ভেতর এমন কোনও সূত্র লুকোনো আছে, যার সাহায্যে মন্দিরে রুদ্রদেবের বেদির তলায় লুকোনো গুপ্তধন উদ্ধার করা যায়।

—ধরো, তোমার অঙ্কটা ঠিক। তাহলে আংটি যে পেয়েছে বা হাতিয়ে নিয়েছে, সে গুপ্তধন আত্মসাৎ করে কেটে পড়ত। ফেলারারামের প্রেতাত্মা তা নিশ্চয়ই টের পেত। সে এখনও আংটি চাইতে হানা দিত না।

—আংটি এখনও কেউ পায়নি। কারণ নিচের তলার বাথরুমের জানালা থেকে কোনও কাক আংটি নিয়ে গিয়ে তার বাসায় রেখেছিল। আংটি হয়তো এখনও কাকের বাসাতেই আছে।

—আংটি কাক তুলে নিয়ে গেছে গতবছর জুন মাসে। কাকেরা প্রতিবছর নতুন করে বাসা বানায়। বাসা বদলাতেও দেখেছি আমি।

—তাহলে কোথাও ঝোপজঙ্গলে পড়ে আছে। কিংবা কাদার তলায় চলে গেছে। বরং বটতলাটা ভালো করে খুঁজলে আংটিটা এখনও খুঁজে পাওয়ার চান্স আছে।

কর্নেল জ্বলন্ত চুরুট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হলেন। তারপর চোখ খুলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—গোপীমোহনবাবুর সব সময় বেহালা সঙ্গে রাখা এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই বেহালা গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা এই কেসে খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, জয়ন্ত!

একটু চমকে উঠে বললুম,—তাহলে কি গোপীবাবুর বেহালার ভেতর আংটি লুকোনো ছিল?

—খুনির বেহালার ওপর রাগের কী কারণ থাকতে পারে?

উত্তেজিতভাবে বললুম,—কর্নেল! তাহলে আজ রাত্রে খুনি মন্দিরে ঢুকবে!

—খুনি অত বোকা নয়। সে হালদারমশাইকে গতকাল এবং আমাদের আজ জমিদারবাড়িতে দেখেছে। আমাদের কথাবার্তাও শুনেছে। তাই সে সতর্ক হতে বাধ্য। আর তার ওই সতর্কতার আভাস আমরা পেয়েছি নকুলঠাকুরের সামনে ফেলারামের প্রেতাত্মার আবির্ভাবে। প্রেতাত্মা আংটি চাইছিল ওঁর কাছে। ওটা খুনির একটা চাল। আমাদের সে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে।

—কর্নেল! তাহলে খুনি কি জমিদারবাড়িরই কেউ?

কর্নেল আবার চোখবুজে হেলান দিলেন। তারপর আস্তে বললেন,—অবশ্যই।

—সেই লোকটাই কি গলায় দড়ির ফাঁস আটকে ফেলারামবাবুর ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে?

আবার কে?—বলে কর্নেল ধ্যানমগ্ন হলেন।

ছয়

রাত্রে খাওয়ার সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। খাওয়ার পর দোতলায় আমাদের ঘরে এসে কর্নেলকে বলেছিলুম,—হালদারমশাই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আছেন। এই বৃষ্টিতে ওঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে।

কর্নেল বলেছিলেন—একালের সন্ন্যাসীরা রিস্টওয়াচ পরেন। গাড়ি চাপেন। রেলগাড়ি, বাসমোটর বা প্লেনেও চাপেন দেখেছি। বৃষ্টিতে তাঁরা রেনকোট পরতেও পারেন। যাই হোক, ওসব চিন্তাভাবনা না করে শুয়ে পড়া যাক। বৃষ্টির রাতে বিছানা খুব আরামদায়ক হয়ে ওঠে।

বিছানা সত্যি আরামদায়ক হয়েছিল। ঘুম ভেঙেছিল কারও ডাকাডাকিতে। চোখ খুলে দেখি, একটা লোক আমার জন্য বেড-টি এনেছে।

নিশ্চয়ই কর্নেলের নির্দেশ। উঠে বসে চায়ের কাপপ্লেট নিয়ে বললুম,—কর্নেলসায়েব কি বেরিয়েছেন?

লোকটি বিনীতভাবে বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বাবুমশাই আর সায়েব ভোরবেলা গঙ্গার বাঁধে বেড়াতে গেছেন।

জিগ্যেস করলুম,—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, আমার নাম বেচারাম। সবাই বেচু বলে ডাকে।

—আচ্ছা বেচু, তুমি ঝাঁপুইহাটির ওদিকে ডাকিনীতলায় কখনও গেছ?

—চৈত্র সংক্রান্তির রাত্তিরে ওখানে এ তল্লাটের অনেকে মানত দিতে যায়। আমিও যাই।

—ডাকিনীতলা মানে কি কোনও গাছ?

বেচু মুখে ভয়-ভক্তির ভাব ফুটিয়ে বলল,—স্যার! ওই গাছটার নাম অচিন গাছ। অমন গাছ আমি কোথাও দেখিনি। চৈত্র-সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলা ঢাকঢোল, কাঁসির বাজনা শুরু হলেই গাছটার ডালপালা থরথর করে কাঁপে। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। জেলেদের মুখে শুনেছি, রাতবিরেতে ওই গাছে ডাকিনীর কান্না শোনা যায়।

—ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিতে অন্যসময় মানুষজন যায় না?

—কার বুকের পাটা? একাদোকা গেলে মুখে রক্ত উঠে মারা পড়বে যে! একবার ঝাঁপুইহাটির একটা লোক সাহস করে গিয়েছিল। তারপর তার আর পাত্তা নেই। তখন দলবেঁধে অনেক লোক নৌকোয় চেপে ডাকিনীতলায় তাকে খুঁজতে গেল। গিয়ে দেখে, লোকটা ডাকিনীতলায় পড়ে আছে। রক্তবমি করে মারা পড়েছে।

—কতদিন আগের কথা এটা?

—এই তো গতবছর। বাবুগঞ্জের লোকও ঝাঁপুইহাটিতে গিয়ে তার মড়া দেখতে ভিড় করেছিল।

এই সময় নিচের তলা থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাকল। বেচারাম তখনই চলে গেল। বুঝলুম সে আরও কিছু সাংঘাতিক ঘটনার কথা বলত। সুযোগ পেল না।

কর্নেল ফিরলেন সওয়া নটায়। সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

বললুম,—মর্নিং কর্নেল! আশা করি আপনি স্লুইস গেটের কাছে অশ্বত্থ গাছে সেই গগনবেড় পাখির দর্শন পেয়েছেন?

টুপি, পিঠে-আঁটা কিটব্যাগ, ক্যামেরা আর বাইনোকুলার টেবিলে রেখে কর্নেল বললেন,—আমার দুর্ভাগ্য! ক্যামেরায় টেলি-লেন্স ফিট করার সময় দুষ্টু পাখিটা তার প্রকাণ্ড ঠোঁট ফাঁক করে আমাকে গালাগালি করে উড়ে গেল। বাইনোকুলারে দেখলুম, উড়তে-উড়তে সে ডাকিনীতলার জলটুঙ্গির জঙ্গলে চলে গেল। সম্ভবত সেখানে ওর জুটি আছে। বাসা থাকাও সম্ভব। বাসাতে ওদের কাচ্চাবাচ্চা থাকার মরশুম এটা।

—আপনারা কি গঙ্গার বাঁধে হাঁটতে-হাঁটতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। এবার যাব হেমেনবাবুর পানসি নৌকোতে।

—সাবধান কর্নেল! কিছুক্ষণ আগে বেচু বেড-টি দিতে এসে বলল, গতবছর ডাকিনীতলায় একটা লোক গিয়ে রক্তবমি করে মারা পড়েছিল।

কর্নেল হাসলেন,—লোকেরা একটু বাড়িয়ে বলে। হেমেনবাবুর কাছে শুনেছি, একটা লোক চুরি করে কাঠ কাটতে গিয়েছিল ডাকিনীতলার জঙ্গলে। সাপের কামড়ে মারা পড়েছিল।

শিউরে উঠলুম,—সর্বনাশ! সন্ন্যাসীবেশী হালদারমশাই কোনও কারণে ওখানে রাত কাটাতে গেলে সাপের পাল্লায় পড়বেন!

কর্নেল বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন,—হালদারমশাই একসময় জাঁদরেল দারোগাবাবু ছিলেন। রাতবিরেতে বনবাদাড়ে চোর-ডাকাতের খোঁজে বিস্তর হানা দিয়েছেন। সাপ সম্পর্কে তাঁর সতর্কতা স্বাভাবিক। যাই হোক, আমরা নটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট করে বেরুব।

হেমেনবাবুর বাড়ির উত্তরে বাঁধানো ঘাটে একটা পানসি নৌকো বাঁধা ছিল। আমরা সেই পানসিতে চাপলুম। পেছনে হালের মাঝি, সামনে দাঁড়ের মাঝি। হেমেনবাবুর হাতে দোনলা বন্দুক। তাঁকে জিগ্যেস করলুম,—বিলের জলে শানবাঁধানো ঘাট কীভাবে তৈরি করেছেন?

হেমেনবাবু বললেন,—কোনও-কোনও বছর গ্রীষ্মকালে বিলের জল কমে যায়। ওই ঘাট থেকে দূরে সরে যায়। বছর দশেক আগে এলাকায় ভীষণ খরা হয়েছিল। সেই সুযোগে পাকাঘাট তৈরি করেছিলুম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়ন্ত একটু চিন্তা করলেই কথাটা বুঝতে পারত। সত্যি হেমেনবাবু! জয়ন্ত কীভাবে সাংবাদিকতা করে, আমার কাছে এটা এখনও রহস্য।

মনে-মনে চটে গিয়ে বললুম,—ইঞ্জিনিয়াররা জলভরা নদীতে ব্রিজ তৈরি করেন। তাই আমি ভেবেছিলুম, সেইভাবেই ঘাটটা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রচুর টাকা খরচ হয়। তাই—

আমার কথা চাপা পড়ল কর্নেলের কথায়। বাইনোকুলারে তিনি দূরে একটা জলটুঙ্গি দেখতে-দেখতে বলে উঠলেন,—কী আশ্চর্য! সেই সন্ন্যাসী একটা গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে বসে আছেন দেখছি! ওখানে একটা ছোটো ছিপনৌকো বাঁধা আছে। কোনও শিষ্য নৌকোটা গুরুদেবের সেবার জন্য দিয়েছেন হয়তো!

হেমেনবাবু বললেন,—নৌকোটা তাহলে ঝাঁপুইহাটির চরণ-জেলের। গাঁজার প্রসাদ পেতে এবার চরণ সন্ন্যাসীর সঙ্গ ধরেছে।

বিলের জল উত্তাল বাতাসে দুলে উঠছিল। যত পানসি নৌকো এগোচ্ছে, ঢেউ ক্রমশ বাড়ছে। কর্নেল ছইয়ে হেলান দিয়ে টাল সামলাচ্ছিলেন। আকাশে আজ ভাঙাচোরা মেঘ। মাঝে-মাঝে উজ্জ্বল রোদ্দুর ঝলসে উঠছে। জলটুঙ্গিটা প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। খালিচোখে চাপ-চাপ

সবুজের পুঞ্জ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ কর্নেল বললেন,—হেমেনবাবু! মাঝিদের বলুন, আমরা সোজা উত্তরে এগিয়ে ডাকিনীতলার পশ্চিমদিকে নামব। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ করা উচিত হবে না। তাছাড়া গগনবেড় পাখিটাকে ওইদিকেই জলটুঙ্গিতে যেতে দেখেছি।

হেমেনবাবু সেইমতো নির্দেশ দিলেন। তারপর আমাকে বললেন,—বুঝলেন জয়ন্তবাবু, আজকাল আইন হয়েছে, পাখি বা বন্য জীবজন্তু মারা চলবে না। তবে আমি বহুবছর আগে পাখি শিকার করা ছেড়ে দিয়েছি। বন্দুকটা নিয়েছি অন্য কারণে। বিলের কোনও-কোনও জলটুঙ্গিতে ডাকাতদের ডেরা থাকে। জেলেদের ওরা কিছু বলে না। জেলেদের সঙ্গে ওদের শর্ত হল, জেলেরা ওদের কথা গোপন রাখবে। তাহলে জেলেরা নিরাপদে মাছ ধরতে পারবে। কিন্তু আমাকে জলডাকাতরা শত্রু মনে করে। ওদের হাতেও আজকাল ফায়ার আর্মস থাকে।

বললুম,—সর্বনাশ! আপনাকে দেখলে তাহলে ওরা যদি গুলি ছোড়ে?

হেমেনবাবু হাসলেন,—ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিতে ডাকাতরা ডেরা পাতে না। কারণ ওই জলটুঙ্গিটা ঝাঁপুইহাটি গ্রামের কাছে। খালিচোখেই পুলিশ ওদের দেখতে পাবে। তাছাড়া ডাকাতরাও গ্রাম্য লোক। ডাকিনী সম্পর্কে ওদের মনে আতঙ্ক আছে। তাই চৈত্র সংক্রান্তির রাতে গোপনে ডাকিনীতলায় মানত দিতে আসে।

বাতাস বইছিল পূর্বদিক থেকে। তাই আমাদের নৌকো উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারছিল। কাছে ও দূরে জেলেনৌকো দেখতে পাচ্ছিলুম। ডাকিনীতলার জলটুঙ্গির পশ্চিমে গিয়ে এবার সামনে থেকে বয়ে আসা বাতাসের চাপে নৌকোর গতি কমে গেল। কর্নেল বাইনোকুলারে এখন সম্ভবত গগনবেড় পাখি খুঁজছিলেন।

ডাকিনীতলার জলটুঙ্গির পশ্চিমদিকে পানসি যখন ভিড়ল, তখন প্রায় বারোটা বাজে। হেমেনবাবু দাঁড়ের মাঝিকে বললেন,—পবন! তোমার খুড়ো পানসিতে বসে বিশ্রাম নিক। তুমি দা আর লাঠি নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলো। এখানে ঝোপঝাড় কম। দায়ে কেটে পথ করতে হবে। লাঠি বাঁ-হাতে রেডি রাখবে। সাপের উপদ্রব আছে শুনেছি।

পবন বলিষ্ঠ গড়নের যুবক। কষ্টিপাথরে গড়া যেন তার শরীর। গলায় শখ করে রুপোর সরু হার ঝুলিয়েছে। তাতে একটা ছোটো লকেটে কোনও সাধুবাবার ছবি দেখলুম। বাঁ-বাহুতে একটা তামার মাদুলি লাল সুতোয় বাঁধা আছে। সে এক লাফে লাঠি আর লম্বাটে দা হাতে নিয়ে নেমে একটা গাছের গুঁড়িতে নৌকোর কাছি শক্ত করে বেঁধে দিল। তারপর বলল,—বাবুমশাই! ওই দেখুন ঝোপঝাড়ের ভেতর পায়ে-চলা পথ। এ তো আশ্চর্য ব্যাপার! এদিকে নৌকো ভিড়িয়ে কারা চলাচল করে। ডাকাতরা এখানে ঘাঁটি করেনি তো?

কর্নেল নৌকো থেকে নেমে বাইনোকুলারে খুঁটিয়ে দেখে বললেন,—সামনে ঘন জঙ্গল দেখছি। পথটা চলে গেছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। দেখা যাক, ডাকাতরা কীভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করে।

হেমেনবাবু বললেন,—কর্নেল! অকারণ ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী?

পবন বলল,—জঙ্গলের আড়াল থেকে ডাকাতরা গুলি ছুড়তে পারে স্যার!

কর্নেল বললেন,—তাহলে আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি চুপিসাড়ে গিয়ে দেখে আসি কোথায় পথটা শেষ হয়েছে!

কর্নেল হেমেনবাবু বা পবনের নিষেধ শুনলেন না। অগত্যা আমরা তিনজনে তাঁকে অনুসরণ করলুম। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল ঘুরে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিতে বললেন—কথা বলা চলবে না।

উঁচু গাছের পর ঝোপঝাড়ের ভেতর পথটা ডাইনে ঘুরেছে। সেই বাঁকের মুখে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে কর্নেল থামলেন। এবার কাদের চাপাগলায় কথাবার্তা শোনা গেল। আমরা কর্নেলের কাছে

গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলুম। স্যাঁতসেঁতে ঘাসে ঢাকা মাটি। রাতের বৃষ্টির জল ঝোপের নিচের পাতায় আটকে ছিল। আমাদের ভিজিয়ে দিল। কিন্তু তখন আমাদের কান কাদের কথাবার্তার দিকে। এইসব কথা কানে আসছিল :

—ফেলারামবাবুর কথা মিথ্যা হতেই পারে না। গতরাত্রে বৃষ্টির সময় সুযোগ ছিল।

—কিন্তু কালী ব্যাটাচ্ছেলে যে সারা রাত জেগে থাকে। ওর চোখে এড়িয়ে বাড়ি ঢোকা কঠিন।

—কালী করবেটা কী? পাইপগানের গুলিতে ওর মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

—তা না হয় দিলুম। কিন্তু বুড়োকর্তা দোতলা থেকে বন্দুকের গুলি ছুড়বে যে! কাল তোরা বৃষ্টির সময় পাঁচিল ডিঙোতে চাইছিলি। অত উঁচু পাঁচিল ডিঙোতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকতে হবে।

—হ্যাঁ রে! গুপীবাবুও তো বলেছিল মন্দিরে মেঝেতে সাত রাজার ধন লুকোনো আছে।

—আছে তো বটেই। তা না হলে কি ফেলারামবাবু মারা পড়ে? গুপীবাবুরও একই দশা হয়?

—গুপীবাবু আমাকে বলেছিল, কালীর এক ঘুঁসিতেই ফেলারাম পটল তুলেছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

—হাসিস নে! রাগে আমার মাথা খারাপ হয়ে আছে। তারপর গুপীবাবুও মারা পড়ল।

—মাইরি! গুপীবাবুকে গাবতলায় কে মারল কে জানে! কেন মারল বুঝি না!

—ন্যাকা! বুঝিস না কিছু? ফেলারাম মুখুজ্জে বুড়োকর্তার ঠাকুরদার কী বই পড়ে জানতে পেরেছিল মন্দিরে সাত রাজার ধন লুকোনো আছে। গুপীবাবুকে ফেলারামবাবু জুটি করতে চেয়েছিল। দু'জনই মারা পড়ল। পুলিশ মাইরি বুড়োকর্তার টাকা খেয়ে সব জেনেও চুপ করে আছে।

—ফেলারামবাবুর ভূতের গুজব রটেছে। ব্যাপারটা বোঝা যায় না। হ্যাঁ রে! আমাদের কেউ রাতবিরেতে ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে না তো?

—বলা যায় না। ঘরের শত্রু বিভীষণ থাকতেই পারে। ভেবেছে, জমিদার বাড়িতে ভয় দেখিয়ে একা মন্দিরের ধনরত্ন বাগিয়ে নেবে।

—আমরা ছ'জন আছি দলে। ছ'জনই এখানে আছি। ডাকিনীমায়ের দিব্যি খেয়ে প্রত্যেকে বল—

—চুপ! সেই সাধুবাবা এদিকে আসছে। শোন। লোকটা সাধু নয়। সাধু সেজেছে! কিছু মতলব আছে।

—উঠে পড় সবাই। কুতুবপুরের জলটুঙ্গিতে মঘাদা আসবে বলেছে। মঘাদা যা বলে, তা-ই করব। আর সাধুবাবার কথা বলছিস? যাওয়ার সময় ওকে ল্যাং মেরে দেখি, সত্যি-সত্যি সাধু নাকি।

—আই! ওদিকে যাসনে। নৌকো এদিকে রেখেছি। বাবুগঞ্জের হেমেনবাবুর পানসি দেখেছি ওদিকে কোথায় যাচ্ছে।

—চুপ! উঠে পড়। আর নয়। আরে! সাধুবাবা কি লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিল নাকি? তবে রে!

তারপর আর কোনও কথা শোনা গেল না। এলোমেলো উত্তাল বাতাসে গাছপালার শব্দ অন্য কোনও শব্দ ঢেকে দিল। কর্নেলের ইশারায় আমরা ওই অবস্থায় বসে রইলুম। মিনিট পাঁচেক পরে হেমেনবাবু চাপাস্বরে বললেন,—চিনতে পেরেছি। ওরা মঘাডাকাতের চেলা। আমার মনে হচ্ছে, ফেলারামবাবু গোপীবাবু মন্দিরের গুপ্তধনের আশায় মঘাডাকাতের দলের সাহায্য নিতে চেয়েছিল।

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন,—সন্ন্যাসীর ওপর ওরা হয়তো হামলা করেছে! সন্ন্যাসী একা। ওরা ছ'জন। চলুন। ব্যাপারটা দেখি!

ঝোপের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে-যেতে কর্নেল আবার চাপাস্বরে বললেন, —হেমেনবাবু! দরকার হলে ওদের মাথার ওপর দিয়ে ফায়ার করবেন! জয়ন্ত! তোমার ফায়ার আর্মস বের করো! পবন! তুমি আমাদের পেছনে থাকবে।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। হালদারমশাইয়ের কাছে তাঁর রিভলভার থাকার কথা। কিন্তু রিভলভার বের করার সুযোগ পাবেন কি? ছ'জন ডাকাতের সঙ্গে একা লড়বেন কী করে? ওরা ওঁকে প্রাণে মেরে ফেলতেও পারে।

এবার একটুকরো ফাঁকা ঘাসের জমি। তারপর উঁচু-নিচু গাছের ঘন জঙ্গল। বর্ষায় জঙ্গল দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। তার ওদিকে কোথাও হালদারমশাইয়ের গর্জন শোনা গেল,—হালাগো গুলি কইরা মারুম! ছাড়। ছাড় বলছি। খাইসে! হালারা সত্যই ডাকাত। আমারে বান্ধিস ক্যান তোরা?

কর্নেল ইশারায় হেমেনবাবুকে শূন্যে ফায়ার করতে বললেন। তারপর ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে তিনি ছুটে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম আমরা। পবন গর্জে উঠল,—মুণ্ডু কেটে বলি দেব। আমার বাবাও ডাকাত ছিল! আমি গগন ডাকাতের ছেলে!

এতক্ষণে দেখলুম, হালদারমশাই একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা আছেন। কিন্তু তাঁর জটাজুট খসে পড়েনি। ডাকাতরা তাঁর দাড়িও ওপড়ায়নি। সম্ভবত সে-সুযোগ পায়নি। অতর্কিতে ঝোপ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বেঁধে ফেলেছে। তারপর হেমেনবাবুর গুলির শব্দে ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

হেমেনবাবু বললেন,—পবন! তুমি তোমার খুড়োকে গিয়ে দ্যাখো। তার বিপদ দেখলে ডাকবে।

পবন চলে গেল। কর্নেল ততক্ষণে কিটব্যাগ থেকে তাঁর জঙ্গল-নাইফ বের করে দড়ি কেটে গোয়েন্দাপ্রবরকে মুক্ত করলেন। বললেন,—আপনার ঝুলি কোথায়?

হালদারমশাই বললেন,—ভুল করছি। ঝুলি সঙ্গে লই নাই। ঝুলিতে আমার ফায়ার আর্মস আছে। কিন্তু আপনারা আইয়া পড়লেন কীভাবে? নাকি স্বপ্ন দেখতাছি?

হেমেনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—কী আশ্চর্য! মিঃ হালদার যে!

হালদারমশাই বললেন,—হঃ! আর কইবেন না। চরণ কইছিল, ডাকিনীতলায় একদল ডাকাত ঘাঁটি করছে। কিন্তু ডাকাতগো পিছনে লাগার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। এক মিনিট! ডাকিনীতলায় আমার ত্রিশূল আর ঝুলি আছে। লইয়া আসতাছি। আপনারা এদিকে আউগাইয়া যান। ডাকাতগো ঘাঁটি দেখবেন!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেলেন। কর্নেল উলটোদিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর চলার পর দেখলুম, ওলটানো মস্ত নৌকোর মতো একটা কুঁড়েঘর। উলুকাশ দিয়ে চাল তৈরি করা হয়েছে। কাঠমোটা গাছের ডাল কেটে বানানো। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এই ডেরাটা বেশিদিনের নয়।

উঁকি মেরে দেখলুম, ভেতরে ব্যানাখড়ের ওপর কয়েকটা চট বিছানো আছে। আর কিছু নেই। জিনিসপত্র সবই নিয়ে পালিয়েছে ডাকাতেরা।

কর্নেল বললেন,—হেমেনবাবু! পুলিশকে জানিয়ে দেবেন, আজ সন্ধ্যার পর যেন কুতুবপুরের জলটুঙ্গি পুলিশ ঘিরে ফেলে।

হেমেনবাবু বললেন,—তা আর বলতে? মঘাডাকাতের দল গতমাসে বাবুগঞ্জে দুটো বাড়িতে ডাকাতি করেছে। আমার বাড়িতে হামলা করতে এসেছিল। উত্তরের জানালা দিয়ে দু'রাউন্ড ফায়ার করে ভাগিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু ওরা এবার জয়কুমারের গৃহদেবতার মন্দিরে হামলার চক্রান্ত করেছে। খুব ভাবনার কথা।

হালদারমশাই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ছেড়ে প্যান্টশার্ট পরে আবির্ভূত হলেন। ছদ্মবেশের সঙ্গে গেরুয়া ঝুলি ওঁর পলিথিনের ব্যাগে ঢুকেছে। কিন্তু ত্রিশূলটা নেই। তিনি বললেন,—চরণ কইছিল এই কুঁড়েঘরের কথা। সে গোপনে দেখছিল একদিন। তো কাইল রাত্রে বৃষ্টির সময় টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে এখানে আইলাম। দেখলাম, কেউ নাই। হালারা আইজ ভোরবেলা আইছিল। আমি আরামে রাত কাটাইয়া খুব ভোরে ডাকিনীতলায় গিছলাম।

বললুম,—আপনার ত্রিশূল কোথায় গেল হালদারমশাই?

গোয়েন্দাপ্রবর হাসলেন,—ত্রিশূল অর্ডার দিয়া বানাইয়া লইছি। পার্ট বাই পার্ট খুইল্যা ব্যাগে রাখা যায়। মড়ার খুলিটা প্লাস্টিকের।

কর্নেল বললেন,—আপনি ডাকিনীতলায় রাত্রি জাগতে এসেছিলেন কেন?

হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—চরণ কইছিল, গোপীবাবুরে সে গাঁজার লোভে কোনও-কোনও রাত্রে ডাকিনীতলায় লইয়া আইত। তারপর গোপীবাবু ডাকিনীর গাছের ডালে উঠতেন। বেহালা বাজাতেন! গোপীবাবুর গাছের ডালে বইস্যা বেহালা বাজানোর কথায় আমার খটকা বাধছিল। তাই কাল সন্ধ্যার পর ডাকিনীতলায় আইছিলাম। কথামতন চরণ নৌকা লইয়া খাড়া ছিল। তার লোভ গাঁজার। আমি তারে পাঁচ টাকা দিয়ে কইলাম, তুমি যেখানে হইতে পারো, গাঁজা লইয়া আও। আমি ধ্যানে বসি। চরণ গাঁজা কিনতে গেল। তখন আমি গাছে চড়লাম। যে-ডালে বইয়া গোপীবাবু বেহালা বাজাতেন, চরণ দেখাইয়া দিছিল। টর্চের আলোয় দেখি, ডাল যেখানে গাছের কাণ্ড হইতে বারাইছে, সেই জোড়ের মুখে কালো এক ইঞ্চি পিচের মতো জিনিস ঠাসা। ছুরির ডগা দিয়া উপড়াইয়া দেখি—এই দেখেন, কী লুকানো ছিল!

হালদারমশাই প্যান্টের পকেট থেকে যা বের করলেন, তা দেখে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম,—এই তো সেই কিং সলোমন'স রিং। রাজা সলোমনের আংটি!

সাত

হেমেনবাবুর পানসি নৌকোয় চেপে আমরা তাঁর বাড়ি পৌঁছলুম। তখন দুটো বেজে গেছে। খাওয়ার পর হালদারমশাই বললেন,—ইরিগেশন বাংলো হইতে কাইল লাঞ্চ খাইয়াই চেক আউট করছি। অরা কইল, পেমেন্ট হেমেনবাবু করবেন। আপনি শুধু বিলে সই করেন। এটা কেমন কথা?

হেমেনবাবু বললেন,—ও নিয়ে চিন্তা করবেন না মিঃ হালদার! আপনি আমার গেস্ট।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে সেই তুর্কি আংটি 'কিং সলোমন'স রিং' আতশ কাচ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। একটু পরে তিনি কিটব্যাগ থেকে একটা খুবই ছোটো স্ক্রু-ডাইভারের মতো জিনিস বের করলেন। তারপর একটা খবরের কাগজ টেবিলে বিছিয়ে তার ওপর আংটিটা রেখে তিনি সেই জিনিসটা দিয়ে আংটির ডিমালো অংশের একপাশে চাপ দিলেন। অমনি ডিমালো অংশের খাপ খুলে গেল। ভেতরে বিষের গুঁড়ো থাকবে ভেবেছিলুম। তেমন কিছু দেখলুম না। কর্নেল আংটিটা উপুড় করে ঠুকতেই ইঞ্চিটাক লম্বা সরু একটা চাবি কাগজে পড়ল। অমন খুদে চাবি এ যাবৎ কোথাও দেখিনি।

গোয়েন্দাপ্রবর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন,—ওইটুকখান চাবি কী কামে লাগবে?

কর্নেল বললেন,—সেকালের কারিগরের দক্ষতা দেখলে অবাক হতে হয়। এই খুদে চাবিটা কোনও বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি। ধাতু বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন, এটা কোন-কোন ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছিল।

হেমেনবাবু বললেন,—ওটা নিশ্চয় কোনও তালা খোলার চাবি?

—ঠিক ধরেছেন। খুদে চাবিটা আংটিতে ঢুকিয়ে আগের মতো আটকে দেওয়া যাক। ততক্ষণে আপনি থানার ও.সি.-কে ফোন করে জানিয়ে দিন, আমরা এখনই যাচ্ছি। সঙ্গে পুলিশ ফোর্স এবং অফিসার নিয়ে উনি যেন তৈরি থাকেন। গোপীবাবুর হত্যাকারীর জন্য অবশ্যই ওঁকে হাতকড়া নিয়ে যেতে হবে। আর মঘার দলকে আজ কুতুবপুরের জলটুঙ্গিতে পাকড়াও করার কথাও ও.সি..-কে বলবেন।

হেমেনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হালদারমশাইয়ের গোঁফ যথারীতি তিরতির করে কাঁপছিল। তিনি চাপাগলায় বললেন,—খুনিরে চিনলেন ক্যামনে কর্নেলস্যার?

কর্নেল হাসলেন,—খানিকটা তথ্য-প্রমাণ, খানিকটা অঙ্ক। দুইয়ে-দুইয়ে চার করতে পেরেছি। আপনারা দুজনে তৈরি হয়ে নিন। আমি তৈরি আছি।

সাড়ে তিনটেতে হেমেনবাবুর গাড়িতে চেপে আমরা বেরোলুম। কর্নেল প্রকাণ্ড মানুষ। অনিল-ড্রাইভারের বাঁদিকে বসলেন। আমি, হালদারমশাই আর হেমেনবাবু পেছনে বসলুম।

থানার সামনে গিয়ে দেখলুম, ও.সি. তপন বিশ্বাস পুলিশ-জিপের পাশে বেটন হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। জিপের পেছনে ঠাসাঠাসি করে সশস্ত্র পুলিশেরা বসে আছে। ও.সি.-র পাশে এক পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কর্নেলের উদ্দেশে সেলাম ঠুকলেন। তপনবাবু বললেন,—ইনি গোপীবাবুর মার্ডারকেসের আই.ও—ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, সাব-ইন্সপেক্টর মনোরঞ্জন পাল।

কর্নেল বললেন,—আমরা জমিদারবাড়িতে ঢোকার মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে আপনারা ঢুকবেন। ততক্ষণ একটু তফাতে অপেক্ষা করবেন। আমবাগানের কাছে রাস্তার মোড়ে আপনারা থাকলে জমিদারবাড়ি থেকে কেউ দেখতে পাবে না।

আধঘণ্টা পরে জমিদারবাড়ির গেটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! আমরা এগোচ্ছি। কালীনাথ আমাদের দেখতে পেয়েছে। আপনাকেও চিনতে পারবে। আপনি বলবেন, ওই বটগাছটার ফল খুব মিষ্টি। আমি কয়েকটা পাকা ফল নিয়ে আসি। বলে আপনি বটতলায় থাকবেন।

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন,—ওখানে খাড়াইয়া থাকুম! ক্যান?

—যথাসময়ে জানতে পারবেন। কুইক!

কালীনাথ এসে করজোড়ে প্রণাম করে বলল,—কর্তামশাই আপনার জন্য অস্থির হয়ে আছেন। কাল রাত্রে বৃষ্টির সময় উনি লাইব্রেরি ঘরের জানালায় আবার ফেলারামবাবুকে দেখেছেন!

হালদারমশাই বটগাছটার দিকে তাকিয়ে বললেন,—এমন বটগাছ কোথাও দেখি নাই! কর্নেলস্যার! দেখছেন ফলগুলি কত মোটা আর লাল টুকটুকে। আমি খাইয়া দেখছিলাম। খুব মিঠা।

বলে তিনি বাড়ির উত্তরে কম্পাউন্ড ওয়ালের কাছে বিশাল বটগাছটার দিকে চলে গেলেন। কর্নেল, আমি আর হেমেনবাবু কালীনাথকে অনুসরণ করলুম। সেই অর্ধবৃত্তাকার উঁচু রোয়াকে জয়কুমারবাবু কালকের মতো ছড়ি-হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কালীনাথ আর ভোলা কয়েকটা চেয়ার এনে দিল। জয়কুমার বললেন,—ভোলা! শিগগির গিয়ে কফির ব্যবস্থা কর।

ভোলা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বারান্দা দিয়ে চলে গেল। আমরা বসার পর জয়কুমারবাবু গতরাতে বৃষ্টির সময় লাইব্রেরি ঘরের জানালায় গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো ফেলারামের আবির্ভাবের কথা বললেন। কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—আপনি গুলি করবেন বলেছিলেন। গুলি করেননি?

জয়কুমারবাবু বললেন,—বন্দুকের নল ওঠাবার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্নেলসায়েব! এর একটা বিহিত করুন। আর কত উপদ্রব সহ্য করা যায়?

—বিহিত করতেই এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূতটা ধরা পড়বে। তবে এবার আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন।

—বলুন!

—আপনার ঠাকুরদার নাম কী ছিল?

—অভয়কুমার রায়চৌধুরি। আমার বাবার নাম অক্ষয়কুমার রায়চৌধুরি।

—আপনার ঠাকুরদা কি কখনও বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বাধ্য হয়ে ওঁকে স্বেচ্ছাসৈনিক হতে হয়েছিল। কথাটা অদ্ভুত শোনাবে। কিন্তু দেশীয় রাজা জমিদারদের ওপর ব্রিটিশ সরকার প্রচুর যুদ্ধ-করের বোঝা চাপিয়েছিল। অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ঠাকুরদার ছিল না। তাছাড়া তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছিল। তাই তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পক্ষে তুরস্ক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই সব কথা তাঁর লেখা 'আমার জীবন' বইয়ে ছিল।

—ছিল, মানে এখন বইটা কি নেই?

—ওই বদমাশ নেশাখোর ফেলারাম বইটা চুরি করে কোথায় কাকে বেচে দিয়েছিল।

—আপনি তো বইটা পড়েছিলেন?

—পড়েছি। অনেকবার পড়েছি।

—তাতে কি সেই আংটির কথা ছিল না?

জয়কুমারবাবু চাপাস্বরে বললেন,—ছিল। আংটিটা তিনি একজন মৃত তুর্কি সেনার আঙুল থেকে কৌতূহলবশে খুলে নিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন, ওতে সাংঘাতিক বিষ ভরা আছে। তাই আংটি খুলে বিষের গুঁড়ো ফেলে দিয়েছিলেন।

—আপনার ঠাকুরদা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে ধনী তুর্কি বণিক আজিজ কোকার বাড়ি লুঠ করেছিলেন?

জয়কুমারবাবু অবাক হয়ে বললেন,—আপনি কি বইটা পড়েছেন? বইটা কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যেতে পারে। দুষ্প্রাপ্য বই।

এবার আমাকে অবাক করে হেমেনবাবু বললেন,—আপনার ঠাকুরদার এককপি 'আমার জীবন' আমার ঠাকুরদা অজিতেন্দ্র সিংহরায়কে উপহার দিয়েছিলেন। আজ সকালে কর্নেলসায়েবকে বইটা দিয়েছিলুম।

জয়কুমারবাবু বললেন,—তাহলে লুকিয়ে লাভ নেই। আমার ঠাকুরদা আজিজ কোকার বাড়ি লুঠের সময় একছড়া নানা রত্নখচিত হার হাতিয়েছিলেন। সেই হারে যে সূক্ষ্ম নকশা ছিল, তাকে বলা হয় অ্যারাবেস্ক। এ আর এ বি ই এক্স! অর্থাৎ আরবদেশের সূক্ষ্ম নকশা! বইয়ে লেখা ছিল, —'হারছড়া আমি গোপনে এনেছিলুম। কখনও ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটলে তা স্বাধীন ভারত সরকারের কোষাগারে উপহার দেব।' আমার মুখস্থ আছে। কিন্তু হেমেন! তুমি তো কখনও আমাকে এ কথা বলোনি যে, তোমাদের বাড়িতে—

বাধা দিয়ে হেমেনবাবু বললেন,—আপনি তো জিগ্যেস করেননি, তাই বলিনি। ফেলারামাবাবু এই বইটাই চুরি করে কোথাও বেচেছে, তা কি আপনি আমাকে বলেছিলেন?

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছ।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বইয়ের শেষপাতায় শেষ বাক্যের নিচে দু'লাইন ছড়া আছে। পড়েছেন?

—হ্যাঁ। 'রুদ্রদেবের পায়ের তলে/লক্ষ হীরামানিক জ্বলে'

এই সময় কালীনাথ চা আনল ট্রেতে। ভোলা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এসে বলল,—গরুগুলো আজ খাবে কী কর্তামশাই? এখনও গ্যাঁদা ঘাস দিয়ে গেল না। দেখে আসব নাকি?

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা ভোলা! তোমার স্ত্রী শৈলর হাতে তৈরি চা কি নকুলঠাকুর খান? কাল তোমাদের কর্তামশাইকে বলতে শুনলুম, ঠাকুরমশাইকে শৈল গরম চা করে দেবে। তাই জিগ্যেস করছি।

জবাব দিলেন জয়কুমারবাবু। বললেন,—খাবে না কেন? স্বজাতি যে। এ বাড়িতে তিন মুখুজ্জে ছিল। নকুল মুখুজ্জে, ফেলারাম মুখুজ্জে আর এই ভোলারাম মুখুজ্জে। ফেলারাম লেখাপড়া শিখেছিল। চাকরি পেয়েছিল। ঘুষ খেতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে চাকরি গেল। তখন এসে আমার কাছে আশ্রয় নিলে। ভোলাকে বাবা লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। ওরা দু'ভাই। ওদের বাবা-ঠাকুরদা আমাদের জমিদারি সেরেস্তায় কর্মচারী ছিল। ভোলা টেনেটুনে নাম সই করতে পারে!

ভোলা গাল চুলকোচ্ছিল। মুখে বিব্রত হওয়ার ছাপ। এবার বলল,—গ্যাঁদাকে দেখে আসি।

কালীনাথ বলল, ওই গ্যাঁদা ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছে।—বলেই সে পা বাড়াল। ফের বলল,—কর্তামশাই! থানা থেকে পুলিশের গাড়ি এসেছে। বড়ো দারোগাবাবু আসছেন। সঙ্গে ছোটো দারোগাবাবু।

একজন হাফপ্যান্টপরা উদোম গা বালক মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে বারান্দার নিচে দিয়ে চলে গেল। ভোলা বলল,—এত দেরি কেন রে? গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিতে হবে।

সে বারান্দা থেকে নামছিল। কর্নেল বললেন,—ভোলা! শোনো! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভোলা হকচকিয়ে গিয়ে বলল,—আমার সঙ্গে স্যার?

—হ্যাঁ। তুমি বারান্দায় একটু বসো।

ভোলা বারান্দায় একটা থামের কাছে বসল। ও.সি. তপন বিশ্বাস, এস.আই. মনোরঞ্জন পাল এবং চারজন কনস্টেবল এল। দু'জন কনস্টেবলের হাতে রাইফেল। অন্য দু'জনের হাতে দুটো ছোটো লাঠি। জয়কুমারবাবু তাঁদের আপ্যায়ন করে কালীনাথকে বললেন,—লাইব্রেরিঘরে গিয়ে বসা যাক। কালী! লাইব্রেরি খুলে দে।

লাইব্রেরিঘরে যাওয়ার সময় কর্নেল ভোলাকে ডাকলেন,—তুমিও এসো ভোলা। তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব।

ভোলা তবু নড়ছে না দেখে কালীনাথ তার হাত ধরে টানল। —এসো ভোলারামবাবু! তোমাকে সায়েব ডাকছেন। হাজার হলেও বামুনের ছেলে। সায়েব তোমাকে খাতির করে ডাকছেন। এসো!

লাইব্রেরিঘরে আমরা ঢুকলুম। দরজায় কনস্টেবলরা এসে দাঁড়াল। ভোলা গম্ভীরমুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কর্নেল বললেন,—আচ্ছা ভোলা! তুমি গতবছর জুন মাসে কর্তাবাবুর হুকুমে বটের ডাল কাটতে উঠেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পা ফসকে পড়ে গিয়ে তোমার পায়ের হাড় ভেঙেছিল?

—আজ্ঞে!

—হঠাৎ তোমার পা ফসকে গেল কেন? কোনও কারণে নিশ্চয় অন্যমনস্ক হয়েছিলে। তুমি তো আগেও কতবার বটের ডাল দালান ছুঁলে কর্তার হুকুমে কেটেছিলে। কোনওবার পা ফসকায়নি। তাই মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই তুমি কিছু দেখে চমকে উঠেছিলে। আর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে—

হঠাৎ ঘুরে কর্নেল জয়কুমারবাবুকে বললেন,—তার আগেই আপনার আংটি হারিয়েছিল। তাই না?

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কাল কাকের স্বভাবের কথা আপনি বলছিলেন!

কর্নেল হাসলেন—হ্যাঁ। একটা কাক বাথরুমে উঁচু জানালায় রাখা আপনার আংটি তুলে নিয়ে গিয়ে বটগাছে তার বাসায় রেখেছিল। প্রসঙ্গত বলি, আংটিতে জলস্পর্শ বারণ ছিল। তার কারণ, আংটির ভেতরে একটা লুকোনো জিনিসে মরচে ধরার সম্ভাবনা ছিল। যাই হোক, ভোলা ডাল

কেটে নামবার সময় কাকের বাসায় আংটি দেখে চমকে উঠেছিল। তার দাদা ফেলারামের কাছে সে ওই আংটির গোপনকথা শুনেছিল। তাই উত্তেজনায় সে কেঁপে উঠেছিল। আংটিটা হাতিয়ে উত্তেজনার চোটে সে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিল। কি ভোলা? তাই না?

ভোলা মুখ নামিয়ে গাল চুলকোতে থাকল।

কর্নেল বললেন,—আংটিটা তুমি অন্য কোথাও রাখতে সাহস পাওনি। তার আগে বলি—তুমি আছাড় খেয়ে পড়ার সময় কে সবার আগে তোমার কাছে গিয়েছিল?

কালীনাথ বলল,—শৈলবালা স্যার! শৈলবালা বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চ্যাঁচামেচি শুনে আমি দৌড়ে গিয়েছিলুম।

কর্নেল বললেন,—আংটি ভোলা তার স্ত্রী শৈলবালার হাতে দিয়েছিল। শৈলবালাকে ও.সি. তপনবাবু পরে জেরা করবেন। আমার অঙ্কটা লক্ষ করুন। হাসপাতাল থেকে ফিরে ভোলা তার দাদা ফেলারামের তাগিদে—কিংবা অন্য কোনও কারণে আংটিটা বাঁয়াতবলা ফাঁসিয়ে দিয়ে তার ভেতর রেখেছিল। এদিকে গোপীমোহন হাজরা বেহালা-বাজিয়ে মানুষ। তবলা কেন ফেঁসেছে—

তাঁর কথার ওপর জয়কুমারবাবু বললেন,—গোপী তবলা সারিয়ে আনত বরাবর। তাকে তবলাটা শিগগির সারিয়ে আনতে বলেছিলুম।

কর্নেল বললেন,—তাহলে দেখা যাচ্ছে গোপীবাবু তবলার ভেতর আংটিটা দেখে তখনই আত্মসাৎ করেছিলেন। ইতিমধ্যে ফেলারামবাবু গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছেন। গোপীবাবু শিক্ষিত লোক। তিনি নিশ্চয়ই অভয়কুমার রায়চৌধুরির 'আমার জীবন' পড়েছিলেন।

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। গোপীকে আমি লাইব্রেরি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলুম। কারণ ফেলারাম প্রায়ই বই বা অন্যান্য জিনিস চুরি করে কোথায় বেচে আসত।

—বোঝা যাচ্ছে, গোপীবাবু গুপ্তধনের লোভেই আংটি বেচে দেননি। আজ দুপুরে আমরা মঘাডাকাতের চেলাদের কাছে ডাকিনীতলার জঙ্গলে শুনেছি, গোপীবাবু তাদের মন্দির লুঠ করার চক্রান্তে জড়িত ছিলেন। ওই ডাকাতদের ফেলারামবাবুই বলেছিলেন, মন্দিরে গুপ্তধন আছে। যাই হোক, ভোলা নিশ্চয় টের পেয়েছিল, মঘাডাকাতের সঙ্গে গোপীবাবুর চক্রান্ত হয়েছে। ভোলা! তাই না?

ভোলা ফুঁসে উঠল,—আমি স্বচক্ষে দেখেছি মঘার সঙ্গে গোপীবাবু গাবতলায় বসে কথা বলছে।

—তাই তুমি সাহস পাওনি গোপীবাবুকে চ্যালেঞ্জ করতে। অথচ তুমি ঠিক বুঝেছিলে কে বাঁয়াতবলার ভেতর থেকে আংটি হাতিয়েছে। তাছাড়া তোমার এক পায়ে জোর নেই। তাই অবশেষে তুমি তোমার দাদার ভূত সেজে ভয় দেখাতে শুরু করলে!

জয়কুমারবাবু বললেন,—ফেলারামের মুখে গোঁফদাড়ি ছিল!

কর্নেল হাসলেন,—ভোলা নকল গোঁফদাড়ি পরলে তাকে দাদার মতো দেখাবে। তাই না?

জয়কুমারবাবু ছড়ি তুলে গর্জন করলেন,—ওরে বজ্জাত! ওরে নেমকহারাম!

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আমি এখনই আসছি। কাল বিকেলে বটতলায় ঘোরাঘুরি করে আমি কিছু জিনিস আবিষ্কার করেছি। নিয়ে আসছি।

জয়কুমারবাবু বললেন,—আর কি তা আছে? ভোলার দজ্জাল বউ শৈল এতক্ষণে তা লুকিয়ে ফেলেছে।

হেমেনবাবু বললেন,—বটতলায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার পাহারা দিচ্ছেন।

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। লাইব্রেরি ঘরে কিছুক্ষণ ঘোর স্তব্ধতা এল। কালীনাথ ভোলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় চারজন কনস্টেবল। সেই স্তব্ধতা না এলে জানালা দিয়ে মেয়েলি গলার

কর্কশ চ্যাঁচামেচি আমরা শুনতে পেতুম না। জয়কুমারবাবু বললেন,—কালী! শৈল কাকে গালাগালি করছে দেখে আয়!

ও.সি. তপনবাবু বললেন,—কালী নয়। মনোরঞ্জনবাবু! আপনি যান। ভোলার স্ত্রীকে এখানে ডেকে আনুন।

ডাকবার দরকার হল না। কর্নেল জলকাদা মাখা একটা ছোটো চটের থলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হালদারমশাইও এসে গেলেন। তাঁদের পিছনে মধ্যবয়সিনী রোগা ফর্সা এক মহিলাও চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ঘরে ঢুকল। সে হালদারমশাইয়ের দিকে আঙুল তুলে বলল,—ওই বাঙাল মিনসের কী সাহস! বামুনের মানতের থলেয় হাত দেয়! শাপ লাগবে না? মুখে রক্ত উঠে মরবে না? আমি আমার ভাসুরের আত্মার মুক্তির জন্য মানত দিয়েছিলুম। সেই থলে ছুঁয়ে দিল? ও বুড়োসায়েব! মানতের থলে খুললে মুখে রক্ত উঠবে বলে দিচ্ছি।

কালীনাথ হাঁকল,—চো-ও-প! তুলে বিলের জলে ছুড়ে ফেলব।

ততক্ষণে থলে খুলে কর্নেল প্রথমে বের করেছেন একটা ছেঁড়া দড়ির ফাঁস। তারপর বের করলেন কাগজের মোড়ক। তা থেকে বেরুল নকল গোঁফদাড়ি। তারপর কর্নেল নিরেট লোহার ছোটো একটা প্যাঁচালো রড বের করলেন। একটু হেসে তিনি বললেন,—এটাই মার্ডার উইপন। ধুয়ে ফেললেও আতশ কাচে দেখেছিলুম, খাঁজে-খাঁজে রক্তের চিহ্ন আছে। এই থলেটা পাঁচিলের কাছে মানকচুর ঝোপের ভেতর লুকোনো ছিল। নকল গোঁফদাড়ি গত রাতে বৃষ্টির সময় পরার জন্য ভিজে গিয়েছিল। এখনও ভিজে আছে। থলেতে ঘটা করে সিঁদুরের ছোপ দেওয়া হয়েছে। মানতের জিনিস কিনা! আসলে ফেলারাম মুখুজ্জের ভূতের হামলা চালিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল।

কালীনাথ বলে উঠল,—ওই লোহার ডাণ্ডস দিয়ে গাইগরুর খুঁটি পোতা হয়। গোপীবাবু খুন হওয়ার দিন বিকেলে ভোলা গাবতলার কাছে গরুকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল।

মনোরঞ্জনবাবু উঠে গিয়ে ভোলার দু-হাত পিছনে টেনে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। জয়রামবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন,—ভোলার হাতে এত জোর যে গোপীর খুলি ফাটিয়ে মেরেছে?

কর্নেল বললেন,—প্রতিদিন যাকে গাইগরু নিয়ে গিয়ে এই লোহার রড দিয়ে খুঁটি বসাতে হয়, তার হাত এই ওজনদার দুরমুসের ঘা মারতে পোক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কথা বলতে-বলতে আচমকা ভোলারাম গোপীবাবুর মাথার পেছনে দুরমুসের ঘা মেরেছিল। আংটি হরণের প্রতিশোধ নয়। খুনের উদ্দেশ্য ছিল গোপীবাবুর বেহালার ভেতর লুকিয়ে রাখা আংটি উদ্ধার। কিন্তু আংটি বেহালার ভেতর ছিল না।

উপসংহার

ও.সি. তপন বিশ্বাসের নির্দেশে সাবইন্সপেক্টর মনোরঞ্জনবাবু সেই থলেসহ ভোলাকে এবং দুজন কনস্টেবল শৈলবালাকে নিয়ে গেল। তপনবাবু বললেন,—আমি হেমেনবাবুর গাড়িতে ফিরব। জায়গা হবে তো?

হেমেনবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই হবে।

জয়কুমারবাবুর হাত কাঁপছিল। আস্তে বললেন,—কী সাংঘাতিক কাণ্ড! কর্নেলসায়েব! আপনি কি আংটির খোঁজ পেয়েছেন?

কর্নেল পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে খুললেন। মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। বিদ্যুতের আলো ক্ষীণ! কালীনাথ হ্যাজাগ জ্বালতে গেল। টর্চের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল

অভয়কুমার রায়চৌধুরির সংগৃহীত 'রাজা সলোমনের আংটি।' কর্নেল সংক্ষেপে ডাকিনীতলার ঘটনা শুনিয়ে বললেন,—এই আংটি উদ্ধার করেছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার। আমাদের প্রিয় হালদারমশাই!

হালদারমশাই বললেন,—আংটির কথা ভাবি নাই। চরণ কইছিল, কোনও-কোনও রাত্রে গোপীবাবু গাঁজা খাইয়া একটা ডালে গিয়া বইতেন। সেখানে উনি বেহালা বাজাইতেন। এই কথায় আমার খটকা বাধছিল। ক্যান ওই ডালে বইয়া গোপীবাবু বেহালা বাজাইতেন?

কর্নেল বললেন,—এবার ভোজবাজি দেখুন! আংটির মধ্যে একটা খুবই ছোটো আর সূক্ষ্ম চাবি লুকানো আছে। এই চাবি দিয়ে সম্ভবত রুদ্রদেবের বিগ্রহের বেদি খোলা যায়। সন্ধ্যারতি শেষ হোক। তারপর আমরা মন্দিরে যাব।

জয়কুমারবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—ঠাকুরদা তাঁর বইয়ের শেষে ছড়া লিখেছিলেন : 'রুদ্রদেবের পায়ের তলে। লক্ষহীরা মানিক জ্বলে।' হ্যাঁ—সেই রত্নহার বেদির তলায় লুকানো ছিল। আমার জামাই সুভদ্র কলকাতায় একটা ট্রেডিং কোম্পানি খুলে ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছিল। ঋণের দায়ে কোম্পানি নীলাম হওয়ার মুখে আমার মেয়ে নীলা এসে আমাকে ধরল। জমিজমা বেচে সুভদ্রের ঋণ শোধ করে তাদের কাছে গিয়ে আমাকে থাকতে হবে। ছেলেদুটো তো বিদেশে। কদাচিৎ আসে। চিঠিপত্র লিখেও বাবার খোঁজ নেয় না। নীলা আর সুভদ্র প্রায়ই আসে। খোঁজখবর নেয়। তো আমি সেই রত্নহার গোপনে বের করে নীলাকে দিয়েছিলুম। বলেছিলুম—এই রত্নহার আমার ঠাকুরদার লুঠের জিনিস। রুদ্রদেবের তাই অভিশাপ লেগেছে এ বাড়িতে। এটা নিয়ে তোরা আমাকে অভিশাপ থেকে বাঁচা। তোরাও বাঁচ। রুদ্রদেবের কৃপা হয়েছিল। সে বছর জমিতে ফসলও প্রচুর পেয়েছিলুম। আমার জামাইয়ের কোম্পানি ঋণের ধাক্কা সামলে মোটামুটি ভালোই চলছে।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তাই 'রাজা সলোমনের আংটি' সম্পর্কে আর আপনার মাথাব্যথা ছিল না?

—ঠিক বলেছেন। এই আংটিতে বড়োজোর একভরির মতো সোনা আছে। তার দাম আর কতটুকু? গোপীটা বোকা। বেচে দিয়ে কোথাও পালিয়ে গেলে প্রাণে বাঁচত। গুপ্তধনের লোভে পড়েছিল হতভাগা!

ও.সি. তপন বিশ্বাস বললেন,—জয়কুমারবাবু! খুনের মামলার স্বার্থে এই আংটিটা আমি সিজ করতে বাধ্য হচ্ছি। কর্নেলসায়েবরা আছেন। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হেমেনবাবু আছেন। আমি তাঁদের সামনে আংটিটা নিচ্ছি। থানায় গিয়ে সিজার লিস্টের কপি পাঠিয়ে দেব।

আপনার অভিরুচি!—বলে জয়কুমারবাবু কালীর দিকে ঘুরলেন। সে হ্যাজাগ জ্বেলে এনেছিল। জয়কুমারবাবু হঠাৎ আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন : ওরে কালী! আমরা দুজন এই পোড়োবাড়ি পাহারা দেব। এ কী হয়ে গেল রে কালী?

নকুলঠাকুর ঘরে ঢুকে বললেন,—কর্তামশাই! আমিও তো আছি। আমার কথা ভুলে গেলেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—চলি জয়কুমারবাবু! আশা করি, আর আপনার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হবে না।

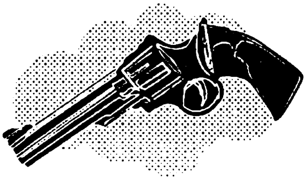

বত্রিশের ধাঁধা

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার— আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি কাগজটা ভাঁজ করে রেখে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, — জয়ন্তবাবু তো সাংবাদিক। তাই কথাটা আপনারে জিগাই।

বললুম,—বলুন হালদারমশাই।

গোয়েন্দাপ্রবর একটু হেসে বললেন,— আপনাগো কাগজে বিজ্ঞাপনে দেখি, কোনওটার হেডিং নিরুদ্দেশ। আবার কোনওটার হেডিং নিখোঁজ। ক্যান? মানে তো এক।

—এটা বিজ্ঞাপন বিভাগের লোকেদের খেয়াল। তাঁরাই তো বিজ্ঞাপনের হেডিং দেন।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটা ইংরেজি পত্রিকা পড়ছিলেন। দাঁতে কামড়ানো চুরুটের নীল ধোঁয়া তাঁর টাকের ওপর ঘুরপাক খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তিনি পত্রিকাটা বুজিয়ে রেখে বললেন,—জয়ন্তের জবাব হালদারমশাইয়ের মনঃপুত না হওয়ারই কথা।

হালদারমশাই সায় দিলেন,—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার! নিরুদ্দেশ আর নিখোঁজ। দুইরকম হেডিং অথচ একই মানে। ক্যান দুইরকম?

কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। মিটিমিটি হেসে বললেন,—হালদারমশাই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন জয়ন্ত! এটা হালকাভাবে নিও না। রীতিমতো ভাষাবিজ্ঞানের শব্দার্থতত্ত্বের মধ্যে ব্যাপারটা পড়ে।

বললুম, সর্বনাশ! এই সুন্দর সকালবেলায় ওইসব গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আওড়াবেন না প্লিজ!

—মোটেও গুরুগম্ভীর তত্ত্ব নয় জয়ন্ত! হালদারমশাই তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন পড়ছিলেন। তুমিও একবার পড়ে নিলে পারো!

এবার একটু অবাক হতে হল। আজকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে কর্নেল কোনও রহস্যের লেজ দেখতে পেয়েছেন নাকি? কাগজটা তুলে নিয়ে কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। 'নিরুদ্দেশ' শিরোনামে পর-পর দুটো বিজ্ঞাপন আছে। প্রথমটা এই :

'বাবা অমু! তুমি শীঘ্র বাড়ি ফিরে এসো। তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। টাকার দরকার হলে টেলিফোনে জানাও।—বাবা'

দ্বিতীয়টা এই :

'*পুঁটুদা, তুমি যা চেয়েছিলে তা-ই হবে। যেখানেই থাকো, ফিরে এসো। — ভুঁটু*'

এরপর 'নিখোঁজ শিরোনামের তলায় একটি প্যান্ট-হাফশার্ট-পরা বলিষ্ঠ গড়নের ছেলের ছবি। তার নিচে ছাপা হয়েছে :

'এই ছবিটি শ্রীমান দীপক কুমার রায়ের। বয়স প্রায় ১৪ বছর। গায়ের রং ফর্সা। চিবুকে একটু কাটা দাগ আছে। কেউ এর সন্ধান দিতে পারলে নগদ ১০ হাজার টাকা পুরস্কার।

পীতাম্বর রায়, ৮-১ সি ঘোষপাড়া লেন, কলকাতা - ৪৬'

এরপর জ্যোতিষী এবং তান্ত্রিকদের ছবিসহ বিজ্ঞাপন। কাগজ থেকে মুখ তুলে বললুম—নাঃ! বিজ্ঞাপনের লোকেদের খেয়াল-খুশিমতো হেডিং।

কর্নেল দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন,—হালদারমশাই ঠিক ধরেছেন। নিরুদ্দেশ আর নিখোঁজ একই ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে কথাদুটোর মানেতে যে একটা তফাত আছে, তা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

হালদারমশাই একটু উত্তেজিত হলেই ওঁর ছুঁচলো গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে কাঁপে। লক্ষ করলুম উনি উত্তেজিত। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, — হঃ! বুঝছি। যে স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালায়, তার হেডিং দিচ্ছে নিরুদ্দেশ। আর কোনওভাবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যারে বাড়িছাড়া কইর্‌য়া কেউ বা কারা গুম করে, কিংবা ধরেন, মার্ডার কইর্‌য়া ফ্যালে—

ওঁর কথার ওপর বলে উঠলুম—কী সর্বনাশ! হালদারমশাই; ওসব অলুক্ষুণে কথা প্লিজ বলবেন না।

কর্নেল বললেন,—নিখোঁজ ছেলেটির ছবি দেখার পর মার্ডার কথাটা শুনলে সত্যি খারাপ লাগে। কাজেই হালদারমশাই, এ প্রসঙ্গ থাক। হেডিং দুটোর প্রচলিত অর্থ বুঝেছেন, এই যথেষ্ট।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে তখনও উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। একটু পরে তিনি আস্তে বললেন,—কর্নেলস্যার! কর্নেল হাসলেন,—আপনি কী বললেন, বুঝতে পেরেছি হালদারমশাই। নিখোঁজ ছেলেটি সম্পর্কে আপনার উৎসাহ জেগেছে।

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—দশ হাজার টাকার জন্য না। আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির হাতে এখন কোনও কেস নাই, এ জন্যও না। কথাটা হইল গিয়া, এমন বিজ্ঞাপন মাইনষে দেয় কখন? যখন পুলিশ দিয়াও কাম হয় না, তখন।

—ঠিক বলেছেন।

—ভদ্রলোকের লগে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা হয়।

—বেশ তো। ঠিকানা দেওয়া আছে। টুকে নিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করুন।

গোয়েন্দাপ্রবর সোয়েটারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খুদে নোটবই এবং ডটপেন বের করলেন। তারপর পীতাম্বর রায়ের ঠিকানা টুকে নিয়ে বললেন,—কলকাতা ছেচল্লিশ কোন এরিয়া য্যানো?

কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোট্ট স্ট্রিট-ডাইরেক্টরি বের করলেন। তারপর পাতা উলটে দেখে নিয়ে বললেন,—ঠিকানাটা গোবরা এলাকার।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

বললুম, — যাকগে। হালদারমশাই তখন দুঃখ করছিলেন, আজকাল রহস্যের খুব আকাল চলেছে দেশে। চুরি ছিনতাই ডাকাতি খুনোখুনি প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু সবই প্রকাশ্যে আর সাদামাটা ব্যাপার। কাকেও মেরে গুম করে ফেলাটাও আর তত রহস্যজনক নয়। কাজেই দেখা যাক, এই ঘটনাটার পেছনে ছুটোছুটি করে উনি যদি কোও রহস্য খুঁজে পান, মন্দ কী?

কর্নেল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, এইসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন, — ষষ্ঠী!

একটু পরে দুজন ভদ্রলোক এসে কর্নেলকে নমস্কার করলেন। একজনের পরনে প্যান্ট শার্ট, জ্যাকেট। রাশভারী মধ্যবয়সী মানুষ। অন্যজনের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি শাল। কর্নেল প্রথমজনের উদ্দেশে বলে উঠলেন, — কী আশ্চর্য! মিঃ অধিকারী যে! বসুন, বসুন! ষষ্ঠী! শিগগির কফি চাই।

মিঃ অধিকারী বললেন, — কিছুদিন থেকেই আসব-আসব করছিলুম। শেষ পর্যন্ত আসতেই হল। আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য। আমাদের রায়গড় স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। গতবছর রিটায়ার করেছেন। কুমুদ! বুঝতেই পারছ ইনি সেই স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

এবার কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁদের আলাপ করিয়ে দিলেন। লক্ষ করলুম অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভদ্রলোকের চেহারায় যেন কিছুটা অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। চোখের তলায় কালচে ছোপ। কপালে ভাঁজ। মুখে ও চোখে বিষণ্ণতা গাঢ় ছাপ ফেলেছে।

মিঃ অধিকারীর পুরো নাম কৃষ্ণকান্ত অধিকারী। তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, — জয়ন্ত আমার বিশ্বস্ত। তাছাড়া সব ব্যাপারে ও আমার সহকারী। কথা যত গোপনীয় হোক, ওর সামনে বলতে দ্বিধা করবেন না।

মিঃ অধিকারী বললেন, — আমি অক্টোবর-নভেম্বর এই দুটো মাস ব্যবসার কাজে বাইরে ছিলুম। ফিরেছি ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে। তারপর ঘটনাটা শুনে প্রথমে পুলিশ সোর্সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। শেষে আপনার দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম। কুমুদ আমার বাল্যবন্ধু। অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাকে সাহায্যের জন্য যতদূর যেতে হয়, আমি রাজি।

— ঘটনাটা কী?

— কুমুদ! তুমিই বলো। তোমার মুখ থেকেই কর্নেলসায়েবের শোনা উচিত।

কুমুদ একটু কেশে গলা সাফ করে বললেন, — রায়গড়ে তো আপনি গেছেন! একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে খেলার মাঠ আর তার পাশে ঘন জঙ্গলটা সম্ভবত দেখেছেন!

কর্নেল বললেন, — হ্যাঁ। জঙ্গলটার অদ্ভুত নাম। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল। আমি অবশ্য কোনওরকম হাড়-মট-মট করা শব্দ শুনিনি।

মিঃ অধিকারী বললেন, — আপনাকে তো বলেছিলুম, কোনও যুগে কেউ শুকনো গাছে বাতাসের শব্দ শুনে ভূতুড়ে গল্প রটিয়েছিল। একটা ভূত নাকি হাঁটাচলা করে। আর পায়ের হাড় মট-মট করে ভাঙার মতো শব্দ হয়। বোগাস! কুমুদ! সংক্ষেপে বলো এবার।

কুমুদবাবু বললেন, — লক্ষ্মীপুজের পরদিনের ঘটনা। আমার একটিমাত্র ছেলে। সুদীপ্ত নাম। ডাকনাম দীপু। ক্লাস টেনের ছাত্র। পড়াশুনা, খেলাধুলো সবেতেই ভালো। তবে একটু একরোখা আর দুঃসাহসী। তো অন্যদিনের মতো সেদিন বিকেলে দীপু ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। ওদের খেলার কোনও সময় - অসময় থাকে না। সূর্য ডুবেছে, তখনও ওরা খেলায় মেতে আছে। জঙ্গলের দিকটায় একটা গোলপোস্ট। দীপুর কিকের খুব জোর। তার কিকে বলটা গোলপোস্টের ওপর দিয়ে জঙ্গলের ভেতর পড়েছিল। তাই দীপুই বলটা কুড়িয়ে আনতে জঙ্গলে ঢুকেছিল।

এইসময় ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। কর্নেল বললেন, — কফি খান। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

কুমুদবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও কফির পেয়ালা তুলে নিলেন কৃষ্ণকান্তবাবু তাগিদে। কয়েক চুমুক খাওয়ার পর তিনি জোরে শ্বাস ফেলে বললেন, — দীপু জঙ্গলে বল আনতে গেল তো গেলই। আর ফিরল না। আজ জানুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ। দীপু এখনও ফিরল না।

কর্নেল বললেন, — একটু খুলে বলুন প্লিজ! আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তবু সব কথা খুলে না বললে তো আমার পক্ষে এক পা এগোনো সম্ভব নয়।

কুমুদবাবু বললেন, — দীপু ফিরছে না দেখে ওর বন্ধুরা প্রথমে ডাকাডাকি করে। সাড়া না পেয়ে ওরা দীপু যেখানে জঙ্গলে ঢুকেছিল, সেখান দিয়ে ঢোকে। তখন জঙ্গলে আঁধার ঘনিয়েছে। অনেক ডাকাডাকি আর খোঁজাখুঁজি করে ওরা ভয় পেয়েছিল। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার থাকতে পারে। কিন্তু বাঘ-ভালুক থাকার কথা শোনা যায় না। ওরা রায়গড়ে ফিরে পাড়ার লোকেদের খবর দেয়। আমিও খবর পেয়ে ছুটে আসি। তারপর টর্চ-লাঠিসোঁটা আর বন্দুক নিয়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকেছিলুম। তখন শরৎকালে জঙ্গল খুব ঘন। সাপের উৎপাতও স্বাভাবিক।

কুমুদবাবু চুপ করলেন। কর্নেল বললেন, — জঙ্গলটা তো বেশ বড়। আপনারা পুরোটাই কি খুঁজেছিলেন?

— না। জঙ্গলের ভেতরে একটা গভীর ডোবা আছে। সেই ডোবার পাড়ে খানিকটা টাটকা রক্ত দেখেছিলুম। আর—

— বলুন!

— আমরা যখন রক্ত দেখছি, তখন জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত— অমানুষিক চিৎকার শুনতে পেয়েছিলুম। না— চিৎকার বলাও যাবে না। চেরা গলায় আর্তনাদ— কিংবা ওইরকম এখটা তীক্ষ্ণ কাঁপাকাঁপা হিংস্র শব্দ— শব্দটা একটানা অন্তত একমিনিট ধরে শোনা গেল। কৃষ্ণকান্তের বন্দুক আছে। ওর ভাই বরদা দুবার ফায়ার করল বন্দুকের। কিন্তু আমরা আর এগোতে সাহস পেলুম না। রক্ত দেখেই ধরে নিয়েছিলুম দীপু কোনও হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছে। বাঘ-ভালুকের কথা শোনা যায় না বটে, কিন্তু জঙ্গল তো! কোত্থেকে এসে জুটলেই হল। তবে সেই অমানুষিক চিৎকারটা কোন জানোয়ারের, তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি।

— তারপর আপনারা কী করলেন?

— সে রাত্রে থানায় খবর দিলুম। পুলিশ রাত্রে জঙ্গলে ঢুকতে রাজি হয়নি। সকালে থানার কজন সশস্ত্র কনস্টেবল নিয়ে বড়বাবু ডোবার পাড়ে রক্ত দেখেই বললেন, — দীপুকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। এলাকার লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারা জঙ্গল তোলপাড় করল। কিন্তু দীপুর চিহ্নটুকু খুঁজে পাওয়া গেল না।

কর্নেল কুমুদবাবুর কথা শোনার পর বললেন, — এটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে মিঃ অধিকারী, আপনি নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতেন না।

কৃষ্ণকান্ত অধিকারী বললেন, — আপনি ঠিকই ধরেছেন কর্নেলসায়েব! কুমুদ! এবার বাকি অংশটা বলো।

কুমুদবাবু বললেন, — দিন দশেক পরে পোস্টম্যান একটা খাম দিয়ে গেল। খামের ওপরে ইংরেজিতে আমার নাম - ঠিকানা লেখা ছিল! কিন্তু ভেতরে ছিল শুধু একটা রঙিন ফোটো। ফোটোটা দীপুর।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, — আপনার নিখোঁজ ছেলের ফোটো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি অবাক হয়েছিলুম। ফোটোটা উলটে দেখে আরও অবাক হলুম। পিছনে লাল কালিতে লেখা আছে : দীপু বেঁচে আছে। সময় হলেই বাড়ি ফিরবে।

মিঃ অধিকারী বললেন, —অদ্ভুত ব্যাপার! কুমুদ নিজের ছেলের হাতের লেখা চেনে। খামের ওপর ইংরেজি লেখা আর ফোটোর পিছনে বাংলায় লেখা নাকি দীপুর নয়।

কুমুদবাবু বললেন, — হ্যাঁ। দীপুর লেখা নয়। অন্য কেউ লিখেছে।

মিঃ অধিকারী বললেন, — খাম আর ফোটোটা কর্নেলসায়েবকে দাও কুমুদ!

কুমুদবাবু বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল খাম থেকে ফোটোটা বের করে উলটে-পালটে দেখলেন। তারপর বললেন, — হুঁ। তারপর?

কুমুদবাবু বললেন, — এর কদিন পরে আবার একটা খাম এল ডাকে। একই হাতের লেখা এবার শুধু একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে—

মিঃ অধিকারী বললেন, — চিঠিটা বরং কর্নেলসায়েবকে দাও।

কুমুদবাবু পকেট থেকে আর একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল চিঠিটা বের করে মৃদুস্বরে পড়তে থাকলেন,

'দীপুর পড়ার টেবিলে ড্রয়ারের মধ্যে খুঁজে দেখুন একটা অঙ্কের ধাঁধা লেখা আছে। ধাঁধার চারদিকে ৩২ লেখা আছে দেখতে পাবেন। যদি ওটা ড্রয়ারে না থাকে ওর বই আর খাতাগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চয়ই ওটা পাবেন। পেয়ে গেলে ধাঁধার কাগজটা খামে ভরে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে ডোবার দক্ষিণপাড়ে একটুকরো ঢিল চাপা দিয়ে গোপনে রেখে আসবেন। সাবধান! পুলিশ কিংবা অন্য কাকেও ঘুণাক্ষরে একথা জানাবেন না। কিংবা নিজেও সেখানে গোপনে লক্ষ রাখবেন না। তাহলে দীপুকে আর ফিরে পাবেন না।'

পড়া শেষ করে কর্নেল— বললেন, — ধাঁধাটা পেয়েছিলেন?

— আজ্ঞে না। অগত্যা কী করব, অনেক ভেবেচিন্তে একটা চিঠি লিখে জঙ্গলের ভেতর ডোবার পাড়ে রেখে এসেছিলুম। লিখেছিলুম, ওটা খুঁজে পাচ্ছি না। দয়া করে আমাকে আরও দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক।

—তারপর?

ঠিক দু-সপ্তাহ পরে আবার একটা চিঠি এল ডাকে। ওটা পেয়েছি কি না জানতে চেয়েছে। —বলে কুমুদবাবু আবার একটা খাম কর্নেলকে দিলেন।

মিঃ অধিকারী বললেন, — কুমুদ আবার সময় চেয়ে চিঠি রেখে এসেছিল। তার কিছুদিন পরে আমি হংকং থেকে ফিরলুম। কুমুদ আমাকে সব ঘটনা বলল। তখন আমাদের রেঞ্জের পুলিশের ডি. আই. জি. সুকুমার ভদ্রের কাছে কুমুদকে নিয়ে গেলুম। মিঃ ভদ্র হেসে উড়িয়ে দিলেন। পাত্তাই দিলেন না। বললেন, ছেলে বাবার সঙ্গে দুষ্টুমি করছে। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। দীপু ঠিকই বাড়ি ফিরে আসবে।

কুমুদবাবু বলেন, — ওঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি, দীপু তেমন ছেলে নয়। জঙ্গলে রক্তের ব্যাপারটাও ডি. আই. জি. সায়েব গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, — তাঁর কাছে এই কেসে রায়গড় থানার পুলিশ-রিপোর্ট আছে। ডোবাটার কাছে আদিবাসীদের ওঝারা নাকি গোপনে মুরগি বলি দেয়।

মিঃ অধিকারী বললেন, — সেটা অবশ্য ঠিক। জঙ্গলের পূর্বে আদি বস্তি আছে। ছোটবেলায় দেখেছি ওরা জঙ্গলে গিয়ে ধামসা বাজিয়ে নাচ-গান করে পুজো দিত। আজকাল ওরা খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তা বলেও পুরোনো প্রথা কেউ গোপনে মেনে চলতেই পারে। যাই হোক, কর্নেলসায়েবকে অনুরোধ, দীপুর অন্তর্ধান রহস্যের একটা কিনারা করুন।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওঁরা দুজনে চলে গেলেন। তারপর বললুম, — রীতিমতো রহস্যজনক ঘটনা কর্নেল! বিশেষ করে অঙ্কের ধাঁধা এবং ৩২ সংখ্যাটার মধ্যে নিশ্চয় কোনও মূল্যবান জিনিসের সম্পর্ক আছে।

কর্নেল দীপুর ফোটোটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি সেই খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে 'নিখোঁজ' শীর্ষক ছবিটা দেখতে থাকলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতশ কাচ বের করে দুটো ছবি মিলিয়ে দেখে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, — বত্রিশের ধাঁধার আর একটা দিক খুবই অদ্ভুত জয়ন্ত! খবরের কাগজে ছাপা নিখোঁজ দীপককুমার রায়ের ছবি আর রায়গড়ের কুমুদবাবুর নিখোঁজ ছেলে সুদীপ্ত ওরফে দীপুর ছবি হুবহু মিলে যাচ্ছে।

চমকে উঠে বললুম, — দেখি, দেখি।

তারপর ছবি দুটো দেখেই আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। দুটো ছবিই একজনের!

দুই

কর্নেল আতশ কাচে বিজ্ঞাপনের ছবি আর সেই ফোটোটা আরও কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর এদিনের আরও কয়েকটা ইংরেজি ও বাংলা খবরের কাগজ খুলে বিজ্ঞাপনগুলো দেখার পর বললেন, — নাঃ! পীতাম্বর রায় শুধু তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় দীপুর ছবিসহ বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন।

বললুম, — কিন্তু শুধু একটা কাগজে কেন? নিখোঁজ দীপুর জন্য যিনি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চান, তাঁর পক্ষে অন্য কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল। ... অন্তত একটা ইংরেজি কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল না কি?

কর্নেল সায় দিলেন, — অবশ্যই ছিল।

বলে তিনি একটু হাসলেন, — এমন হতে পারে, পীতাম্বর রায় ধরেই নিয়েছেন, বহুলপ্রচারিত এবং জনপ্রিয় একটা বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই যথেষ্ট।

— আমার আরও একটা ব্যাপারে অবাক লাগছে কর্নেল!

— বলো!

— রায়গড়েও নিশ্চয়ই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা যায়।

— যাওয়া স্বাভাবিক। তবে এদিনের কাগজ সেখানে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে যাওয়া কথা।

— না— আমি বলতে চাইছি, দীপুর বাবা আর তাঁর বন্ধু কৃষ্ণকান্তবাবু কলকাতা আসার পথে কি খবরের কাগজ পড়েনি? বিশেষ করে দৈনিক সত্যসেবকের মতো জনপ্রিয় কাগজ!

— পড়েননি। অথবা পড়লেও বিজ্ঞাপনটা তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তা না হলে কথাটা তাঁর বলতেন।

— আমার ধারণা, রায়গড়ে পৌঁছে ওঁরা সেখানকার কারও কাছে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা জানতে পারবেন। কারও না কারও চোখে বিজ্ঞাপনটা পড়তে বাধ্য।

— হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ।

বলে কর্নেল কাগজ থেকে বিজ্ঞাপনটা কেটে নিলেন এবং উলটো পিঠে পত্রিকার নাম ও তারিখ লাল ডটপেনে লিখে রাখলেন। তারপর টেবিলের নিচে ড্রয়ার থেকে একটা বড় খাম বের করে বিজ্ঞাপন, ফোটো এবং দীপুর বাবার দিয়ে যাওয়া সেই চিঠি দুটো তাতে ভরে রাখলেন।

সেই সময় আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল। বললুম, — আচ্ছা কর্নেল, এই বিজ্ঞাপনদাতা পীতাম্বর রায় দীপুর বাবা কুমুদবাবুর কোনও আত্মীয় নন তো? হয়তো কুমুদবাবুর কাছে কোনও সূত্রে খবর পেয়ে তিনি বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন!

কর্নেল খামটা টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকাচ্ছিলেন। বললেন, — কিন্তু পীতাম্বর রায় বিজ্ঞাপনে দীপুকে দীপককুমার রায় করেছেন। এদিকে কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর নাম সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বা সুদীপ্তকুমার ভট্টাচার্য।

বললুম,—ধরা যাক, পীতাম্বর রায় কুমুদবাবুর আত্মীয় নন। হিতৈষী বন্ধু। সুদীপ্ত শুনতে দীপক শুনেছিলেন।

কর্নেল হাসলেন, — সাবধান জয়ন্ত! তুমি একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছ। বরং আর এক পেয়ালা কফি খেয়ে ঘিলু চাঙ্গা করো!

বলে তিনি হাঁক দিলেন, — ষষ্ঠী! কফি।

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে-খেতে বললাম, হালদারমশাই এতক্ষণে নিশ্চয়ই গোবরা এলাকায় গিয়ে পীতাম্বর রায়কে খুঁজে বের করে ফেলেছেন। দেখা যাক, তিনি কোন খবর আনেন।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। এতক্ষণে তুমি গোলকধাঁধা থেকে বেরুতে পেরেছ।

— তার মানে, হালদারমশাই দীপুর অন্তর্ধানরহস্য একা-একা ফাঁস করে ফেলবেন বলছেন? আপনাকে নাক গলাতে হবে না?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন।

সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল চোখ না খুলে বললেন, — ফোন ধরো জয়ন্ত!

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই প্রাইভেট ডিটেকটিভের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, — কর্নেলস্যার!

দ্রুত বললুম, — বলুন হালদারমশাই!

— জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেলস্যার কী করতাছেন?

—ধ্যানে বসেছেন। আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন? অমন হাঁসফাঁস করেই বা কথা বলছেন কেন?

কর্নেল আমার হাত থেকে রিসিভার ছিনিয়ে নিয়ে বললেন,—বলুন হালদারমশাই!... হ্যাঁ।... তারপর?... বলেন কী?... আপনি বরং আমার এখানে চলে আসুন।... ঠিক বলেছেন। রাখছি।

বললুম,—কী ব্যাপার?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হালদারমশাইয়ের সঙ্গে তোমার রসিকতা করার বদঅভ্যাস আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রসিকতা সঙ্গত নয়। বিশেষ করে উনি যখন রীতিমতো মল্লযুদ্ধ করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে আমাকে টেলিফোন করছেন।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—মল্লযুদ্ধ মানে?

—হালদারমশাইয়ের মুখে সে-সব কথা শুনে পাবে।

একটু বিব্রত হয়ে বললুম,—কিন্তু আমি তা কেমন করে জানব? তাছাড়া আমি ওঁর সঙ্গে কিন্তু রসিকতা করিনি।

—তোমার কণ্ঠস্বরে রসিকতার আভাস ছিল।

—সরি!

কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—না, না। সরি বলার মতো কিছু করোনি তুমি। তবে তৈরি থাকো। হালদারমশাই তোমার জন্য আর-একটা গোলকধাঁধা নিয়ে আসছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর এলেন প্রায় মিনিট কুড়ি পরে। চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। ডানহাতের বুড়ো আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা। সোফায় ধপাস করে বসে বললেন,—ফায়ার আর্মস লইয়া যাই নাই। ভুল করছিলাম।

কর্নেল বললেন,—আগে কফি খান। তারপর ওসব কথা। ষষ্ঠী! হালদারমশাইয়ের জন্য কফি নিয়ে আয়।

এবার লক্ষ করলুম, হালদারমশাইয়ের সোয়েটারে জায়গায়-জায়গায় কালচে ছোপ। প্যান্টের নিচের দিকটা ভিজে গেছে। আঙুলে ব্যান্ডেজ। তার মানে, কারও সঙ্গে মল্লযুদ্ধটা বেশ জোরালো হয়ে গেছে।

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে হালদারমশাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকাতে-তাকাতে চলে গেল। হালদারমশাই যথারীতি ফুঁ দিয়ে কফি পান করতে থাকলেন।

তারপর হঠাৎ খি-খি করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন,—কী কাণ্ড! ঘুঘু দ্যাখছে, ফান্দ দ্যাখে নাই। ড্রেনে অরে ফ্যালাইয়া দুই পাঁও দিয়ে রগড়াইছি!

কর্নেল বললেন,—আগে কফি খেয়ে নিন হালদারমশাই!

গোয়েন্দামশাই এবার তারিয়ে-তারিয়ে কফি পান করতে থাকলেন। কফি শেষ হলে তিনি অভ্যাসমতো একটিপ নস্যি নিলেন, তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

ঘোষপাড়া লেন একটা ঘিঞ্জি গলি। দুধারে খোলা নর্দমা। গলিটা শেষ হয়েছে একটা কারখানার দেওয়ালে। ৮/১/সি নম্বরে একটা মান্ধাতা আমলের দোতলা বাড়ি। বাড়িটার দোতলায় একটা মেস আছে। মেসের তিনটে ঘরে যারা থাকে, তাদের নানারকমের পেশা। কেউ বেসরকারি অফিসের কর্মী, কেউ ড্রাইভার, কেউ খবরের কাগজের হকার। বাঙালি-অবাঙালি দুই-ই আছে। আজ রবিবারে মেসের বাসিন্দারা কে-কোথায় বেরিয়েছে। দোতলার ছাদে একটা টিনের শেডঢাকা ঘরে রান্না হয়। হালদারমশাই মেসের ম্যানেজার আদিনাথ ধাড়ার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এ সব খবর পান।

তো তিনি গেছেন পীতাম্বর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পীতাম্বরবাবু প্রতি শনিবার বিকেলে অফিস থেকে সোজা দেশের বাড়িতে চলে যান! সোমবার সেখান থেকে ফিরে অফিসে যান। তারপর মেসে ফেরেন সন্ধ্যাবেলায়। কোনও-কোনও দিন রাত নটাও বেজে যায়। পীতাম্বরবাবু যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে থাকে জনৈক রমেশ শর্মা। রমেশ কোনও ব্যবসায়ীর গাড়ির ড্রাইভার।

কথায়-কথায় হালদারমশাই পীতাম্বরবাবুর দেশের বাড়ির ঠিকানা জানতে চান। ম্যানেজার আদিনাথবাবু মেসের রেজিস্টার খুলে ঠিকানাটা লিখে দেন। তারপর হালদারমশাইয়ের চোখে পড়ে, আদিনাথবাবুর টেবিলে আজকের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা পড়ে আছে।

খবরের কাগজটা পড়ার ছলে হালদারমশাই আদিনাথবাবুকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে দিয়ে বলেন,—এ কী! পীতাম্বরবাবুর ছেলে নিখোঁজ নাকি? বিজ্ঞাপনটা দেখে আদিনাথবাবু খুব অবাক হয়ে যান। কারণ পীতাম্বরবাবু এমন একটা ঘটনার কথা তাঁকে জানাননি!

দুজনে যখন কথা বলছিলেন, তখন বারান্দায় কেউ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আদিনাথবাবু টের পেয়ে তাকে ডেকে বলেন,—কী গোবিন্দ? ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? এখানে এসো।

কথাটা বলে আদিনাথবাবু হালদারমশাইকে ইশারায় জানিয়ে দেন, এই ছোকরা এ পাড়ার এক মস্তান। গোবিন্দ ঘরে না ঢুকে এবং কোনও কথা না বলে চলে যায়। তখন আদিনাথবাবু হালদারমশাইকে বলেন, আপনার বন্ধু পীতাম্বরবাবুর সঙ্গে এই গুণ্ডামাস্তানটার খুব ভাব। পীতাম্বরবাবুকে সতর্ক করে দিয়েছিলুম। কিন্তু কথা কানে নেননি। পীতাম্বরবাবু আপনার বন্ধু বটে, কিন্তু খুলেই বলছি, ওঁর হাবভাব আমার মোটেও পছন্দ হয় না। আমার ধারণা, পীতাম্বরবাবুর ছেলে বা ছোটভাই—যেই হোক, তার নিখোঁজ হওয়ার জন্য উনি নিজেই দায়ী।

বিচক্ষণ হালদারমশাই আর কথা না বাড়িয়ে মেসের ফোন নম্বর জেনে নিয়ে চলে আসেন। তারপর নির্জন গলিতে সেই গোবিন্দের মুখোমুখি পড়ে তার সঙ্গে পীতাম্বরবাবুর কথা তুলে ভাব জমাতে চেষ্টা করেন। তখনই ঘটে যায় অঘটন। হঠাৎ গোবিন্দ প্যান্টের পকেট থেকে একটা চাকু বের করে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হালদারমশাই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। এমন অবস্থায় পুলিশজীবনে বহুবার পড়েছেন। তিনি গোবিন্দের পায়ে জোরে লাথি মারেন। গোবিন্দ নোংরা ড্রেনে পড়ে যায়। তারপর হালদারমশাই তার চাকুটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং দৈবাৎ তাঁর বুড়ো আঙুলের নিচে একটু কেটে যায়। তবে চাকুটা তিনি করায়ত্ত করেছিলেন।

ততক্ষণে একজন-দুজন করে লোক জড়ো হয়েছিল গলিতে। তারা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছিল। কেউ এগিয়ে আসেনি। হালদারমশাই চলে আসার আগে গোবিন্দের মুখে জুতোসুদ্ধ চাপ দিয়ে ড্রেনের নোংরা জল আর আবর্জনায় অন্তত দুমিনিট ডুবিয়ে রেখে হনহন করে চলে আসেন। আর পিছু ফেরেননি।

সদর রাস্তায় একটা ফার্মেসিতে ব্যান্ডেজ কিনে গোয়েন্দাপ্রবর ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে তিনি কর্নেলকে ফোন করেছিলেন।

হালদারমশাই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্প্রিংয়ের চাকুটি দেখালেন। বাঁটের কাছে একটু চাপ দিতেই প্রায় চার ইঞ্চি ফলা বেরিয়ে এল। দেখেই আঁতকে উঠলুম।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন,—পীতাম্বর রায়ের দেশের বাড়ির ঠিকানাটা এবার দিন হালদারমশাই! ঠিকানাটা সম্ভবত বর্ধমান জেলার রায়গড়।

হালদারমশাই প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করতে গিয়ে চমকে উঠলেন। তাঁর চোখদুটো গুলিগুলি হয়ে উঠল। উত্তেজনায় গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপতে থাকল। তিনি বলে উঠলেন,—আপনি ক্যামনে জানলেন?

কর্নেল কাগজটা নিয়ে বললেন,—নিছক অনুমান।

গোয়েন্দাপ্রবর আর-এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—কী কাণ্ড!

বললুম,—এই কাণ্ডের পিছনে একটা বড়ো কাণ্ড আছে হালদারমশাই!

হালদারমশাই আমার দিকে সেইরকম গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বললেন,—কন কী?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—জয়ন্ত আপনাকে নিয়ে রসিকতা করছে। ওর কথায় কান দেবেন না। আপনার কাজ আপনি করে যান।

তা করব। —হালদারমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, পীতাম্বরবাবু অমন আনসোশ্যাল হারামজাদারে ক্যান বহাল করছেন, এই রহস্য জানা দরকার। আমি পীতাম্বরবাবুর লগে দেখা করতে গিছলাম। গোবিন্দ ক্যান শুধু এইজন্যই আমারে স্ট্যাব করার চেষ্টা করল? আমার বুদ্ধিসুদ্ধি এক্কেরে ব্যাবাক তালগোল পাকাইয়া গেছে।

—প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে আপনার তো লাইসেন্স আছে। দরকার মনে করলে আপনি পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন।

হালদারমশাই একটু হেসে বললেন,—পুলিশের সাহায্য আমার লাগবে না কর্নেলস্যার! আমার প্ল্যান কী, তা আপনারে জানাইয়া দিই।

—হ্যাঁ। আমাকে না জানিয়ে কিছু করবেন না যেন।

কখনও করছি কি? —বলে হালদারমশাই সোয়েটারের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট নোটবই বের করলেন। তারপর বললেন,—পীতাম্বরবাবুর মেসের ফোন নম্বর লইছি। কাল সোমবার রাত্রে ওনারে ফোন করব। তারপর ওনারে বলব, নিখোঁজ দীপককুমার রায়ের খোঁজ আমি পাইছি। আপনি শিগগির সাক্ষাৎ করুন। আমি ওনারে গণেশ অ্যাভেনিউয়ে আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতেই আইতে বলব।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন,—তার মানে, আপনি যে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তা পীতাম্বরবাবুকে জানাবেন?

—হঃ!

—বাঃ! আপনার প্ল্যানটা চমৎকার। এ ধরনের কেসে প্রাইভেট ডিটেকটিভের নাক গলানো তো স্বাভাবিক।

বললুম,—পীতাম্বরবাবু আপনার কাছে যাবেন বলে মনে হয় না!

হালদারমশাই হাসলেন,—না আইতে চাইলে অরে থ্রেটন করব। পুলিশের ভয় দেখাব।

কর্নেল বললেন,—আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে মক্কেলের ফোটো তুলে রাখেন। তাই না? আমার দরকার পীতাম্বর রায়ের একটা ছবি।

গোয়েন্দাপ্রবর আশ্বাস দিলেন,—পীতাম্বর রায়ের ছবি আপনি পাইবেন কর্নেলস্যার! যে ভাবেই হোক, অরে মিট করব। ছবিও তুলব।

—ওঁদের মেসের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন।

হালদারমশাই নোটবই থেকে নাম্বারটা কর্নেলকে দিলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, —বর্ধমান জেলার রায়গড়ের নাম কইলেন তখন। ব্যাপারটার এট্টুকখানি হিন্ট দিন কর্নেলস্যার!

কর্নেল চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রেতে ঘরে নেভালেন। তারপর বললেন,—আপাতত আপনাকে শুধু এটুকু জানিয়ে রাখছি, রায়গড়ে আমি বার-দুয়েক গিয়েছিলুম। প্রথমবার গিয়েছিলুম প্রায় পাঁচবছর আগে। ওখানে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। আর আছে একটা গভীর জঙ্গল। তো আমি গিয়েছিলুম আমার এক বন্ধু ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে। ডঃ চট্টরাজ কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ববিভাগের একজন কর্মকর্তা। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ খোঁড়াখুঁড়ি করে তাঁর একটা টিম প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছিল। আপনি তো জানেন, এ বিষয়ে আমারও কিছু বাতিক আছে। যাই হোক, সেখানে গিয়ে আলাপ হয়েছিল কৃষ্ণকান্ত অধিকারী নামে একজন বড়ো ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তাঁর হেড অফিস আসানসোলে। রায়গড়ে তাঁর পৈতৃক বাড়ি। রায়গড়ের জঙ্গলে তাঁর সঙ্গে অনেক ঘোরঘুরি করেছিলুম। মিঃ অধিকারী তরুণ বয়সে দক্ষ শিকারি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ঘুরে বিরল প্রজাতির কিছু পাখির ছবি তুলেছিলুম। পরের বছর মিঃ অধিকারী কলকাতায় নিজের কাজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবার আসল কথাটা বলি। ওই জঙ্গলটার নাম হাড়মটটিয়ার জঙ্গল। কারণ রাতবিরেতে ওই জঙ্গলে হাড়-মট-মট করে কোনও অদ্ভুত জন্তু অথবা ভূতপ্রেত নাকি ঘুরে বেড়ায়। এই রহস্য ফাঁস করার উদ্দেশ্যেই আমি মিঃ অধিকারীর সঙ্গে আবার রায়গড়ে গিয়েছিলুম।

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন,—হাড়মটমটির শব্দ শুনছিলেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—গিয়েছিলুম মার্চ মাসে। তখন রাতবিরেতে জোরে বাতাস বয়। অনেক অদ্ভুত শব্দ শুনেছিলুম, তা ঠিক। তবে হাড়মটমটিয়ার রহস্য রহস্যই থেকে গেছে।

—পীতাম্বর রায়ের বাড়ি রায়গড়ে—আপনিই কইলেন। অরে চেনেন?

নাঃ। তবে নামটা যেন শুনেছিলুম।—বলে কর্নেল আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টে তাকালেন।

বুঝলুম, আমি যেন এখনই ব্যাপারটা হালদারমশাইয়ের কাছে ফাঁস না করি। আমি একটা পত্রিকা পড়ার ভান করলুম।

হালদারমশাই বললেন,—আমি এবার যাই কর্নেলস্যার! যেভাবে হোক, পীতাম্বর রায়েরে মিট করব। আর ছবি তুলব।

—কিন্তু এবার একটু সতর্ক থাকবেন যেন!

—হঃ। লাইসেন্সড রিভলভার আছে। সাথে রাখুম।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবেগে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বললুম,—ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি হালদারমশাইকে জানালেন না কেন?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—জানালে উনি এখনই রায়গড়ে ছুটে যেতেন। আপাতত আমি পীতাম্বর রায়ের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাই। কেন সে অমন বিজ্ঞাপন দিল, তা আমার জানা দরকার।

এইসময় আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জেগে উঠল। বললুম,—আচ্ছা কর্নেল! আপনি রায়গড়ে একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের কথা বললেন। দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের সঙ্গে সেখানকার কোনও দামি প্রত্নদ্রব্যের সম্পর্ক নেই তো?

কর্নেল আমাকে চমকে দিয়ে বললেন,—আছে। সম্ভবত সেটাই বত্রিশের ধাঁধা।

তিন

রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত কোনও প্রত্নদ্রব্যের সঙ্গে দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের সম্পর্কে আছে শুনে কর্নেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। তাঁকে এখন বড়ো বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কথাটা বলে তিনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন।

একটু পরে বললুম,—দীপুর অন্তর্ধানের কারণ সম্পর্কে আপনি তাহলে দেখছি একেবারে নিশ্চিত?

কর্নেল গলার ভেতরে বললেন,—হুঁ।

—কিন্তু সেই প্রত্নদ্রব্যটা কী?

ওটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ডঃ চট্টরাজের কাছে শুনেছিলুম। একটা ছোটো বাকসের মতো জিনিসটার গড়ন। কিন্তু বাকসো নয়। তাছাড়া ওটা কোনও অজানা ধাতুতে তৈরি। —বলে কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন, আশ্চর্য ঘটনা! ওটা ডঃ চট্টরাজের ক্যাম্প থেকেই চুরি হয়ে গিয়েছিল।

—আপনি বলছিলেন, সম্ভবত বত্রিশের ধাঁধার সঙ্গে ওটার সম্পর্ক আছে।

—সম্ভবত বলার কারণ, ডঃ চট্টরাজ বলেছিলেন, চৌকো গড়নের কালো জিনিসটার গায়ে খুদে হরফে কী সব লেখা ছিল। দেখতে নাকি নাগরি লিপির মতো। ওটা পরিষ্কার করার সময় দেয়নি চোর। তবে ডঃ চট্টরাজ ওটার ওপরের দিকে নাগরি লিপিতে ৩ এবং ২ এদুটো সংখ্যা অনুমান করেছিলেন। নেহাতই অনুমান। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই পড়েছিলেন।

—ডঃ চট্টরাজ এই চুরির কথা পুলিশকে জানাননি?

—আমি নিষেধ করেছিলুম। কারণ এতে একটা হইচই শুরু হত। ডঃ চট্টরাজকেও পুরাতত্ত্ব দফতরের কাছে কৈফিয়ত নিতে হতো। তাঁর সুনামহানিরও আশঙ্কা ছিল।

—আপনি তো তখন সেখানে ছিলেন!

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আমি সেদিন ওখানে ছিলুম না। কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর সঙ্গে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। তবে ওখানে থাকলেও চোরধরা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডঃ চট্টরাজের দলে ছিলেন দশ-বারো জন লোক। আর খোঁড়াখুঁড়ির কাজে স্থানীয় কয়েকজন মজুরের সাহায্য দরকার হয়েছিল। মিঃ অধিকারীই সেইসব মজুর জোগাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা নিরক্ষর। এছাড়া এলাকার লোকেরাও রোজ এসে ভিড় করত। কাজেই বুঝতে পারছ, আমার পক্ষে ব্যাপারটা ছিল খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো। তার চেয়ে বড়ো কথা, চুরি যাওয়া জিনিসটাকে তত গুরুত্ব দেননি ডঃ চট্টরাজ।

হাসতে-হাসতে বললুম,—তাহলে এবার জিনিসটার গুরুত্ব খুব বেড়ে গেল।

কর্নেল হাসলেন না। তেমনই গম্ভীরমুখে বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছ। ডঃ চট্টরাজ গত বছর রিটায়ার করেছেন। যাদবপুরে থাকেন। দেখি, ওঁকে পাই কি না।

বলে কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। তারপর সাড়া পেয়ে বললেন, —ডঃ চট্টরাজ আছেন?... আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইলিয়ট রোড থেকে বলছি।... বাইরে গেছেন? মানে, কলকাতার বাইরে?... কবে ফিরবেন?... বলে যাননি? আপনি কে বলছেন? হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

রিসিভার রেখে কর্নেল বিরক্ত মুখে বললেন,—অদ্ভুত লোক! সম্ভবত নতুন কোনও কাজের লোক। ডঃ চট্টরাজের পুরাতন ভৃত্য পরেশ আমাকে চেনে। এই লোকটার গলার স্বর যেমন কর্কশ, কথাবার্তাও তেমনই উদ্ধত প্রকৃতির লোকের মতো।

—ডঃ চট্টরাজের স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে তো আছেন। আপনি—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন,—ওঁর স্ত্রী বেঁচে নেই। ছেলে থাকে আমেরিকায়। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লিতে। মেয়ে-জামাই দুজনেই বিজ্ঞানী। যাদবপুরের বাড়িতে ডঃ চট্টরাজ একা থাকেন।

বলে তিনি আবার হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। দাঁতের ফাঁকে রাখা জ্বলন্ত চুরুটের নীল ধোঁয়া আঁকাবাঁকা হয়ে তাঁর চওড়া মসৃণ টাকের ওপর নাচতে-নাচতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তবে এতক্ষণে বুঝলুম,—বৃদ্ধ রহস্যভেদী পাঁচ বছর আগেকার রায়গড়ের স্মৃতির মধ্যে আরও কোনও সূত্র খোঁজাখুঁজি করছেন।

বললুম,—আমি এবার উঠি। দেড়টা বাজে।

কর্নেল আগের মতো গলার ভেতর বললেন,—উঁ?

আপনি ধ্যান করবেন। আমি চুপচাপ বসে থাকব। এর মানে হয় না। —বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

সেই সময় ষষ্ঠীচরণ ভেতরের দরজায় পরদার ফাঁকে মুখ বের করে সহাস্যে বলল,— দাদাবাবু? আপনার এবেলা নেমন্তন্ন।

অমনই কর্নেলের ধ্যানভঙ্গ হল। চোখ কটমটিয়ে ষষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আমরা খাব।

ষষ্ঠী বলল,—সব রেডি বাবামশাই!

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত কি স্নান করতে চাও? আমার মতে, এই শীতের অবেলায় স্নান করলে ঠান্ডা লেগে জ্বর-জ্বালা হবে। চলো, খেয়ে নেওয়া যাক।

খাওয়ার পর ড্রয়িংরুমে এসে কর্নেল বললেন,—কিছুক্ষণ পরে আমরা বেরুব।

বললুম,—পীতাম্বর রায়ের সেই মেসে যাবেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—নাঃ! ওই ব্যাপারটা হালদারমশাইয়ের হাতেই থাক। চাকু হারিয়ে সেই গোবিন্দ এখন ভোজালি জোগাড় করে ফেলেছে।

—গোবিন্দের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। হালদারমশাইয়ের ওপর সে আচমকা চড়াও হল কেন?

—প্রশ্নটা আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু ওই অবস্থায় ওঁকে ডিটেলস জানাবার জন্য পীড়াপীড়ি করিনি। আমার ধারণা, মেসের ম্যানেজার আদিনাথ ধাড়াকে হালদারমশাই নিশ্চয়ই মুখ ফসকে এমন কোনও কথা বলে ফেলেছিলেন, যা গোবিন্দের কানে গিয়েছিল। হালদারমশাইয়ের হঠকারী স্বভাবের কথা তুমি তো জানো!

একটু পরে বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জেগেছে।

—বলো!

—রায়গড়ের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে যে চৌকো কালো জিনিসটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটার কথা কি ডঃ চট্টরাজের কলিগরা জানতেন না? জানলে তো তাঁরা সরকারি রিপোর্টে কথাটা উল্লেখ করতে বলতেন! আমি যতটা জানি, এসব রিপোর্টে পুরো টিমের সই থাকে।

—তুমি ঠিক বলেছ। উৎখননে পাওয়া প্রতিটি জিনিসের তালিকাও করা হয়। তাতেও পুরাতাত্ত্বিক দলের সদস্যদের সই থাকে। কিন্তু ডঃ চট্টরাজ আমাকে গোপনে জানিয়েছিলেন, ওই জিনিসটা উনি দৈবাৎ কুড়িয়ে পান। ওটার কোনও গুরুত্ব আছে বলে ওঁর মনে হয়নি। তাই দলের কাকেও বলেননি।

—অথচ ওটা ওঁর ক্যাম্প থেকে চুরি গেল!

—হ্যাঁ। স্মৃতিটা ঝালিয়ে নিতে-নিতে আজ আমার মনে হল, এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা।

—আপনি তখন বলছিলেন বটে! কিন্তু আশ্চর্য কেন?

—ডঃ চট্টরাজ তারপর যখন জিনিসটার গুরুত্ব টের পেলেন, তখন ওটা অসাবধানে রাখলেন কেন?... ঠিক এই কথাটা ওঁকে জিগ্যেস করে কোনও সদুত্তর পাইনি।

—আজ কি তাই ওঁকে তখন ফোন করলেন?

—হ্যাঁ। তুমি বুঝতেই পারছ, এতদিন পরে সেই চুরি যাওয়া জিনিসটাকে কেন্দ্র করে একটা জমজমাট রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। কাজেই ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে কথা বলা এখন কত জরুরি। অথচ উনি নাকি বাইরে গেছেন।

কর্নেলকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আধপোড়া চুরুটটা অ্যাশট্রেতে ঘষে নিভিয়ে রেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—এক মিনিট। আমি পোশাক বদলে আসি।

বেলা আড়াইটে নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমার গাড়ি নিচে পার্ক করা ছিল। কর্নেল সামনের সিটে আমার বাঁদিকে বসে বললেন,—হাজরা রোডের দিকে চলো। তারপর আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললুম,—অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই যাচ্ছেন। কার কাছে?

কর্নেল হাসলেন,—চলো তো!

হাজরা রোডে পৌঁছে কর্নেলের নির্দেশে কিছুদূর চলার পর ডানদিকে একটা সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তায় এগিয়ে গেলুম। তারপর এক জায়গায় তিনি আমাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন, দেখলাম বাঁদিকে একটা চওড়া গেট। ওপারে বুগেনভিলিয়ার ঝাঁপি। কর্নেল নেমে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর একটা লোক গেট খুলে দিল। কর্নেল ইশারায় আমাকে গাড়ি ভেতরে ঢোকাতে বললেন।

গাড়ি ঘুরিয়ে ঢালু ফুটপাত দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় চোখে পড়ল, মার্বেলফলকে লেখা আছে 'রায়গড় রাজবাটি'। দেখামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠলুম।

নুড়িবিছানা লনের অবস্থা, আগাছায় ঢাকা ফুলের গাছ, শুকনো ফোয়ারার শীর্ষে ভাঙাচোরা একটা মূর্তি এবং দোতলা পুরোন বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বাড়িটার স্থাপত্য ইতালীয় ধাঁচ। বড়ো-বড়ো থাম এবং জানালা। পোর্টিকোর তলায় গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়ালুম। কর্নেল ততক্ষণে সেই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে প্রকাণ্ড দরজার সামনে পৌঁছে গেছে। লোকটা ঘরের ভেতর দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

বললুম,—কী আশ্চর্য!

কর্নেল বললেন,—তোমাকে একটু চমক দিয়ে আনন্দ পেলুম। এসো।

ওপরতলায় এতক্ষণে কুকুরের গর্জন শুনতে পেলুম। বললুম,—সর্বনাশ! কুকুরটা ছেড়ে দেওয়া নেই তো?

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই লোকটি হলঘরের সিঁড়িতে নামতে-নামতে বলল,—যান সার! কুমারবাহাদুর ওপরের বারান্দায় আছেন। উনি আপনাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

কাঠের সিঁড়িতে বিবর্ণ লালচে কার্পেট পাতা আছে। হলঘরের মেঝেতেও আছে। এ ধরনের অনেক বনেদি অভিজাত পরিবারের বাড়িতে কর্নেলের সঙ্গে কতবার এসেছি।

চওড়া এবং লম্বাটে বারান্দার মাঝখানে বৃত্তাকার একটা অংশ। সেখানে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হুইলচেয়ারে বসে ছিলেন। কর্নেলকে দেখে সহাস্যে বললেন,—আসুন! আজ ঘুম থেকে ওঠার পর কেন যেন মনে হচ্ছিল, আপনি আসবেন।

বলে তিনি হাঁক দিলেন,—মধু! রেক্সিটা বড্ড চ্যাঁচাচ্ছে। ওকে নিচে নিয়ে যা। আর সাবিত্রীকে বল, কর্নেলসায়েব এসেছেন। কফিটফি চাই।

কোণের একটা ঘর থেকে কালো দানোর মতো একটা গুঁফো লোক বেরিয়ে এসে কর্নেলকে সেলাম ঠুকল। তারপর কুকুরটার চেন খুলে নিচে নিয়ে গেল।

আমরা কুমারবাহাদুরের মুখোমুখি বসলুম। কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। কুমারবাহাদুরের নাম অজয়েন্দুনারায়ণ রায়। একসময় এঁরই পূর্বপুরুষ রায়গড় পরগনার রাজা ছিলেন। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে। কথায়-কথায় জানতে পারলুম, বছর দশেক আগে সিঁড়ি থেকে পা হড়কে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। দুটো পা-ই অকেজো হয়ে গেছে। তাই হুইলচেয়ারে বসে দোতলায় চলাফেরা করেন। নিচে নামেন না।

মধুর মতো তাগড়াই চেহারার এক প্রৌঢ়া কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল। সে কর্নেলের দিকে ঝুঁকে প্রণামও করল। কর্নেল বললেন,—কেমন আছ সাবিত্রী? দেশে যাও-টাও তো?

সাবিত্রী আস্তে বলল,—আর কার কাছে যাব কর্নেলসায়েব? একটা ভাই ছিল। সে দুর্গাপুরে চাকরি পেয়ে চলে গেছে।

সে চলে গেলে কুমারবাহাদুর বললেন,—আর সে রায়গড় নেই। মাঝেসাঝে ওখানকার কেউ-কেউ এসে দেখা করে যায়। হ্যাঁ—আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে। কলেজ হয়েছে। কিন্তু দলাদলি হাঙ্গামা নাকি বেড়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—গত লক্ষ্মীপুজোর সময় হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের কাছে ফুটবল খেলতে গিয়ে—

হাত তুলে কর্নেলকে থামিয়ে কুমারবাহাদুর বললেন,—শুনেছি। গতমাসে কেষ্ট অধিকারী এসেছিল। আপনার সঙ্গে নাকি তার আলাপ হয়েছে বলছিল। খুব পয়সা করেছে কেষ্ট। বলছিল, হংকং ঘুরে এসেছে সদ্য।

—দীপু নামে যে ছেলেটি নিখোঁজ হয়েছে, তার বাবা কুমুদ ভট্টাচার্যকে কি আপনি চেনেন?

—চিনব না মানে? আমার সুপারিশেই তো কুমুদ মাস্টারি পেয়েছিল। তা প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন আমি রায়গড়ের এম.এল.এ. ছিলুম। কেষ্ট বলছিল, কুমুদ রিটায়ার করেছে। এদিকে ওর ছেলে হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর নিখোঁজ হয়ে গেল। তখন আমিই কেষ্টকে বলেছিলুম, কুমুদকে নিয়ে আপনার সঙ্গে শিগগির দেখা করো। দেখা করেনি ওরা?

—আজ সকালে ওঁরা এসেছিলেন।

কুমারবাহাদুর হেসে উঠলেন,—তাই কি আপনি আমার কাছে কোনও ক্লু খুঁজতে এসেছেন?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—যদি তা-ই ভাবেন, তাহলে আপনার ধারণা কী বলুন।

—কুমুদের ছেলের ব্যাপারে?

—হ্যাঁ।

কুমারবাহাদুর একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আমাদের বাড়িটা সরকারকে কলেজ করতে দিয়েছিলুম। এতদিন সেখানে কলেজ হয়েছে। ওই বাড়িতে আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরি ছিল। কুমুদ যখন বেকার, ওকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলুম। লাইব্রেরি আমার ঠাকুরদার আমলের। বইপত্র অগোছাল অবস্থায় ছিল। বহু দুষ্প্রাপ্য বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাকে সব বইয়ের ক্যাটালগ তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলুম। সেই সময় আমার পূর্বপুরুষের লেখা একটা সংস্কৃত কুলকারিকার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওতে আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য ছিল।

—সেটা কি ছাপানো বই ছিল?

—না। তখনও এ দেশে ছাপাখানার চল হয়নি। হাতে তৈরি পুরু কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপি।

আমি বলে উঠলুম,—ওতে কি আপনার পূর্বপুরুষের কোনও গুপ্তধনের কথা—

আমার কথার ওপর কুমারবাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন,—না জয়ন্তবাবু! গুপ্তধনটন থাকলে তা আমার ঠাকুরদার আমলেই খুঁজে বের করা হতো। জমিদারি উঠে যাওয়ার পর তিনি ব্যবসাবাণিজ্য করে কেষ্ট অধিকারীর মতো কোটিপতি হতেন। এই যে বাড়িটা দেখছেন, এটা ছাড়া আমার একটুকরো স্থাবর সম্পত্তি নেই। কোনওমতে ঠাটঠমক বজায় রেখেছি। তাও কতদিন পারব জানি না। হয়তো এই বাড়িটা কোনও প্রোমোটারকে বেচে একটা ফ্ল্যাটের খাঁচায় বাস করতে হবে।

কর্নেল বললেন,—সংস্কৃতে লেখা সেই পাণ্ডুলিপি কি আপনি পড়েছিলেন?

—নাঃ। আমার অত সংস্কৃতবিদ্যা ছিল না। বাবারও ছিল না। অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল ওটা কোনও সংস্কৃতজানা পণ্ডিতকে দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে ছাপতে দেব। আমার পূর্বপুরুষের পারিবারিক ইতিহাস দেশের ঐতিহাসিকদের কাজে লাগতে পারত।

—তা হলে কি আপনার ধারণা, কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর নিখোঁজ হওয়ার পিছনে সেই পাণ্ডুলিপির সম্পর্ক আছে?

কুমারবাহাদুর গম্ভীরমুখে বললেন,—কেষ্ট অধিকারী আমাকে ঠিক এই প্রশ্ন করেছিল। সে বলছিল, কুমুদ ভট্টাচার্য সংস্কৃত জানে। স্কুলে সে সংস্কৃত পড়াত। কাজেই কেষ্টর ধারণা সত্য হতেই পারে। আমি কুমুদকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিলুম কেষ্টকে। আশ্চর্য! আজ কেষ্ট আর কুমুদ আপনার কাছে এসেছিল। অথচ আমার কাছে কেষ্ট ওকে নিয়ে এল না। ব্যাপারটা গোলমেলে। আপনি যখন এই কেসে হাত দিয়েছেন, তখন আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, রায়গড়ে গিয়ে কুমুদকে সরাসরি চার্জ করুন। ছেলে কেন নিখোঁজ হল, তার আসল সূত্র কুমুদের কাছেই পাবেন। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—মিঃ অধিকারী আপনাকে কতটুকু বলেছে জানি না। তিনি কি উড়ো চিঠিতে বত্রিশের ধাঁধার কথাটা বলেছেন?

—বলেছে। কেষ্ট অধিকারী মহা ধূর্ত লোক। আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছিল। আমি তাকে বলেছিলুম, কোনও ধাঁধা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমাদের পরিবারে এমন কোনও গুজবের কথাও চালু ছিল না।

কর্নেল হাসলেন,—আমার ধারণা, আপনি কিছু জানেন।

কুমারবাহাদুর আস্তে বললেন,—ব্যাপারটা গুপ্তধন-টন নয়। পাণ্ডুলিপিতে নাগরি লিপিতে লেখা একটা ছক দেখেছিলুম, তা সত্য। আমার মতে, ওটা তন্ত্রসাধনার কোনও গোপন সূত্র।

—ছকটা আপনি টুকে রাখেননি?

—নাঃ।

আপনার এটুকু সূত্রই আমার কাছে মূল্যবান। এবার আমরা উঠি। —বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।

কুমারবাহাদুর একটু হেসে বললেন,—এর বদলে আমিও কিছু প্রত্যাশা করি কর্নেলসায়েব!

—বলুন।

—সেই হারানো পাণ্ডুলিপি আপনি আমাকে উদ্ধার করে দিন।

—কুমারবাহাদুর! আমার প্রথম লক্ষ্য সেই পাণ্ডুলিপি। কারণ ওটা না খুঁজে পেলে কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের কিনারা করা আমার পক্ষে কঠিনই হবে। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে পৌনে সাতটা বেজে গিয়েছিল। কর্নেল ষষ্ঠীকে কফি করতে বলে ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর টুপি খুলে রেখে টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। জিগ্যেস করলুম,—রায়গড় যাচ্ছেন কবে?

কর্নেল আস্তে বললেন,—আজ রাতের ট্রেনেই যাচ্ছি। তুমি কফি খেয়ে বাড়ি যাও। তারপর তৈরি হয়ে এসো। তোমার গাড়ি আমার খালি গ্যারাজঘরে রাখার অসুবিধে নেই। আমি হাওড়া স্টেশনে ফোন করে ট্রেনের খবর নি।

বলে তিনি রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন,—কে বলছেন?... সে কী কথা! আমার কর্তাবাবা তো বেঁচে নেই।... বলেন কী? টাক ফুটো করে দেবেন? আমার টাকের প্রতি কেন সুনজর ব্রাদার?... আচ্ছা। আচ্ছা।

কর্নেল রিসিভার রেখে তুম্বোমুখে বললেন,—কেউ হুমকি দিল। মনে হচ্ছে, সাপের লেজে পা দিয়েছি।

চার

শীতের রাতে ট্রেনজার্নির অনেক অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু এমন বিচ্ছিরি ট্রেনজার্নি এই প্রথম। ট্রেনটা যেন ঘুমোতে-ঘুমোতে এগোচ্ছিল। আর সে কী শীত! আসলে রায়গড় ছোটো স্টেশন। তাই সেখানে কোনও মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়ায় না। এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একটা ফার্স্টক্লাসের বগি এবং নামেই তা ফার্স্টক্লাস। মনে হচ্ছিল অসংখ্য ছেঁদা দিয়ে শীত ঢুকে আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে তুলছে।

কর্নেল কিন্তু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ফার্স্টক্লাসে আমরা দুজন ছাড়া আর কোনও যাত্রী ছিল না। যখনই কোথাও ট্রেন থামছিল, তখনই সতর্ক হয়ে লক্ষ রাখছিলুম। কুপের দরজা অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। কিন্তু সেই যে কর্নেলকে টেলিফোনে হুমকি দিয়েছিল এবং কর্নেল বলেছিলেন,—মনে হচ্ছে যেন সাপের লেজে পা দিয়েছি; তাই সারাক্ষণ চাপা একটা আতঙ্ক পিছু ছাড়ছিল না।

তবে সারা পথ কেউ কুপের দরজায় নক করেনি এবং আমি জ্যাকেটের ভেতরপকেটে আমার লাইসেন্সড রিভলভার তৈরি রেখে বাথরুমে যাওয়ার ছলে দেখে নিচ্ছিলুম, অন্য কোনও কুপে কেউ উঠেছে কি না। কেউ কোনও স্টেশনে এই ফার্স্টক্লাসে ওঠেনি। তবু অস্বস্তি কাটছিল না।

রায়গড়ে পৌঁছুনোর কথা ভোর পাঁচটা নাগাদ। পৌঁছুল সাড়ে সাতটায়। নিঝুম নিরিবিলি ছোটো স্টেশন। আমরা দুজন ছাড়া আরও কয়েকজন যাত্রী নেমে চায়ের স্টলে ভিড় করল। তারা সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। মাটির ভাঁড়ে ফুঁ দিতে-দিতে চা খেয়েই তারা নিচের চত্বরে নেমে গেল। তারপর দেখলুম, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের পেছনে উঠে গেল এবং ট্রাকটা গোঁ-গোঁ শব্দ করতে-করতে গাঢ় কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ট্রেনটা তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। এবার এখানে এক পেয়ালা কফি খেয়ে নাও।

বললুম,—কষ্ট কী বলছেন? হাড় কাঁপিয়ে দিয়েছে, এমন সাংঘাতিক শীত।

—আরও সাংঘাতিক শীত তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে জয়ন্ত। হাড়মটমটিয়া তার নাম।

চা-ওয়ালা খুব খাতির করে গরম কফির কাপ-প্লেট হাতে তুলে দিয়ে বলল,—স্যারদের কোথায় যাওয়া হবে?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—শুনলে না? হাড়মটমটিয়া বললুম।

চা-ওয়ালা কিন্তু হাসল না। সে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বলল,—স্যার! আপনারা কি হাড়মটমটিয়ার নতুন ফরেস্ট বাংলোয় যাবেন?

—হ্যাঁ।

সে চাপাস্বরে বলল,—সাবধানে থাকবেন স্যার।

—কেন বলো তো?

—গত রাতে নটার ট্রেনে আমার মাসতুতো ভাই যতীন কলকাতা গেল। তার মুখে শুনলুম, ফরেস্ট বাংলোর পেছনদিকে কাল সন্ধ্যাবেলা হাড়মটমটিয়া আবার একটা মানুষ খেয়েছে!

—আবার একটা মানুষ খেয়েছে?

—যতীন তো তা-ই বলে গেল। সে নাকি রক্তারক্তি কাণ্ড! চৌকিদার হাড়মটমটিয়ার হাঁকডাক শুনতে পেয়েছিল। তারপর রায়গড়ে খবর দিয়েছিল। যে লোকটাকে খেয়েছে, সে নাকি রায়গড়ের লোক। ওখানে সন্ধ্যাবেলা কেন গিয়েছিল কে জানে!

—তোমার বাড়িও কি রায়গড়ে?

—না স্যার। পাশের গ্রামে, হাতিপোঁতায়।

—হাড়মটমটিয়া আবার মানুষ খেয়েছে বললে। আগেও কি খেয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়গড়ের এক মাস্টারমশাইয়ের ছেলেকে খেয়েছিল শুনেছি। তা মড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু রক্তটক্ত পড়েছিল। যতীন বলে গেল, এবার লোকটার রক্তমাখা মড়া পাওয়া গেছে।

—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, কানুহরি দাস।

—আচ্ছা, এই যে হাড়মটমটিয়া বলছ, সেটা কি কোনও জন্তু?

কানুহরি চা-ওয়ালা আবার চাপাস্বরে বলল,—জন্তু-টন্তু নয় স্যার! কেউ বলে পিশাচ। কেউ বলে যখ। রায়রাজাদের গড় পাহারা দিত। সেখানে থেকে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে। পিশাচ বলুন, যখ বলুন, মানুষের রক্ত তাদের খাবার। শুধু রক্তই বা কেন? মাংসও খায় শুনেছি। কুমুদ মাস্টারমশাইয়ের ছেলেটাকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল না? কচি হাড়। তাই হাড়সুদ্ধু খেয়ে ফেলেছিল। বুঝলেন না?

বুঝলুম।—বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন।

এতক্ষণে কয়েকজন যাত্রী এসে চায়ের স্টলে ভিড় করল। কানুহরি তাদের একজনকে বলল, —নিমাই! শুনলুম, আবার নাকি হাড়মটমটিয়া তোমাদের গ্রামের কাকে খেয়েছে?

নিমাই বাঁকা মুখে বলল,—বজ্জাতি করতে গিয়েছিল। তেমনি ফলও পেয়েছে।

—বজ্জাতি মানে?

—বজ্জাতি না হলে জঙ্গলে গিয়ে যখের ধন খুঁড়ে বের করতে গিয়েছিল কেন উপেন? বাংলোর চৌকিদারের মুখে খবর পেয়ে অনেক লোক ছুটে গিয়েছিলুম। ঢাকঢোল কাঁসি বাজিয়ে মশাল জ্বেলে সে এক কাণ্ড! তারপর দেখি উপেন দত্ত একটা গর্তের পাশে পড়ে আছে। একটা শাবলও দেখতে পেলুম! রক্তারক্তি ব্যাপার।

—হাড়মটমটিয়ার ডাক শুনতে পাওনি?

আমরা শুনতে পাইনি। চৌকিদার নাকি শুনেছিল।—নিমাই বেঞ্চে বসে বাঁকা মুখে বলল, ছেড়ে দাও! কথায় বলে না? লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মা কালীর দিব্যি কানুদা! উপেন ফি শনিবার কলকাতা থেকে এসে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের পাশে ঘুরঘুর করে বেড়াত—তা জানো?

—বলো কী নিমাই?

নিমাই চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,—নিজের চোখে দেখেছি। বাবুপাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে ফুটবল ক্রিকেট-ফিকেট সব খেলত। আমি বসে-বসে খেলা দেখতুম। আর শনিবার হলেই উপেন দত্ত সেখানে হাজির। এক ফাঁকে কখন জঙ্গলে ঢুকে যেত।

নিমাই এবং কানুহরির কথাবার্তা চলতে থাকল। কর্নেল হঠাৎ উঠে পড়লেন। তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচের চত্বরে নেমে আস্তে বললেন,—কী বুঝলে জয়ন্ত?

বললুম,—গেঁয়ো লোকদের কুসংস্কার। জনৈক উপেন দত্তকে কেউ বনবাংলোতে ডেকে পাঠিয়েছিল। তারপর মওকা বুঝে খুন করেছে। অবশ্য এটাও একটা রহস্যময় হত্যাকাণ্ড। আপনি নাক গলাচ্ছেন দেখলেও অবাক হব না।

কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,—গেঁয়ো লোকেদের কুসংস্কার বলছ। শহরের উচ্চশিক্ষিত এবং বাঘা-বাঘা পণ্ডিতদেরও প্রচুর কুসংস্কার থাকে। পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে আলাপ হলে এর প্রমাণ পেতে।

—কিন্তু আমরা কি পায়ে হেঁটেই বনবাংলাতে যাব?

—বনবাংলো এখান থেকে শর্টকাটে মাত্র দু-কিলোমিটার। লক্ষ করো, রুক্ষ মাটি, ঝোপঝাড় আর পাথরের চাঁইয়ে ভরা ঢেউখেলানো মাঠটা আমাদের চলার পক্ষে খাসা! কারণ এখনও কুয়াশা ঘন হয়ে আছে। কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে চলাই ভালো। আমার ইচ্ছে ছিল, ঠিক সময়ে ট্রেন পৌঁছুলে চুপি-চুপি বনবাংলোয় পৌঁছনো যাবে। কিন্তু ট্রেনটা যাচ্ছেতাই দেরি করে পৌঁছুল।

ওঁকে অনুসরণ করে বললুম,—কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেললে কেলেঙ্কারি!

কর্নেল হাসলেন,—যেদিকে সোজা হাঁটছি, সেদিকেই হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল। আশা করি দিনের বেলা হাড়মটমট করে বেড়ানো পিশাচ বা যখটা আমাদের দেখা দেবে না। সে তো নিশাচর!

কিছুদুর চলার পর রুক্ষ অনাবাদি মাঠটা ঢালু হয়ে নেমেছে দেখা গেল। তারপর একটা ছোটো শীর্ণ নদী। নদীতে একফালি জলস্রোত তিরতির করে বয়ে চলেছে। নদীর বুকে অজস্র পাথর ছড়িয়ে আছে। কর্নেলের নির্দেশে সাবধানে সেইসব পাথরে পা ফেলে ওপাশে পৌঁছুলুম। ততক্ষণে কুয়াশা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সোনালি রোদ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে শিশিরে নিম্নাঙ্গ ভিজে করুণ দশা হল। তবে গায়ে পুরু জ্যাকেট এবং মাথায় টুপি থাকায় শরীরের ঊর্ধ্বাংশ রক্ষা পেল।

এবার সামনে আবছা কালো বিশাল উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—এবার পাহাড়ে উঠতে হবে নাকি?

কর্নেল বললেন,—ওটা পাহাড় নয়। ওটাই সেই হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল! এখান থেকে মাটিটা ক্রমশ উঁচু হয়েছে বলে কুয়াশার ভেতর জঙ্গলটা পাহাড় মনে হচ্ছে।

চড়াইয়ে উঠে গিয়ে একফালি মোরাম বিছানো রাস্তায় পৌঁছুলুম। রাস্তাটা বাঁক নিয়ে একটা টিবিতে উঠে গেছে। সেই টিবির ওপর হলুদ রঙের ছোটো বাংলো দেখতে পেলুম।

বাংলোর চৌকিদার আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল। সে কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বলল, —আপনি কি কর্নেলসাহেব? রেঞ্জারসায়েব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাংলোর বারান্দায় বসে রেঞ্জারসায়েব চা খাচ্ছিলেন। বারান্দার নিচে একটা জিপগাড়ি। কর্নেল এবং আমাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন,—আসুন! আসুন কর্নেলসায়েব! গতরাতে যখন আপনি টেলিফোন করলেন, তখন আমি সবে এই বাংলো থেকে বাড়ি ফিরেছি। ফোনে সব কথা বলতে পারিনি। তবে আপনি আসছেন শুনে খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছিলুম। তারপর ভোরবেলায় উঠে এখানে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।

কর্নেল আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রেঞ্জারের নাম অমল চ্যাটার্জি। চৌকিদারকে তিনি শিগগির কফি আনতে বললেন। লক্ষ করলুম, ভদ্রলোক কর্নেলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। উত্তেজনার কারণ আমার অবশ্য জানা। স্টেশনে শুনে এসেছি, রায়গড়ের জনৈক উপেন দত্তের রক্তাক্ত লাশ কাল সন্ধ্যায় এই বাংলোর পিছনদিকে জঙ্গলের ভেতর পাওয়া গিয়েছে।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—আপনাকে বলেছিলুম, শিগগির আমরা এই জঙ্গলের একটা বাংলো বানাচ্ছি। এরপর এলে আপনি সেখানেই থাকবেন। আপনার মতো একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর পক্ষে এটাই উপযুক্ত জায়গা। তো দেখুন, বাংলো হয়ে গেছে। বিদ্যুতের ব্যবস্থা এখনও করা যায়নি। আর কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

চৌকিদার ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে এল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন,—কাল সন্ধ্যায় কেন আপনাকে এখানে আসতে হয়েছিল, সে-সব কথা স্টেশনে শুনে এলুম।

শুনেছেন?—মিঃ চ্যাটার্জির চোখদুটো উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল : এ এক অদ্ভুত ঘটনা কর্নেলসাহেব! হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে কোনও হিংস্র জন্তু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমার একার কেন, রায়গড়ের সবারই সন্দেহ, উপেন দত্ত ওখানে সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখা কোনও দামি জিনিস খুঁড়ে বের করতে এসেছিল।

—পুলিশ এসেছিল নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ। পুলিশ বডি তুলে নিয়ে গেছে। রায়গড় হাসপাতালে বডির পোস্টমর্টেম হবে। তবে আপাতদৃষ্টে পুলিশের ধারণা আমার সঙ্গে মিলে গেছে।

—কোনও হিংস্র জন্তুর হামলা?

—ঠিক তা-ই। রায়গড়ের বেশিরভাগ লোকের বিশ্বাস এ কাজ হাড়মটমটিয়ার!

রেঞ্জারসায়েব কথাটা বলে হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন,—আর সব লোকের কী ধারণা?

—উপেন দত্ত লোকটার নামে অনেক বদনাম ছিল। এলাকার চোর-ডাকাতদের কাছে চোরাই মাল কিনে কলকাতায় ব্যবসা করত। কাজেই পাওনা-কড়ি নিয়ে কোনও চোর বা ডাকাতের সঙ্গে বিবাদ ছিল। সে উপেনকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে।

—আপনি তো লাশ দেখেছেন। কী অবস্থায় ছিল?

—গর্তের পাশে কাত হয়ে পড়ে ছিল। সোয়েটার ছিঁড়ে ফালাফালা। সারা শরীরে ধারালো নখের আঁচড় কাটা। মাথার খুলির অবস্থাও তাই।

—শুনলুম, চৌকিদারই প্রথমে লাশ দেখতে পেয়েছিল?

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—নাখুলাল! তুমিই বলো সায়েবকে।

চৌকিদার নাখুলাল বলল,—সার! এই বাংলোর পেছনে একটা কেমন আওয়াজ হয়েছিল। আমি বল্লম আর টর্চ নিয়ে গেলুম। ভাবলুম, চোরচোট্টা—নয়তো শেয়াল। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ স্যার! পেছনের পাঁচিল পর্যন্ত সাবধানে এগিয়ে গেলুম। তারপর নিচের জঙ্গলের ভেতর আলো ফেললুম! তখনই দেখলুম, একটা লোক ঝোপে ঢুকে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, কে ওখানে? কোনও সাড়া এল না। আর তারপরই হাড়মটমটিয়ার চেরাগলার গজরানি ভেসে এল।

কর্নেল বললেন,—তুমি কি আগে কখনও তার গজরানি শুনেছ?

—হ্যাঁ সার! এই বাংলো হওয়ার পর রাত্তিরে তিন-তিনবার শুনেছি। প্রথমে শনশন করে হাওয়ার মতো শব্দ ওঠে। তারপর মট মট মট মট—তারপর কানে তালাধরানো আওয়াজ। আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ! এইরকম।

—তো তারপর তুমি কী করলে?

—এখানে থাকার সাহস হল না আর। ঘুরপথে মাঠ দিয়ে আমাদের বস্তিতে চলে গেলুম।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—কর্নেলসায়েব তো নাখুলালদের বস্তি দেখেছেন!

কর্নেল বললেন,—আদিবাসীদের বস্তি?

—হ্যাঁ, নাখুলালরা সবাই খ্রিস্টান। তা-ও আপনি জানেন!

—জানি। তো নাখুলাল! তারপর কী করলে বলো!

নাখুলাল শ্বাস ছেড়ে বলল,—বস্তির লোকেরা আমাকে রায়গড়ে খবর দিতে পাঠাল। খুলেই বলছি স্যার! হাড়মটমটিয়া আমাদের দেবতা। আমাদের লোকেরা বলে 'ঠাকুরবাবা'। ওঁকে আমরা ভক্তি করি। কিন্তু জঙ্গলে আমি একটা লোক দেখেছি। ঠাকুরবাবা তাকে খেয়ে ফেলেছেন। আমাদের তখন একটাই কাজ। রায়গড়ে খবর দেওয়া। কেন? না—আর যেন অন্য জাতের কেউ ঠাকুরবাবাকে চটায় না।

—তুমি খবর দিলে কাকে?

—আজ্ঞে সার কেষ্টবাবুকে। উনি এখন রায়গড়ের লিডার। সদ্য উনি কলকাতা থেকে ফিরেছেন শুনলুম। কিন্তু খবর পেয়েই গাঁসুদ্ধু লোক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। তারপর— মিঃ চ্যাটার্জি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—এখন সরকারি নিয়ম করা হয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের খবর না দিয়ে এই জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। তাই আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, আমাকে একা আসতে হল বন্দুক নিয়ে। এখনও ফরেস্ট গার্ড বহাল করা হয়নি।

—লাশ শনাক্ত করার পর কি পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—মিঃ চ্যাটার্জি! লাগেজ ঘরে রেখে এখনই একবার ওখানে যেতে চাই।

—অবশ্যই। নাখুলাল! সায়েবদের ঘর খুলে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বাংলোর পেছনের দরজা দিয়ে বেরুলুম। নাখুলাল বাংলোয় থাকল। মিঃ চ্যাটার্জি তাকে আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে বললেন।

ঢালু মাটিতে পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে। ঝোপঝাড় আর উঁচু-উঁচু গাছের তলায় শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে। অমল চ্যাটার্জির কাঁধে বন্দুক। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

একটু পরে মোটামুটি সমতল মাটি পাওয়া গেল। এখানে জঙ্গলের কিছুটা অংশ ফাঁকা। ফাঁকা রুক্ষ মাটিতে একটা গর্ত খোঁড়া আছে দেখতে পেলুম। গর্তের পাশে কালচে ছোপগুলো যে উপেন দত্তেরই রক্ত, তা বুঝতে পারলুম।

কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে গর্তের পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। মাত্র হাতখানেক গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। সেই গর্তের দিকে তিনি তাকিয়ে যেন ধ্যানমগ্ন হলেন।

মিঃ চ্যাটার্জি একটু হেসে বললেন,—শক্ত চাঙড় মাটি, তা না হলে জন্তুটার পায়ের ছাপ পড়ত।

বললুম—আশ্চর্য! জঙ্গলের এই জায়গাটুকু এমন রুক্ষ কেন? একটু ঘাস পর্যন্ত গজায়নি।

—আমার ধারণা, এর তলায় গ্রানাইট পাথর আছে। এই অঞ্চলে এমন রুক্ষ নীরস মাটি অনেক জায়গায় দেখেছি। ঘাসও গজাতে পারে না।

—কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি, উপেনবাবু যদি কোনও চোরাই মাল পুঁতে রাখতে চাইতেন, তাহলে এমন জায়গা বেছে নিলেন কেন?

—সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। আবার এমন যদি হয়, উপেনবাবু কোনও চোরাই মাল এখানে পুঁতে রেখেছিলেন এবং কাল সন্ধ্যায় তা তুলে নিতে এসেছিলেন—তাহলে সেই চোরাই মালটাই বা গেল কোথায়? কাল সন্ধ্যায় অত আলো এবং মানুষজনের ভিড় ছিল এখানে। কারও-না-কারও চোখে পড়তই জিনিসটা। কী বলেন?

—এমন হতে পারে আক্রান্ত হওয়ার সময় দূরে ছুড়ে ফেলেছিলেন!

রেঞ্জারসায়েব হাসলেন,—আমি ভোরবেলা এসে এখানে চারদিকে জঙ্গলের ভেতর খুঁজেছি। কুয়াশা ছিল। কিন্তু ওটা বাধা নয়। তেমন কোনও জিনিস খুঁজে পাইনি।

এইসময় কর্নেল গর্তের চারপাশের মাটি থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মিঃ চ্যাটার্জি! আপনার অনুমান ঠিক। এই দেখুন, কালো রঙের অজস্র লোম পড়ে ছিল এখানে।

মিঃ চ্যাটার্জি তাঁর হাত থেকে কয়েকটা কালো লোম নিয়েই বললেন,—ভালুকের লোম! এই জঙ্গলে ভালুক থাকার গুজব শুনেছিলাম। তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বুনো ভালুক খুব হিংস্র। মানুষ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। হ্যাঁ—ওইরকম ক্ষতচিহ্ন একমাত্র ভালুকের নখের আঁচড়েই হতে পারে।

কর্নেল বললেন,—ঠিক বলেছেন। এবার চলুন। বাংলোতে ফেরা যাক।

অমল চ্যাটার্জি হাত থেকে লোমগুলো ঝেড়ে ফেলে বললেন,—আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন কর্নেলসায়েব। বিশেষ করে আপনাকেই বলছি কথাটা। বিরল প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি অর্কিড কিংবা পরগাছার নেশায় আপনার দেখেছি জ্ঞানগম্যি থাকে না।

তিনি কথাটা বলে হেসে উঠলেন। তারপর লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকলেন। এই সময় আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, স্টেশনে শোনা সেই নিমাইয়ের কথা। রায়গড়ের উপেন দত্ত প্রতি শনিবার কলকাতা থেকে এসে এই জঙ্গলে ঢুকে পড়তেন। গতকাল অবশ্য রবিবার ছিল। শনিবারে জঙ্গলে ঢুকলে যে উপেন দত্ত রবিবার আবার ঢুকবেন না, তার মানে নেই। দেখা যাচ্ছে, রবিবারও ঢুকেছিলেন এবং বেঘোরে ভালুকের আক্রমণে মারা পড়েছেন।

কর্নেলের পাশে গিয়ে চাপাস্বরে বললুম,—কর্নেল! এই উপেন দত্ত সেই পীতাম্বর রায় নয় তো?

কর্নেল মৃদু হেসে গলার ভেতর বললেন,—তুমি সবই বোঝা জয়ন্ত! তবে একটু দেরিতে। হ্যাঁ—উপেন দত্তই যে পীতাম্বর রায়, তাতে কোনও ভুল নেই। তবে কথাটা চেপে যাও।

আমরা বাংলোর নিচে পৌঁছেছি, হঠাৎ ওপরে বাংলোর পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে নাখুলাল চিৎকার করে উঠল,—সায়েব! ভালুক! ভালুক!

রেঞ্জারসায়েব চমকে পিছনে ঘুরে গুড়ুম করে বন্দুক ছুড়লেন। জঙ্গলে পাখিদের চ্যাঁচামেচি এবং কেন একটা হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। কর্নেল তখনই বাইনোকুলারে পিছনদিকে জঙ্গলের ভেতর ভালুক খুঁজতে থাকলেন।

রেঞ্জারসায়েব অমল চ্যাটার্জি বন্দুক বাগিয়ে বললেন,—কর্নেলসায়েব! ভালুকটা কি দেখতে পেলেন?

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন,—কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছি। জন্তুটা দেখতে ভালুকের মতো নয়।

মিঃ চ্যাটার্জি উত্তেজিতভাবে বললেন,—তাহলে কি ওটা শিম্পাঞ্জি?

কর্নেল হাসলেন,—এদেশের জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি থাকে না মিঃ চ্যাটার্জি! আপনি তা ভালোই জানেন।

—না। মানে, আমি বলতে চাইছি, এলাকায় শীতের সময় মেলা বসে। সার্কাসের দলও আসে। দৈবাৎ কোনও সার্কাসের শিম্পাঞ্জি পালিয়ে এসে এই জঙ্গলে ঢুকতেও পারে।

—ওটা শিম্পাঞ্জিও নয়।

—তাহলে ওটা কী?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—ওটাই হয়তো সেই হাড়মটমটিয়া। সম্ভবত সে চুপিচুপি আমাদের কথা শুনতে আর আমরা কী করছি, তা দেখতে এসেছিল।

রেঞ্জারসায়েব হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

পাঁচ

ফরেস্ট রেঞ্জার অমল চ্যাটার্জি আমাদের ব্রেকফাস্টের পর চলে গেলেন। বলে গেলেন,—রায়গড় ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসের একটা কোয়ার্টারে তিনি আপাতত থাকার এবং অফিস করার জায়গা পেয়েছেন। পরে এই বাংলোর পাশে তাঁর অফিস এবং কোয়ার্টার হবে। যাই হোক, দরকার হলে চৌকিদারকে পাঠালে তিনি চলে আসবেন। তাছাড়া সময় হাতে থাকলে তিনি কর্নেলকে সঙ্গ দেবেন। বিশেষ করে এই জঙ্গলে যে অদ্ভুত প্রাণীটা এসে জুটেছে, তার সম্পর্কে কৌতূহল তাঁর যথেষ্ট। তবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুসারে প্রাণীটাকে প্রাণে মারা যাবে না।

ব্রেকফাস্টের পর বারান্দায় বসে চুরুট টানতে-টানতে কর্নেল বললেন,—আচ্ছা নাখুলাল! তোমার খ্রিস্টান নাম কী?

চৌকিদার সবিনয়ে বলল,—যোশেফ নাখুলাল সার!

—তোমাদের ফাদার স্যামুয়েল কি এখন বস্তিতে স্কুল চালাচ্ছেন?

না সার! ফাদার স্কুলের স্যামুয়েল কি এখন বস্তিতে স্কুল চালাচ্ছেন?

না সার! ফাদার স্কুলের ভার দিয়েছেন আমার ভাইপো ফিলিপকে। ফিলিপ—সুরেন ওর নাম। দুমকা মিশন স্কুল থেকে পাশ করে এসেছে। —বলে চৌকিদার কণ্ঠস্বর চাপা করল : সুরেন মাস্টারমশাইয়ের ছেলে দীপুর বন্ধু ছিল সার! দীপু যেদিন জঙ্গলে হারিয়ে যায়, সুরেনই তো সাহস করে বাবুদের ছেলেদের ডেকে তাকে খুঁজতে ঢুকেছিল।

—আচ্ছা নাখুলাল, ওদের যে ফুটবলটা জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা কি খুঁজে পেয়েছিল ওরা?

নাখুলাল বুকে ক্রস এঁকে ভয়পাওয়া মুখে বলল,—সেদিন বলটার দিকে কারও মন ছিল না। পরদিন সকালে সুরেন বলটা দেখতে পেয়েছিল। বলটা কোনও জানোয়ার ছিঁড়ে ফালাফালা করে রেখেছিল। ব্লাডারও ছিঁড়ে ফেলেছিল। সুরেনকে আপনি জিগ্যেস করবেন।

—করব। তোমাদের বস্তিটার কী নাম যেন?

—রংলিডিহি। আপনি দেখে থাকবেন, বস্তির মাটির রং একেবারে লাল। বুড়োদের কাছে শুনেছি, রংলিডিহিও জঙ্গলের মধ্যে ছিল। আর এই জঙ্গল ছিল একেবারে রেললাইন পর্যন্ত। এখন ওদিকটা ফাঁকা।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—নাখুলাল! তুমি আমাদের খাওয়ার জন্য বাজার করে আনো। বাজার তো সেই রায়গড়ে। তুমি কি পায়ে হেঁটে যাবে?

—না সার! সাইকেল আছে। বাংলোর পিছনে আমার থাকার ঘর। সেখানে আছে। আপনারা আসবেন শুনে আমি সাইকেল এনে রেখেছি।

কর্নেলের কাছে টাকা নিয়ে যোশেফ নাখুলাল সাইকেলে থলে ঝুলিয়ে ঢালু রাস্তায় নেমে গেল এবং একটু পরে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হল।

বাংলোটা উঁচুতে বলে শীতের হাওয়া এসে হুলস্থূল বাধাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে পড়লুম। নতুন তৈরি ঘরে পেন্ট আর চুনকামের গন্ধ পাচ্ছিলুম। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। চোখে পড়ল ঢেউখেলানো অনাবাদি, কোথাও আবাদি প্রান্তর। তার শেষে নীল পাহাড়ের উঁচু-নিচু শিখর। বুঝলুম, ওদিকটা বিহার এবং ওই পাহাড় ছোটনাগপুর রেঞ্জের একটা অংশ।

কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন,—রায়গড়-রাজাদের পুরনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে হলে পশ্চিম-উত্তর কোনে তাকাও। যে নদীটা পেরিয়ে এলুম, ওখানে তা জলে ভরা। কারণ দুর্গের নিচে দহ ছিল একসময়। এখন দহ বুজে গেছে। তবে জলের স্রোত সাংঘাতিক তীব্র।

বললুম,—এখনও কুয়াশা আছে। আপনার বাইনোকুলারটা দিন।

বাইনোকুলার অ্যাডজাস্ট করে নিতেই চোখে পড়ল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে আছে। এবং একটা অংশ হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল পর্যন্ত এগিয়ে আছে।

হঠাৎ দেখলুম, ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে দুজন লোক বেরিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়াল। দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। কিন্তু কর্নেলের বাইনোকুলারে তাদের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। একজনের পরনে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট ও মাথায় টুপি। তার কাঁধে একটা কিটব্যাগ ঝুলছে। অন্যজন বেঁটে এবং মোটাসোটা। তার পরনে প্যান্ট, গায়ে সোয়েটার আর মাথায় মাফলার জড়ানো। দুজনের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তারা অঙ্গভঙ্গি করে সম্ভবত কথা বলছে।

কর্নেলকে বললুম কথাটা। অমনি তিনি বাইনোকুলার প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন,—কী আশ্চর্য! পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ আর কৃষ্ণকান্ত অধিকারী ওখানে কী করছেন?

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—দুজনেই জঙ্গলে ঢুকে গেলেন।

—যাকগে। এখন এ নিয়ে মাথাব্যথার মানে হয় না। ট্রেনজার্নির ধকল সামলাতে তুমি গড়িয়ে নাও। নাখুলাল ফিরে এলে স্নান করে ফ্রেশ হওয়া যাবে।

নাখুলাল ফিরল ঘণ্টাদেড়েক পরে। সে বলল,—সুরেনকে আসতে বলেছি কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। তুমি আমাকে আরেক পেয়ালা কফি খাইয়ে দাও।

নাখুলাল হাসল,—জানি সার! রেঞ্জারসায়েব বলেছেন, আপনি হরঘড়ি কফি খান।

—এখানে স্নানের জলের ব্যবস্থা আছে তো?

—আছে সার! বাংলোর পিছনে নিচে একটা কুয়ো আছে। কুয়োর মুখ ঢাকা। ওই দেখুন, টিউবেল। টিউবেলের নল কুয়োর মধ্যে ঢোকানো আছে। আমি জল তুলে দেব। এক বালতি জল গরম করে দেব।

বলে সে বাংলোর পিছনদিকে কিচেনে চলে গেল। তারপর দশমিনিটের মধ্যেই একপট কফি এনে দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্নেলের কথায় কফি পান করতে হল। কর্নেলের বরাবর ওই এক কথা : কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে।

কফি খেয়ে আমি পোশাক বদলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বাংলোর পিছনে গেলেন। ভাবলুম, হাড়টমটিয়া নামক অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর প্রাণীটিকে বাইনোকুলারে আবার খুঁজতে গেলেন। চৌকিদার প্রাণীটাকে দেখে ভালুক ভেবেছিল। কিন্তু আমি প্রাণীটাকে না দেখতে পেলেও কোনও হাড়মটমট-করা শব্দ শুনিনি। এদিকে কর্নেল গম্ভীরমুখে বলছিলেন, প্রাণীটা ভালুকের মতো দেখতে হলেও ভালুক নয় এবং ওটাই হয়তো সেই হাড়মটমটিয়া! সে নাকি ওত পেতে আমাদের কথা শুনতে এসেছিল! কী অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার!

এই দিনদুপুরে কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে গা ছমছম করে উঠল! ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত আর বিখ্যাত ব্যবসায়ী কৃষ্ণকান্ত অধিকারীকে দুর্গের ধ্বংসস্তূপে দেখার কথাও মনে পড়ল। ওঁদের আচরণও অদ্ভুত।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এসে বারান্দায় বসলেন। বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বারান্দায় আমাকে দেখে কর্নেল বললেন,—ভেবেছিলুম তুমি কম্বল ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছ!

বেতের চেয়ার টেনে বসে বললুম,—স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোব। কিন্তু আপনি কি হাড়মটমটিয়ার খোঁজে বাংলোর পিছনে ওত পেতেছিলেন?

—না। নাখুলালের সঙ্গে গল্প করছিলুম। লোকটি খুব সরল প্রকৃতির। আদিবাসীদের এই গুণটা আছে। খ্রিস্টান হলেও রংলিডিহির বুড়ো-বুড়িরা যেমন, তেমনি যুবক-যুবতীরাও জঙ্গলের

দেবতাকে মানে। শুনলে না? তখন নাখুলাল ঠাকুরবাবার কথা বলছিল। তবে এই ঠাকুরবাবা এক ভয়ঙ্কর দেবতা। আগে মানুষের রক্ত খেত। এখন মুরগির রক্ত পেলেই খুশি হয়। জঙ্গলের মধ্যে যেখানে একটা ডোবা আছে, ওটার পাড়ে ঠাকুরবাবার থান ছিল। এখন থানটা বটগাছের শেকড়ে ঢাকা পড়েছে। তবে নাখুলালের মুখ থেকে কিছু তথ্য পেলুম। দীপুর হারিয়ে যাওয়ার রাত্রে ডোবার পাড়ে রক্ত দেখে পুলিশ বলেছিল, আদিবাসীরা মুরগি বলি দিয়েছিল, সেই রক্ত। নাখুলাল বলল, পুলিশের কথা ঠিক। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে কেউ-কেউ ঠাকুরবাবার কাছে মুরগি বলি দিয়ে মানত করে। মানত করার জন্য গোপনে বিকেলের দিকে বলির জায়গাটা পরিষ্কার করতে হয়। তো নাখুলাল কথায়-কথায় বলে ফেলল, কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মানত দিয়েছিল তার জ্যাঠতুতো দাদা মানকু। মানকুর সঙ্গে বিকেলে গোপনে থান পরিষ্কার করতে গিয়েছিল শিবু। শিবু খ্রিস্টান হলেও ওঝার পেশা ছাড়েনি। সে মন্তরতন্তর জানে।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। জিগ্যেস করলুম,—তারপর?

কর্নেল আস্তে বললেন,—মানকু আর শিবু-ওঝা দুটো লোককে একটা ঝোপের আড়ালে বসে থাকতে দেখেছিল। তাদের সাড়া পেয়ে ওরা লুকিয়ে পড়ে। ওদের একজনকে মানকু আর শিবু চিনতে পেরেছিল। সেই লোকটা রায়গড়ের উপেন দত্ত। অন্যজনকে চিনতে পারেনি।

—এসব কথা কি ওরা পুলিশ বা কুমুদবাবুকে বলেছিল?

—না। ওরা খামোকা ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। তাছাড়া ওদের মানত করার কথা শুনলে ফাদার স্যামুয়েল চটে যেতেন। মিশন থেকে সাহায্য বন্ধ হয়ে যেত। তাই নাখুলাল আমাকে অনুরোধ করল, এসব কথা যেন কাকেও না বলি।

কথাগুলো শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম। বললুম,—কর্নেল! তাহলে উপেন দত্ত ওরফে পীতাম্বর রায় আর তার সেই গুন্ডা গোবিন্দ বল কুড়োতে আসা দীপুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর দীপু কোনও সুযোগে পালিয়ে যায়। তাই পীতাম্বর রায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

কর্নেল হাসলেন,—অঙ্কটা একটু জটিল জয়ন্ত!

—কেন?

কর্নেল বললেন,—পরে বুঝবে। আপাতত স্নান করে ফেলো। প্রায় বারোটা বাজে।

স্নানাহারের পর কর্নেল বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে হেলান দিলেন। আমি অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিতে গায়ে কম্বল চাপা দিলুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

সেই ঘুম ভাঙল চৌকিদারের ডাকে। সে চা এনেছিল। বিছানা ছেড়ে ঘড়ি দেখলুম। চারটে বেজে গেছে। জিগ্যেস করলুম,—কর্নেলসায়েব কোথায় নাখুলাল?

চৌকিদার বলল,—সুরেন এসেছিল সার! কর্নেলসায়েব তার সঙ্গে আমাদের বস্তিতে গেছেন।

কর্নেলের খেয়ালিপনা আমার জানা! রাগ করার মানে হয় না। বারান্দা থেকে লনে গিয়ে দিনশেষের বিবর্ণ রোদে দাঁড়িয়ে চা পানে মন দিলুম। লনের দুধারে সুদৃশ্য স্কুলবাগান। ঝাউগাছ, অর্কিড আর কয়েকরকম পাতাবাহার। এতক্ষণে দেখলুম একজন মালি এসে আপনমনে বাগান পরিচর্যা করছে। চৌকিদার তার সঙ্গে গল্প করতে গেল।

প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রেললাইন পূর্ব থেকে বাঁক নিয়ে পশ্চিম ঘুরেছে। ঢিমেতালে এগিয়ে চলেছে একটা মালগাড়ি। রেললাইন পেরিয়ে একটা পিচের রাস্তা এই বাংলোর পূর্বদিকে আদিবাসী বস্তির কিনারা ঘেঁসে উত্তরে অদৃশ্য হয়েছে। ওটাই বোধহয় রায়গড়গামী সড়ক। এই অবেলায় পিচের সড়কে মাঝে-মাঝে একটা করে ট্রাক বা বাস যাতায়াত করছে। একটা সাদা অ্যাম্বাসাডারও আসতে দেখলুম। গাড়িটা আদিবাসী বস্তির পূর্বে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালি কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার সময় আমাকে সেলাম ঠুকে গেল। সরকারি অফিসার ভেবেছে হয়তো। চৌকিদার বাংলোর পিছনের ঘর থেকে একটা চীনা লণ্ঠন জ্বেলে আমাদের ঘরে রাখল। তারপর একটা হ্যারিকেন বারান্দায় টেবিলে রাখল।

বললুম,—নাখুলাল? তুমি পেছনের ঘরে থাকো। তোমার ভয় করে না?

নাখুলাল বুকে ক্রস এঁকে বলল,—না সার! আমার বল্লম আর তির-ধনুক আছে। তবে সার! জঙ্গলে আছেন বাবাঠাকুর আর আমার বুকে ক্রস আছে। প্রভু যিশু আছেন মাথার ওপর। ওই দেখুন! প্রভুর দয়া! চাঁদ উঠেছে।

এই বনভূমিতে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য উপভোগ করব কী, আমার মনে শুধু সেই অদ্ভুতুড়ে জন্তুটার জন্য আতঙ্ক। হাওয়ায় গাছপালার অদ্ভুত শব্দে এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছিলুম। হাতে ততক্ষণে টর্চ নিয়েছি এবং আমার লাইসেন্সড রিভলভারটা ঘরে বালিশের পাশে রেখেছি।

বারান্দায় বসে অকারণ এদিকে-ওদিকে টর্চের আলোয় জ্যোৎস্নাকে ক্ষতবিক্ষত করছিলুম। কতক্ষণ পরে কাঠের গেট খুলে কর্নেলকে ঢুকতে দেখলুম। তিনি কাকে বললেন,—এবার তুমি চলে যাও। খামোকা কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসার দরকার ছিল না।

কেউ বলল,—তা কি হয় সার? আপনি বাংলোয় না পৌঁছানো পর্যন্ত মনে শান্তি পেতুম না।

কণ্ঠস্বর কোনও তরুণের মনে হল। উচ্চারণ বেশ মার্জিত। চৌকিদার বলল,—সুরেন এসেছিল সার?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। খুব ভালো ছেলে তোমার ভাইপো! খুব ভদ্র। সাহসীও বটে! নাখুলাল বলল,—ফাদার বলেছেন ওকে কলেজে ভর্তি করে দেবেন।

—বাঃ! তবে আপাতত কফি নাখুলাল!

—হ্যাঁ সার! আমি জল চাপিয়ে রেখেছি কুকারে।

কর্নেল বারান্দায় উঠে ইজিচেয়ারটা টেনে বসলেন। বললেন,—জয়ন্ত! কথা বলছ না? তার মানে এই বৃদ্ধের প্রতি খাপ্পা হয়েছ। কিন্তু তোমার ভাতঘুম নষ্ট করার মানে হয় না। এতে তোমার শরীর ফিট হয়ে গেছে।

বললুম,—মোটেও খাপ্পা হইনি। লনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না উপভোগ করছিলুম।

কর্নেল হাসলেন,—উপভোগ, নাকি হত্যা করছিলে? দূর থেকে বারবার টর্চের আলোর ঝলক দেখে আমি ভাবনায় পড়েছিলুম। হাড়মটমটিয়াকে ওত পাততে দেখেছ সম্ভবত।

বললুম,—ওকথা থাক। কতদূর ঘুরলেন বলুন!

নাখুলাল পটভর্তি কফি, দুধ, চিনি, এক প্লেট স্ন্যাক্স আর কাপপ্লেট রেখে গেল। কর্নেল কফি তৈরি করতে-করতে বললেন,—তুমি ঘুমোচ্ছিলে। তখন সুরেন এসেছিল। ছেলেটির বয়স ষোলো-সতেরো বছর মাত্র। দারুণ সাহসী। জঙ্গলে যেখানে সে বলটা পরদিন কুড়িয়ে পেয়েছিল, সেখানে নিয়ে গেল আমাকে। লক্ষ করলুম, খেলার মাঠ থেকে বলটা অতদূরে পৌঁছুতে পারে না। তার মানে কেউ বলটা ইচ্ছে করেই ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে দীপু বলটা দেখতে না পায়। যাই হোক, সুরেন আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ি থেকে প্লাস্টিকের থলেতে ভরে ছেঁড়া বলটা এনে দেখাল।

—বলটা নিয়ে আসেননি?

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগটা দেখালেন। ওটা তাঁর পায়ের কাছে রাখা ছিল। বললেন,—পরে দেখবে। আপাতদৃষ্টে মনে হবে, কোনও হিংস্র জন্তু ওটাকে যথেষ্ট ছিঁড়েছে। কিন্তু আতশ কাচের সাহায্যে দেখে বুঝলুম, সূক্ষ্ম সূচলো কোনও যন্ত্রে কেউ এই কাজটা করেছে। অর্থাৎ দীপু যেন

কোনও হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছে, এটাই তখন লোককে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। বুঝতেই পারছ, দীপুকে যারা অপহরণ করেছিল, তারা তাকে নিরাপদে সম্ভবত কলকাতা নিয়ে যেতে সময় চেয়েছিল।

—কর্নেল! তাহলে আমার ধারণা ট্রেনে নয়, দীপুকে কিডন্যাপাররা মোটর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—ঠিক ধরেছ। আমার থিয়োরি তা-ই।

—কিন্তু কুমুদবাবুর সঙ্গে দেখা করে কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু নারায়ণ রায়ের পারিবারিক পাঠাগারের সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—তার আগে আমাদের জানা দরকার, উপেন দত্ত জঙ্গলের ভেতর পাথুরে মাটিতে, কেন গর্ত খুঁড়ছিল? জয়ন্ত! আজ রাত্রে আমরা ওখানে যাব। সুরেনকে বলেছি, সে রাত ন'টার মধ্যে খেয়েদেয়ে এখানে চলে আসবে।

—নাখুলাল এসব কথা তাদের বস্তিতে রটিয়ে দেবে না তো?

—সুরেন তার জ্যাঠাকে সব বুঝিয়ে বলবে।

আধঘণ্টা পরে নাখুলাল মাথায় হনুমানটুপি এবং গায়ে ওভারকোট পরে কফির ট্রে নিতে এল। সে একটু হেসে বলল,—কর্নেলসায়েব! সুরেনকে কেমন লাগল আপনার?

কর্নেল বললেন,—খুব ভালো। সাহসী ছেলে। শোনো! সুরেন আবার এখানে রাত নটা নাগাদ আসবে।

নাখুলালের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। সে বলল,—অত রাতে জঙ্গলের পথে সে একা আসবে? সার যদি বলেন, আমি গিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

কর্নেল হাসলেন,—তোমার চিন্তার কারণ নেই নাখুলাল! ফাদার স্যামুয়েল সুরেনকে যে ক্রস দিয়েছেন, তাতে প্রভু যিশুর কথা খোদাই করা আছে। ওই ক্রস যার গলায় ঝুলছে, কারও সাধ্য নেই তার ক্ষতি করে।

আদিবাসী খ্রিস্টান যোশেফ নাখুলাল তাতে খুব আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না। গম্ভীরমুখে সে চলে গেল।

বাইরে ঠান্ডা বাড়ছিল। আমরা ঘরে গিয়ে বসলুম। কর্নেল কিটব্যাগ থেকে প্ল্যাস্টিকে মোড়া সেই ছেঁড়া ফুটবল আর ব্লাডার বের করে দেখালেন। বললুম,—কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে।

কর্নেল বললেন,—কী?

—ছেঁড়া ফুটবলের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, উপেন দত্ত ওরফে পীতাম্বর রায়কে কি একইঅস্ত্রে হত্যা করা হয়েছে? তার শরীরে নাকি হিংস্র জন্তুর মতো নখের আঁচড় ছিল!

কর্নেল ছেঁড়া ফুটবল আর ব্লাডার কিটব্যাগে আগের মতো প্লাস্টিকে মুড়ে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন,—সাধারণত এভাবে নখের আঁচড়ে কিছু ফালাফালা করা বুনো ভালুকের অভ্যাস। লোকেরা বা নাখুলাল নিজেও যে গর্জন শুনেছিল, বুনোভালুক কতকটা ওইরকম গর্জনই করে। হ্যাঁ—এ জঙ্গলে ভালুক থাকা অসম্ভব নয়। তাই দীপুর কিডন্যাপার ব্যাপারটা ভালুকের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। তারপর তার ফটো এবং বত্রিশের ধাঁধার ব্যাপারটা এসে গিয়েছিল। কিন্তু লোকেরা তো এসব গোপন কথা জানে না! এরপর উপেন দত্তের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকেরা আগের মতো ভালুক বা ওই জাতীয় হিংস্র জন্তুকেই আততায়ী ভাবছে। আবার হাড়মটমটিয়ার কিংবদন্তিতে যারা বিশ্বাসী, তারা ভাবছে এটা ওই ভূতুড়ে প্রাণীর কাজ। এদিকে উপেন দত্ত চোরাই মালের কারবার করত। তা নিয়েও নানা কথা রটেছে। এ

থেকে শুধু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায়। তা হল : কেউ বা কারা একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়।

—কেন?

—এর উত্তর পাব, যদি উপেন দত্ত যা খুঁজছিল, তা দৈবাৎ আমরা পেয়ে যাই।

—রাত্রে কেন? দিনে সেই জিনিসটা খুঁজে বের করা যায় না?

—দিনে ঝুঁকি আছে। কারণ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ আর কৃষ্ণকান্ত অধিকারীকে আমরা একত্রে আবিষ্কার করেছি।

রাত নটায় সুরেন এল। সদ্য গোঁফের রেখা গজানো ছেলেটিকে মুখে লাবণ্য যেমন আছে, তেমনি স্মার্টনেসও আছে। আমাকে সে নমস্কার করে কর্নেলকে বলল,—কর্নেলসায়েব! আমি আমার জেঠুর সঙ্গে কথা বলে আসি।

আমরা সাড়ে নটায় খেয়ে নিলুম। নাখুলালের মুখ তখনও গম্ভীর। রাত দশটায় আমরা বাংলোর উত্তরের গেট খুলে বেরিয়ে গেলুম। নাখুলাল বল্লম আর পাঁচ ব্যাটারি টর্চ হাতে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

আজ সকালে যেখানে যেতে একটুও ভয় পাইনি, এই জ্যোৎস্নারাতে সেখানে পৌঁছুতে প্রতি মুহূর্তে চমকে উঠছিলুম। আমার এক হাতে টর্চ, অন্যহাতে রিভলভার। কর্নেলের কাঁধে শুধু কিটব্যাগ। আর সুরেনের হাতে টর্চ আর একটা শাবল।

গাছের ছায়া দুলছে শীতের হাওয়ায়। জ্যোৎস্নায় চারপাশে অজানা রহস্য অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, কারা যেন ছায়ার আড়ালে ওত পেতে আছে—তারা যেন মানুষ নয়। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কোথায় গাছের শুকনো ডাল ভাঙার মতো মটমট শব্দ হতে থাকল। আমরা থমকে দাঁড়ালুম। কর্নেল টর্চ জ্বালতে নিষেধ করলেন।

শব্দটা মিনিট দুয়েক পরে থেমে গেল। সুরেন ফিসফিস করে বলল,—এই শব্দটা আমি অনেকবার শুনেছি। কিন্তু কীসের শব্দ তা বুঝতে পারিনি।

কর্নেল আস্তে বললেন,—চলো! এসে গেছি।

সেই ফাঁকা জায়গায় গর্তটার কাছে পৌঁছে কর্নেল চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন,—উপেন দত্তের গর্ত থেকে হাত তিনেক দূরে—এই যে এখানে। টর্চ জ্বালবার দরকার নেই। এখানে দিনে একটা আবছা ক্রুসচিহ্ন দেখেছিলুম।

বলে উনি সেখানে বসে কিটব্যাগ থেকে কী একটা খুদে কালো জিনিস বের করলেন। জিনিসটাতে একবিন্দু লাল আলো ফুটে উঠল। এবার চিনতে পারলুম। ওটা কর্নেলের সেই মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র। যন্ত্রটা ক্ষীণ পিঁ-পিঁ শব্দ করতে থাকল। কর্নেল সুইচ টিপলে শব্দ বন্ধ হল। আলোও নিভল। তিনি বললেন,—সাবধানে খোঁড়ো সুরেন!

আমি এবং কর্নেল একটু তফাতে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম। সুরেনের শাবল খুব সহজেই মাটিতে ঢুকে যাচ্ছিল। বুঝলুম, এখানে শক্ত মাটির বদলে বালি ভরা আছে একটু পরে সুরেন শাবল রেখে দু'হাতে বালি সরিয়ে একটা ছোটো প্যাকেটের মতো জিনিস বের করল। কর্নেল সেটা তার হাত থেকে নিয়ে বললেন,—জায়গাটা আগের মতো ভরাট করে দাও। সকালে আমি এসে পাথর কুড়িয়ে এনে ঠিকঠাক করে দেব।

কিছুক্ষণ পরে আমরা ফিরে চললুম। বাংলোর কাছাকাছি গেছি, হঠাৎ পিছনে একটা অমানুষিক গর্জন শুনতে পেলুম। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ—আঁ!

কর্নেল বললেন,—কুইক! দৌড়ে বাংলোয় গিয়ে ঢুকতে হবে।

ছয়

সামান্য চড়াই বেয়ে বাংলোর পিছনের গেটে পৌঁছে দেখি, নাখুলাল ওভারকোট পরে এক হাতে বল্লম এবং অন্য হাতে টর্চ নিয়ে সবে তার ঘর থেকে বেরুচ্ছে। সুরেন গেট বন্ধ করে আদিবাসী ভাষায় তার জ্যাঠা নাখুলালকে কিছু বলল। তার কথার জবাবে নাখুলালও কিছু বলল। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় তার মুখে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করলুম।

পরে আমাদের ঘরে বসে চীনে লণ্ঠনের আলোয় সুরেনের মুখে চাপা হাসি দেখতে পেলুম। বললুম,—তোমার জেঠা নাখুলাল দূর থেকে অদ্ভুত গর্জন শুনে ভয়ে কোণঠাসা হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি ভয় পাওনি মনে হচ্ছে।

সুরেন বলল,—আমার জেঠুকে তখন জিগ্যেস করলুম, গেটে তোমার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। তুমি ঘরে ঢুকে কী করছিলে? জেঠু বলল, হাড়মটমটিয়াকে সায়েবরা রাগিয়ে দিতে গেলেন। আমি গেটে একা দাঁড়িয়ে থাকলে সে আগে আমাকেই উপেন দত্তের মতো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। আসলে হয়েছে কী জানেন? ওই অদ্ভুত গজরানি শুনে জেঠু বেজায় ভয় পেয়েছে।

—কিন্তু তুমি ভয় পাওনি?

না সার! ওই গজরানি আমি অনেকবার শুনেছি। কিন্তু সাহস করে দাঁড়িয়ে দেখেছি, গজরানিটা হঠাৎ থেমে গেছে। হাড়মটমটিয়া আমাকে দেখা দেয়নি, মারতে আসা তো দূরের কথা। —বলে সুরেন হেসে উঠল : কর্নেলসায়েবকে বলতে যাচ্ছিলুম, সাহস করে দাঁড়াব। দেখবেন, কেউ হামলা করবে না। তাছাড়া আপনার হাতে তো রিভলভার ছিল।

কর্নেল হাসলেন না। গম্ভীরমুখে বললেন,—সুরেন! হাড়মটমটিয়া যে জিনিসটা এতদিন পাহারা দিচ্ছিল সেটা আজ রাতে আমরা হাতিয়ে নিয়েছি। তাই সে খাপ্পা হয়ে তেড়ে আসছিল। জয়ন্ত গুলি ছুড়লেও সে ভয় পেত না।

সুরেন একটু অবাক হয়ে বলল,—যে প্যাকেটটা খুঁড়ে তুললুম, ওতে কী আছে সার?

—পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, তোমার বন্ধু দীপু নিখোঁজ হওয়ার পিছনে এই জিনিসটাই দায়ী। যাই হোক, তুমি এত রাতে বাড়ি ফিরো না। তোমার জ্যাঠার কাছে থাকো।

নাখুলাল বারান্দা থেকে আদিবাসী ভাষায় সুরেনকে কিছু বলল। সুরেন বেরিয়ে গেল। তারপর দুজনে বারান্দা দিয়ে ঘুরে পিছনের দিকে চলে গেল।

কর্নেল দরজা বন্ধ করে দিয়ে জ্যাকেটের ভেতর থেকে ছোটো প্যাকেটটা বের করলেন। সেটা শক্ত সুতোয় আগাগোড়া জড়ানো। এবং বাঁধা ছিল। কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ থেকে ছুরি বের করে সুতো কেটে ফেললেন। তারপর কালো পলিথিনের মোড়ক খুললে শক্ত কাগজের মোড়ক দেখা গেল। কর্নেল আস্তে বললেন,—জানি না, এতে যা আছে ভাবছি, তা সত্যিই আছে কি না। থাকলে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে।

তারপর তিনি আরও একটা মোড়ক খুলে ফেললেন। কুচকুচে কালো, চৌকো, ইঞ্চি চারেক প্রস্থ এবং ইঞ্চি ছয়েক দৈর্ঘ্যের এক অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলুম। জিনিসটার উচ্চতাও প্রায় চার ইঞ্চি। সব দিকেই সুন্দর কারুকার্য করা। তবে ওটার একদিকে খুদে গোল বোতাম সারিবদ্ধভাবে বসানো আছে। কর্নেল বললেন,—বেশ ওজন আছে। হাতে নিয়ে দেখতে পারো!

হাতে নিয়ে অনুমান করলুম ওজন প্রায় হাফ কিলোগ্রাম হবে। আগাগোড়া উলটে পালটে দেখার পর বললুম,—এটা পাথর মনে হলেও পাথরের নয় কর্নেল!

কর্নেল আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে বললেন,—না। এটা অজানা কোনও ধাতুতে তৈরি। জয়ন্ত! আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ চট্টরাজের ক্যাম্প থেকে এই জিনিসটাই চুরি গিয়েছিল, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। পীতাম্বর রায় ওরফে উপেন দত্তই এটা চুরি করে জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিল। কোনও কারণে গতরাতে সে এটা খুঁড়ে বের করতে এসেছিল। কিন্তু সে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল জায়গা খুঁড়ছিল। সেই সময় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ী। সম্ভবত সে উপেনের অজ্ঞাতসারে তাকে অনুসরণ করে এসেছিল!

বললুম,—কিন্তু আততায়ী যদি কোনও মানুষ হয়, তাহলে তাকে ওভাবে ক্ষতবিক্ষত করে মারল কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার এটুকু বোঝা উচিত জয়ন্ত। দীপুকে কোনও জন্তু মেরে ফেলেছে বলে গুজব রটেছিল। তা ছাড়া এই জঙ্গলে নাকি হাড়মটমটিয়া নামে সাংঘাতিক ভূত বা পেতনি আছে বলে আদিবাসীরা বিশ্বাস করে। কাজেই আততায়ী এবং তার পেছনে যারা আছে, তারা উপেন দত্তের মৃত্যু কোনও অদ্ভুত জন্তুর আক্রমণেই হয়েছে, এটা দেখাতে চেয়েছিল।

—কিন্তু ওই অমানুষিক গর্জন কি সত্যিই কোনও জন্তুর!

—জানি না।

—কর্নেল! আপনি আমাদের ছুটে পালিয়ে বাংলোয় আশ্রয় নিতে বলেছিলেন!

—হ্যাঁ। রাতবিরেতে জঙ্গলে শুধু রিভলভার দিয়ে আত্মরক্ষা করা যায় না। যাই হোক, এবার শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে আমরা কুমুদবাবুর বাড়ি যাব।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখি, নাখুলাল বেড-টি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে আজ উজ্জ্বল রোদ ফুটেছে। কালকের মতো কুয়াশা নেই। জিগ্যেস করলুম,—কর্নেলসায়েব কোথায় নাখুলাল?

নাখুলাল বলল,—উনি ভোরে উঠে সুরেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন।

—কোনদিকে গেছেন দেখেছ?

নাখুলাল উত্তর-পশ্চিম কোণে দূরের দিকে আঙুল তুলে বলল,—পুরনো গড়ের খণ্ডহরের দিকে যেতে দেখেছি সার!

বেড-টি বিছানায় বসে আমার খাওয়ার অভ্যাস। কিন্তু বাইরে রোদ দেখে বারান্দায় গিয়ে বসলুম। কুয়াশা আজ যেন দূরে সূরে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পিচের সড়কে মাঝে মাঝে যানবাহন যাতায়াত করছে।

নাখুলাল বলে গেল, বাথরুমে গরম জল দিয়েছে। এখনই মুখ না ধুলে জলটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাই বাথরুমে ঢুকলুম। তারপর প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট পরে বাংলোর পশ্চিমদিকে গেলুম। প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপে কুয়াশা ঘন হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অনুর্বর রুক্ষ মাঠ এবং নদীর দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়ল, কেউ হনহন করে এগিয়ে আসছে। অস্পষ্ট একটা মূর্তি। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ আছে। লোকটা নদী পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসার পর চিনতে পারলুম।

লোকটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই! কিন্তু উনি কী করে জানলেন আমরা এই বনবাংলোতে উঠেছি?

আরও কাছাকাছি এসে তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন এবং চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। বাংলোর সদর গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু পরে গোয়েন্দাপ্রবর এসে গেলেন। বললুম,—আসুন হালদারমশাই! আপনাকে কে বলল আমরা এখানে আছি?

হালদারমশাই আড়ষ্টভাবে হেসে বললেন,—সেই গোবিন্দরে ফলো করছিলাম। মেসের ম্যানেজাররে ফোন করছিলাম কাইল বিকালে। তিনি কইলেন, গোবিন্দ তারে কইছে, পীতাম্বরবাবু

মারা গেছেন। পীতাম্বরবাবুর ভাগনা খবর আনছে। সেই ভাগনারে ম্যানেজারবাবু চেনেন। সে মাঝে-মাঝে মেসে গিয়া মামার লগে থাকত। তো দুইজনে পীতাম্বরবাবুর জিনিসপত্র লইয়া হাবড়া স্টেশনে গেছে।

বললুম—আপনি তাহলে তখনই হাওড়া স্টেশনে ছুটে গিয়েছিলেন?

—ঘরে চলেন। সব কমু। কর্নেলসায়েব কই গেলেন?

—মর্নিংওয়াকে।

হালদারমশাই বারান্দায় বসে মাথায় জড়ানো মাফলার খুললেন। নাখুলাল এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললুম,—নাখুলাল! ইনি কর্নেলসায়েবের বন্ধু। শিগগির এঁর জন্য চায়ের ব্যবস্থা করো!

নাখুলাল চলে গেলে হালদারমশাই যা বললেন, তার সারমর্ম হল : হাওড়া স্টেশনে গিয়ে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে গোবিন্দদের আবিষ্কার করতে পারেননি। অগত্যা ফিরে আসবেন ভাবছেন, সেই সময় তাঁর চোখে পড়ে, গোবিন্দ আর তার বয়সি এক যুবক বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামছে। অমনি তিনি আড়ালে গিয়ে তাদের দিকে লক্ষ রাখেন। কিন্তু রায়গড় যাওয়ার ট্রেন রাত বারোটায়। এনকোয়ারিতে খবর নিয়ে টিকিট কেটে হালদারমশাই তাদের চোখের আড়ালে অপেক্ষা করেন। অবশেষে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ভিড়লে তিনি গোবিন্দদের পিছনের কামরায় ওঠেন। ভোরবেলা রায়গড় স্টেশনে নেমে গোবিন্দ আর তার সঙ্গী একটা ট্রাকে জায়গা পেয়ে চলে যায়। হালদারমশাই বেশ কিছুক্ষণ পরে স্টেশনচত্বরে নেমে কীভাবে যাবেন, তার খোঁজ নিচ্ছিলেন। একদল আদিবাসী সেই সময় হাঁটতে-হাঁটতে স্টেশনচত্বরে ঢুকছিল। তাদের জিগ্যেস করে তিনি জানতে পারেন, হাঁটাপথে রায়গড় তত দূরে নয়। নাকবরাবর এগিয়ে তাদের বসতির ভেতর দিয়ে গেলে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরত্ব। সেই আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন, রায়গড়ে কোনও হোটেল নেই। এদিকে ষষ্ঠীচরণ তাঁকে জানিয়েছিল আমরা রায়গড়ে এসেছি। কথায়-কথায় এক দাড়িওয়ালা সায়েবের খোঁজ নেন তিনি। প্রাইভেট ডিটেকটিভের বুদ্ধি! তাছাড়া তিনি প্রাক্তন এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। কর্নেল যে বনবাংলোয় উঠেছেন, সেই খবরও তিনি পেয়ে যান।

ইতিমধ্যে চা এনেছিল চৌকিদার। চা খেতে-খেতে হালদারমশাই তাঁর কথা শেষ করে বললেন, —আদিবাসী ভদ্রলোকেরে পীতাম্বর রায়ের কথা জিগাইলাম। ও নামে রায়গড়ে কেউ নাই শুনিয়া ওনারে কইলাম, রায়গড়ের এক ভদ্রলোক কলকাতায় থাকতেন। তিনি মারা গেছেন হঠাৎ। তখন ভদ্রলোক কইলেন, একজন জঙ্গলে কী সাংঘাতিক জানোয়ারের পাল্লায় পইড়া মারা গেছে বটে। তার নাম উপেন দত্ত। তখন গোবিন্দর কথা বললাম। ভদ্রলোক কইলেন, গোবিন্দ একজন গুণ্ডা। উপেন দত্ত লোকটাও ভালো ছিল না। গোবিন্দ ছিল তার এক চেলা!

এবার আমি উপেন দত্তের মৃত্যুর ঘটনা হালদারমশাইকে বললুম। এ-ও বললুম, উপেন দত্ত সত্যিই পীতাম্বর রায়। তবে গতরাতের ঘটনা বললুম না। বলতে হলে কর্নেলই বলবেন।

কর্নেল একা ফিরলেন, তখন নটা বাজে। তিনি হালদারমশাইকে দেখামাত্র বলে উঠলেন, —সুপ্রভাত হালদারমশাই! আমি কিছুক্ষণ আগে বাইনোকুলারে আপনাকে আবিষ্কার করে অবাক হয়েছিলুম। আপনার গোয়েন্দাগিরির তুলনা নেই!

গোয়েন্দাপ্রবর জিভ কেটে বললেন,—লজ্জা দ্যান ক্যান কর্নেলস্যার? গোবিন্দ আর তার এক সঙ্গীরে ফলো করিয়া আইয়া পড়ছি!

কর্নেল নাখুলালকে ডেকে বললেন,—আমাদের এই গেস্টের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে নাখুলাল! আমি রেঞ্জারসায়েবকে খবর দেব। তোমার চিন্তার কারণ নেই। পাশের ঘরটা খুলে দাও। আর আমাদের তিনজনের জন্য ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করো!

নাখুলাল পাশের ঘরের তালা খুলে দিল। তারপর ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে গেল। হালদারমশাই পাশের ঘরে উঁকি মেরে এসে বললেন,—নতুন ঘর! পেন্টের গন্ধ পাইলাম। ইলেকট্রিসিটি নাই?

কর্নেল বললেন,—নাঃ! তবে এখন শীতকালে অসুবিধে নেই। হ্যাঁ—মশা আছে! তাই মশারিও আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে নাখুলাল ট্রেতে সাজিয়ে ঘিরে ভাজা লুচি, আলুর তরকারি আর সন্দেশ দিয়ে গেল। এখানে ভালো পাঁউরুটি পাওয়া যায় না। তবে ঘি নাকি নির্ভেজাল। সন্দেশও উৎকৃষ্ট। ব্রেকফাস্টের পর কফি এল। নাখুলালকে বাজার করার টাকা দিলেন কর্নেল। সে সাইকেলে চেপে চলে গেল।

কফি খেতে-খেতে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম—দুর্গের ধ্বংসস্তূপে সুরেনকে নিয়ে ঘুরছিলেন দেখেছি। ওখানে কি কিছু আবিষ্কার করলেন?

কর্নেল বললেন,—আবিষ্কার করার অনেক কিছু এখনও থাকতে পারে ওখানে। তবে সেটা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজ। আমি দেখতে গিয়েছিলুম, কাল কৃষ্ণকান্ত অধিকারী আর ডঃ চট্টরাজ ওখানে কী কারণে গিয়েছিলেন। ঘুরতে-ঘুরতে একটা ধ্বংসস্তূপের ভেতর গুহার মতো জায়গা চোখে পড়ল। ছোটো গুহার সামনে লতার ঝালর ছিল। সুরেন বলল, একবার দীপু তাকে এই গুহাটা দেখাতে নিয়ে এসেছিল। গুহার ভেতর কালো লোম পড়ে থাকতে দেখে তারা ভেবেছিল ওখানে ভালুক থাকে। তাই তখনই সেখান থেকে দুজনে পালিয়ে গিয়েছিল। দৈবাৎ ভালুকটা যদি এসে পড়ে! তো আমিও ওখানে ভালুকজাতীয় জন্তুর লোম পড়ে থাকতে দেখলুম।

বললুম,—উপেনের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, সেখানেও তো লোম কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। এদিকে নাখুলালও কাল ভালুক দেখে চিৎকার করছিল। কিন্তু আমার এখনও ধারণা জন্তুটা ভালুক নয়।

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন,—ভালুক যদি অ্যাটাক করতে আসে, গুলি করুম।

কর্নেল হাসলেন,—না হালদারমশাই! জন্তুটা সম্ভবত ভালুক নয়। তবে দৈবাৎ আপনি জন্তুটাকে দেখতে পেলে গুলি ছুড়বেন না। আপনার রিভলভার দেখাতে পারেন! তাতেই জন্তুটা ভয় পাবে।

—রিভলভার দেখলে ভালুক ভয় পাবে? কন কী কর্নেলস্যার?

পাবে।—বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন : আপনি ঘুমিয়ে নিন। আমাদের ঘরে তালা এঁটে দিয়ে আমরা এবার বেরুব। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিন। আমরা বারোটা নাগাদ ফিরব।

বাংলোর নিচের রাস্তায় নেমে কর্নেল বললেন,—সুরেনকে কুমুদবাবুর কাছে আমাদের আসার খবর দিতে পাঠিয়েছি। আমরা আদিবাসী বস্তির ভেতর দিয়ে শর্টকাটে যাব।

অদিবাসী বস্তিটি বেশ পরিচ্ছন্ন। কর্নেলের পিঠে কিটব্যাগ আঁটা, গলা থেকে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছে। তারা তাঁকে বিদেশি ট্যুরিস্ট ভেবে তাদের গির্জাঘর, স্কুল, এমনকী জঙ্গলে তাদের পূর্বপুরুষের ঠাকুরবাবার থান দেখাতে চাইছিল। কিন্তু কর্নেলের মুখে বাংলা শুনে তাদের আগ্রহ কমে গেল।

বস্তি পেরিয়ে বাঁদিকে সেই খেলার মাঠে পৌঁছুলুম। মাঠের পূর্বপ্রান্তে সেই পিচরাস্তা দেখা গেল। খেলার মাঠের ওপর দিয়ে আমরা কিছুটা গেছি, তখন সুরেনকে দেখতে পেলুম। সুরেন বলল,—মাস্টারমশাই বাড়িতে আছেন। আপনার আসার কথা শুনে খুব খুশি হয়েছেন।

কর্নেল বললেন,—ওঁর বাড়ি কি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে?

সুরেন আঙুল তুলে বলল,—ওই তো! শেষ দিকটায় বটগাছের ফাঁক দিয়ে একতলা পুরনো বাড়ি।

কর্নেল বাইনোকুলারে উত্তরদিকে অবস্থিত রায়গড় খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললেন,—চলো!

কুমুদ ভট্টাচার্য তাঁর বাড়ির উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে অভ্যর্থনা করে বসার ঘরে ঢোকালেন! তিনি বললেন,—আপনি দয়া করে এসেছেন। আমার মনে আশা জেগেছে, দীপুকে আপনি উদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু ওদিকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার! কেষ্টবাবুর সঙ্গে সেদিন কলকাতায় আপনার কাছে গিয়েছিলুম, সেদিনকার একটা খবরের কাগজে দীপুর ছবি ছাপিয়ে কে লিখেছে—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন,—হ্যাঁ। আপনারা চলে যাওয়ার পর বিজ্ঞাপনটা আমি দেখেছি।

কুমুদবাবু বললেন,—বাড়ি ফিরে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি তো অবাক। কেষ্টবাবুর বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা তাঁকে বলেছিলুম। উনি বললেন, কর্নেলসায়েবের নিশ্চয়ই এটা চোখে পড়েছে। উনি পীতাম্বর রায়ের ঠিকানায় খোঁজ নেবেন।

—নিয়েছি। সে এই রায়গড়ের লোক। তাছাড়া আপনি শুনলে আরও অবাক হবেন, তার নাম উপেন দত্ত, যে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে মারা পড়েছে!

কুমুদবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন,—আমার ধারণা, এটাই দীপুর পড়ার ঘর!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক মিনিট। আমি আসছি।

বলে কুমুদবাবু ভেতরে চলে গেলেন। ঘরের একধারে একটা ছোটো তক্তপোশে বিছানার ওপর বেডকভার চাপানো আছে। তার পাশে দেওয়াল ঘেঁসে এবং চেয়ার। টেবিলের ওপর পড়ার বই এবং খাতাপত্র সাজানো। টেবিলসংলগ্ন দেওয়ালে কাঠের র‍্যাক। চারটে র‍্যাকে বই ঠাসা আছে। কর্নেল উঠে গিয়ে সেই র‍্যাকের নতুন ও পুরনো বই দেখতে থাকলেন। বললেন,—নানা বিষয়ের বই পড়ত দীপু। বিজ্ঞান আর ইতিহাসের বই-ই বেশি। খেলাসংক্রান্ত বইও দেখছি।

বলে কর্নেল খেলাসংক্রান্ত একটা বই টেনে নিলেন। পাতা উলটে দেখতে থাকলেন। সেটা দেখার পর আর-একটা খেলার বই টেনে বের করলেন। তারপর লক্ষ করলুম, এই বইটার ভেতর থেকে কর্নেল একটুকরো কাগজ বের করে জ্যাকেটের ভেতর চালান করলেন।

সেই সময় কুমুদবাবু এসে গেলেন। বললেন,—দীপুর খেলাধুলোয় যেমন, তেমনই নানারকম বই পড়ার আগ্রহ ছিল।

কর্নেল বইটা র‍্যাকে ঢুকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। তা-ই দেখছিলুম।

একজন ফ্রক পরা কিশোরী চায়ের ট্রে রেখে গেল। কুমুদবাবু বললেন,—গরিব মানুষ। আপনার সেবাযত্ন করার ক্ষমতা নেই। নেহাত চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করছি।

কর্নেল বললেন,—আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। আপনার অ্যাপায়নের দরকার নেই। অবশ্য চা খেতে আপত্তি নেই। কফির পর চা খেতে মন্দ লাগে না।

সুরেনকে কুমুদবাবু চায়ের কাপ-প্লেট নিজের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—সুরেন দীপুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দীপু নিখোঁজ হওয়ার পর দীপুর বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র সুরেনই খুব ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে।

চা খেতে-খেতে কর্নেল বললেন,—আপনি তো স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তার আগে আপনি রায়গড় রাজবাড়ির পারিবারিক লাইব্রেরি দেখাশুনা করতেন শুনেছি?

কুমুদবাবু কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন,—একটা কথা আপনাকে কেষ্ট অধিকারীর সামনে বলার সুযোগ পাইনি। সুরেনের সামনে বলা যায়। রাজবাড়ির লাইব্রেরিতে একখানা সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ছিল। কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায় সেই পাণ্ডুলিপির অনুবাদ করতে বলেছিলেন আমাকে। পাণ্ডুলিপিটা আমি দেখেছিলুম। কিন্তু কদিন পরে গিয়ে শুনি, ওটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কুমুদবাবু চুপ করলেন। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—তারপর?

কুমুদবাবু আরও চাপাস্বরে বললেন,—আমার সন্দেহ হয়েছিল, রাজবাড়ির এক কর্মচারী মাখন দত্ত রাজবাড়ির অনেক জিনিস চুরি করে তার ভাই উপেন দত্তের সাহায্যে বিক্রি করত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাখনই পাণ্ডুলিপি চুরি করেছিল। মাখনকে কুমারবাহাদুর বিশ্বাস করতেন। আমার সামনেই তাকে উনি বলেছিলেন, ওতে তাঁর পূর্বপুরুষের একটা গোপন কাহিনি আছে। মোগল বাদশাহ আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ নাকি তাঁর পূর্বপুরুষকে একটা আশ্চর্য জিনিস উপহার দিয়েছিলেন। তার ভেতরে ছিল অমূল্য কী একটা রত্ন। কিন্তু কীভাবে সেই জিনিস খুলে রত্নটা বের করতে হয়, তা মানসিংহ বলেননি। তিনি বলেছিলেন, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে অঙ্ক কষে রত্নটা বের করে নেবেন।

—তারপর?

—মানসিংহের সেই উপহার কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, রাজবংশের কেউ তার হদিশ পাননি। শুধু পাণ্ডুলিপিতে হয়তো তার হদিশ ছিল। আমি খুঁটিয়ে পড়ার সুযোগ পাইনি। হাতের লেখা। তার ওপর নাগরি লিপি। তবে একটা শ্লোকে চোখ বুলিয়ে দেখেছিলুম একটা জটিল অঙ্কের কথা আছে। অঙ্কটা অদ্ভুত।

—আপনার কি মনে আছে অঙ্কটা?

—হ্যাঁ। এক থেকে পনেরো পর্যন্ত পনেরোটি সংখ্যা চার সারিতে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে ওপরে, নিচে এবং দুধারে যোগ করলে যোগফল হবে বত্রিশ।

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ। বত্রিশের ধাঁধা! তা আপনি কি দীপুকে অঙ্কটার কথা বলেছিলেন?

—বলেছিলুম। দীপু অঙ্কে খুব পাকা।

—কবে বলেছিলেন?

—যখন শ্লোকটা পড়ি, তখন দীপুর জন্মই হয়নি। কিন্তু অঙ্কটা আমার মনে ছিল! গত পুজোর সময় একদিন উপেন দত্ত আমার বাড়িতে এসেছিল। সে দীপুর খোঁজ করছিল। দীপুকে সে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পরে দীপু নিখোঁজ হলে উপেনের ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ছেলে দীপু; উপেন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী বলেছিল, আমাকে জানায়নি। উপেন তাকে কলকাতা থেকে অনেকগুলো বই কিনে এনে উপহার দিয়েছিল। তাই আমি ভেবেছিলুম, দীপুর যেসব বই পড়ার ইচ্ছে, তা আমি কিনে দিতে পারি না। তাই দীপু হয়তো উপেনকাকুকে সেইসব বইয়ের কথা বলেছিল। দীপু উপেন দত্তকে উপেনকাকু বলত। কিন্তু তারপর দীপু কেন যেন উপেনকে এড়িয়ে চলত। বলত, লোকটা ভালো নয়।

—উপেনের সঙ্গে মিঃ অধিকারীর সম্পর্কে কেমন ছিল?

কুমুদবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—উপেন কলকাতায় ব্যবসা করত শুনেছি। তবে চোরাই মালের কারবারি বলে এখানে তার বদনাম ছিল। কেষ্টবাবুর সঙ্গে তার ব্যবসার সম্পর্ক ছিল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তাহলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে দীপুর ছবি দেখে আপনি অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু পীতাম্বর রায় যে উপেন দত্ত, তা বুঝতে পারেননি?

—আজ্ঞে না। কেষ্ট অধিকারীও পারেনি। তবে আমাদের দুজনেরই সন্দেহ হয়েছিল, দীপুকে সে অপহরণ করেছিল, দীপু যে-ভাবে হোক তার হাত থেকে পালিয়েছে। কিন্তু সে বাড়ি ফিরল না কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আমার অঙ্কটা এবার বলি। দীপু যার সাহায্যে উপেনের হাত থেকে পালিয়েছিল, সম্ভবত তার হাতেই আবার বন্দি হয়েছে। আপনার কাছে পাঠানো উড়ো চিঠি থেকে বোঝা যায়, দীপু সেই বত্রিশের ধাঁধার সমাধান করেছিল। কিন্তু তা উপেন দত্তকে দিতে চায়নি বলেই কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার খোঁজ দেয়নি। সে নিশ্চয়ই বলেছিল, তার খাতাপত্রের ভেতর কোথাও ওটা আছে।

—কিন্তু আমি তন্নতন্ন খুঁজেও তা পাইনি।

এইসময় বাইরে কেউ ডাকল,—কুমুদ! কুমুদ! ওহে ভট্টাচার্য!

কুমুদবাবু উঁকি মেরে দেখে আস্তে বললেন,—কেষ্ট অধিকারী এসেছেন।

কৃষ্ণকান্ত অধিকারী ঘরে ঢুকে কর্নেলকে দেখে বললেন,—কর্নেলসায়েবের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তিনি নতুন ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন, সেই খবর একটু আগে পেলুম। তাই ভাবলুম, কুমুদকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাব।

কর্নেল বললেন,—মিঃ অধিকারী! এখান থেকে এবার আপনার বাড়িতে যেতুম।

সাত

কুমুদবাবুর বাড়ির পিছনদিকে একটা গলিরাস্তায় কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। কুমুদবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা সেই গাড়িতে গিয়ে চাপলুম। সুরেন বেচারা মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল তাকে বললেন,—তুমি বরং বাংলোয় গিয়ে খুড়োর রান্নাবান্নায় সাহায্য করো!

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পুরনো বসতি এলাকা ছাড়িয়ে নতুন টাউনশিপে পৌঁছলুম। কথাপ্রসঙ্গে মিঃ অধিকারী বললেন,—কুমুদ ভট্টাচার্যের পাড়ায় একজনের বাড়ি গিয়েছিলুম। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে উপেন দত্ত নামে একটা লোক নাকি ভালুকের কামড়ে মারা পড়েছে। উপেনের সঙ্গে আমাদের একটুখানি কারবারি সম্পর্কে ছিল। লোকটা বজ্জাত ছিল ঠিকই। তবে দালাল হিসেবে ব্যবসাবাণিজ্যে তার বুদ্ধি ছিল প্রখর। তার দাদা মাখন দত্ত জমিদারবাড়ির কর্মচারী ছিল। নগেনই আমাকে ডেকেছিল। নগেন এখন চলাফেরা করতে পারে না। তাই আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলুম। সেইসময় মাখনের ভাগনে বিজয় বলল, কুমুদমাস্টারের বাড়িতে একজন দাড়িওয়ালা সায়েব এসেছেন!

মিঃ অধিকারী হাসতে-হাসতে বললেন—অমনি বুঝলুম আপনি এসেছেন। এদিকে বনদফতরের রেঞ্জার অমল চ্যাটার্জির সঙ্গে সকালে বাজারে দেখা হয়েছিল। সে কথায়-কথায় আপনাদের খবর দিল। অমল আমার এক বন্ধুর ছেলে। দুর্গাপুরের ওদিকে থাকত। সম্প্রতি এখানে বদলি হয়ে এসেছে।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—মাখনবাবু কি তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনাকে ডেকেছিলেন?

মিঃ অধিকারী গাড়ির স্পিড কমিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। মাখনের সন্দেহ, তার ভাইকে কেউ খুন করে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছিল। আমি যেন পুলিশকে একটু বলে দিই। কিন্তু উপেন পুলিশ রেকর্ডে দাগি স্মাগলার। কিছু করা যাবে না।

—আচ্ছা মিঃ অধিকারী, আপনি কি গোবিন্দ নামে কাকেও চেনেন?

মিঃ অধিকারী হাসলেন—কুমুদ গোবিন্দের কথা বলছিল বুঝি?

—নাঃ! আমি আদিবাসী বস্তির একজনের কাছে শুনেছি, গোবিন্দ নামে উপেনবাবুর এক শাগরেদ ছিল। সে নাকি কলকাতা থেকে রায়গড়ে ফিরে এসেছে।

একটু পরে মিঃ অধিকারী বললেন,—হ্যাঁ। গোবিন্দটা যেমনই গোঁয়ার, তেমনই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছোকরা। এখানে বজ্জাতি করে বেড়াত বলে ব্যবসায়ীরা ওর পিছনে পুলিশ লাগিয়েছিল। গোবিন্দ কলকাতায় গিয়ে উপেনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। গোবিন্দ ফিরে এসেছে, সে-খবর মাখনবাবুর কাছে পেয়েছি। সত্যি বলতে কী, আমি একটু উদ্বিগ্ন হঠে উঠেছি। গোবিন্দ রায়গড়ের দুর্বৃত্তদের লিডার হয়ে উঠতে পারে।

মিঃ অধিকারীর দোতলা বিশাল বাড়ি দেখে বুঝলুম, তিনি বনেদি ধনী পরিবারের বংশধর। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা অনেকটা জায়গার ওপর পুরনো বাড়ির চেহারা একেলে করা হয়েছে। রংবেরঙের ফুলের বাগান এবং কেয়ারিকরা নানারকম দেশি বিদেশি গাছ চোখে পড়ল। নুড়িবিছানো লন দিয়ে এগিয়ে গাড়ি পোর্টিকোর তলায় দাঁড়াল।

মিঃ অধিকারী আমাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা আধুনিক আসবাবে সাজানো। নানা দেশের সুন্দর সব ভাস্কর্য, প্রকাণ্ড ফ্লাওয়ার ভাস ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য দেখে মনে হয়, ভদ্রলোক ব্যবসায়ী হলেও রুচিশীল। এমন মানুষের সঙ্গে উপেন দত্তের সম্পর্ক যেন মানায় না।

তিনি একটা লোককে আমাদের জন্য কফি আনতে বলে মুখোমুখি বসলেন। প্রশস্ত ঘরটার মেঝে পুরোটা চিত্রবিচিত্র এবং নরম কার্পেটে ঢাকা। কর্নেল বললেন,—ঘরটা নতুন করে সাজিয়েছেন দেখছি!

মিঃ অধিকারী বললেন,—হ্যাঁ। আমার ছেলে তীর্থঙ্কর আমেরিকার নিউজার্সি এলাকায় থাকে। সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট আর কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স শেষ করে পুজোর আগে ফিরবে। কী আর বলব বলুন? তীর্থঙ্কর ওখানে একটি মার্কিন মেয়েকে বিয়ে করেছে। বউমা ইতিমধ্যে বাংলা শিখে নিয়েছে।

কর্নেল হাসলেন। —ভালোই তো।

দুজনে এইসব নিয়ে কথা বলতে থাকলেন। আমার মনে হচ্ছিল, কেন কর্নেল কোনও অছিলায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের কথা তুলছেন না? মিঃ অধিকারীর সঙ্গে গতকাল সকালে তো দুর্গের ধ্বংসস্তূপে ডঃ চট্টরাজকে কর্নেল দেখতে পেয়েছিলেন।

সেই লোকটা ট্রেতে কফি আর স্ন্যাকস এনে বলল,—এখনই একবার ওপরে চলুন আজ্ঞে! আসানসোল থেকে বাচ্চুবাবুর টেলিফোন এসেছে! গিন্নিমা আমাকে বললেন।

কথাটা শুনেই মিঃ অধিকারী হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। সেইসময় কর্নেল লোকটিকে জিগ্যেস করলেন,—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, আমার নাম ভুজঙ্গ।

—তোমাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি কি চলে গেছেন?

আজ্ঞে কলকাতা থেকে তো কেউ এ বাড়িতে আসেননি! —বলেই সে একটু হাসবার চেষ্টা করল।

—আজ্ঞে, কাল এক ভদ্রলোক কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারপর কর্তাবাবু তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যান। কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, তিনি উঠেছেন নদীর ধারে সরকারি ডাকবাংলোতে। কলকাতারই লোক বটে।

কর্নেল পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, —তোমার কর্তাবাবুকে যেন এসব কথা বলো না। মুখটি বুজে থাকবে। কেমন?

ভুজঙ্গ প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে চাপাস্বরে বলল,—আজ্ঞে! কী বলব সার আপনাকে? আমার কর্তাবাবু হাড়কেপ্পন লোক। মাসে খোরাকি আর পঁচিশ টাকা মাইনে।

—তোমার বাড়ি কি রায়গড়েই?

—না সার! মদনপুরে আমার বাড়ি। মাস ছয়েক হল, এ বাড়িতে কাজে লেগেছি। শিগগির এ কাজ ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচি। সার! কলকাতায় আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দেবেন?

—দেখব। তুমি গোপনে বনবাংলোয় আমার সঙ্গে সময়মতো দেখা করো!

লোকটা কৃতার্থ হয়ে সেলাম করে চলে গেল। বললুম,—আপনি কী করে বুঝলেন ভুজঙ্গকে ঘুষ খাইয়ে ডঃ চট্টরাজের খবর পাওয়া যাবে? ও যদি মুখ ফসকে মিঃ অধিকারীকে—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে মুচকি হেসে বললেন,—অবজারভেশন জয়ন্ত! পর্যবেক্ষণ! এমন একটা অভিজাত বাড়িতে অতিথির জন্য যে ট্রে নিয়ে আসছে, তার ট্রে আনার ভঙ্গি এবং মুখের হাবভাব দেখেই অনুমান করা যায়, পরিচারক এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত, না অনভ্যস্ত! এ সব পরিবারের কাজের লোকেরা স্মার্ট হয়। ভুজঙ্গকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, সে নেহাত গ্রাম্য লোক এবং এখনও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি।

বলে কর্নেল কফির পেয়ালায় চুমুক দিলেন। আমার কফি পানের ইচ্ছা দিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেয়ালা হাতে নিতে হল। কিছুক্ষণ পরে মিঃ অধিকারী ব্যস্তভাবে ফিরে এসে বললেন,—আমি দুঃখিত কর্নেলসায়েব! আসানসোল হেড অফিস থেকে আর্জেন্ট কল এসেছে। আমাকে এখনই গাড়ি নিয়ে ছুটতে হবে। সম্ভবত কাল সকালে ফিরে আসব। না, না। আপনারা কফি শেষ করে নিন। আমি রেডি হয়ে আসি। আপনাদের আমি বনবাংলোর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে যাব।

কর্নেল বললেন,—আমাদের জন্য ভাববেন না। তিনবছর পরে রায়গড়ে এলুম। একটু ঘোরাঘুরি করতে চাই।

আমরা শিগগির কফির পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রাখলুম। ভুজঙ্গ হাসিমুখে এসে ট্রে নিয়ে গেল। তারপর মিঃ অধিকারী টাই-সুট পরে ব্রিফকেস হাতে বেরিয়ে এলেন। আমরা দুজনে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে গেট পেরিয়ে গেলুম। তারপর কর্নেল উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করলেন। একবার পিছু ফিরে দেখলুম, মিঃ অধিকারীর অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা সবেগে বেরিয়ে গেল।

নিউ টাউনশিপ এলাকা পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেকটি একতলা বা দোতলা বাড়ির সামনে পিছনে ফুল-ফলের গাছ। হাঁটতে-হাঁটতে একটা চৌরাস্তার কেন্দ্রে বসানো উঁচু বেদির ওপর নেতাজির প্রতিমূর্তির কাছে গিয়ে কর্নেল বললেন,—একটা সাইকেলরিকশো পেলে ভালো হতো।

জিগ্যেস করলুম,—কোথায় যাবেন?

—ডাকবাংলোয়।

—সর্বনাশ! ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করবেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—সর্বনাশ কীসের? তিনি যদি রায়গড়ে বেড়াতে আসতে পারেন, আমরাও কি আসতে পারি না? উনি তো জানেন রায়গড় আমার প্রিয় ঐতিহাসিক জায়গা!

চৌরাস্তা থেকে বাঁদিকে কিছুটা গিয়ে একটা খালি সাইকেলরিকশো পাওয়া গেল। কর্নেল রিকশোওয়ালাকে বললেন,—ডাকবাংলো চলো!

নিউ টাউনশিপ এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তা ডাইনে বাঁক নিয়েছে। এবার বাঁদিকে সেই শীর্ণ নদীর অন্য রূপ চোখে পড়ল। রাস্তার ধারে ভাঙন রোধের জন্য গাছপালা সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

সমান্তরালে জলভরা ছোটো নদী বয়ে চলেছে। তারপর সরকারি ডাকবাংলো চোখে পড়ল। একতলা সেকেলে বাংলোর ভোল ফেরানো হয়েছে। রঙিন টালির চাল এবং চারদিকে বারান্দা। লনের দুপাশে ফুলবাগিচা আর দেশি বিদেশি বিচিত্র সব কেয়ারিকরা গাছ।

কর্নেল রিকশোওয়ালাকে বললেন,—তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমরা এখনই আসছি।

বাঁদিকে সবুজ ঘাসের ওপর একটা বেতের চেয়ারে সম্ভবত কোনও হোমরাচোমরা সরকারি অফিসার বসে রোদের আরাম নিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের একবার তাকিয়ে দেখলেন মাত্র। বারান্দার সিঁড়ির ওপর উর্দিপরা একটা লোক বসে ছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল।

কর্নেল বললেন,—ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তুমি তাঁকে খবর দাও।

লোকটা বলল,—ওই নামে কেউ বাংলোয় নেই সার!

—তাহলে আমার শুনতে ভুল হয়েছে। এক ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এসেছেন। ফর্সা, লম্বা, মুখে—মানে চিবুকে কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখে চশমা...

—বুঝেছি সার! আপনি কেষ্ট অধিকারীমশাইয়ের বন্ধুর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। তুমি ঠিক ধরেছ।

—সার! উনি কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন। রিকশো ডেকে দিলুম।

কর্নেল ঘড়ি দেখে মুখে হতাশার ছাপ ফুটিয়ে বললেন,—কী আশ্চর্য! আমার সঙ্গে ওঁর দেখা করার কথা চিল! হঠাৎ কেন চলে গেলেন?

লোকটা বলল,—ওঁকে অধিকারীমশাই টেলিফোন করেছিলেন। তাই চলে গেলেন।

—আর ফিরে আসবেন না বলে গেছেন নাকি?

—হ্যাঁ সার।

—ওঁর নামটা ভুলে যাচ্ছি। ট্রেনে আসবার সময় আলাপ হয়েছিল। ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ, না...

—সার! চট্টরাজ নয়। চ্যাটার্জি সায়েব। ডি. চ্যাটার্জি। বড়ো সরকারি অফিসার।

—ঠিক বলেছ!

বলে কর্নেল চলে এলেন। সাইকেলরিকশোতে চেপে বললুম,—বড্ড গোলমেলে ঘটনা কর্নেল!

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—মিঃ অধিকারী দেখছি গভীর জলের মাছ। কলকাতায় কুমারবাহাদুরের কথা শোনার পরই তাঁর সম্পর্কে আমার সন্দেহ জেগেছিল। তবে আমার এখন মনে হচ্ছে, কুমুদবাবুকে সঙ্গে নিয়ে উনি যখন আমার কাছে যান, তখন উনি দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের মূল কারণটা জানতেন না। সম্ভবত পীতাম্বর রায় অর্থাৎ উপেন দত্ত এখানে এসে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারপর উপেন সম্ভবত মিঃ অধিকারীর কথায় হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে পুঁতে রাখা প্রাচীন রত্নকোষ—হ্যাঁ, জিনিসটাকে প্রাচীন যুগে রত্নকোষ বলা হতো—

ওঁর কথার ওপর বললুম,—ঠিক বলেছেন। মিঃ অধিকারীই হয়তো রত্নকোষ বিনা পয়সায় বাগিয়ে নেওয়ার জন্য জঙ্গলের ভেতর উপেনকে খুন করেছেন।

রিকশোওয়ালার দিকে ইশারা করে কর্নেল আস্তে বললেন,—চুপ! এখন কোনও কথা নয়।

কিছুক্ষণ পরে রিকশোওয়ালা জিগ্যেস করল—আপনারা কি চৌরাস্তার কাছে নামবেন সার?

কর্নেল বললেন,—না। তুমি হাইওয়েতে চলো। রংলিডিহির মোড়ে আমরা নামব।

রংলিডিহি নাখুলালদের বস্তির নাম, তা ভুলে গিয়েছিলুম। হাইওয়ে ওই আদিবাসী বস্তির প্রান্তে ধনুকের মতো বেঁকে আবার সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। বাঁকের মুখে নেমে রাঙামাটির এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হেঁটে বনবাংলোয় পৌঁছুতে মিনিট পনেরো লাগল। রাস্তাটা জঙ্গলের ভেতর

দিয়ে চড়াইয়ে উঠেছে। বাংলোর গেটের কাছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন,—জঙ্গলে কী একটা জানোয়ার আছে। আমি ফায়ার করার সুযোগ পাই নাই। নাখুলালের মুখে যা শুনছি তা মিথ্যা না।

কর্নেল বললেন,—একটা পনেরো বাজে। স্নান করেননি কেন?

হালদারমশাই বললেন,—যা ঘটছে, স্নানের কথা মাথায় ছিল না। চলেন। সব কইতাছি।

আমাদের ঘরের তালা খুললেন কর্নেল। দক্ষিণ ও পশ্চিমের জানালা আমিই খুলে দিলুম। নাখুলাল এসে সেলাম দিয়ে বলল,—সুরেন আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে বাড়ি গেল। খেয়েদেয়ে আসবে। আপনারা কখন যাবেন সার?

কর্নেল বললেন,—দেড়টায়। এখন সওয়া একটা বাজে।

নাখুলাল চলে গেলে হালদারমশাই যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি নাখুলালের সঙ্গে গল্প করতে-করতে বাংলোর পিছনে গিয়েছিলেন। তার মুখে জঙ্গলের হাড়মটমটিয়া নামে অদ্ভুত জন্তুর কথা শোনেন। তারপর উপেন দত্তের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, তিনি খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে যান। তারপর হঠাৎ তাঁর বাঁদিকে ঘন ঝোপের ভেতর মটমট করে শুকনো ডাল ভাঙার মতো শব্দ শুনতে পান। অমনই তিনি রিভলভার বের করে সেদিকে সাবধানে এগিয়ে যান। কী একটা কালো ভালুকের মতো জন্তুকে আবছা দেখামাত্র তিনি রিভলভার তাক করেন। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, জন্তুটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাহস করে ঝোপের কাছে গিয়ে তিনি অনেক কালো লোম দেখতে পান। জন্তুটা যে ভালুক নয়, তার কারণ বুনোভালুক মানুষ দেখামাত্র তেড়ে আসে। কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, সে অদৃশ্য হল কেন? পিছনের জঙ্গল আরও ঘন। সেখানে একটা বিড়াল গলে যাওয়ার উপায় নেই।

শোনার পর কর্নেল বললেন,—ওসব নিয়ে ভাববেন না। আর জঙ্গলেও যেন একা যাবেন না। লাঞ্চ খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসব।

খাওয়ার পর অভ্যাসমতো আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে ভাতঘুমের চেষ্টায় ছিলুম। কর্নেল এবং হালদারমশাই খোলামেলা জায়গায় ঘাসের ওপর দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে চাপাস্বরে কথা বলছিলেন। বুঝতে পেরেছিলুম, কর্নেল এবার গোয়েন্দাপ্রবরকে পুরো ঘটনা ব্যাকগ্রাউন্ডসমেত জানাতে চান।

কতক্ষণ পরে আমার ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গিয়েছিল কর্নেলের ডাকে। শীতের রোদ ফিকে সোনালি হয়ে উঠেছে। চারটে বেজে গেছে। আমি উঠে বসলে কর্নেল বললেন,—শিগগির তৈরি হয়ে নাও। সঙ্গে তোমার ফায়ার আর্মস নেবে।

বললুম,—এসময় এক পেয়ালা চা বা কফি খেলে শরীরটা চাঙ্গা হতো।

কর্নেল হাসলেন,—ওই দ্যাখো, টেবিলে প্লেট ঢাকা দেওয়া তোমার চায়ের কাপ। আমি আর হালদারমশাই কফি খেয়ে নিয়েছি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম,—হালদারমশাইও যাচ্ছেন তো?

—উনি কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন।

—ওঁকে কোথায় পাঠালেন?

—আসানসোলে মিঃ অধিকারীর হেডঅফিসে। সেখানে ওঁর একটা বাড়িও আছে। সুরেন হালদারমশাইকে রংলিডিহির মোড়ে বাসে তুলে দেবে। ঘণ্টাতিনেক সময় লাগবে।

—ওঁকে আসানসোলে পাঠালেন কেন?

কর্নেল পিঠে তাঁর কিটব্যাগ এঁটে গলা থেকে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। চোখ কটমটিয়ে ধমক দিলেন,—নো কেন! চা গিলে শিগগির তৈরি হও। অত কেন-কেন কেন?

আমি সত্যিই চা গিলে ফেলে তৈরি হয়ে নিলুম। এবার কর্নেল সহাস্যে বললেন,—বাঃ! এই তো চাই।

কর্নেল জানালা বন্ধ করে তালা এঁটে নাখুলালকে বললেন,—বেরুচ্ছি নাখুলাল!

নাখুলাল কালকের মতো মালির সঙ্গে গল্প করছিল। সেলাম দিয়ে বলল,—কখন ফিরবেন সার?

—যদি একটু রাতও হয়, তুমি চিন্তা করো না।

কর্নেল বাংলো থেকে নেমে রাঙামাটির সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে বললুম,—কর্নেল! আপনি আজ অবিকল এক মন্ত্রীমশাইয়ের মতো বলছিলেন, অত কেন-কেন কেন? অবশ্য তারপরও তিনি আমাদের সাংবাদিক দলটিকে ভেংচি কেটে বলেছিলেন, খালি কেনর ক্যানেস্তারা!

কর্নেল বললেন,—তোমার নার্ভ চাঙ্গা হয়ে গেছে। এবার শোনা! রংলিডিহির মোড়ে সুরেন হালদারমশাইকে বাসে তুলে দিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে আমরা যাব মাখন দত্তের বাড়ি।

—উপেন দত্তের দাদা মাখন দত্ত। তাই না?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। যাই হোক, তুমি ওখানে যাচ্ছ সাংবাদিক পরিচয়ে, যা তোমার প্রকৃত পরিচয়। উপেন দত্তের মৃত্যু সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য তুমি কলকাতা থেকে এসেছ। বুঝেছ তো? এবার পরে কথাটা মন দিয়ে শোনা। এ ছাড়া কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর জঙ্গলে নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তুমি সকালে কুমুদবাবুর বাড়ি গিয়ে সব খব নিয়েছ। কেমন?

—বুঝেছি।

—তুমি উপেন দত্তের স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবে। সান্ত্বনা দেবে। সরকারি সাহায্যের জন্য দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লিখবে—একথাও বলবে। মাখনবাবুর সঙ্গে কথা বলা সময় তাঁর দেখা রায়গড় রাজবাড়ি এবং রাজলাইব্রেরির কথাও তুলবে। তারপর মওকা বুঝলে সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটার—

কর্নেলের কথা শেষ হল না। অতর্কিতে সংকীর্ণ এবং এবড়োখেবড়ো রাস্তার বাঁদিকের ঘন ঝোপ থেকে কেউ কর্নেলের দিকে প্রায় ঝাঁপ দিল। আমি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। তারপর দেখলুম, কর্নেল আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় আততায়ীর তলপেটে স-বুট লাথি মারার সঙ্গে-সঙ্গে সে আর্তনাদ করে ধরাশায়ী হল। কর্নেল তার পিঠের ওপর দমাস করে বসে রিভলভার বের করে তার কানের পাশে ঠেকিয়ে বললেন,—ট্রিগার টানলেই কী হবে তুমি বুঝতে পারছ তো?

এতক্ষণে দেখতে পেলুম, তার হাতের ছোরাটা ছিটকে পড়েছে। ছোরাটার ফলা প্রায় ছ'ইঞ্চি। ওটা কুড়িয়ে নিলুম। এবার আমার হাতে রিভলভার।

কর্নেলের মতো প্রকাণ্ড এবং ওজনদার মানুষ তার পিঠে বসেছিলেন এবং তার ফলে তার মুখটা মাটিতে ধাক্কা খেয়ে নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। কর্নেল এবার তার দু'হাত পিছনে টেনে আমাকে বললেন,—আমার ব্যাগে দড়ি আছে। শিগগির বের করে দাও।

কর্নেলের পিঠে আঁটা ব্যাগের চেন টেনে নাইলনের শক্ত দড়ি বের করে দিলুম। আমি জানি, এই ব্যাগে স্ক্রু-ড্রাইভার থেকে শুরু করে সবরকমের জিনিস ভরা থাকে। কর্নেল দড়িতে আততায়ীর হাতদুটো পিঠমোড়া করে বেঁধে ওর পিঠ থেকে নামলেন। তারপর চুল খামচে ধরে তাকে দাঁড় করালেন। রক্তাক্ত মুখে সে হাঁফাচ্ছিল। কর্নেল তার পাঁজরে একটা ঘুঁসি মেরে বললেন,—তোর নাম গোবিন্দ। তাই না?

আততায়ী বয়সে তরুণ। এখনও রক্তাক্ত মুখে তাকে বীভৎস দেখাচ্ছিল। সে কোনও কথা বলল না। কর্নেল মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—চলো! এই শয়তানটাকে জঙ্গলের ভেতর একটা গাছে বেঁধে রেখে আসি। হাড়মটমটিয়া খুবলে-খুবলে এর মাংস খাবে।

কর্নেল এই বলে তাকে টেনে বাঁদিকে জঙ্গলে ঢোকানোর ভঙ্গি করতেই সে বিকট ভাঙা গলায় কেঁদে উঠল,—আর এমন করব না সার। আমি টাকার লোভে—ও হো হো! বাবা গো!

কর্নেল বললেন,—আগে বল তোর নাম গোবিন্দ? মিথ্যা বললে তোকে গাছে বেঁধে রেখে আসব।

সে গোঙানো গলায় বলল,—হ্যাঁ সার। আমি গোবিন্দ।

কে তোকে টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে খুন করতে বলেছে?—বলে কর্নেল তার চুল ওপড়ানোর মতো সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

গোবিন্দ হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—কেষ্টবাবু সার! আজ আসানসোল যাওয়ার সময় আমাকে বলেছিল, দাড়িওলা সায়েবকে খুন করলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে।

কর্নেল আবার তার চুলে টান দিয়ে বললেন,—কুমুদবাবুর ছেলে দীপু কোথায়?

—মা কালীর দিব্যি, জানি না সার! উপেনদা তাকে কলকাতায় একজনের বাড়িতে রেখেছিল। দীপু সেখান থেকে পালিয়ে গেছে।

এই সময় একদল আদিবাসী মজুর হাঁটাপথে রায়গড় স্টেশন থেকে আসছিল। তারা এসে নিজেদের ভাষায় হইচই করতে থাকল। একজন বাংলায় বলল,—সায়েব! এর নাম গোবিন্দ গুন্ডা। পুলিশের তাড়া খেয়ে কলকাতা পালিয়েছিল। আমাদের বস্তিতে গিয়েও এই বজ্জাত গুন্ডা যাকে খুশি, খামোকা মারধর করে টাকা আদায় করত। এই গুন্ডাটা রংলিডিহিতে ঢুকলে আমাদের বউ-ঝিরা ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ত। একে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

বলে সে আদিবাসী ভাষায় কিছু বলল। দুজন দৌড়ে চলে গেল। কর্নেলের নির্দেশে ছোরাটা ভাঁজ করে গোবিন্দের প্যান্টের পকেটে ভরে দিলুম। কর্নেল আদিবাসীদের ঘটনাটা শোনালেন। একজন প্রৌঢ় আদিবাসী আচমকা গোবিন্দর পিঠে এক কিল মেরে নিজেদের ভাষায় কিছু বলল। বুঝলুম, অতীতে গোবিন্দ তার কোনও ক্ষতি করেছিল।

একটু পরে রংলিডিহি থেকে ধামসা আর কাঁসি বাজাতে-বাজাতে একদল লোককে আসতে দেখলুম। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! ওরা গোবিন্দকে হয়তো গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলবে। তার আগে তুমি আর আমি রিভলভার থেকে শূন্যে গুলি ছুড়ে ওদের থামানোর চেষ্টা করব।

এই কথা শুনে সেই আদিবাসী লোকটা বলল,—আমি এগিয়ে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বলছি সার। তা না হলে রংলিডিহির লোকেরা গোবিন্দকে আস্ত রাখবে না। আপনি ঠিকই বলেছেন।

কথাটা বলে সে এবং আরও দুজন লোক দু'হাত তুলে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল।

আট

সবে আদিবাসী লোক তিনটি ছুটে গেছে এবং সামনে ধামসা-কাঁসি বাজানো রংলিডিহির ক্রুদ্ধ আদিবাসী জনতা গর্জন করতে-করতে তেড়ে আসছে, এই সময় পিঠের দিকে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় গোবিন্দের দিকে যেমন আমার, তেমনই কর্নেলের লক্ষ না থাকাই স্বাভাবিক ছিল। আর এই সুযোগে ওই অবস্থায় গোবিন্দ আচম্বিতে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল।

এই আকস্মিক ঘটনার জন্য তৈরি ছিলুম না। শুধু চেঁচিয়ে উঠলুম,—ধরো! ধরো! পালিয়ে যাচ্ছে! পালিয়ে যাচ্ছে!

কর্নেল গোবিন্দকে ধরার জন্য পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আদিবাসী জনতাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। তাদের একটা দল লাঠি-বল্লম-কাটারি হাতে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

এতক্ষণে কর্নেলের মুখে কথা ফুটল,—সর্বনাশ! গোবিন্দ ওই অবস্থায় হয়তো পালাতে পারবে না। লোকগুলো ওকে খুন করে ফেলবে!

ততক্ষণে ধামসা-কাঁসির বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। আদিবাসী জনতা থমকে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে ঘুরে নিজেদের ভাষায় কী সব বলাবলি করছে। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, —তোমরা বরং কেউ শিগগির থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দাও। কী ঘটেছিল, সে-কথা আমি পুলিশকে বুঝিয়ে বলব।

একজন বলল,—সার! গোবিন্দকে পুলিশ ধরবে না। আমি আজই দেখেছি, গোবিন্দ কেষ্টবাবুর গাড়িতে চেপে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। কেষ্টবাবুকে পুলিশ খুব খাতির করে।

এই সময় দৌড়ুতে-দৌড়ুতে সুরেন এসে গেল। সে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—পথে আসতে -আসতে সব শুনেছি সার! গোবিন্দ নাকি আপনাকে খুন করতে এসেছিল!

কর্নেল বললেন,—সুরেন! আমার এই নেমকার্ড নিয়ে এখনই তুমি রায়গড় থানায় চলে যাও। এখানে আসবার আগে আমি পুলিশের ডি. আই. জি. অরবিন্দ মুখার্জিকে টেলিফোনে খবর দিয়েছিলুম। উনি নিশ্চয়ই রায়গড় থানায় আমার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

বলে তিনি বুকপকেট থেকে নেমকার্ড বের করে সুরেনকে দিলেন। সুরেন সবে পা বাড়িয়েচে, এমনসময় জঙ্গল থেকে সেই সশস্ত্র লোকগুলি বেরিয়ে এল। তাদের একজন আদিবাসী ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল। অমনই দেখলুম, চঞ্চল জনতা ছবিতে আঁকা মানুষের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বললুম,—কী ব্যাপার সুরেন?

সুরেন চাপাস্বরে বলল,—বাবা হাড়মটমটিয়া গোবিন্দকে মেরে ফেলেছে।

কর্নেল চমকে উঠলেন,—সে কী! ওদের একজনকে ডাকো তো সুরেন! ব্যাপারটা শুনি।

সুরেনের ডাকে লাঠি হাতে বলিষ্ঠ গড়নের এক যুবক এগিয়ে এসে আমাদের সেলাম ঠুকে ভয়ার্ত মুখে বলল,—সার! গোবিন্দ বেশিদূর যেতে পারেনি। বাবা হাড়মটমটিয়া উপেন দত্তের মতোই তার চেলা গোবিন্দের মাথার খুলি আর মুখ থেকে বুক পর্যন্ত চিরে ফেলেছে। চিত হয়ে পড়ে আছে গুন্ডাটা।

তার এক সঙ্গী বলল,—শুনেছি, গোবিন্দ আপনাকে খুন করতে এসেছিল। আমাদের মনে হচ্ছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসবার সময় ঠাকুরবাবা তার পিছু নিয়েছিল। ঠাকুরবাবা পাপীদের শাস্তি দেন কিনা, তাই—

কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—সুরেন! তুমি এদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে থানায় চলে যাও। পুলিশ তার সঙ্গে এসে গোবিন্দের অবস্থা দেখবে। শিগগির!

সুরেন সেই বলিষ্ঠ গড়নের যুবকটিকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেল। আদিবাসী জনতা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একে-একে চলে গেল। বুঝলুম, পুলিশকে তারা খুব ভয় করে। তাছাড়া পাছে পুলিশ তাদেরকে গোবিন্দের খুনি বলে পাকড়াও করে, তাই তারা দ্রুত কেটে পড়ল।

জঙ্গলে যারা গোবিন্দকে ধরতে ঢুকেছিল, তারাও চলে যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—তোমরা চলে যেও না। তোমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং হাতের লাঠি-কাটারিগুলো অন্যদের হাতে দিয়ে তোমরা কয়েকজন আমাদের সঙ্গে এসো। গোবিন্দের লাশ আমি দেখতে চাই।

জনাতিনেক যুবক রাজি হল। অন্যেরা তাদের লাঠি-বল্লব-কাটারি নিয়ে বস্তির দিকে চলে গেল। শীতের সূর্য ততক্ষণে দূর দিগন্তে পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। কর্নেল আর আমার কাছে টর্চ ছিল। টর্চ বের করে ওদের অনুসরণ করলুম। জঙ্গলের ভেতরে এখনই আঁধার ঘনিয়েছে। এলোমেলো বাতাসে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে গাছপালায়। ঝোপঝাড় এড়িয়ে উঁচু গাছের তলা দিয়ে আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাচ্ছিলুম উত্তরে।

কিছুক্ষণ পরে যুবকেরা পশ্চিমে ঘুরল। তারপর খানিকটা খোলা ঘাসে ঢাকা জমিতে পৌঁছুলুম। সেই জমিটার শেষপ্রান্তে যেতেই আচম্বিতে শুকনো ডাল ভাঙার মতো মটমট শব্দ শোনা গেল। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে করজোড়ে ঝুঁকে প্রণাম করার পর বুকে ক্রস আঁকল। বুঝলুম, খ্রিস্টান হলেও এরা পূর্বপুরুষের ধর্মে বিশ্বাস ছাড়েনি। কিন্তু ওই মটমট শব্দ কীসের? শব্দটা আমাদের সামনে জঙ্গলের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

ওরা এবার আঙুল বাড়িয়ে দুটো ঝোপের মধ্যিখানটা দেখাল। কর্নেল আর আমি এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। এ বড় বীভৎস দৃশ্য।

গোবিন্দ পিঠের দিকে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় একটু কাত হয়ে পড়ে আছে। মাথা থেকে বুক পর্যন্ত চাপ-চাপ টাটকা রক্ত এখনও গড়াচ্ছে। তার গায়ের সোয়েটার ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে। কর্নেল একটুখানি দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে সরে এলেন। গম্ভীরমুখে বললেন,—আমারই দোষ, জয়ন্ত! কখনও কারও গায়ে এ পর্যন্ত আমি হাত তুলিনি। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি অথবা সামরিক জীবনের কিছু কদর্য অভ্যাসবশে বেচারাকে আমি ঘুঁসি মেরেছিলুম। এখন আক্ষেপ হচ্ছে। এই হতভাগ্য যুবকটি আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমি শুধু আত্মরক্ষা করে ওকে আটকে রাখতে পারতুম।

একজন আদিবাসী যুবক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল,—সার! পাপী তার শাস্তি পেয়েছে। এজন্য আপনার কোনও দোষ নেই। প্রভু যীশু বলেছেন, পাপের বেতন মৃত্যু।

আর-একজন কিছু বলতে যাচ্ছে, আচম্বিতে সেই অদ্ভুত গর্জন শোনা গেল। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ!

আদিবাসী যুবকেরা অমনি দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল রিভলভার বের করে ব্যস্তভাবে বললেন,—জয়ন্ত! তৈরি থাকো! চারদিকে লক্ষ রাখো! কিন্তু সাবধান! আলো জ্বেলো না।

আমার রিভলভার হাতে ছিল এবং অন্য হাতে টর্চ। চারদিকে সতর্ক লক্ষ রাখলুম। আজ সন্ধ্যায় গর্জনটা থামছে না। গর্জনটা কোনদিক থেকে আসছে, বোঝাও যাচ্ছে না। চাপাস্বরে বললুম, —কর্নেল! কর্নেল! এক রাউন্ড ফায়ার করা যাক।

না।—বলে কর্নেল গুঁড়ি মেরে ডানদিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ টর্চের আলো ফেললেন। এক পলকের জন্য ভালুকের মতো কালো কী একটা জন্তুকে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখলুম। ভালুকের মতো বলছি বটে; কিন্তু যেটুকু দেখেছি, তাতেই মনে হয়েছে, ওটা ভালুক নয়। শিম্পাঞ্জি কিংবা গরিলার মতো। কিন্তু এই জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি বা গরিলা থাকা তো অসম্ভব ব্যাপার।

তবে সেই গর্জনটা থেমে গেছে কর্নেল আলো জ্বালবার পরই। কাজেই ওই অদ্ভুত প্রাণীটাই যে গর্জন করছিল, তাতে ভুল নেই।

এই সময় আমাকে অবাক করে কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললুম,—কী ব্যাপার? হাসছেন কেন?

কর্নেল ঘাসে বসে চুরুট ধরিয়ে তারপর বললেন,—বসো! পুলিশ যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ বসে থেকে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

আমিও বসলুম। তবে অস্বস্তিটা গেল না। বারবার কর্নেলকে প্রশ্ন করেও তাঁর হঠাৎ অট্টহাসির কোনও উত্তর পেলুম না। কিছুক্ষণ পরে গাছপালার শীর্ষে চাঁদ দেখা গেল। বনভূমিতে জ্যোৎস্না ক্রমশ গা ছমছম করা অনুভূতির সঞ্চার করল। শীতের হাওয়ায় কাঁপন জাগল চারপাশের আলো-ছায়ায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সেই সাংঘাতিক অদ্ভুত প্রাণীটা যেন চারপাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যে-কোনও সময় অতর্কিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সুযোগই দেবে না।

কতক্ষণ পরে আমরা যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে জোরালো আলোর ঝলকানি দেখতে পেলুম। তারপর সুরেনের ডাক ভেসে এল,—কর্নেলসায়েব! কর্নেলসায়েব!

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—সম্ভবত সুরেনের সঙ্গী জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছে না।

বলে তিনি টর্চের আলো জ্বেলে সংকেত দিতে থাকলেন। তারপর জোরালো সার্চলাইটের আলো ফেলতে-ফেলতে এসে গেল ওরা। একজন পুলিশ অফিসার কর্নেলকে স্যালুট ঠুকে বললেন,—আপনার খবর আমরা পেয়েছিলুম। আপনি ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন, সে-খবরও পেয়েছি। যাই হোক, কোথায় গোবিন্দ ব্যাটাচ্ছেলের লাশ?

কর্নেল বললেন,—আপনিই কি অফিসার ইন-চার্জ মিঃ তপেশ সান্যাল?

—হ্যাঁ সার!

কর্নেল তাঁকে গোবিন্দের ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখাতে নিয়ে গেলেন। একজন কনস্টেবল হ্যাজাগ এনেছিল। এতক্ষণে হ্যাজাগটা জ্বালাতে ব্যস্ত হল সে। রীতিমতো সশস্ত্র একটি পুলিশবাহিনী এসেছে। সবাই গোবিন্দের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাজাগটা জ্বলে ওঠার পর কনস্টেবলটি মৃতদেহের কাছে রাখল। পুলিশ অফিসার ছিলেন আরও দুজন। তাঁরা সার্চলাইটের আলোয় কাছাকাছি ঝোপঝাড় খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। সুরেন এবং তার সঙ্গী একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের কাছে গেলুম। তখন সুরেন চাপাস্বরে বলল,—এর নাম ছকুয়া। পিটার ছকুলাল মুর্মু। একে জিগ্যেস করুন, কী দেখেছিল?

ছকুয়া আস্তে বলল,—সার! আমি ঠাকুরবাবাকে একটুখানি দেখেছি।

বললুম,—কেমন চেহারা ঠাকুরবাবার?

ছকুয়া বলল,—কালো। দুই হাত মাটিতে ঠেকে যাবে, এমন লম্বা। বড়-বড় নখ সার! গোবিন্দকে মেরে হয়তো রক্ত খেত। আমাদের দেখেই ভ্যানিশ হয়ে গেল।

বুঝলুম, যুবকটি শিক্ষিত। তাকে জিগ্যেস করলুম,—তুমি কি আর কখনও ঠাকুরবাবাকে দেখেছ?

ছকুয়া বলল,—না সার! তবে একবার আমার বাবা লুকিয়ে এই জঙ্গলে গাছের ডালে কাটাতে এসেছিল। বাবা গাছের ওপর থেকে দেখেছিল, ঝোপের আড়ালে ঠাকুরবাবা বসে আছে। আর কী আশ্চর্য সার, বাবা কেন মিথ্যা বলবে?

—আশ্চর্যটা কী?

ছকুয়া ফিসফিস করে বলল,—বাবা দেখেছিল, কেষ্টবাবু বন্দুক কাঁধে ঠাকুরবাবার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অবাক হয়ে বললুম,—সে কী! কেষ্টবাবুকে ঠাকুরবাবা মেরে ফেলেনি?

—সেটাই তো বাবা বুঝতে পারেনি। একটু পরে কেষ্টবাবু চলে গেল। তখন বাবা গাছ থেকে নেমে পালিয়ে গিয়েছিল। কথাটা বাবা কাকেও বলতে বারণ করেছিল। কিন্তু আজ কথায়-কথায় সুরেনকে বলেছি। সুরেন বলল, কথাটা আপনাকে আর কর্নেলকে যেন বলি।

সুরেন বলল,—আমার মনে হচ্ছে, ওটা কোনও সাংঘাতিক জন্তু। কেষ্টবাবুর পোষা জন্তু।

বললুম,—ঠিক বলেছে!

এইসময় দেখলুম, আবার জোরাল স্পটলাইট জ্বেলে কারা আসছে। সুরেন বলল,—হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচার নিয়ে আসছে ওরা। বডি তুলে নিয়ে যাবে। সঙ্গে আর্মড ফোর্সও আছে। ওই দেখুন।

কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দের মৃতদেহ স্ট্রেচারে তুলে হাসপাতালের কর্মীরা আর সশস্ত্র পুলিশদলটি চলে যাওয়ার পর অফিসার-ইন-চার্জ তপেশ সান্যাল বললেন,—এখানে আর আমাদের কিছু করার নেই! চলুন কর্নেলসায়েব! আপনাকে আমি ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে থানায় ফিরব। আমাদের জিপ আর একটা ভ্যান রংলিডিহির কাছে দাঁড় করানো আছে।

কর্নেল এতক্ষণে আমার সঙ্গে মিঃ সান্যালের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবেশ সান্যাল নমস্কার করে হাসতে-হাসতে বললেন,—আপনি সাংবাদিক। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেব আপনার কাগজে যা লেখার লিখবেন। তবে পর-পর দুটো একই ধরনের ঘটনা। এই ফরেস্টে সম্ভবত কোনও সাংঘাতিক হিংস্র প্রাণী আছে। আমরা বনদফতর আর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দফতরে ব্যাপারটা জানাব। প্রাণীটাকে ফাঁদ পেতে ধরা দরকার।

কথা বলতে-বলতে যে দিক থেকে আমরা এসেছিলুম, সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। তারপর দক্ষিণে ঘুরে মিনিট দশেক হাঁটার পর সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পৌঁছুলুম। সুরেন আমাদের সঙ্গ ধরল। ছকুয়া চলে গেল।

কর্নেল বললেন,—আমরা এবার বাংলোয় যেতে পারব। মিঃ সান্যাল! আপনাদের আর কষ্ট করে আসতে হবে না। তবে যে কথাটা বলেছি, আশা করি সেইমতো কাজ হবে!

মিঃ সান্যাল বললেন,—নিশ্চয়ই হবে। আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য ডি. আই. জি. সায়েবের কড়া নির্দেশ আছে। তা ছাড়া এই কেসে আমারও ব্যক্তিগত কৌতূহল তীব্র। আপনি আমার সেই কৌতূহল আরও তীব্র করে দিয়েছেন।

ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দেখি, নাখুলাল চর্চ আর বল্লম হাতে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল বললেন,—নাখুলাল! শিগগির কফি। আজ রাতে ঠাণ্ডাটা বড্ড বেশি। সুরেন! তুমি তোমার জেঠুকে ঘটনাটা শুনিয়ে দিয়ো! তোমার জেঠুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ তো?

সুরেন হাসবার চেষ্টা করে মাতৃভাষায় নাখুলালকে কিছু বলল। তারপর দুজনে বাংলোর পিছনদিকে চলে গেল। বারান্দায় হ্যারিকেন জ্বলছিল। কিন্তু বাইরে বেজায় হিম। কর্নেল দরজার

তালা খুলে ঘরেঢুকে চীনা লণ্ঠনটা জ্বাললেন। তারপর পিঠের কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রাখলেন। বাইনোকুলার আর ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন,—হতভাগা গোবিন্দের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে এই যন্ত্রদুটোর হয়তো ক্ষতি করে ফেলেছি ভেবেছিলুম। কিন্তু নাঃ। দুটোই আস্ত আছে।

এই সময় ছকুয়ার মুখে শোনা তার বাবার হাড়মটমটিয়া এবং কেষ্ট অধিকারীদর্শনের ঘটনাটি বললুম। কিন্তু কর্নেলের মুখে কোনও বিস্ময়চিহ্ন ফুটে উঠল না। পা দুটো ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে মাথার টুপিটা খুলে তিনি শুধু বললেন,—মাদারিকা খেল!

জিগ্যেস করলুম,—তার মানে?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। অন্যমনস্কভাবে বললেন,—হালদারমশাইয়ের জন্য এবার ভাবনা হচ্ছে জয়ন্ত। কেষ্ট অধিকারী এমন সাংঘাতিক লোক, কল্পনাও করিনি! অবশ্য হালদারমশাই ছদ্মবেশেই কেষ্টবাবুর দুর্গে ঢুকবেন। তাহলেও—

হঠাৎ থেমে তিনি দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। একটু পরে সুরেন ট্রেতে কফি আর দু'প্লেট স্ন্যাক্স নিয়ে এল। বললুম,—সুরেন! তুমি কর্নেলসায়েবকে ছকুয়ার বাবার ঘটনা বল!

কর্নেল বললেন,—না সুরেন! জেঠুর কাছে গিয়ে চা বা কফি খেতে খেতে গল্প কর! জেঠুকে বলবে, আজ রাতে তুমি বাংলোতে খাবে এবং থাকবে।

সুরেন চুপচাপ চলে গেল। বুঝলুম, ছকুয়ার বাবার গল্পটা বলার ইচ্ছা তার ছিল। কিন্তু কর্নেল নিজেই আস্ত রহস্যের প্রতিমূর্তি। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, শিগগির আবার হয়তো কিছু ঘটবে।

কিন্তু সে-রাতে তেমন কিছু ঘটল না। রাত দশটা নাগাদ খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট টানতে-টানতে চীনা লণ্ঠনের দম কমিয়ে আমাকে শুয়ে পড়তে বলেছিলেন। উত্তেজনাজনিত ক্লান্তি আমাকে পুরু কম্বলের ভেতর যথেষ্ট আড়ষ্ট করেছিল। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুধু মুখটা বাইরে রেখেছিলুম। পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ। দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল। ঘুমের রেশ বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছিল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে যদি সেই বিকটদর্শন অদ্ভুত প্রাণীটা তার লম্বা হাতের ধারাল নখ দিয়ে আমাকে চিরে ফালা-ফালা করে ফেলে? তারপর একবার মুখ একটু ঘুরিয়ে দেখেছিলুম, কর্নেল তখনও চেয়ারে বসে আলোটা আড়াল করে টেবিলে ঝুঁকে কিছু করছেন। কিন্তু আমার দিকে তাঁর পিঠ। কী করছিলেন, দেখতে পাইনি।

ঘুম ভাঙল নাখুলালের ডাকে। সে বেড-টি দিতে এসেছিল। বাইরে কুয়াশামাখা নিষ্প্রভ রোদ। চায়ের কাপপ্লেট নিয়ে দেখলুম, কর্নেলের বিছানা শূন্য। টেবিলে ওঁর কিটব্যাগ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা নেই। নাখুলাল বলল,—কর্নেলসায়েব সুরেনকে নিয়ে ভোরে বেরিয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কুয়াশা কেটে গেলে বাংলোর লনে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে ছিলুম। রোজকার মতো মালি এসে ফুলবাগিচায় ঝারি থেকে জল দিচ্ছিল। এমন সময় দেখলুম, সুরেন নিচের রাস্তা থেকে হন্তদন্ত হয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে।

সে গেট খুলে লনে ঢুকে বলল,—কর্নেলসায়েব আপনাকে ডেকেছেন। শিগগির রেডি হয়ে আসতে বলছেন।

একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলুম,—উনি কোথায় আছেন?

সুরেন দম নিয়ে বলল,—ভোরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রায়রাজাদের দুর্গ দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে থানায় গিয়েছিলেন। তারপর উপেনবাবুর দাদা মাখনবাবুর বাড়িতে গেলেন। সেখানেই কর্নেলসায়েব আছেন।

শেষ কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, কাল বিকেলে আমাকে কর্নেল সত্যসেবক পত্রিকার পক্ষ থেকে মাখন দত্তের সঙ্গে দেখা করতে বলছিলেন। সেই সময় অতর্কিত গোবিন্দ ছুরি হাতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

দ্রুত তৈরি হয়ে বেরোলুম। জ্যাকেটের পকেটে রিপোর্টারস নোটবুক নিলুম। কাঁধে ঝোলানো কিটব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্রটাও নিতে হল। কারণ কর্নেল 'রেডি হয়ে' যেতে বলেছেন। এই কথাটায় সতর্কভাবে যাওয়ার সংকেত আছে।

সুরেন বলল,—জেঠুকে বলে আসি, আপনারা ব্রেকফাস্ট করবেন না। কর্নেলসায়েব বলে দিয়েছেন।

নাখুলাল গম্ভীরমুখে বাংলোর পিছনদিক থেকে আসছিল। সুরেন এবং তার মধ্যে নিজেদের ভাষায় কিছু কথা হল। তারপর সুরেন এসে বলল,—চলুন সার!

নিচের সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে সুরেন একটু হেসে বলল,—জেঠু আমার জন্য খুব ভাবনায় পড়েছে। তার ভয়, বাবা হাড়মটমটিয়া এবার আমাকে মেরে রক্ত খাবেন।

বললুম,—তুমি ঠাকুরবাবা হাড়মটমটিয়া বলে কিছু আছে বলে বিশ্বাস কর না। তাই না?

সুরেন বলল,—বোগাস সার! রংলিডিহিতে শিবু নামে একজন ওঝা আছে। সে-ই সবার মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। শিবুও নাকি ছকুয়ার বাবার মতো হাড়মটিয়াকে দেখেছে। শিবু বলে, বাবা হাড়মটমটিয়ার নামে মুরগিবলি দেওয়ার রীতি সে এখনও চালু রেখেছে। ডোবার পাড়ে বাবার থান আছে। সেখানে মুরগির রক্ত খাচ্ছিল বাবা। শিবু স্বচক্ষে দেখেছে। বাবাও নাকি তাকে দেখে একটা হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে।

সুরেন হেসে উঠল। বুঝলুম, এই তরুণটি যুক্তিবাদী। সে আমাকে রংলিডিহির দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে হাইওয়েতে নিয়ে গেল। এখানে একটা বাসস্টপ আর কয়েকটা চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান আছে। কয়েকটা সাইকেলরিকশো দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেন তার চেনা একজন রিকশাওয়ালাকে ডেকে বলল,—মাখন দত্তের বাড়ি চলো ঝাব্বুদা!

ঝাব্বু আমাকে দেখে নিয়ে বলল,—তিনটাকা লাগবে সুরেন।

সুরেন কিছু বলার আগেই আমি বললুম,—ঠিক আছে। শিগগির চলো!

হাইওয়ে এখানে থেকে বাঁক নিয়ে রায়গড়ের পাশ দিয়ে গেছে। সামনে জোরালো শীতের হাওয়া। ঝাব্বুর তিনটাকা ভাড়ার বদলে দশটাকা দাবি করা উচিত ছিল। প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব পার হতে আধঘণ্টা লেগে গেল। রায়গড়ের মোড়ে বাঁক নিয়ে গলিরাস্তায় বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর মাখনবাবুর জরাজীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে রিকশো দাঁড় করাল ঝাব্বু। তাকে একটা পাঁচটাকার নোট দিলে সে খুশিতে আমাকে সেলাম ঠুকল। এই আদিবাসীরা এখনও কী সরল!

উঁচু বারান্দায় সিমেন্টের চটা উঠে আছে। বারান্দায় সুরেন উঠে গিয়ে ঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল,—ছোটসায়েব এসেছেন সার!

ভেতরে ঢুকে দেখলুম, কর্নেল একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা তক্তপোশে শতরঞ্চি পাতা। সেখান বসে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—নমস্কার! নমস্কার! আমি সার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার ফ্যান। কাজেই আমি আপনাদের দুজনকেই চিনি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখার কথা ভাবিনি। জয়ন্তবাবু! আপনি আমার পাশে বসুন। সুরেন! তুই এখানেই বোস্ বাবা!

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—জয়ন্ত! আশা করি, বুঝতে পারছ মাখনবাবু কী বলছেন?

মাখনবাবু চাপাস্বরে বললেন,—উপেন আমার ছোটভাই বটে, কিন্তু ওকে আমি ঘৃণা করতুম। জানতুম সে শয়তান গোবিন্দকে নিয়ে কী সাংঘাতিক কাজ করছে। রাজবাড়িতে এখন তো কলেজ

হয়েছে। তার আগে উপেন কত দামি-দামি জিনিস চুরি করে কলকাতায় বেচেছিল। সব জেনেও মুখ খোলার সাহস ছিল না। আমাকে দাদা বলেও সে রেহাই দিত না!

কর্নেল বললেন,—আপনার সাহায্য খুবই জরুরি মাখনবাবু! রাজবাড়ির সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা—

মাখনবাবু তাঁর কথার ওপর বললেন,—ওটা কুমুদের বোকামি! বোকামি কিংবা লোভ। এখন স্বীকার করা উচিত ছিল ওর। অথচ এখনও আপনাদের কথাটা জানায়নি। কেন দীপুকে উপেন কিডন্যাপ করেছিল, কুমুদ জানত না? দীপু সরল ছেলে। রাজবাড়ির ওই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি তার বাবা তাকে দেখিয়েছিল। দীপু কথায়-কথায় তার বন্ধুদের বলে ফেলেছিল। সেই কথা উপেনের কানে পৌঁছুতে দেরি হয়নি। এখন কুমুদ আমার সামনে সত্যি কথাটা বলুক। সে ভট্টচায। বামুনের ছেলে। পৈতে ছুঁয়ে বলুক, পাণ্ডুলিপিটা সে উপেনকে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বেচেছিল কি না?

অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকালুম। কর্নেল বললেন,—যাকগে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন ওটা আপনি উপেনবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে যেভাবে হোক, উদ্ধার করে দিন।

মাখনবাবু বললেন,—জয়ন্তবাবুর জন্য চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি গিয়ে দেখি, উপেনের বউ রমা আছে নাকি।

মাখনবাবু ভেতরের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। একটি বালিকা আমাকে চা দিয়ে গেল। কর্নেলকে এবার গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি আস্তে বললেন,—আজ ভোরে ও.সি মিঃ সান্যাল উপেনের ঘর সার্চ করে গেছেন। কিন্তু ওটা পাননি। মাখনবাবু বলছিলেন, কাল সকালে কেষ্টবাবু—মিঃ অধিকারী এ পাড়ায় এসেছিলেন। কুমুদবাবুর বাড়িতে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তো তিনি উপেন দত্তের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেই এসেছিলেন! আমার ধারণা ছিল পাণ্ডুলিপিটা কেষ্টবাবু হাতিয়েছেন। কিন্তু মাখনবাবু একটু আগে বললেন, তাঁর ভ্রাতৃবধূ গতরাতে একটা সুটকেস তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখতে দিয়ে গেছে। তবে তালার চাবি রমার কাছে আছে। তাই উনি তার কাছে গেলেন।

অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার পর মাখনবাবু ফিরে এসে রুষ্টমুখে বললেন,—বজ্জাত মেয়ে! উপেনের দোসর তো? কর্নেলসায়েব এসে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন সে এসে সুটকেসটা নিয়ে গেছে। আমার বড় মেয়ে সুতপা বলল, কাকিমা মিনিটপাঁচেক আগে বাপের বাড়ি যাচ্ছে বলে গেল। সুরেন! সায়েবদের নিয়ে এক্ষুনি বাসস্টপে যাও। ওকে পেয়ে যাবে।

নয়

সুরেন বেরুতে যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—বসো সুরেন! খামোকা ছুটোছুটি করে লাভ নেই।

মাখনবাবু অবাক হয়ে বললেন,—কী বলছেন কর্নেলসায়েব! রমা সুটকেস নিয়ে উধাও হয়ে গেলে আর কোনওদিন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করাই যাবে না!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আপনি চিন্তা করবেন না মাখনবাবু! আপনাদের বাড়ির দিকে লক্ষ রাখতে বলেছিলুম পুলিশকে। না—পোশাকপরা পুলিশ নয়। সাদা পোশাকে ছদ্মবেশে তারা ওত পেতে আছে পালাক্রমে। এতক্ষণ আপনার ভ্রাতৃবধূকে সুটকেসসহ পুলিশ পাকড়াও করে ফেলেছে।

মাখনবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন,—বাঃ! এ একটা কাজের মতো কাজ করেছেন আপনি।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আপনাকে একটা অনুরোধ, মাখনবাবু!

—বলুন! বলুন!

—আপনার ভাই উপেন দত্তের ঘরটা তো তালাবন্ধ।

—হ্যাঁ। তবে আপনি বললে তালা খোলার চেষ্টা করতে পারি। বাজারে নানকু নামে একটা লোক আছে। সে তালার চাবি তৈরি করে দিতে পারে। দৈবাৎ চাবি হারিয়ে গেলে নানকুর ডাক পড়ে। সুরেন তাকে চেনে।

কর্নেল বললেন,—সুরেন! তুমি নানকুকে ডেকে আনো শিগগির!

সুরেন বেরিয়ে গেল। তারপরই মাখনবাবুর মেয়ে তপতী ভেতরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, —বাবা! অরুদা এসে কাকিমার কথা জিগ্যেস করছে। কী বলব!

মাখনবাবু বললেন,—ওকে বসতে বল্। যাচ্ছি।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—অরু কে?

আজ্ঞে, আমার ভাগনে।—বলে মাখনবাবু কণ্ঠস্বর চাপলেন : ভাগনে বলে অরুণের পরিচয় দিতে লজ্জা করে। উপেন ওকে নষ্ট করেছিল। অরুণ গোবিন্দের জুটি।

আমার মনে পড়ে গেল, হালদারমশাই গোবিন্দ আর উপেন দত্তের ভাগনেকে ফলো করে এসেছেন কলকাতা থেকে। বললুম,—কর্নেল! এই অরুণই গোবিন্দের সঙ্গে কলকাতা থেকে উপেনবাবুর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে।

মাখনবাবু বললেন,—বরং অরুকে এখানে ডাকি কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—থাক। আপনি গিয়ে দেখুন সে কী বলছে। তারপর দরকার মনে করলে এখানে ডেকে আনবেন।

—খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছে অরু। তার মানে, পুলিশের ভয়ে সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বলে মাখনবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন। কর্নেলের চুরুট নিভে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে বললেন,—হালদারমশাইয়ের জন্য দুর্ভাবনায় আছি। থানায় টেলিফোন করে আমাকে তাঁর খবর দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু কুমারবাহাদুরকে তাঁর পূর্বপুরুষের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।

বললুম,—পাণ্ডুলিপিসহ রমা দত্তকে পুলিশ এতক্ষণ নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছে।

এইসময় বাড়ির ভেতরে মাখনবাবুর চড়া গলায় কথাবার্তা শোনা গেল,—ছোটমামির হয়ে তুই ঝগড়া করতে এসেছিস? তোর লজ্জা করে না হতভাগা! তোর ছোটমামিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তো আমি কী করব? আরে! ও কী করছিস তুই? উপেনের ঘর খুলছিস কেন? চাবি কোথায় পেলি? অরু! ঘর খুলবিনে বলে দিচ্ছি।

কর্নেল ভেতরে ঢুকে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম। উঠোনের মাঝখানে একটা ইঁদারা। তার ওধারে একটা একতলা নতুন বাড়ি। দোতলা করার জন্য লোহার শিক উঁচু হয়ে আছে ইতস্তত। মধ্যিখানে খোলা সিঁড়িতে পলেস্তারা এখনও পড়েনি। একটা ঘরে তালা খুলছে বলিষ্ঠ চেহারার একজন যুবক। গায়ের রং তামাটে। মাথায় ফিল্মহিরোদের স্টাইলে ছাঁটা চুল। গায়ে নীল টিশার্ট, পরনে জিনস। সে শেষ তালাটা খুলেছে, তখনই কর্নেল গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

সে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর কর্নেলকে দেখে বলল,—কাঁধ ছাড়ুন বলছি।

কর্নেল তার কাঁধে আরও চাপ দিয়ে একটু হেসে বললেন,—তোমার ছোটমামার ঘরের চাবি তুমি কোথায় পেলে?

অরুণ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। বলল,—বড়মামা! তুমি জানো এই ভদ্রলোক কে?

বাড়ি একেবারে স্তব্ধ। মাখনবাবুর স্ত্রী, মেয়ে আর দুই ছেলে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। মাখনবাবু গর্জে উঠলেন,—উনি তোর যম। হতচ্ছাড়া বাঁদর! তোর এত সাহস উপেনের ঘরে ঢুকতে চাস? শিগগির বল কে তোকে চাবি দিল?

অরুণ খেঁকিয়ে উঠল,—তুমি ভেবেছে, ছোটমামা মরে গেছে বলে মিথ্যামিথ্যি ছোটমামিকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে এই বাড়ি দখল করবে?

কর্নেল বললেন,—তুমি ঘরে ঢুকছ কেন অরুণ?

অরুণ বলল,—ছোটমামি আমাকে তার ঘরে থাকতে বলেছে। আমি বাড়ি পাহারা দেব। আপনি জানেন না স্যার, বড়মামা ছোটমামার বাড়ি দখল করে ছোটমামিকে তাড়িয়ে দেবে।

কর্নেল তার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিয়ে বললেন,—ঠিক আছে. তোমার ছোটমামি যখন তোমাকে চাবি দিয়েছে, তখন তুমি তার ঘরের মালিক। মাখনবাবু! আপনি অরুণকে বাধা দেবেন না।

বলে কর্নেল একটু সরে দাঁড়ালেন। অরুণ শেষ তালাটা খুলে ঘরে ঢুকল। আমি ততক্ষণে বারান্দায় উঠে কর্নেলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ঘরের ভেতর আবছা আঁধার। লক্ষ করলুম, অরুণ খাটের ম্যাট্রেসের তলা থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করল। কর্নেল চুরুট কামড়ে ধরে বললেন,—চলো জয়ন্ত! এঁদের পারিবারিক ব্যাপারে আমাদের নাক না গলানোই উচিত।

সেই সময় প্যাকেটটা বগলদাবা করে অরুণ বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করছিল। আচম্বিতে কর্নেল তার বগলের ফাঁক থেকে প্যাকেটটা টেনে নিলেন। তারপরই দেখলুম, অরুণের হাতে একটা ছুরি ঝকমক করে উঠেছে। মাখনবাবু বোবাধরা গলায় শুধু বলে উঠলেন,—এই! এই!

কর্নেল তৈরিই ছিলেন। গোবিন্দকে ধরাশয়ী করার পদ্ধতিতে অরুণের পেটে লাথি ঝাড়তেই সে ককিয়ে উঠে বারান্দায় পড়ে গেল। কর্নেল যথারীতি তার দিকে রিভলভার তাক করলেন। এবার আমি কাল বিকেলের মতো হতবুদ্ধি হয়ে যাইনি। অরুণের ছুরিটা ছিটকে পড়েছিল। দ্রুত কুড়িয়ে নিলুম। অরুণ কুঁকড়ে গিয়ে গোঙাচ্ছিল। কর্নেলের লাথিটা জোরালো ছিল। প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে অরুণের চুল ধরে কর্নেল তাকে দাঁড় করালেন। তারপর তাকে ঘরের ভেতর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। চাবির গোছা চৌকাঠের কাছে পড়ে ছিল। কর্নেল দরজা বন্ধ করে তিনটে তালা এঁটে নেমে এলেন। বললেন,—মাখনবাবু! আপনার ভাগনের জন্য চিন্তা করবেন না। আমি থানায় গিয়ে পুলিশকে বলছি। আপনি এবং আপনার বাড়ির সবাই যা দেখেছেন, পুলিশকে আশা করি তা-ই বলবেন।

মাখবাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় নেমেছি, সুরেনকে হন্তদন্ত আসতে দেখলুম। সে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—নানকুর আসতে একটু দেরি হবে।

কর্নেল বললেন,—নানকুর দরকার আর হবে না সুরেন! আমরা থানায় যাচ্ছি। তুমি বনবাংলোয় চলে যাও। তোমার খুড়ো খুব ভয় পেয়েছে। তোমাকে দেখলে সে সাহস পাবে।

বড়রাস্তায় গিয়ে কর্নেল একটা সাইকেলরিকশো ডাকলেন। বললেন,—থানায় যাব।

রিকশো চলতে শুরু করলে কর্নেল প্যাকেটটার টেপ উপড়ে খুলে ফেললেন। তারপর কয়েকটা স্তর কাগজের মোড়ক খুলে একটা দিক দেখে নিলেন। তাঁর মুখে প্রসন্নহাসি ফুটতে দেখলুম। আমিও দেখে ফেলেছি জিনিসটা কী। সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি। মেটে রঙের তুলোট কাগজে নাগরি লিপিতে লেখা 'কুলকারিকা'। বাকিটুকু পড়ার আগেই কর্নেল আগের মতো মোড়ক এঁটে তাঁর পিঠে আটকানো কিটব্যাগের চেন খুলে পাণ্ডুলিপিটা ঢুকিয়ে রাখলেন।

বললুম,—তাহলে অরুণের ছোটমামির সুটকেসে পুলিশ কিছু পাবে না।

—কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্য কিছু। বোঝা যাচ্ছে, এই মোড়কে কী আছে রমা জানত না। অরুণ তাকে বলেনি। তবে আমার অবাক লাগছে, রাত্রে পুলিশ রমার বাড়ি সার্চ করে এটা দেখতে পায়নি কেন? একটা সম্ভাবনা, জিনিসটা অরুণের কাছেই ছিল। পুলিশ চলে যাওয়ার পর সে চুপি-চুপি ও বাড়িতে ঢুকে এটা খাটের ম্যাট্রেসের তলায় রেখেছিল। তখন মাখনবাবুরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এতক্ষণে অরুণ ঝুঁকি নিয়ে এটা নিতে এসেছিল। কেষ্ট অধিকারী তাঁর কোনও লোককে সম্ভবত অরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে গিয়েছিলেন।

সায় দিয়ে বললুম,—এটা ছাড়া আর কোনও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।

ও.সি. তপেশ সান্যাল কর্নেলের অপেক্ষা করছিলেন। অভ্যর্থনা করে আমাদের বসালেন। তারপর একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবলকে ডেকে কফি আনতে হুকুম দিলেন। বললেন,—উপেন দত্তের স্ত্রীকে বাসস্টপে যাওয়ার পথে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তার সুটকেসে কাপড়চোপড়ের তলায় দুটো হেরোইনের প্যাকেট পাওয়া গেছে। আনুমানিক দাম আড়াই লাখ টাকা। আর একটা অষ্টধাতুর বিগ্রহ পাওয়া গেছে। বিগ্রহ কোন দেবতার, তা বুঝতে পারলুম না। ঠিক এইরকম বিগ্রহ সোনাডিহির জমিদারবাড়ি থেকে দু-বছর আগে চুরি গিয়েছিল। ওঁরা যে ফটো দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সোনাডিহিতে খবর দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল বললেন,—উপেন দত্তের ভাগনে অরুণকে আপনারা খুঁজছিলেন। এইমাত্র উপেন দত্তের ঘরের ভেতর তাকে ঢুকিয়ে তালা এঁটে দিয়েছি। এই চাবি নিয়ে এখনই কোনও অফিসারকে পাঠিয়ে দিন। এই ছোকরা ঠিক গোবিন্দের মতোই হঠাৎ ছুরি বের করে আমাকে স্ট্যাব করতে চেয়েছিল। উপেন দত্তের দাদা মাখনবাবু সপরিবারে ঘটনাটা দেখেছেন।

তপেশবাবু তখনই একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ডেকে চাবির গোছ দিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন। তিনি তখনই বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন,—মিঃ হালদারের কথা আপনাকে বলেছিলুম। তাঁর—

—হ্যাঁ। মিঃ হালদার আসানসোল থেকে রিং করেছিলেন আধঘণ্টা আগে। তিনি আপনাকে জানাতে বললেন, তাঁকে কলকাতা ফিরতে হচ্ছে। কেউ অধিকারীর বন্ধু একই ট্রেনে কলকাতা ফিরছেন। রাতের দিকে মিঃ হালদার থানায় রিং করবেন। সম্ভব না হলে কাল মর্নিংয়ে।

এইসময় কফি আর বিস্কুট আনল একটি ছেলে। বুঝলুম, থানার পাশেই চা-কফির দোকান আছে। আমার কফি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তপেশবাবুর অনুরোধে কফিতে চুমুক দিলুম। কর্নেল কফি পেলে খুশি হন। কফি খেতে-খেতে তিনি বললেন,—দুপুর দুটোয় কি আপনি ফ্রি আছেন?

তপেশবাবু হাসলেন,—আমি কোনও সময়ই ফ্রি নয়। তবে আপনার জন্য ফ্রি হতে পারি।

—আপনি সঙ্গে একজন এস. আই. এবং দুজন আর্মড কনস্টেবল নেবেন। একটা স্পট লাইটও চাই।

—একটু হিন্ট দেবেন কি?

কর্নেল হাসলেন,—মোটামুটি একটা অ্যাডভেঞ্চার। কাজেই আপনার সঙ্গীদের আপনি বেছে নেবেন। তারা যেন দক্ষ এবং সাহসী হয়। হ্যাঁ—মাখনবাবু বলছিলেন, রায়গড়ে বাঁকা নামে একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে সে মারা যায় বলে রটেছিল। কিন্তু এই থানার তৎকালীন ও.সি. জনৈক মি. ভাদুড়ি তাকে লোহাপুরে একটা পাহাড়ের চাতালে দেখতে পেয়েছিলেন। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তাকে আর খুঁজে বের করতে পারেননি তিনি।

তপেশবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন,—হ্যাঁ, বাঁকা। তার একটা কেস ফাইল আমি দেখেছি।

বিহারের পুলিশও তার খোঁজে ব্যস্ত। মি. প্রশান্ত ভাদুড়ির রিপোর্ট আমি পড়েছি। বাঁকা ডাকাতের একটা পায়ে গুলি লেগেছিল। তাকে খুঁড়িয়ে হাটতে দেখেছিলেন প্রশান্তবাবু!

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—যাই হোক, অরুণের বিরুদ্ধেও আমি একটা এফ. আই. আর. করে রাখতে চাই।

অবশ্যই। আপনি নিজেই লিখে দিন।—বলে তপেশবাবু একশিট কাগজ দিলেন।

কর্নেল পকেট থেকে কলম বের করে দ্রুত অরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখে তপেশবাবুকে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মনে রাখবেন, বেলা দুটো। আমি বনবাংলোয় অপেক্ষা করব।

বেরিয়ে এসে সাইকেলরিকশোতে চেপে হাইওয়ে দিয়ে রংলিডিহির মোড়ে পৌঁছুতে এবার মাত্র আধঘণ্টা লাগল। কারণ আমরা দক্ষিণ উত্তাল শীতের হাওয়ার গতিপথে যাচ্ছিলুম। রিকশোভাড়া মিটিয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে একড়োখেবড়ো জঙ্গলের দক্ষিণ সীমানার সেই পথটা এবং তিনদিক দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন।

বাংলোর সামনে সুরেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে সে হাসল। বলল,—আমার খুড়ো খুব মনমরা হয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—আবার ভালুক দেখেছে, না হাড়-মটমট-করা শব্দ শুনেছে নাখুলাল?

নাখুলাল বাংলোর পিছন থেকে আসছিল। কথাটা শুনতে পেয়েছিল সে। সেলাম করে বিমর্ষ মুখে হেসে সে বলল,—সুরেনের কানে কিছু ঢোকে না। লেখাপড়া শিখে তার কান বদলে গেছে স্যার! আমি দুবার বাংলোর উত্তরদিকে নিচের জঙ্গলে ঠাকুরবাবার চলাফেরার শব্দ শুনেছি।

বলে সে অভ্যাসমতো বুকে ও কপালে ক্রস আঁকল। কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—তুমি ভয় পেয়ো না নাখুলাল! বল্লম তুলে চেঁচিয়ে বলবে, শিগগির তোমার হাড়-মটমট শব্দটা থেমে যাবে ঠাকুরবাবা! শিবু-ওঝা তার গুরুকে ডাকতে গেছে।

সুরেন হেসে গড়িয়ে পড়ল। নাখুলাল বলল,—লাঞ্চ রেডি স্যার! স্নান করবেন তো করুন। গরম জল চাপিয়ে রেখেছি।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত স্নান করবে। আমার স্নানের দিন আগামী কাল।

ঘরে ঢুকে আস্তে বললুম,—আপনি অরুণের কাছ থেকে একটা প্যাকেট ছিনতাই করেছেন। অরুণ বা মাখনবাবু পুলিশকে তা বলবেন।

কর্নেল কপট চোখ কটমটিয়ে বললেন,—স্নান করে ফেলো। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। একটায় লাঞ্চ করব। দটোয় তপেশবাবু আসবেন।

স্নানাহারের পর অভ্যাসমতো আমি বিছানায় গড়াচ্ছিলুম। কর্নেল বারান্দায় বসে চুরুট টানছিলেন। একটু পরে সুরেনকে দেখলুম। সে লনের রোদে ঘাসের ওপর বসল। তার একটু পরে কানে এল, কর্নেল তাকে বলছেন,—গর্তটা তুমি দেখেছিলে। অন্য কাকেও কি বলেছিলে?

সুরেন বলল,—দীপুকে বলেছিলুম। দীপু আর কাকেও বলতে আমাকে বারণ করেছিল।

—তুমি বা দীপু কেউ কি ওখানে ঢুকেছিলে?

—দুজনে একদিন ঢুকতে যাচ্ছিলুম। ভেতর থেকে চাপা গর্জন শুনে দুজনে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। রায়রাজাদের দুর্গ তো জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেবার কলকাতা থেকে সরকারি লোকেরা এসে জঙ্গল সাফ করেছিল। কিন্তু ওদিকটা সাফ হয়নি। খোঁড়াও হয়নি। দীপু বলেছিল, সরকার আর টাকা দিচ্ছে না। তাই খোঁড়ার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। ও.সি. তপেশবাবু দুটো নাগাদ আসবেন। আমরা বেরুব। তুমি সঙ্গে থাকবে।

ভাতঘুমে আমার চোখ বুজে এসেছিল। এই বাংলোতে ঠাণ্ডাটা জঘন্য। দিনের বেলাতেও দুটো

কম্বল মুড়ি দিতে হয়। কিন্তু সবে কম্বলের মধ্যে ওম সঞ্চারিত হয়েছে এবং আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—সহসা কর্নেল কম্বলদুটো তুলে ডাক দিলেন,—জয়ন্ত! আর নয়। উঠে পড়ো।

বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে হল। লনে ও.সি. তপেশ সান্যাল, আর একজন অফিসার এবং দুজন তাগড়াই চেহারার আর্মড কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেলও তৈরি হয়েছেন দেখলুম। তখনই বাথরুমে ঢুকে মুখে ঠাণ্ডা হিম জলের ঝাপটা দিলুম। তারপর পোশাক বদলে প্যান্টের পকেটে আমার খুদে আগ্নেয়াস্ত্রটি ভরে বেরিয়ে এলুম।

দেখলুম, পুলিশের জিপগাড়ি বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে আছে। জিপে এতগুলো লোক কীভাবে যাবে, বুঝতে পারছিলুম না। কিন্তু কর্নেলের সঙ্গে আমাদের উলটোদিকে বাংলোর উত্তরের ছোট্ট গেটে পায়ে হেঁটে যেতে হল। নাখুলাল গেটের তালা খুলে দিল। কর্নেল তাকে বললেন,—গেট খোলা থাক। আমরা এখনই ফিরে আসছি।

বাংলোর নিচের জঙ্গলে নেমে কিছুটা চলার পর কর্নেল বাঁদিকে পশ্চিমে ঘুরলেন। দুর্গম ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে কর্নেল আবার ডাইনে উত্তরে ঘুরলেন। তারপর ইশারায় সুরেনকে ডাকলেন। সুরেনের হাতে একটা জঙ্গলকাটা লম্বা দা ছিল। সে আস্তে বলল,—পাথরের স্ল্যাবগুলো আর-একটু নিচে, স্যার!

পশ্চিমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঘন দুর্গম জঙ্গল। সুরেন দা-এর আঘাতে সামনের একটা ঝোপ কেটে ফেলল। তারপর অবাক হয়ে দেখলুম পাথরের ঘরের একটা ধ্বংসাবশেষ। শেষপ্রান্তে কুয়োর মতো একটা গর্তের মুখে লতাপাতা ঝালরের মতো ঝুঁকে আছে। গর্তটা নিখুঁত চতুষ্কোণ। ওপরে একটা চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা গাছ গর্তে বৃষ্টি ঢুকতে দেয় না।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—মিঃ রক্ষিত! আপনি আর একজন আর্মড কনস্টেবল এই গর্তের দিকে লক্ষ রাখবেন। প্লিজ! যেন গুলি ছুড়বেন না। আপনারা ঝোপের আড়ালে এমনভাবে বসবেন, যেন গর্ত দিয়ে কেউ বেরুলে আপনাদের না দেখতে পায়। বাকিটা আপনাদের দক্ষতা আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে। আমরা তাহলে আসছি। যথাসময়ে দেখা হবে। সুরেন! এসো।

ও.সি. তপেশবাবু, একজন আর্মড কনস্টেবল, কর্নেল, সুরেন এবং আমি আবার বাংলোয় ফিরে গেলুম। তারপর বাংলোর সদর গেট দিয়ে নেমে হাঁটতে-হাঁটতে পশ্চিম-উত্তর দিকে কোনাকুনি এগিয়ে চললুম। এদিকে রুক্ষ শক্ত মাটিতে ছোট-বড় নানা গড়নের কালো পাথর ছড়িয়ে আছে। কদাচিৎ একটা করে বিস্তীর্ণ ঝোপ। কর্নেল মাঝে-মাঝে বাইনোকুলারে সম্ভবত দুর্গের ধ্বংসস্তূপ লক্ষ করছিলেন। প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে নদী দেখলুম। নদীর বুকে পাথরে সাবধানে পা রেখে ওপরে গেলুম।

তারপর আমরা দুর্গের ধ্বংসস্তূপে পৌঁছে সুরেনের নির্দেশ ডানদিকে হাঁটতে থাকলুম। শীতের রোদ বিকেলে নিষ্প্রভ এবং দূরে কুয়াশার পরদা ঝুলছে। এ বেলা হাওয়া তত উত্তাল নয়। একটু পরে দেখলম, দুর্গের পূর্বদিকে অসংখ্য স্তূপ ঘিরে জঙ্গল গজিয়ে আছে। পা বাড়াতে হচ্ছে সাবধানে। সর্বত্র পাথরের স্ল্যাব এবং তার ফাঁকে গাছপালা গজিয়ে আছে। একখানে গিয়ে সুরেন একটা স্তূপ দেখাল।

এই স্তূপটা একটা ছোট্ট ঘরের ধ্বংসাবশেষ। ছাদের একটা অংশ টিকে আছে। ছাদের ওপর থেকে ঘন লতাপাতা নেমে এসেছে। কর্নেল ইশারায় তপেশবাবুকে ডেকে কী একটা দেখালেন। উঁকি মেরে দেখলুম, লতাপাতার নিচে কাশঝোপের ওপর কয়েকটা কালো লোম। এরকম লোম কর্নেলের সঙ্গে এসে একটা গুহার মতো জায়গায় দেখেছিলুম।

তপেশবাবু কাশঝোপের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—জন্তুটার পায়ের চাপে কাশঝোপের মাঝখানটা বেঁকে গেছে।

কর্নেল ঠিকই বলেন, জয়ন্ত! তুমি বোঝো সবই। তবে বড্ড দেরিতে।

আজ বিকেলের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্য এতক্ষণে স্পষ্ট হল আমার কাছে। কিন্তু অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—আর কোনও কথা নয়। আপনারা সবাই সশস্ত্র। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যা কিছু ঘটুক, গুলি ছুড়বেন না। স্পটলাইটটা আমাকে দিন। আমি আগে নামব। আমার পাশে তপেশবাবু থাকবেন। পিছনে কনস্টেবল নরসিংহ আর জয়ন্ত। সবার পিছনে সুরেন। জয়ন্ত! তোমার আর্মস বের করো। কিন্তু গুলি ছুড়বে না।

লতাপাতার ঝালর সরিয়ে দিলেন কর্নেল। দেখলুম, প্রায় ছফুট উঁচু এবং ফুট চারেক চওড়া একটা চতুষ্কোণ পাথরের দরজা। কিন্তু কপাট নেই। কর্নেল একটু থেমে খুব চাপাস্বরে বললেন, —কত ফুট নামতে হবে জানি না। এই সুড়ঙ্গপথটা নদীর তলা দিয়ে গেছে।

তপেশবাবু আস্তে বললেন,—আমার অনুমান, অন্তত তিরিশ ফুট নামতে হবে। সিঁড়ি কিছুটা খাড়া হতে পারে।

কর্নেল উঁকি মেরে দেখে বললেন,—হ্যাঁ। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করেছে সিঁড়ি। সাবধান! যেন পা স্লিপ করে না কারও। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আমরা খুব আস্তেসুস্থে আর যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামব। একটানা আলো জ্বালব না। দুপাশের দেওয়ালে একটা হাত রেখে নামতে হবে। পাশাপাশি দুজন।

আমি বুঝতে পারছিলুম না কেন কর্নেল বারবার গুলি ছুড়তে নিষেধ করছেন। সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণীটার নখ যে তীক্ষ্ণ, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে আক্রমণ করলেও কি চুপ করে থাকতে হবে?

কর্নেল ও তপেশবাবু নামবার মুখে পিছু ফিরে সুরেনকে দেখে নিলেন। সে ধারালো লম্বা দা হাতে নিয়ে নির্বিকার মুখে এগিয়ে এল। কর্নেল একবার স্পটলাইট ফেলে নিচের ধাপগুলো দেখে নিয়ে শুধু বললেন,—বাঃ!

মসৃণ এবং ফুটখানেক চওড়া কালো পাথরের সিঁড়ি একঝলক দেখে নিয়ে আবার গা শিউরে উঠল। কুয়োর মধ্যে নামলে হয়তো মানুষের এমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। তারপর নামছি তো নামছি। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে, সুড়ঙ্গটা ধসে যাবে না তো?

গুনে-গুনে চল্লিশটা ধাপ নামার পর কর্নেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্পটলাইটটা আবার জ্বাললেন। এবার সমতল মসৃণ পাথরের পথ। তারপর কর্নেল আবার স্পটলাইট জ্বাললেন। চোখে পড়ল দেওয়াল ঘেঁসে কয়েকটা কাঠের পেটি সাজানো। তপেশবাবু ফিসফিস করে বললেন,—এ কার গোডাউন?

তারপরই কানে তালা ধরে গেল বিকট সেই গর্জনে—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ!

দশ

সেই গভীর সুড়ঙ্গের অমানুষিক ভয়ঙ্কর গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু তারপরই গর্জনটা থেমে গেল। কর্নেল স্পটলাইটের আলো ফেলেছিলেন সামনের দিকে। জন্তুটা শিম্পাঞ্জিই হোক, কিংবা আদিবাসীদের ‘ঠাকুরবাবা’ হাড়মটমটিয়া হোক, তীব্র আলোর নাগাল থেকে সম্ভবত দূরে সরে গেল।

কর্নেল স্পটলাইট নিভিয়ে দিলে ও.সি. তপেশবাবু টর্চ জ্বালালেন। তারপর তিনি সুড়ঙ্গপথে বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁসে রাখা থাক-বন্দি পেটিগুলো পরীক্ষা করে চাপাস্বরে বললেন,—চোরাই

মাল তো বটেই! কিন্তু এগুলো ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে গেলে সেই সুযোগে স্মাগলাররা সব লোপাট করতে পারে।

কর্নেল প্লাইউডের পেটিগুলোতে চোখ বুলিয়ে বললেন,—তপেশবাবু! আপনি ঠিকই বলেছেন। এগুলোতে সুইডেনের একটা কোম্পানির নাম ছাপা আছে।

বলেন কী!—বলে তপেশবাবু উপরের একটা পেটি নামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

কর্নেল সামনে স্পটলাইটের আলো আর একবার ফেলে বললেন,—বাবা হাড়মটমটিয়া এদিকে আর আসবে না। একটা ব্যাপার স্পষ্ট। ওই প্রাণীটা আগ্নেয়াস্ত্রকে ভয় পায়। বরং ঝটপট একটা কাজ করা যাক। সুরেনের দা-এর সাহায্যে একটা পেটি খুলে দেখা যাক, ওতে কী আছে। জয়ন্ত! তুমি স্পটলাইটটা নাও। মাঝে-মাঝে জ্বেলে সামনে আর পিছনে আলো ফেলবে।

তপেশবাবু বললেন,—ঠিক বলেছেন! এমন হতেই পারে, স্মাগলারদের লোক আড়ি পেতে আমাদের এই সুড়ঙ্গে নামতে দেখেছে।

কর্নেল ততক্ষণে ওপরের পেটিটা নামিয়ে ফেলেছেন। তপেশবাবুর কথাটা শুনে আমার আতঙ্ক বেড়ে গেছে। এই সুড়ঙ্গের ভিতরে কেষ্ট অধিকারীর দল বন্দুক পিস্তল নিয়ে আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করলে প্রাণে বাঁচার চান্স নেই। ওই প্রাগৈতিহাসিক ভয়ংকর জন্তুটার চেয়ে স্মাগলাররা আরও বিপজ্জনক।

সুরেনের দা-এর সাহায্যে পেটির একটা দিক খুলে দিতেই কর্নেল বললেন,—যন্ত্রাংশে ভর্তি।

তপেশবাবু জিগ্যেস করলেন,—যন্ত্রাংশ? কী যন্ত্র?

কর্নেল বললেন,—আমার অনুমান এগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের টুকরো। পার্টগুলো জোড়া দিলে বোঝা যাবে অটোমেটিক রাইফেল কিংবা আরও সাংঘাতিক কোনও অস্ত্র।

কী সর্বনাশ!—তপেশবাবু চমকে উঠে বললেন : কর্নেল! তাহলে আগে এই পেটিগুলো সিজ করে থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। জন্তুটার ব্যবস্থা পরে করা যাবে।

কর্নেল বললেন,—তপেশবাবু! ওই জন্তুটাই এগুলো পাহারা দেয় বলে আমার ধারণা। জন্তুটা সম্পর্কে এলাকায় গুজব রটে গেছে। তাছাড়া লোকেরা ধরেই নিয়েছে, দীপু জন্তুটার পেটে গেছে। তারপর উপেন দত্তও তার আক্রমণে মারা পড়েছে। তাই স্মাগলারচক্র বলুন কিংবা কেষ্ট অধিকারীর দল বলুন, ওরা নিশ্চিত যে কারও সাহস হবে না এই গোপন সুড়ঙ্গে ঢোকে!

সুড়ঙ্গের ভিতরে চাপাস্বরে এইসব কথাবার্তাও ভুতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলছিল। হঠাৎ সুরেন বলল, —সার! আমি আর এই কনস্টেবলদাদা দুজনে মিলে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে বরং ওত পেতে বসে থাকব। কেউ এলেই তার ঠ্যাঙে দায়ের কোপ মারব।

এমন সাংঘাতিক একটা অবস্থায় কর্নেল হেসে ফেললেন,—তুমি বুদ্ধিমান সুরেন! সুড়ঙ্গের মুখে ওত পেতে থাকলে একজন লোক একশোজন শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তপেশবাবু! আপনি কনস্টেবল নরসিংহকে পুলিশ অফিসার হিসাবে নির্দেশ দিন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে প্রথমে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে আততায়ীদের তাড়িয়ে দিতে বা পায়ে গুলি করতে পারবে।

তপেশবাবুর নির্দেশ পেয়ে নরসিংহ এবং সুরেন এগিয়ে গেল। যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি, সেই সিঁড়িতে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে ওরা অদৃশ্য হল। কর্নেল বললেন,—চলুন। এবার আমরা এগিয়ে যাই।

কর্নেল সামনে, তাঁর বাঁদিকে তপেশবাবু এবং ডানদিকে পিছনে আমি। তিনজনের হাতেই গুলিভরা রিভলভার। কর্নেল স্পটলাইটের আলো মধ্যে মধ্যে জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছিলেন। পায়ের

তলায় পাথরের ইট, দুধারে দেওয়ালেও পাথরের ইট এবং মাথার ছাদে চওড়া মসৃণ বড়-বড় কালো পাথরের স্ল্যাব।

জীবনে বহুবার কর্নেলের সঙ্গী হয়ে কত সাংঘাতিক অভিযানে গেছি। কিন্তু এই অভিযান একেবারে অন্যরকম। কোন যুগে রায়গড়ের কোন রাজা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হলে যাতে নিরাপদে একটা নিবিড় অরণ্যপথে (সে যুগে জঙ্গলটা নিশ্চয় আরও দুর্গম আর বিস্তীর্ণ ছিল) সপরিবারে পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে একটা নদীর তলা দিয়ে এই গোপন সুড়ঙ্গপথ তৈরি করেছিলেন। আর এতকাল পরে আমরা সেই পথে একটা মূর্তিমান বিভীষিকার মুখোমুখি হতে চলেছি। এই সব কথা ভেবেই যুগপৎ বিস্ময় আর আতঙ্কে আমি উদ্বেলিত হচ্ছিলুম।

চলেছি তো চলেছি। মাঝে-মাঝে কর্নেলের হাতে স্পটলাইটের ঝলকানি, তারপর নিবিড়কালো অন্ধকার। ঘড়ি দেখার কথা মনে ছিল না। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে হিংস্র জন্তুটার আবির্ভাব ঘটাতে পারে। কারণ ক্রমশ তার মরিয়া হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। সুড়ঙ্গের অন্যমুখে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তা টের পেয়ে সে আরও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

কর্নেল বলেছেন, জন্তুটা আগ্নেয়াস্ত্র দেখলে ভয় পায়। কেন তাঁর এমন ধারণা হল, বুঝতে পারছিলুম না। কিছুক্ষণ পরে স্পটলাইটের আলো ফেলে কর্নেল বললেন,—আমরা এখন নদীটার তলা দিয়ে যাচ্ছি। ওই দেখুন তপেশবাবু! ছাদ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে।

তপেশবাবু ছাদ লক্ষ করে বললেন,—ধসে পড়বে না তো?

—ধসে পড়ার কারণ নেই। সেকালের স্থপতি আর কারিগররা কত দক্ষ ছিলেন, বিশ্বের সর্বত্র তার প্রমাণ আছে। জলের ফোঁটাগুলো নিচে পড়ে পাথরের ইটের ফাঁক দিয়ে তলার বালিতে মিশে যাচ্ছে। হ্যাঁ—কিছুটা পথ পিচ্ছিল হয়ে আছে। সাবধানে পা ফেলে আসুন।

নদীর তলায় সুড়ঙ্গপথে হেঁটে যাওয়ার এই অভিজ্ঞতা সাংঘাতিক। কে বলতে পারে হঠাৎ এখনই এই প্রাচীন সুড়ঙ্গের ছাদ ধসে যাবে না? প্রাণ হাতে করে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। একসময় কর্নেল বললেন,—আমরা নদী পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এবার আরও সাবধান। পথটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পরই আবার সেই কানে তালা ধরানো ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। —আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! সুড়ঙ্গের মধ্যে এই গর্জন শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে যাচ্ছিল। গর্জন থামলে কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—শিম্পাঞ্জি বা গরিলারা কতকটা এইরকম গর্জন করে শুনেছি। কিন্তু—

তিনি হঠাৎ থেমে গেলে তপেশবাবু বললেন,—কিন্তু কী?

আসলে কর্নেল কান পেতে কী শুনছিলেন। বললেন,—গর্জনটা থেমে যাওয়ার পর প্রতিবার শুনেছি শুকনো ডালভাঙার মতো মটমট শব্দ। শুনুন! শব্দটা ভারি অদ্ভুত!

তপেশবাবু এবং আমি দুজনেই এতক্ষণে স্পষ্ট শুনতে পেলুম মটমট শব্দ। এই শব্দ হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলেও শুনেছিলুম। কিন্তু সুড়ঙ্গের ভিতরে শব্দটা যেন কোন অজানা বিভীষিকারই সাড়া। কোনও প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র প্রাণী যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এই শব্দ তারই পা ফেলার শব্দ।

মটমট শব্দটা একটু পরে থেমে গেল। কর্নেল আবার পা বাড়ালেন। এবার ক্রমশ সুড়ঙ্গপথ একটু করে উঁচু হয়েছে। পাথরে জুতো স্লিপ করছে। তাই আমি দেওয়াল ঘেঁসে হাঁটছিলুম। কর্নেল আলো ফেলে হঠাৎ বললেন,—সাবধান! একটা সাপ মনে হচ্ছে!

তপেশবাবু বললেন,—কই? কোথায় সাপ?

—সামনে। ফণা তুলেছে!

—সর্বনাশ! তাহলে বিষাক্ত গোখরো সাপ। আলো দেখলে ওরা ফণা তোলে!

বলে তপেশবাবু কর্নেলের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন,—সাপটাকে দেখতে পাচ্ছি। গুলি করে ওর ফণাটা এখনই গুঁড়ো করে দিচ্ছি।

কর্নেল তাঁকে এগিয়ে যেতে দিলেন না। বললেন,—সাপটা কি বাবা হাড়মটমটিয়ার পোষা? তাকে কামড়ালে তো টের পেতুম। এক মিনিট! আমি সাপটার সঙ্গে একটু খেলা করি!

তপেশবাবু কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলুম,—কর্নেল! কর্নেল! আপনি সামরিক জীবনে অনেকবার বিষাক্ত সাপের পাল্লায় পড়েছেন, তা জানি। কিন্তু এখন আপনার হাতে শুধু একটা স্পটলাইট আর রিভলভার। আপনি আমাকে বলেছিলেন, একটা লাঠির সাহায্যে কতবার বিষাক্ত সাপ ধরেছেন। কিন্তু এখন লাঠিও তো নেই।

তপেশবাবু ব্যস্তভাবে বললেন,—খেলা করে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না কর্নেলসায়েব! আমরা এখানে সাপের সঙ্গে খেলা করতে আসিনি!

কর্নেল তাঁর কথা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন,—আপনার বেটনটা কোমরে ঝুলিয়ে রেখেছেন। ওটাই সাপ ধরার পক্ষে যথেষ্ট! বেটনটা দিন আমাকে।

ও.সি. তপেশ সান্যাল বিরক্ত হয়ে বললেন,—এই নিন। কিন্তু এটা লাঠির চেয়ে ছোট।

কর্নেল বললেন,—কেরালার বেদেরা এইটুকু লাঠি দিয়েই বিষাক্ত সাপ ধরে। দেখুন না আপনি শুধু স্পটলাইটটা নিয়ে আমার পাশে এসে সাপটার ওপর আলো ফেলুন।

এতক্ষণে আমি চিত্রবিচিত্র ফণা তোলা সাপটাকে দেখতে পেলুম। ফণাটা একটু-একটু দুলছে। শিউরে উঠলুম।

কর্নেল গুঁড়ি মেরে বাঁ-হাতে বেটন এবং ডান হাতে রিভলভার নিয়ে সাপটার সামনে প্রায় দু'মিটার তফাতে হাঁটু ভাঁজ করে বসলেন। তারপর আমাদের অবাক করে হেসে উঠলেন। বললেন, —এটাকে এমনভাবে দেখতে পেয়েছিলুম, যেন ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে আসছে। তা এগিয়ে আসতেই পারে। কারণ সাপটা চড়াই থেকে উতরাইয়ে নেমেছে।

কথাগুলো বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে সাপটার মাথা ধরলেন। তপেশবাবু বললেন,— এ কী!

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—সত্যিকার সাপ নয়। রবারের তৈরি খেলনা সাপ! কেউ অন্ধকার থেকে জোরে এই খেলনা সাপটা আমাদের দিকে ছুড়ে ফেলেছে, যাতে আমরা ভয় পাই। হ্যাঁ—সে আমাদের দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছে। সে জানে, আমরা গুলি করে সাপটা মারব। কিন্তু সে জানে না, জঙ্গলের মধ্যে সুড়ঙ্গের অন্য দরজার আড়ালে আমাদের লোক ওত পেতে আছে।

কর্নেল বেটনটা ও.সি. তপেশবাবুকে ফেরত দিয়ে স্পটলাইট নিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। তপেশবাবু বললেন,—একটা কথা বুঝতে পারছি না। জন্তুটা তো জঙ্গলে সুড়ঙ্গের দরজায় গিয়ে দেখে আসতে পারে, কেউ সত্যি ওত পেতে আছে কি না।

কর্নেল বললেন,—জঙ্গলে এখনও দিনের আলো আছে। সে দিনের আলোয় বেরুতে চায় না। অবশ্য তার মালিক কৃষ্ণকান্ত অধিকারী থাকলে অন্য কথা!

তপেশবাবু বললেন,—ওটা কেষ্টবাবুর পোষা জন্তু?

—হ্যাঁ! এবার কিন্তু সাবধান! মনে হচ্ছে, সামনে এবার ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে! কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে স্পটলাইট জ্বেলে উপরদিকে আলো ফেললেন। ওদিকের মতো এদিকেও সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম।

তপেশবাবু উপরদিকে তাকিয়ে বললেন,—কর্নেল! শিম্পাঞ্জি বা গরিলাটাকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে আর গর্জন করছে না কেন?

কর্নেল সিঁড়ির ধাপে সাবধানে পা ফেলে উঠতে-উঠতে বললেন,—গর্জন করছে না, তার কারণ গর্জন করে-করে তার গলা ফেঁসে গেছে। ওই দেখুন, সে উঠে যাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে দশ-বারোটা ধাপ উঠেছি, উপরে আচমকা গুলির শব্দ এবং হইহল্লার শব্দ শোনা গেল। কর্নেল বললেন,—সর্বনাশ! সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ রক্ষিত বা কনস্টেবল ওটাকে গুলি করে মারল নাকি?

তপেশবাবু বললেন,—ওঁদের গুলি করতে নিষেধ করে গেছি। সম্ভবত শূন্যে গুলি ছুড়ে জন্তুটাকে ভয় দেখালেন মিঃ রক্ষিত। রিভলভারের গুলির শব্দ মনে হল।

কর্নেল বললেন,—বেচারা হাড়মটমটিয়া বিপদে পড়ে গেছে। ওই দেখুন! সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে করজোড়ে প্রাণভিক্ষা করছে।

অবাক হয়ে দেখলুম,—গরিলা বা শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীটা দু-হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। স্পটলাইটের আলোয় তার দু-হাতের ধারাল নখগুলো ঝকমক করছে। দুটো দাঁত মুখের দুধারে বেরিয়ে আছে। দাঁতদুটো বাঁকা ধারাল তীক্ষ্ণাগ্র ছুরির মতো।

তপেশবাবু বললেন,—কর্নেলসায়েব! পোষা জন্তুরা মালিকের হুকুমে অনেক কসরত দেখাতে পারে। ব্যাটাচ্ছেলের প্রণামের ভঙ্গিটাও শেখানো। কিন্তু আমরা ভুল করেছি। ল্যাসো বা দড়ির ফাঁস কিংবা খাঁচার ব্যবস্থা করা যেত, যদি বন্যপ্রাণীসংরক্ষণ বিভাগে খবর দিয়ে আসতুম। এই অবস্থায় ওটাকে কীভাবে ধরবেন বুঝতে পারছি না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ধরা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তা সে বুঝে গেছে। এখন সে নিজের প্রাণভিক্ষা চাইছে। আসুন! রিভলভার তৈরি রেখে আমার পিছনে আসুন। বাবা হাড়মটমটিয়া আমাদের ওপর ঝাঁপ দিতে এলেই তিনটে গুলি তাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেব, এটুকু কি সে জানে না?

বলে তিনি জন্তুটার দিকে মুখ তুলে হাসলেন,—ঠাকুরবাবা! ওহে বাবা হাড়মটমটিয়া! ওপরে উঠে যাও। তোমাকে কেউ গুলি করে মারবে না। তুমি ওঠে গিয়ে মিঃ রক্ষিতের সামনে নমো করো গে! ওঠো! ওঠো!

মনে হল, কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর পোষ্য প্রাণী। তাই মানুষের কথা বোঝে। প্রাণীটা ওপরে উঠে গেল। মিঃ রক্ষিতের গর্জন শুনতে পেলুম,—এক পা এগিয়ো না বলছি! আশ্চর্য তো এটা কি বনমানুষ!

কর্নেল সুড়ঙ্গের দরজার মুখে গিয়ে বললেন,—মিঃ রক্ষিত! আশ্চর্যই বটে! না-না ও পালাবে না! ও জানে, এবার পালানোর চেষ্টা করলেই ওর ঠ্যাং ভেঙে যাবে।

কর্নেল বেরিয়ে যাওয়ার পর তপেশবাবু, তারপর আমি বেরোলুম। জঙ্গলে এখন দিনের শেষে বিবর্ণ আলো আর ঠান্ডা হিম বাতাস। চির অন্ধকারের জগত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছি এবং চেনা পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। বুকভরে নিশ্বাস নিলুম। তারপর জন্তুটার দিকে তাকালুম।

জন্তুটার শরীর প্রকাণ্ড। দুটো হাত অস্বাভাবিক লম্বা। সারা গায়ে কালো লোম। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওর চোখদুটো যেন মানুষেরই মতো।

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে জন্তুটার দিকে তাকিয়ে বললেন,—আর কেন বাবা হাড়মটমটিয়া? এবার খোলস ছেড়ে বেরোও! নাকি আমি সাহায্য করব?

অমনই জন্তুটা মানুষের ভাষায় হাঁউমাউ করে কেঁদে বলে উঠল,—সার। আমার কোনও দোষ নেই। কেষ্ট অধিকারীর পাল্লায় পড়ে আমার এই দুর্দশা!

কর্নেল হাসলেন,—বুঝেছি! তা তুমিই সেই বাঁকা ডাকাত?

তপেশবাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন,—বাঁকা? এর নামে বিহার আর পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য ডাকাতি আর খুনখারাপি কেস আছে!

কর্নেল বললেন,—বাঁকা নিজে শিম্পাঞ্জি বা গরিলার পোশাক খুলতে পারবে না। কেষ্ট অধিকারী অসাধারণ ধূর্ত! ওর গলার কাছে ব্যাটারিচালিত একটা খুদে জাপানি মাইক্রোফোন আর টেপরেকর্ডার ফিট করে দিয়েছে। একটা বোতাম টিপলে গর্জন শোনা যায়। অন্যটা টিপলে মটমট শব্দ হয়। বেচারা বাঁকাকে একেবারে বাঁকা করে রেখেছে কেষ্টবাবু!

বলে তিনি বাঁকাকে জন্তুর খোলস থেকে মুক্ত করলেন। বাঁকার শরীরও প্রকাণ্ড। মাথার চুল কাঁচাপাকা। পরনে হাফপ্যান্ট আর একটা সোয়েটার। সে হাঁটু ভাঁজ করে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

কর্নেল খুদে টেপরেকর্ডারের বোতাম টিপে বললেন,—ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকবার টেপটা চালাতে হয়েছে আজ। এদিকে গত দু-তিনদিনও কয়েকবার টেপ বাজিয়েছে। ব্যাটারির দোষ কী?

তপেশবাবু খোলস বা ছদ্মবেশের হাত এবং পায়ের নখ, তারপর দাঁতদুটো পরীক্ষা করে দেখছিলেন। বললেন,—এ তো দেখছি ইস্পাতের তৈরি। ধারালো বাঁকা চুরির মতো।

কর্নেল বললেন,—তপেশবাবু! সুড়ঙ্গের অন্য দরজায় সুরেন আর নরসিংহ আছে। মিঃ রক্ষিতকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন। উনি ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আপনি বাঁকা আর তার জন্তুর পোশাক নিয়ে কনস্টেবলের সঙ্গে এখনই থানায় ফিরে যান। তারপর পুলিশভ্যানে অন্তত একডজন আর্মড কনস্টেবলসহ সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রাখা চোরা আগ্নেয়াস্ত্রের পেটিগুলো নিয়ে আসা দরকার।

তপেশবাবু পকেট থেকে কর্ডলেস টেলিফোন বের করে বললেন,—কোনও অসুবিধে নেই। আমি ফোনে থানায় জানাচ্ছি। এস. ডি. পি. ও. সায়েব এস. পি. সায়েবকে খবরটা জানাবেন। জঙ্গিদের গোপনে অস্ত্রপাচারের খবর আমরা জানতুম। কিন্তু অস্ত্র পেয়ে যাব, চিন্তাই করিনি। আসলে এই সুড়ঙ্গ সম্পর্কে গুজব শুনেছি। কিন্তু আবিষ্কার করার চেষ্টা আমরা করিনি। আপনি কেমন করে জানলেন?

কর্নেল বললেন,—সুরেনের এই এলাকা নখদর্পণে। সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার সে একা করেনি। তার বন্ধু দীপুর সাহায্যে করেছিল। কারণ ওই গড়ে প্রত্নদফতর উৎখননের সময় দুজনেই ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে ঘুরত। ডঃ চট্টরাজ প্রত্নদফতরের অধিকর্তা ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।

তপেশ কর্ডলেস টেরিফোনে খবর দেওয়ার পর বললেন,—এখনই ফোর্স এসে যাচ্ছে। কর্নেলসায়েবকে অনুরোধ, ফোর্স না আসা পর্যন্ত আপনারা আমাকে সঙ্গ দিন।

ততক্ষণে মিঃ রক্ষিত বাঁকার দু-হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছেন এবং কনস্টেবলটি দড়িতে তার কোমর বেঁধে ফেলেছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে একজন পুলিশ অফিসার স্পটলাইট জ্বেলে এগিয়ে এসে বললেন, —পুলিশভ্যান এসে গেছে সার!

তপেশবাবু কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই প্রচণ্ড শীতে আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আবার দেখা হবে।

কর্নেল বললেন,—আপাতত আমার একটা কাজ শেষ। পরের কাজটা পরে। এখন কফির জন্য আমি ছটফট করছি। চলি।

আমরা নাকবরাবর সিধে জঙ্গলের পথে বাংলোয় পৌঁছলুম। আজ আমার মধ্যে আর একটুও আতঙ্ক ছিল না।

বনবাংলোর চৌকিদার নাখুলাল উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের দেখে উত্তেজিতভাবে বলে উঠল,—জঙ্গলে গুলির শব্দ শুনেছি সার! সুরেনের কোনও বিপদ হয়নি তো?

কর্নেল তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,—না নাখুলাল। বরং সুখবর আছে। যাকে তোমরা বাবা হাড়মটমটিয়া বলতে, সে একজন মানুষ। কালো জানোয়ারের পোশাক পরে সে ভয় দেখাত; যাতে এই জঙ্গলে মানুষজন ঢুকতে না পারে। তুমি বলেছিলে ভালুকের মতো একটা জানোয়ার। আসলে সে একজন ডাকাত। তার নাম বাঁকা। সে গোবিন্দকেও মেরেছে।

নাখুলাল অবাক হয়ে বলল,—বাঁকা ডাকাতের নাম শুনেছি সার! তাহলে জনোয়ার সেজে জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়াত? তাকে আপনারা ধরতে পেরেছেন?

—পেরেছি। এখন শিগগির তুমি কফির ব্যবস্থা করো। সুরেনের জন্য ভেব না। সে একটু পরে এসে পড়বে।

বলে কর্নেল বাংলোর পিছন ঘুরে দক্ষিণের বারান্দায় গেলেন। তারপর ঘরের তালা খুলে বললেন,—জয়ন্ত! চীনে লণ্ঠনটা জ্বালো!

বাইরে আঁধার জমেছে। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। আলো জ্বেলে বললুম—একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আপনি বলছিলেন, বাঁকা তার জানোয়ারের পোশাক নিজে খুলতে পারে না। তা হলে সে খাওয়াদাওয়া করত কীভাবে?

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—তুমি লক্ষ করলে বুঝতে পারতে। বাঁকার মাথা ও মুখের অংশ খোলা যায় এবং ইস্পাতের ধারাল নখ-আঁটা হাত দুটোও দস্তানার মতো সে খুলতে পারে। কিন্তু শরীরের বাকি অংশ অন্যের সাহায্য ছাড়া খোলা যায় না।

একটু পরে নাখুলাল কফি আনল। সে ঘটনাটা শোনার জন্য আগ্রহী, তা তার হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—সব ঘটনা তুমি সুরেনের মুখে শুনতে পাবে নাখুলাল! তুমি কিন্তু মুখ বুজে থাকবে। কারণ আমরা চলে যাওয়ার পর কেষ্ট অধিকারীর লোকেরা তো রায়গড়ে থাকবে। তুমি সুরেনের মতো সব জেনে মুখ বুজে থাকলে তাদের হাতে বিপদে পড়বে না। বুঝেছ?

নাখুলাল চুপচাপ চলে গেল। আমি বললুম,—সুরেন সুড়ঙ্গের কথা জানত?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। ওর বন্ধু দীপুও জানত। তবে সুরেন ডঃ চট্টরাজের চুরি যাওয়া প্রত্নদ্রব্যটাতে কী আছে, তা জানত না। তা জানত শুধু দীপু। দীপুই বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়িয়েছিল। তাই তাকে উপেন দত্ত কিডন্যাপ করেছিল।

—কিন্তু এখনও দীপুর খোঁজ পাওয়া গেল না!

কর্নেল আস্তে বললেন,—সম্ভবত হালদারমশাই দীপুর ব্যাপারে কোনও সূত্র পেয়ে ডঃ চট্টরাজকে ফলো করে কলকাতা গেছেন। দেখা যাক, তিনি কী করতে পারেন।

একটু পরে বললুম,—কর্নেল! ডঃ চট্টরাজের তাঁবু থেকে চুরি যাওয়া জিনিসটা প্রথম আপনার কাছে আছে। আমার ধারণা দীপুর বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়ানো অঙ্কটাও আপনি তার একটা বই থেকে হাতিয়েছেন। এবার তার সাহায্যে প্রত্নদ্রব্যটা অর্থাৎ অদ্ভুত গড়নের ছোট্ট ধাতব জিনিসটা খুলে দেখুন না ওতে কী আছে?

কর্নেল বললেন,—চুপ! দেওয়ালের কান আছে। আর—ওই শোনো! বাংলোর নিচের রাস্তায় পুলিশভ্যান আর জিপগাড়ি যাওয়ার শব্দ হচ্ছে। আমার একসময়কার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত অধিকারী এবার নিছক কেষ্ট অধিকারী হয়ে যাচ্ছেন। জয়ন্ত! এই কেসের এটাই সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা। তাই না?

এগারো

সেই রাত্রে পুলিশবাহিনী গড়ের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে চোরাই অস্ত্রশস্ত্রের পেটিগুলি নিয়ে যাওয়ার সময় বাংলোর কাছে সুরেনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ও.সি তপেশ সান্যাল কর্নেলের সঙ্গে বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে কী সব কথা আলোচনা করে চলে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে জ্যোৎস্না ফুটেছিল। কিন্তু কুয়াশামাখা সেই জ্যোৎস্না বড় রহস্যময়। সুরেন তার লম্বা ধারালো দা খুড়ো নাখুলালের কাছে রেখে আমাদের ঘরে এসেছিল! কর্নেলের জন্য ততক্ষণে দ্বিতীয় দফা কফি নাখুলাল দিয়ে গেছে। সুরেনও আমাদের সঙ্গে কফি খেল। কর্নেলের মতে, একটা সাংঘাতিক ঘটনার পর সুরেনেরও কফি খাওয়া দারকার। নার্ভ চাঙ্গা হবে।

সুরেন বলেছিল,—উঁকি মেরে দেখেছিলুম জনাতিনেক লোক গড়ের দিকে আসছে। তখন একটু আঁধার নেমেছে। নরসিংহদাকে কথাটা বলামাত্র উনি রাইফেল বাগিয়ে আমাকে টর্চ জ্বালতে বললেন। টর্চের আলোয় রাইফেলধারী পুলিশ আছে টের পেয়ে লোকগুলো কেটে পড়ল। নরসিংহদাও চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—কৌন বা?

সুরেন হেসে অস্থির। কর্নেল তাকে বলেছিলেন,—তোমাকে ওরা দেখতে পায়নি তো?

—না সার! তবে আমার মনে হচ্ছে, ওরা আসানসোলে কেষ্টবাবুকে খবর দিতে গেছে!

—যাওয়ারই কথা। পুলিশ আজ রাতেই আসানসোল থানাকে খবর দেবে। কেষ্ট অধিকারীর অফিস, দোকান আর সেখানকার বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাশি চালাবে। যত শিগগির সম্ভব কেষ্টবাবুকে পাকড়াও করা দরকার। তা না হলে দীপুর বিপদের আশঙ্কা আছে।

সুরেন বলেছিল,—কেন? দীপু তো কেষ্টবাবুর বিরুদ্ধে কিছু করেনি!

—সুরেন! দীপু কিছু না করলেও এ পর্যন্ত সব ঘটনা তাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। তাই কেষ্টবাবুর রাগ দীপুর ওপরই পড়বে।

—সার! দীপু কি কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়েছে বলে আপনার ধারণা?

—জানি না। তবে বলা যায় না। দেখা যাক।

রাত দশটা নাগাদ আমরা খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলুম। সকালে নাখুলালের ডাকে আমার ঘুম ভেঙেছিল। সে বেড-টি এনেছিল, বাইরে শীতের সকাল কুয়াশায় ম্রিয়মান দেখাচ্ছিল। আজ শীতটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। নাখুলাল সোয়েটারের ওপর কম্বল চাপিয়েছিল। সে বলল,—আজ শীত খুব জমেছে সার!

বললুম,—তা টের পাচ্ছি। কিন্তু এমন প্রচণ্ড শীতে কর্নেলসায়েব বেড়াতে বেরিয়েছেন। তোমাকে কিছু বলে যাননি?

নাখুলাল বলল,—না সার! সুরেনকে সঙ্গে নিয়ে সায়েব গড়ের দিকে যাচ্ছেন দেখেছি।

বুঝতে পারলুম না আবার কেন কর্নেল গড়ের জঙ্গলে গেছেন। ওখানে কেষ্টবাবু লোকেরা আচমকা হামলা করতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে শীতের উপদ্রবে প্যান্টশার্ট সোয়েটার আর পুরু জ্যাকেট পরে লনে রোদে গিয়ে দাঁড়ালুম। রোদের তেজ কম। সকাল আটটা বাজে। তবু অদূরে ঘন কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রায় আধঘণ্টা পরে কুয়াশা কিছুটা কেটে গেল। সেই সময় বাংলোয় নিচের পথ থেকে মাথায় হনুমান টুপি, গলাবন্ধ কোট আর প্যান্টপরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে একটা লোককে উঠে আসতে দেখলুম। বাংলোর গেটের কাছে দাঁড়াতেই তাকে চিনতে পারলুম। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই!

সম্ভাষণ করলুম,—সুপ্রভাত হালদারমশাই! আপনার ফোন করার কথা ছিল। কিন্তু সশরীরে এসে পড়লেন যে?

গোয়েন্দাপ্রবর ক্লান্তভাবে বললেন,—আর কইবেন না জয়ন্তবাবু! কইলকাত্তা গেছি আর ফিরছি। সিট পাই নাই। সারা পথ খাড়াইয়া আইছি।

তখনই নাখুলালকে ডেকে কফি তৈরি করতে বলে হালদারমশাইকে আমাদের ঘরে নিয়ে গেলুম। দেখলুম, উনি হাতে দস্তানা পরেছেন। দস্তানা এবং হনুমানটুপি খুলে চেয়ারে বসলেন হালদারমশাই। বললুম,—খবর পরে শুনব। আগে কফি আসুক।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জিগ্যেস করলেন,—কর্নেলস্যার গেলেন কই?

বললুম,—প্রাতঃভ্রমণে। গড়ের দিকে সুরেনের সঙ্গে কর্নেলকে যেতে দেখেছে নাখুলাল!

হালদারমশাই তাঁর গলাবন্ধ কোটের বোতাম খুলে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করলেন। তিনি ভাঁজ খুলে কাগজটা আমাকে দেখিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—গড়ের ম্যাপ আনছি। এই কালো দাগটার পাশে লেখা আছে 'টানেল।' তার মানে সুড়ঙ্গ!

অবাক হয়ে বললুম,—কোথায় পেলেন এই ম্যাপ?

গোয়েন্দাপ্রবর খিখি করে আড়ষ্ট হেসে বললেন,—ওঃ চট্টরাজেরে ফলো করছিলাম। উনি আমারে ক্যামনে চিনবেন? এয়ারকন্ডিশন্ড চেয়ারকারে পাশাপাশি সিট।

—বলেন কী! তাহলে অনেক টাকা ভাড়া দিতে হয়েছিল আপনাকে?

—নাঃ! তত বেশি কিছু না। করবটা কী, কন? ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। অথচ চট্টরাজেরে ফলো করতেই হইব।

—বুঝলুম। কিন্তু এই ম্যাপটা?

নাখুলাল কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে ঢুকল। হালদারমশাইকে সে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে হালদারমশাই বললেন,—ডঃ চট্টরাজ ব্রিফকেস থেকে একটা ডায়রি বই বার করছিলেন। তখনই ভাঁজকরা কাগজখান ওনার পায়ের কাছে পড়ল। উনি ট্যার পাইলেন না। তারপর উনি যখন বাথরুমে গেছেন, তখন এই কাগজখান আমি হাতাইলাম। বুঝলেন তো?

হালদারমশাই হাসতে-হাসতে আবার কফিতে মন দিলেন। আমি ম্যাপটা দেখেই বুঝতে পারলুম, সরকারি পুরাদফতরের প্যাডে আঁকা রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ম্যাপ। এটা মূল ম্যাপ নয়। সরকারের সংরক্ষিত প্রাচীন ম্যাপের নকল। ম্যাপে দুর্গ এবং সুড়ঙ্গপথের রেখাচিত্র আছে। একখানে চৌকো ঘরের নকশার পাশে ইংরেজিতে লেখা আছে : 'ট্রেজারি'। অর্থাৎ রাজকোষ। সুড়ঙ্গের পূর্বপ্রান্তে জঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পেলুম।

খুঁটিয়ে ম্যাপটা দেখতে-দেখতে কফি খাচ্ছি, এমন সময় কর্নেলের সাড়া পাওয়া গেল। বারান্দায় উঠেই তিনি সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং হালদারমশাই! আপনাকে এত শিগগির কলকাতা থেকে ফিরতে দেখে আমি অবাক হইনি।

হালদারমশাই কর্নেলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চাপাস্বরে বললেন,— দীপুর খোঁজ পাইছি। সে কলকাতায় ডঃ চট্টরাজের বাড়িতে ছিল। তারে আনবার জন্যই চট্টরাজ গিছলেন। তারপর তারে লইয়া উনি রাত্রের ট্রেনে আসানসোলে ব্যাক করলেন। আসানসোলে মিঃ অধিকারীর বাড়িতেই দীপুরে সম্ভবত লইয়া গেলেন। আমি আসানসোলে নামলাম না। ক্যান কী, খবরটা আপনারে জানানো দরকার।

সুরেন সম্ভবত তার খুড়োকে কর্নেলের কফি তৈরি করার জন্য বলতে গিয়েছিল। এই সময় সে ফিরে এল। তারপর হালদারমশাইকে দেখে সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। কর্নেল তাকে

বললেন,—সুরেন! তাহলে তুমি রংলিডিহি থেকে শিবু-ওঝার ছেলেকে ডেকে আনো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দশটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।

সুরেন চলে গেল। কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—কী ব্যাপার?

কর্নেল টুপি, কিটব্যাগ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা ইত্যাদি টেবিলে রেখে বললেন,—গড়ের একটা ধ্বংসস্তূপের মাথার প্রকাণ্ড একটা পিপুল গাছে অদ্ভুত প্রজাতির পরগাছা দেখে এলুম। সুরেন অত উঁচু গাছে চড়তে পারল না। শিবু-ওঝার ছেলে ডন নাকি গাছে চড়তে ওস্তাদ। আমি অবশ্য ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে ছবি তুলেছি।

নাখুলাল কফি রেখে গেল। কর্নেল তারিয়ে-তারিয়ে কফি পান করতে থাকলেন। এবার জিগ্যেস করলুম,—আচ্ছা কর্নেল, আপনি হালদারমশাইকে ফিরতে দেখে অবাক হননি কেন?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। বললেন,—এবার হালদারমশাইয়ের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি শোনা যাক।

হালদারমশাই যা বললেন, তার সারমর্ম এই :

কর্নেলের নির্দেশে আসানসোলে গিয়ে কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর কোম্পানির হেড অফিস খুঁজে বের করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। কেষ্টবাবু সেখানে নামকরা ব্যবসায়ী। এক কর্মচারীর কাছে হালদারমশাই কেষ্টবাবুর বাড়ির কথা জিগ্যেস করলে ভদ্রলোক বলেন, অধিকারীসায়েব এই অফিসের তিনতলায় থাকেন। তাঁর আসল বাড়ি রায়গড়ে। তবে এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। খুব ব্যস্ত আছেন।

হালদারমশাই কাছেই একটা হোটেলে ওঠেন। হোটেলের তিনতলায় তাঁর রুম। তাই কেষ্ট অধিকারীর অফিসবাড়ির ওপরতলারদিকে তাঁর নজর রাখার সুবিধা ছিল। রাত্রে তিনি রায়গড় থানায় ফোন করে জানান, এখনও কোনও খবর নেই। সকালে আবার ফোন করবেন। পরদিন সকালে কেষ্টবাবুর অফিসবাড়ির তিনতলার ছাদে হালদারমশাই রোদে দুজনকে চেয়ারে বসে চা বা কফি খেতে দেখেন। ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের চেহারার বর্ণনা কর্নেল তাঁকে দিয়েছিলেন। তাই তিনি ডঃ চট্টরাজকে চিনতে পারেন।

দুপুরে খাওয়ার পর হালদারমশাই দেখতে পান, কেষ্টবাবু এবং ডঃ চট্টরাজ একটা গাড়িতে উঠছেন। দ্রুত নেমে গিয়ে তিনি একটা অটোরিকশো ভাড়া করে সাদা গাড়িটিকে অনুসরণ করেন। গাড়িটা রেল স্টেশনে গিয়েছিল। এর পর তিনি ডঃ চট্টরাজকে ট্রেনের চেয়ারকারে উঠতে দেখেন। চেয়ারকারে উঠে চেকারকে অনুরোধ করে টিকিটের ব্যবস্থা করেন। চেয়ারকার প্রায় খালি ছিল। এর পর ডঃ চট্টরাজের পাশের সিটে বসে একসময় তিনি রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ম্যাপটা পেয়ে যান। কীভাবে পান, তা তিনি আমাকে আগেই বলেছেন। এবার কর্নেলকে সবিস্তারে বলে নিজের অভিযানের বাকি অংশে চলে এসেছিলেন।

গাড়ি বর্ধমান পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। তাঁর গায়ে-পড়া আলাপে ডঃ চট্টরাজ বিরক্ত হচ্ছিলেন, হালদারমশাই তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি পাওয়ার ঝামেলা সম্পর্কে হালদারমশাই কথা তোলেন। তখন ডঃ চট্টরাজ বলেন, তাঁর গাড়ি অপেক্ষা করবে স্টেশনে। হালদারমশাই তখন করুণ মিনতি করে ডঃ চট্টরাজের বাড়ির কাছে নামিয়ে দিতে বলেন। হালদারমশাইয়ের হার্টের অসুখ আছে। তাছাড়া তিনি যাদবপুর এলাকাতেই থাকেন।

এইভাবে গোয়েন্দাপ্রবর বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ডঃ চট্টরাজের গাড়িতে ঠাঁই জোগাড় করেন। ড্রাইভারের সঙ্গে একজন শক্তসমর্থ চেহারার লোক এসেছিল। তাকে

ডঃ চট্টরাজ জিগ্যেস করেন,—শ্রীমান দীপু কেমন আছে? কথাটা শুনেই হালদারমশাই কান পাতেন। কিন্তু চোখ বন্ধ। হার্টের রুগি তো!

লোকটি বলে,—দীপু বড্ড বেগড়বাঁই করছে।

ডঃ চট্টরাজ বলেন,—ওকে আজই রাত বারোটা পাঁচের ট্রেনে বাড়ি পৌঁছে দেব। আমি নিজেই নিয়ে যাব। আমার একটু ধকল হবে। কিন্তু কী আর করা যাবে?

ডঃ চট্টরাজ তাঁর বাড়ির কাছে হালদারমশাইকে নামিয়ে দিয়ে যান। এরপর হালদারমশাই লেকভিউ রোডে নিজের ফ্ল্যাটে ফেরেন। তারপর হনুমানটুপি পরে পোশাক একেবারে বদলে চোখে চশমা এঁটে ঠিক সময় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছান। তিনি প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার সময় দীপুর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন, সে উপেন দত্তের বাড়ি থেকে পালিয়ে সরল বিশ্বাসে ডঃ চট্টরাজের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ডঃ চট্টরাজ তাকে চুরি যাওয়া প্রত্নদ্রব্য উদ্ধারে সাহায্যের ছলে আটকে রাখেন। দীপুর অবশ্য এতে উৎসাহ থাকারই কথা। ডঃ চট্টরাজকে হালদারমশাই বলতে শুনেছিলেন,—মিঃ অধিকারীই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। মিঃ অধিকারীর গাড়িতে আমরা সোজা রায়গড় যাব। চিন্তা কোরো না। আগে হারানো জিনিসটা উদ্ধার করা যাক।

ততক্ষণে কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছেন। গোয়েন্দাপ্রবরের কথা শেষ হলে তিনি চোখ খুলে বললেন,—গত রাতে আসানসোলে কেষ্টবাবুর অফিস আর গোডাউনে পুলিশের হানা দেওয়ার কথা। পুলিশ ওখানে কেষ্টবাবু, ডাঃ চট্টরাজ আর দীপুকে পেলে এতক্ষণ রায়গড় থানায় খবর আসত এবং খবরটা থানা থেকে আমাদের কাছে পৌঁছুত। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ধূর্ত কেষ্টবাবু দীপুকে নিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ছলে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে। ডঃ চট্টরাজ সম্ভবত থানায় রিং করতেন।

আমি বললুম,—উনি তো গতকাল কী ঘটেছে জানেন না। আসানসোলে কেষ্টবাবুর অফিসে পুলিশ হানা দেবে, তা-ই বা কেমন করে জানবেন?

কর্নেলের কথা শুনে হালদারমশাই হতবাক হয়ে বসে ছিলেন। এবার শুধু বললেন,—হঃ!

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ জয়ন্ত! তবে হালদারমশাই অত্যন্ত মূল্যবান খবর এনেছেন।

হালদারমশাই আস্তে বললেন,—দীপু কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়ছে ক্যান? কেষ্টবাবু কি তারে ডঃ চট্টরাজের মতন আটকাইয়া রাখবে? জয়ন্তবাবু কাইল কী সব ঘটছে কইলেন। কী ঘটছে?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—কেষ্টবাবু এখন মরিয়া। কেন, সে-কথা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় শুনবেন। গতকাল আমরাও একটা রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরিয়েছিলুম। তাছাড়া আরও কিছু সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের ঘরে ব্রেকফাস্টের সময় কর্নেল হালদারমশাইকে কালকের সব ঘটনা শোনালেন। গোয়েন্দপ্রবর মাঝে-মাঝে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠছিলেন,—আঃ! আমি মিস্ করছি।

সেই জন্তুটা যে ছদ্মবেশী দুর্ধর্ষ বাঁকা ডাকাত, এ কথা শুনে প্রাইভেট ডিটেকটিভ খিখি করে হেসে অস্থির হলেন। বললেন,—অরে এট্টুখানি দেখছিলাম! ভাগ্যিস গুলি করি নাই!

বললুম,—কর্নেল কেন বলতেন, জন্তুটা ফায়ার আর্মস্‌কে খুব ভয় পায়, সেটা পরে বুঝেছি।

হালদারমশাই বললেন,—হঃ! জন্তু হইলে ভয় পাইব ক্যান? জন্তুরা কি ফায়ার আর্মস বোঝে?

সওয়া দশটা নাগাদ সুরেন তার সমবয়সি একটা রোগা গড়নের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল। কর্নেল সহাস্যে বললেন,—এই তোমার ডন!

সুরেন বলল,—হ্যাঁ সার! আমাদের ফাদার এর ডাকনাম ডন দিয়েছেন। এর খ্রিস্টান নাম ড্যানিয়েল কালীপ্রসাদ বেস্‌রা। মিশনস্কুল ছেড়ে ফাদারের ভয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! রাত জেগে এসেছেন। ঘুমিয়ে নিন। জয়ন্ত! আমার সঙ্গী হবে নাকি?

বললুম,—আমার মাথাখারাপ? অন্য ব্যাপারে আপনার সঙ্গে যেতে সবসময় রাজি। কিন্তু আপনি যখন বনেবাদাড়ে পাখি-প্রজাপতি-অর্কিডের জন্য বেরুচ্ছেন, তখন আমি সঙ্গী হতে রাজি নই! ঠেকে-ঠেকে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!

কর্নেল হাসতে-হাসতে সুরেন ও ডনের সঙ্গে চলে গেলেন। হালদারমশাই আর আমি লনে রোদ্দুরে দুটো চেয়ার পেতে বসলুম। হালদারমশাই বললেন,—একটা কথা বুঝি না। কেষ্টবাবু পোলাটারে আটকাইয়া রাখব ক্যান?

সায় দিয়ে বললুম,—ঠিক বলেছেন! দীপুকে আটকে রেখে কেষ্ট অধিকারীর কী লাভ? যে জিনিসটা বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়ানোর জন্যে দরকার ছিল, সেই তো উপেন দত্তকে শিম্পাঞ্জির ছদ্মবেশে বাঁকা ডাকাত খুন করার পর কর্নেলের হাতে চলে এসেছে—

গোয়েন্দাপ্রবর উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় দেখলুম কুমুদবাবু হন্তদন্ত হয়ে গেট খুলে বাংলোর লনে ঢুকছেন। তিনি এসে কাঁদো-কাঁদো মুখে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন,—কর্নেল সায়েব কোথায়? এদিকে এক সর্বনাশ!

বললুম,—কী হয়েছে কুমুদবাবু?

কুমুদবাবু পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে করুণ মুখে বললেন,—এই চিঠিটা আজ ভোরে বাইরের ঘরের কপাটের ফাঁক দিয়ে কে ঢুকিয়ে রেখেছিল। লক্ষ করিনি। কিছুক্ষণ আগে মেঝে পরিষ্কার করার সময় দীপুর মায়ের চোখে পড়ে। এটা দীপুর লেখা চিঠি। পড়ে দেখুন।

চিঠিটা খুলে দেখলুম লেখা আছে :

'বাবা,

চট্টরাজসায়েবের ক্যাম্প থেকে চুরি যাওয়া জিনিসটা নাকি কোন্ কর্নেলসায়েবের কাছে আছে। তাঁকে এই চিঠি দেখিয়ে বলবেন, ওটা যেন তিনি আজই রাত দশটায় হাড়মটমটিয়ায় জঙ্গলে সেই ডোবার পাড়ে রেখে আসেন। পুলিশকে জানালে আমাকে এরা মেরে ফেলবে। জিনিসটা পেলে আমাকে এরা ছেড়ে দেবে। না পেলে আজ রাত একটায় আমাকে এরা মেরে ফেলবে।

ইতি,

দীপু'

হালদারমশাই আমার মুখের কাছে মুখে এনে চিঠিটা পড়ছিলেন। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ কানে ঝাপটা মারছিল। তিনি এবার সরে বসে উত্তেজিতভাবে বললেন,—কর্নেলস্যারেরে এখনই খবর দেওয়া দরকার।

কুমুদবাবু ভাঙা গলায় বললেন,—কর্নেলসায়েব কোথায় গেছেন?

বললুম,—ওঁর যা বাতিক! গড়ের জঙ্গলে পরগাছা আনতে গেছেন! আপনি ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

আমরা বারান্দায় গিয়ে বসলুম। একটু পরে হালদারমশাই বললেন,—গড়ের জঙ্গল কোথায়? আমারে দেখাইয়া দিলে কর্নেলস্যারেরে খবর দিতাম! জয়ন্তবাবু চেনেন না? কুমুদবাবু, আপনি নিশ্চয়ই চেনেন?

কুমুদবাবু বললেন,—আমার যা অবস্থা, অনেক কষ্টে এসেছি। এখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর কোণে। নদীর ওপারে। নদীতে অবশ্য তত জল নেই।

আমারে দেখাইয়া দ্যান। —বলে গোয়েন্দাপ্রবর উঠে দাঁড়ালেন।

আমি সত্যি বলতে কী, চিঠিটা পড়ার পর নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম। কুমুদবাবু বারান্দা থেকে নেমে হালদারমশাইকে দূরে গড়ের জঙ্গল অর্থাৎ ধ্বংসস্তূপে গজিয়ে ওঠে জঙ্গলটা দেখিয়ে দিলেন। হালদারমশাই আমার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নাখুলালকে ডেকে কুমুদবাবুর জন্য চা আনতে বললুম। নাখুলাল কুমুদবাবুকে 'নমস্তে' করে চলে গেল।

কর্নেল সুরেন আর ডনের সঙ্গে যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় বারোটা বাজে। দেখলুম, একটুকরো মোটা ডালে লালরঙের ঝলমলে ফুল এবং সবুজ চিকন পাতার পরগাছা আটকানো। শেকড়বাকড় কিছুটা দু'ধারে ঝুলে আছে। কর্নেল কুমুদবাবুকে দেখে বললেন,—এক মিনিট। এটা নাখুলালকে মাটিতে বসিয়ে রাখতে বলে আসি।

বললুম,—হালদারমশাই কোথায়? উনি তো আপনাকেই ডাকতে গেছেন!

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন,—হালদারমশাই? তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি!

কর্নেল বাংলোর পিছনদিকে চলে গেলেন। কুমুদবাবু বললেন,—দেখা না হয়েই পারে না। জায়গাটা গোলকধাঁধার মতো। হয়তো এখনও উনি কর্নেলসায়েবকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

একটু পরে কর্নেল ফিরে এসে ডনকে কিছু টাকা দিলেন। ডন খুশি হয়ে চলে গেল। সুরেন গেল তার খুড়োর কাছে। কর্নেল এসে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—একটা কিছু ঘটেছে, তা বুঝতে পারছি। বলুন কুমুদবাবু!

কুমুদবাবু চিঠির ব্যাপারটা বলে রুমালে চোখ মুছলেন। কর্নেল বললেন,—চিঠিটা হালদারমশাই নিয়ে গেলেন কেন? চিঠিটা আমার দেখার দরকার ছিল।

কুমুদবাবু বললেন,—ওটা দীপুরই হাতের লেখা।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না। আপনি বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করুন। ঘুণাক্ষরে চিঠির কথা যেন আর কাউকেও জানাবেন না।

কুমুদবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—কৃষ্ণকান্তবাবু বাড়িতে নেই। উনি—

তাঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন,—কুমুদবাবু! কৃষ্ণকান্ত অধিকারীই আপনার ছেলে দীপুকে আটকে রেখেছে। কিন্তু সাবধান! একথাও যেন আপনি ছাড়া কেউ না জানতে পারে।

কুমুদবাবু চমকে উঠেছিলেন। তিনি মুখ নিচু করে একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বিষণ্ণমুখে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বাংলোর পশ্চিমদিকে গিয়ে বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গল দেখছিলেন। আমি বারান্দায় গিয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলুম। প্রায় পনেরো মিনিট পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। তিনি ঘড়ি দেখে বললেন,—লাঞ্চের সময় হয়েছে। আমরা লাঞ্চ খেয়ে নিয়ে বেরুব। হালদারমশাইয়ের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। উনি যখন খুশি ফিরে লাঞ্চ খাবেন।

বললুম,—ওঁর কোনও বিপদ হয়নি তো?

—বলা যায় না। হঠকারী আর জেদি মানুষ মাঝে মাঝে নিজেকে আগের মতোই পুলিশ অফিসার ভেবে বসেন, এটাই হালদারমশাইয়ের ব্যাপারে একটা সমস্যা।

বলে কর্নেল পোশাক বদলাতে বাথরুমে ঢুকলেন।

আরও আধঘণ্টা দেরি করে সওয়া একটায় আমরা খেয়ে নিলুম। তারপর দুটোর সময় কর্নেল চুরুটে শেষ টান দিয়ে বললেন,—জয়ন্ত! হালদারমশাই সম্ভবত কেষ্ট অধিকারীর ফাঁদে নিজের

অজ্ঞাতসারে পা দিয়েছেন। চলো! তাঁর খোঁজে বেরুনো যাক। সুরেনকে ডেকে নিচ্ছি। গড়ের জঙ্গল তার নখদর্পণে।

কর্নেল, সুরেন আর আমি প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে ডাইনে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল এবং বাঁদিকে সমান্তরালে নদী রেখে গড়ের ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছুলুম। সেখানে নদী পেরিয়ে পশ্চিম গড়ের ধ্বংসস্তূপে ঢুকলুম। কর্নেল এতক্ষণ বাইনোকুলারে চারদিক মাঝেমাঝে দেখে নিচ্ছিলেন। গড়ের ধ্বংসস্তূপের গোলকধাঁধায় ঢোকার পর তিনি বললেন,—সুরেন! দ্যাখো তো ওটা কী?

সুরেন এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতে একটা নোংরা রুমাল তুলে ধরল। আমি চমকে উঠে বললুম,—এটা দেখছি হালদারমশাইয়ের নাকের নস্যি-মোছা রুমাল!

আরও কিছুক্ষণ ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে এগিয়ে একখানে থেমে কর্নেল বললেন,—কী আশ্চর্য!

সুরেন বলে উঠল,—সার! ওই দেখুন, কারা সুড়ঙ্গের দরজায় কত বড় পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে!

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে ঝোপ সরিয়ে বললেন,—জয়ন্ত! সুরেন এসো, আমরা পাথরটা সরানোর চেষ্টা করি। কেষ্টবাবুর লোকেরা সুড়ঙ্গের ছোট্ট দরজাটা পাথর দিয়ে কেন বন্ধ করে গেছে, দেখা যাক।

বারো

সেই জগদ্দল পাথরটা সুড়ঙ্গের দরজা থেকে সরাতে ঠান্ডাহিম শীতের বিকেলে আমাদের শরীর প্রায় ঘেমে উঠেছিল। অনেক চেষ্টার পর পাথরটা একপাশে সরানো গেল মাত্র। তবে এবার অন্তত একজন সুড়ঙ্গে ঢোকার মতো ফোঁকর সৃষ্টি হল। কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিকে দেখে নিতে একটা স্তূপে উঠলেন। তারপর নেমে এসে বললেন,—এখন একটাই সমস্যা। ভিতরে ঢুকলে কেষ্টবাবুর কোনও লোক যদি সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকে, সে গুলি ছুড়তে পারে। আমরা আত্মরক্ষার সুযোগ পাব না।

বললুম,—ঠিক বলেছেন। আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারি কেষ্ট অধিকারী। কাজেই সুড়ঙ্গে তার লোক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বন্দি হালদারমশাইকে পাহারা দিতেই পারে।

সুরেন বলল,—সার! ওঁকে কেষ্টবাবুর লোকেরা ধরে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওঁকে সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওরা গুলি করে মারেনি তো?

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাইকে মেরে ফেলে কেষ্টবাবুর লাভ নেই। বরং ওঁকে বন্দি রেখে আমার কাছে মুক্তিপণ হিসেবে সেই বত্রিশের ধাঁধামার্কা জিনিসটা দাবি করবে। দীপু আর হালদারমশাই দুজনেই কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়েছেন। এতে কেষ্টবাবু আমার ওপর আরও চাপ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে!

সুরেন বলল,—সার! হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে—

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন,—হাড়মটমটিয়ার যুগ শেষ সুরেন! তুমি কি বুঝতে পারছ না কেষ্টবাবু তার চোরাকারবার নিরাপদে চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকদিন—হয়তো অনেকবছর ধরে বাঁকা ডাকাতকে কাজে লাগিয়েছিল? তার গলার কাছে আঁটা খুদে জাপানি টেপরেকর্ডারে মটমট শব্দ বাজিয়ে সে এমন একটা অবস্থা তৈরি করেছিল, যাতে ওই জঙ্গলে সন্ধ্যার পর এমনকী দিনের বেলাতেও লোকে ঢুকতে ভয় পায়।

বললুম,—কিন্তু বেলা পড়ে আসছে কর্নেল! কী করা উচিত এখনই ঠিক করা যাক।

সুরেন বলল,—একটা কথা ভাবছি সার! জঙ্গলের মধ্যে সুড়ঙ্গের অন্য দরজাটাও কি কেষ্টবাবুর লোকেরা এমন করে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে?

কর্নেল বললেন,—সুরেন! একটা কাজ করতে পারবে? এখান থেকে বেরুলে নদী পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণে সিধে ফাঁকা মাঠ। দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে রায়গড় থানায় যেতে পারবে?

সুরেন বলল—পারব সার!

—তাহলে এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে থানার ও.সি. তপেশবাবু কিংবা ডিউটি অফিসারের কাছে পৌঁছে দাও। তুমি একা এসো না। পুলিশের সঙ্গে আসবে।

বলে কর্নেল তাঁর জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা নোটবই বের করে একটা পাতায় দ্রুত চিঠি লিখে ফেললেন। তারপর নিজের একটা নেমকার্ড সুরেনকে দিলেন। সেই সঙ্গে নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে চিঠিটাও দিলেন। সুরেন পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ কর্নেল বললেন,—এক মিনিট। গড়ের জঙ্গল থেকে বেরুনোর পথে তোমার বিপদ হতেও পারে। চলো। আমি তোমাকে নদীর ধারে পৌঁছে দিয়ে আসি! জয়ন্ত! তুমি তোমার রিভলভার বের করে হাতে রাখো। আর এক কাজ করো। ওই স্তূপের কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকো। কেউ যেন তোমাকে না দেখতে পায়! সাবধান!

কর্নেল সুরেনকে নদীর ধারে পৌঁছে দিতে গেলেন। আমি কর্নেলের কথামতো রিভলভার হাতে নিয়ে সেই ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসলুম। অস্বীকার করব না, অজানা আতঙ্কে আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলুম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কেষ্টবাবুর অনুচররা আচমকা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হালদারমশাইয়ের মতো বন্দি করবে। রিভলভার তো হালদারমশাইয়ের কাছেও ছিল!

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। কর্নেলকে ফিরতে দেখে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আশা করি, তোমাকে ভূতেরা ঢিল ছোড়েনি?

বললুম,—না। আপনাকে ছুড়েছিল নাকি?

—ফেরার পথে ছুড়েছিল।

—সর্বনাশ! তাহলে কেষ্টবাবুর লোকেরা এখনও কাছাকাছি কোথাও আছে!

—আছে। বোকামি করে নিজেরাই সেটা জানিয়ে দিল।

—ভাগ্যিস ওরা গুলি ছোড়েনি!

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আমাকে আড়াল থেকে গুলি করে মারলে কেষ্টবাবু সেই মোগলাই রত্নকোষ আর পাবে না, তা ভালোই বোঝে। যাই হোক, পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা সামনেকার এই স্তূপে উঁচুতে বসে থাকি। সাবধানে উঠবে। পা পিছলে পড়ে গেলে হাড় ভেঙে যেতে পারে।

দুজনে একটা নগ্ন উঁচু ধ্বংসস্তূপে উঠে বসলুম। নিরেট পাথরে ঠাসা এই ধ্বংসাবশেষে কোনও উদ্ভিদ গজাতে পারেনি। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। দূরে কুয়াশা ঘনিয়েছে। চারদিকে এতক্ষণে পাখিদের দিনশেষের কল-কাকলি শোনা যাচ্ছিল।

কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখছিলেন। ঘড়ি দেখলুম, চারটে বাজে। এত শিগগির এখানে শীতের দিন ফুরিয়ে যায় কেন? একটু পরে বুঝতে পারলুম, কুয়াশার জন্যই রোদ্দুর এত ম্লান হয়ে গেছে। আধঘণ্টা পরে কর্নেল বাইনোকুলারে পূর্বদিক দেখতে দেখতে বললেন,—বাঃ! তপেশবাবুরা এসে গেছেন! এসো, নেমে পড়া যাক।

আমরা সবে স্তূপ থেকে নেমেছি, হঠাৎ দেখি, সুড়ঙ্গের দরজার ফোকর দিয়ে লাল ধুলো মাখা চুল আর একটা মুখ উঁকি দিচ্ছে। কর্নেল ছুটে গিয়ে বললেন,—হালদারমশাই! আপনাকে কেষ্টবাবুর লোকেরা ছেড়ে দিল তাহলে?

হালদারমশাইয়ের মুখে টেপ আঁটা আছে। কর্নেল টেপ টেনে খুলতেই উনি উহু হু হু করে

উঠলেন যন্ত্রণায়। তারপর বললেন,—আমার হাত দুইখান পিছনে বাঁধা আছে। আমারে উঠাইয়া লন।

ওঁকে কর্নেল এবং আমি দুদিক থেকে ধরে টেনে বের করলুম। কর্নেল কিটব্যাগ থেকে ছুরি বের করে হাতের বাঁধন কেটে দিলেন। গোয়েন্দাপ্রবরের সারা শরীরে লাল ধুলোকাদা মাখা। একটু ধাতস্থ হয়ে তিনি বললেন,—সবখানে হালারা আমারে বান্ধে ক্যান? আচমকা আমার উপর ঝাঁপ দিয়া—ওঃ!

কর্নেল বললেন,—আপনাকে বেঁধে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়েছিল। সুড়ঙ্গের মধ্যে দীপুকে দেখলেন?

—অরে দেখছি। অরে বান্ধে নাই। টর্চের আলো জ্বালছিল কেষ্টবাবু। তারে চিনছিলাম। কিছুক্ষণ আগে উলটাদিক থেইক্যা টর্চ জ্বালাতে-জ্বালতে কেউ আইয়া কইল, স্যার! গতিক ভালো না। সুরেনেরে দৌড়াইয়া যাইতে দেখছি। হয়তো থানায় খবর দিতে গেল। সুড়ঙ্গের পশ্চিমের দরজায় পাথর আটকানো ঠিক হয় নাই। তখন কেষ্টবাবু কইল, এই টিকটিকিটা এখানে বান্ধা থাক। চলো, দীপুকে লইয়া আমরা জঙ্গলের মধ্যে যাই। অরা পলাইয়া গেল। আমার দুই পাঁও বান্ধা ছিল। দেওয়ালের একখানে পাথরের ইট এট্টুখান উঁচু ছিল। সেখানে আন্ধারে পাঁওয়ের দড়ি ঘষতে-ঘষতে যখন ছিঁড়ল, তখন খাড়া হইলাম।

এইসময় তপেশবাবু সদলবলে এসে পড়লেন। তিনি হালদারমশাইকে বললেন,—এ কী অবস্থা মিঃ হালদারের। সুরেনের মুখে অবশ্য ওঁর রুমাল কুড়িয়ে পাওয়ার কথা শুনেছি।

কর্নেল বললেন,—জঙ্গলে সুড়ঙ্গের পূর্ব দরজার কাছে আপনার লোকেরা আছে তো?

ও.সি. তপেশ স্যান্যাল বললেন,—আপনার চিঠি পেয়ে প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে দুজন অফিসার আর ছ'জন আর্মড কনস্টেবলকে পাঠিয়েছি। ওঁরা গেছেন জিপগাড়িতে। খেলার মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে জিপগাড়ি চলার অসুবিধে নেই। কাল রাত্রেই সেটা লক্ষ করেছিলাম। ঝোপঝাড় কোনও বাধা নয়। এবার বলুন, কী করব? সুড়ঙ্গের দরজার পাথরটা পুরোপুরি সরিয়ে ফেলার পর সুড়ঙ্গে ঢুকলে কেষ্টবাবুর লোকেরা যদি গুলি ছোড়ে, তাহলে আমাদের কারও না-কারও প্রাণের ঝুঁকির প্রশ্ন আছে।

কর্নেল কিছু বলার আগেই হালদারমশাই বলে উঠলেন,—কেষ্টবাবু আর তার দুইজন লোক দীপুরে লইয়া উলটোদিকে পলাইয়া গেছে।

তপেশবাবু বললেন,—কতক্ষণ আগে?

—আধঘণ্টার বেশি! কী জানি, ঠিক টাইম স্মরণ হয় না!

—তাহলে তো ওরা পুলিশফোর্স যাওয়ার আগেই পালিয়ে গেছে!

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—এক কাজ করা যাক। পাথরটা সুড়ঙ্গের দরজায় আটকে দিয়ে পুলিশফোর্স আশেপাশে ঝোপে গা-ঢাকা দিয়ে থাক। গড়ের এই জঙ্গলে কেষ্টবাবুর লোকেরা কিছুক্ষণ আগেও ছিল। এখন আপনাদের দেখে পালিয়ে যেতেও পারে। আবার পুলিশ চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারে। আপনি একজন অফিসারকে সেইমতো নির্দেশ দিন। কেষ্টবাবুর লোকেদের সামনে পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি নেবেন।

—তারপর?

—তারপর আর কী? চলুন, আমরা জঙ্গলে সুড়ঙ্গের পূর্ব দরজার কাছে যাই। কী ঘটেছে, এখনই জানা দরকার।

তপেশবাবু একজন অফিসারকে ডেকে সেইমতো নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, —কর্নেলসায়েব! ওখানে আমাদের একজন অফিসারের কাছে কর্ডলেস টেলিফোন আছে। এখনও

কোনও সাড়া পাচ্ছি না। তার মানে, হয় কেষ্টবাবুরা আগেই কেটে পড়েছে, নয়তো পুলিশের জিপের শব্দ শুনে সুড়ঙ্গে লুকিয়েছে। আমি ফোন করে দেখি বরং।

তপেশবাবুর হাতে কর্ডলেস টেলিফোন ছিল। ডায়াল করে একটা সাংকেতিক নম্বর বললেন। তারপর কানের কাছে ফোনটা ধরে কিছু শোনার পর বললেন,—ওকে! ওকে! আমরা যাচ্ছি!

ফোন নামিয়ে তিনি বললেন,—এস. আই. মিঃ মিত্র বললেন, সুড়ঙ্গের দরজার ওপর ঘন ঝোপ আর লতাপাতা আছে। তার ফাঁকে তিনি একটা মুখ দেখতে পেয়েছেন। তাঁকে দেখামাত্র মুখটা অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—তার মানে, ওরা এখনও বেরোতে পারেনি। শিগগির চলুন তপেশবাবু! সুড়ঙ্গে গুলির লড়াই করার বিপদ আছে। ওখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

আমরা গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে পুলিশভ্যানের কাছে পৌঁছুলুম। তপেশবাবু পুলিশভ্যানের ড্রাইভার এবং দুজন সশস্ত্র গার্ডকে ওখানে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর সোজা এগিয়ে গেলেন। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। কর্নেল আস্তে বললেন,—আমাদের আর একটু ডানদিকে গিয়ে নিঃশব্দে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।

এই সময় তপেশবাবুর টেলিফোন বিপ-বিপ শব্দ হল। তিনি কর্ডলেস ফোনটা কানের কাছে ধরে সাড়া দিলেন। তারপর কর্নেলকে চাপাস্বরে বললেন,—সাংঘাতিক লোক কেষ্টবাবু! দীপুর কানের কাছে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েছে। তার দুই সঙ্গী তার পিছনে আছে। কেষ্টবাবু বলছে, তাদের যেতে না দিলে দীপুর মাথায় গুলি করবে। তারপর পুলিশ তাদের গুলি করে মারুক। তাতে পরোয়া নেই।

কর্নেল দিনশেষের ম্লান আলোয় বাইনোকুলারে জঙ্গল দেখে নিয়ে বললেন,—চিনতে পেরেছি। ওই ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে উঠতে হবে। শীতের সময়। তাই ঝরাপাতায় পায়ের শব্দ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঝোপঝাড়ের ভিতর ঝরাপাতার উপদ্রব নেই।

কর্নেলের পিছনে সুরেন, তপেশবাবুর পিছনে আমি এবং আমাদের ডানপাশে হালদারমশাই—এইভাবে গুঁড়ি মেরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বন্য প্রাণীদের মতো আমরা ঢাল বেয়ে উঠে গেলুম। কর্নেল, তপেশবাবু, হালদারমশাই আর আমার হাতে উদ্যত গুলিভরা রিভলভার। এইসময় জঙ্গলে শীতের হাওয়া বইছিল। এতে আমাদের সুবিধেই হল। একখানে কর্নেল থেমে গেলেন। আমরাও থেমে গেলুম। তারপর সত্যিই এক সাংঘাতিক দৃশ্য চোখে পড়ল।

সুড়ঙ্গের দরজার বাইরে কেষ্ট অধিকারী সুরেনের বয়সি একটি ছেলের কানের পাশে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে এক পা-এক পা করে সামনে এগোচ্ছে। তার দুপাশে দুটো ষণ্ডামার্কা লোকের হাতে বিদেশি রাইফেল বলেই মনে হল। তারা পুলিশের দিকে সেই রাইফেল তাক করে এগোচ্ছে। দুজন পুলিশ অফিসার রিভলভার এবং কনস্টেবলরা রাইফেল উঁচিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পজিশন নিয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে আগ্নেয়াস্ত্রের সংঘর্ষ শুরু হবে, এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। তারপর কেষ্টবাবু চাপাগলায় গর্জে উঠল,—আমরা মরব। তার আগে কুমুদমাস্টারের ছেলে মরবে। এখনও ভেবে দ্যাখো পুলিশবাবুরা! ভালোয়-ভালোয় আমাদের যেতে দাও! দেখছ তো? আমার দুই সঙ্গীর হাতে অটোমেটিক কালাশ্‌নিকভ রাইফেল। প্রতি সেকেন্ডে দুটো করে গুলি বেরোয়। তোমরা গুঁড়ো হয়ে যাবে।

হঠাৎ অন্য একটা ঘটনা ঘটে গেল। হালদারমশাই কখন এগিয়ে গেছেন গুঁড়ি মেরে, তা লক্ষ করিনি। তিনি আচম্বিতে ঝাঁপ দিলেন কেষ্ট অধিকারীর ওপরে। কেষ্টবাবু তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হল। এদিকে কর্নেল ও তপেশবাবুও কেষ্টবাবুর দুই সঙ্গীর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদের কালাশ্‌নিকভ রাইফেল দুটো দুজন পুলিশ অফিসার দ্রুত এসে জুতোর নিচে চেপে ধরলেন। দুজনে ধরাশায়ী হল।

এবং কেষ্টবাবুর মতোই তাদের পিঠেও সশস্ত্র এবং ওজনদার দুজন মানুষ কর্নেল এবং ও.সি. তপেশ সান্যাল। কেষ্টবাবুর রিভলভার ছিটকে পড়েছিল। হালদারমশাই তার রিভলভারটা দেখিয়ে দীপুর উদ্দেশ্যে বললেন,—এই পোলাটা কী করে! খাড়াইয়া আছ ক্যান? কেষ্টবাবুর ফায়ার আর্মস কুড়াইয়া লও!

দীপু তবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সুরেন লাফিয়ে এসে কেষ্টবাবুর রিভলভারটা কুড়িয়ে নিল। তারপর ফিক করে হেসে দীপুকে বলল,—হ্যাঁ রে! তুই তো গিয়েছিলি হাফপ্যান্ট স্পোর্টিং গেঞ্জি পরে। ফিরলি সোয়েটার আর ফুলপ্যান্ট পরে। কে কিনে দিল?

দীপু এবার আড়ষ্টভাবে হেসে বলল,—চট্টরাজসায়েব!

ততক্ষণে ধরাশায়ী কেষ্ট অধিকারী এবং তার দুই সঙ্গীকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়েছে। তপেশবাবু বললেন,—মিত্রবাবু! সাবধানে আসামীদের নিয়ে যান। আমি গড়ের জঙ্গল থেকে পুলিশফোর্সকে কলব্যাক করি। আমি নিচে গিয়ে ভ্যানে ফিরব। কর্নেলসায়েব—

কর্নেল দ্রুত বললেন,—আমি কফি খেতে বাংলোয় ফিরব। দীপুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। সুরেন, ওর বাবাকে তুমি গিয়ে খবর দাও। চলো দীপু!

তপেশবাবু একটু হেসে বললেন,—আপনি এবং দীপু, দুজনকেই আমাদের দরকার হবে।

—জানি। আজ রাতেই আমাদের সবাইকে আপনি কেষ্ট অধিকারী অ্যান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পেয়ে যাবেন। অবসরপ্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক ডঃ দেবব্রত চট্টরাজকে বরং রাজসাক্ষী করার ব্যবস্থা আমি কলকাতায় ফিরেই করব। চলি!

বাংলোয় ফেরার পর চৌকিদার নাখুলাল দীপুকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—দীপুবাবু! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? কর্নেল বললেন, সুরেন দীপুর বাবাকে খবর দিতে গেছে। নাখুলাল! শিগগির কফি চাই! আর আমাদের হালদারমশাইয়ের জন্য এক বালতি গরম জলও চাই। উনি গেরুয়া ধুলো মেখে খাঁটি সায়েব হয়ে গেছেন।

হালদারমশাই বললেন,—খুব ধস্তাধস্তি বাধছিল। এরা চারজন। আমি একা।

কিছুক্ষণ পরে কফি খেতে-খেতে কর্নেল বললেন,—তুমি কফি খাচ্ছ না কেন দীপু? কফি খেলে নার্ভ চাঙ্গা হবে। কফি খাও। আজ খেয়েছ?

দীপু বলল,—দুপুরে সুড়ঙ্গের মধ্যে খাবার এনেছিলেন কেষ্টবাবু। আমার খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হয়নি। শুধু উপেনদা আমাকে বস্তির একটা ঘরে গোবিন্দের কাছে আটকে রেখেছিল। সে আমাকে ড্যাগার দেখিয়ে হুমকি দিত। বাইরে থেকে তালা এঁটে রাখত।

—তুমি সেখান থেকে পালিয়েছিলে কী করে?

—এক রাত্রে গোবিন্দ মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় সেই ঘরে শুতে ঢুকেছিল। ভেতর থেকেও রোজ রাত্রে তালা এঁটে দিত। সে রাত্রে সে তালা আঁটতে ভুলে গিয়েছিল। খুব নেশা হয়েছিল তার। সেই সুযোগে আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম। ডঃ চট্টরাজের নেমকার্ডের ঠিকানা আমার মুখস্থ ছিল। খুঁজে-খুঁজে তাঁর বাড়ি গেলুম। তাঁকে বত্রিশের ধাঁধার অঙ্কটা দিলুম। কিন্তু উনি আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করতেন। বলতেন, উপেন দত্তের লোকেরা তোমাকে খুঁজছে। পরে বুঝেছিলুম, উনিও আমাকে আটকে রেখেছেন।

—হুঁ। বাকিটা আমার জানা। তোমার বত্রিশের ধাঁধার অঙ্কটা তোমার একটা বইয়ের ভিতরে পেয়ে গেছি। এই দ্যাখো!

কর্নেল কিটব্যাগ থেকে একটা ভাঁজকরা পুরনো কাগজ দেখালেন। দীপু বলল,—কিন্তু রত্নকোষ তো পাওয়া যায়নি।

কর্নেল বললেন,—রত্নকোষের কথা থাক। চুপচাপ কফি খাও। তোমার বাবা এলে একসঙ্গে

আমরা থানায় যাব। তারপর আজ রাত একটার ট্রেনে কলকাতা ফিরব। তোমার আর কোনও বিপদ হবে না।

একটু পরে কুমুদবাবু এলেন সুরেনের সঙ্গে। তিনি দীপুকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন।

❑

পুলিশের গাড়ি কর্নেল, হালদারমশাই এবং আমাকে সেই রাত্রে রায়গড় স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। কলকাতায় ফেরার পর সেইদিন বিকেলে কর্নেল আমাকে এবং হালদারমশাইকে হাজরা রোডে কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায়ের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

অজয়েন্দুবাবু কর্নেলকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন,—বলুন কর্নেলসায়েব! আপনার অভিযান সফল হয়েছে তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—অভিযান সফল! কিন্তু একটা কথা। আপনি কি জানতেন কৃষ্ণকান্ত অধিকারী নানা অঞ্চলে জঙ্গিদের কাছে চোরা বিদেশি অস্ত্র পাচারের কারবার করত?

অজয়েন্দুবাবু আঁতকে উঠে বললেন,—কী সর্বনেশে কথা! ঘুণাক্ষরে টের পাইনি তো!

—যাই হোক, কেষ্টবাবু সদলবলে ধরা পড়েছে। আপনাকে পরে বিস্তারিত বলব। আপাতত একটা গোপন কাজকর্ম করতে চাই। আপনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিন। বাইরে যেন কেউ না থঅকে।

কুমারবাহাদুর বেরিয়ে গিয়ে সেইমতো ব্যবস্থা করে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। তাঁকে চঞ্চল দেখাচ্ছিল। তিনি চাপাস্বরে বললেন,—সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করতে পেরেছেন কি?

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ থেকে প্রথমে খবরের কাগজের প্যাকেটে ভরা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা তাঁকে দিলেন। তারপর বললেন,—এবার আপনাকে যে জিনিসটা দেব, সেটা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষ সেই জিনিসটা মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন।

বলে তিনি কিটব্যাগ থেকে প্যাকেটে ভরা একটা জিনিস বের করলেন। দেখামাত্র চিনতে পারলুম, এটা হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে উপেন দত্তের মৃতদেহের কাছে নগ্ন মাটি খুঁড়ে সুরেন বের করেছিল। কর্নেল মেটাল ডিটেক্টরে এটারই খোঁজ পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে খুলে বলেননি। আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে থেকেছেন।

প্যাকেটের ভিতর থেকে ছোট্ট চৌকোগড়নের কালো জিনিসটা কর্নেল বের করে বললেন, —এটা একটা রত্নকোষ। এটার কথাই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে আছে। এবার দেখুন, আমি বত্রিশের ধাঁধার সূত্র অনুসারে এটা খুলছি। তবে ধাঁধার জট ছাড়ানোর কৃতিত্ব আমার নয়, কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্যের ছেলে দীপুর। এই ছকের উল্লেখ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে আভাসে ছিল। এই দেখুন!

কর্নেল পকেট থেকে দীপুর বইয়ের ভিতরে পাওয়া কাগজটা টেবিলে মেলে ধরলেন। বললেন, —এক থেকে পনেরো পর্যন্ত সংখ্যা 'চতুষ্ক' পদ্ধতিতে এমন সাজাতে হবে, যে-কোনও দিকের যোগফল বত্রিশ হয়। দীপু সেই বত্রিশের ধাঁধার জট কীভাবে খুলেছে লক্ষ করুন।

	৩২	৩২	৩২	৩২	
৩২	১	৮	৯	১৪	৩২
৩২	১১	১২	৩	৬	৩২
৩২	৭	২	১৫	৮	৩২
৩২	১৩	১০	৫	৪	৩২
	৩২	৩২	৩২	৩২	

অজয়েন্দুবাবু রত্নকোষটি দেখে বললেন,—প্রায় তিনশো-চারশো বছরের এই জিনিসটা এখনও পরিষ্কার আছে দেখছি!

কর্নেল বললেন,—পরিষ্কার ছিল না। আমি ব্রাশের সাহায্যে লোশন দিয়ে এটাকে পরিষ্কার করেছি। এবার এই আতশ কাচের সাহায্যে নাগরি অক্ষরে লেখা সংখ্যাগুলো দীপুর ছক অনুসারে টিপে যাচ্ছি। চারদিক থেকে সংখ্যাগুলো চারবার টিপলে রত্নকোষটা খুলে যাবে।

কর্নেল সাবধানে তর্জনীর চাপে রত্নকোষের পর পর লেখা ১ থেকে ১৫টি সংখ্যা একে একে ছক অনুসারে চারদিকে থেকে চারবার পর-পর টিপলেন। অমনই রত্নকোষটা খুলে দুভাগ হয়ে গেল। আমরা দেখলুম, ভিতরে রংবেরঙের একটি রত্নমালা ঝলমল করে উঠল। কর্নেল মালাটি তুলে বললেন,—হীরা-চুনি পান্না মুক্তা সাজানো ঐতিহাসিক মালা। এখন এর দাম হয়তো বহু লক্ষ টাকা। এই মালা মোগল সোনাপতি রাজা মানসিংহ্ আপনার পূর্বপুরুষকে উপহার দিয়েছিলেন। অতএব আইনত এটা আপনারই প্রাপ্য।

বলে তিনি রত্নমালাটি কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। হালদারমশাই সহাস্যে বলে উঠলেন,—কী কাণ্ড! এমন একখানা হিস্টোরিক্যাল জুয়েলের জন্য যুদ্ধ বাধবে না ক্যান?

অজয়েন্দুবাবু রত্নমালা গলা থেকে খুলে কর্নেলকে দিয়ে বললেন,—আবার আগের মতো রত্নকোষে এটা ভরে দিন। আমি আয়রনচেস্টে লুকিয়ে রাখব। তারপর আপনাকে ডেকে আবার এটা বের করে বিক্রি করব। সেই টাকায় একটা অনাথ আশ্রম খুলব।

কর্নেল মালাটা আগের মতো রত্নকোষে সাজিয়ে দুটো ঢাকনা টিপে ধরলেন। রত্নকোষ আবার বন্ধ হয়ে গেল। কর্নেল টানাটানি করে দেখে বললেন,—আবার বত্রিশের ধাঁধার জট না ছাড়াতে পারলে এটা খুলবে না। কাজেই দীপুর এই কাগজটা রেখে দিন। আর-একটা কথা, কুমুদবাবু গরিব মানুষ। দীপুর পড়াশুনার জন্য—

তাঁর কথার ওপর অজয়েন্দুবাবু বলে উঠলেন,—দীপুর উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব আমার। কুমুদকে আজই লিখে পাঠাচ্ছি। এবার এটা আমি আয়রনচেস্টে রেখে আসি। তারপর কফি খেতে-খেতে আপনার কাছে সব কথা শুনব।

উনি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলে হালদারমশাই বললেন,—কথাটা বলি নাই। এবার বলি। কেষ্টবাবুর পিঠে চাপছিলাম। তখনই ট্যার পাইছিলাম, অর পিঠে একখানা আব আছে। কুঁজও কইতে পারেন। কুঁজে হেভি প্রেসার দিছিলাম।

কর্নেল কথাটা শুনে অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

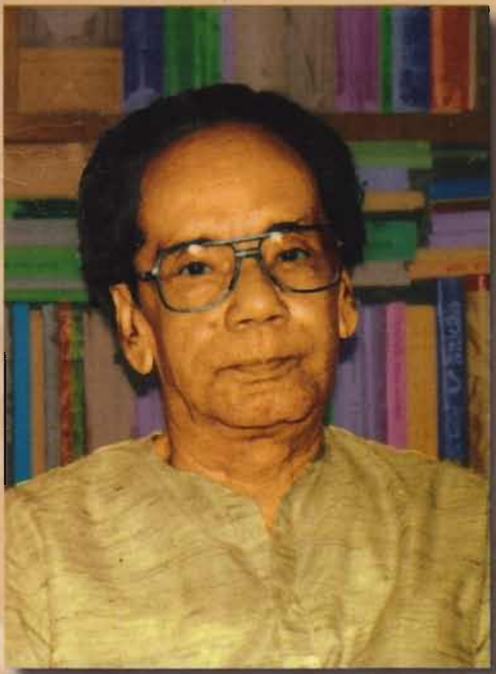

রহস্য কাহিনির নায়ক হিসেবে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। বয়সে তিনি বৃদ্ধ কিন্তু শরীরে যুবকের শক্তি। নেশা প্রজাপতি-পাখি-ক্যাকটাস-অর্কিড। বাতিক অপরাধ রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে লেখা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটদের জন্য কর্নেলের অজস্র রহস্য গল্প ও উপন্যাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা জায়গায়। এবার সেগুলি এক মলাটের মধ্যে এনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের এই প্রয়াস।